অগ্নিসংস্কার—

প্রধূমিত বহ্নি

অগ্নিসংস্কার—

প্রধূমিত বহ্নি

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রাপ্তিস্থান—
রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

সংহতি পাবলিশিং হাউস, ২০৩।২ বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ—১৩৫৩

মূল্য চার টাকা মাত্র

পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৭, মধু রায় লেন, কলিকাতা
হইতে যামিনীমোহন ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

ভাবী কালের মেয়েকে

১৯৪২ সালের আগষ্ট বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী পড়েছি, অনেক কথা শুনেছি, কিছু কিছু নিজের চোখেও দেখেছি। পরে ঐ বিদ্রোহেরই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়ে জেলের মধ্যে কাজের অভাবে মন যখন হাঁফিয়ে উঠেছিল, কিছু একটা করবার জন্যই তখন টুকরা টুকরা সেই সব স্মৃতি, অনুভূতি আর উপলব্ধি একত্র গেঁথে এই গল্প রচনা করি। কোনও রাজনৈতিক দলেরই সপক্ষে বা বিপক্ষে প্রচার করবার অভিসন্ধি এতে নেই। এতে সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক সত্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কল্পিত গল্পের সত্যই ঐতিহাসিক সত্যের চেয়ে বড়।

গল্পটি দীর্ঘ। নানা কারণে একে দুই পর্ব্বে ভাগ করতে হয়েছে। প্রত্যেক পর্ব্বেই একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে; তথাপি দুটি পর্ব্ব একত্র করেই আমার সম্পূর্ণ গল্প। 'প্রধূমিত বহ্নি'তে যার আভাস মাত্র দেওয়া গিয়েছে, তার পরিণতি 'ভস্মাবশেষ'। সে কথাটা পাঠক আর সমালোচককে আগেই বিনীত ভাবে জানিয়ে রাখছি।

গল্পের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ এই যে, বাংলা ভাষায়ও আজকাল সুদীর্ঘ গল্প লেখা এবং ছাপা হচ্ছে,—আমি মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি মাত্র।

কলিকাতা
৯ই আগষ্ট, ১৯৪৬

মণীন্দ্র রায়

অগ্নিসংস্কার

(১)

শনিবারের বাজার।

আর ঘণ্টাকয়েক পরেই হুগলী জিলার এই কারখানাঅঞ্চলটা নাচে, গানে, আনন্দে ও উৎসবে দুলে উঠবে। পথের ধারে ধারে মেলা বসে যাবে। শহর থেকে দোকানী পসারী আসবে দলে দলে; দূর থেকে আসবে বাজীকর; পেশাদার নর্ত্তকী এসে পথের ধারেই তার নাচ-গানের আসর জমিয়ে তুলবে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে রঙের আগুন; গন্ধে ও শব্দে বাতাস ভারী হয়ে উঠবে। ভাটিখানার প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে মদমত্ত পরুষ কণ্ঠের সরস সঙ্গীত তাল-লয়ের বন্ধন কাটিয়ে উদ্দাম হয়ে উঠবে; আবার সঙ্গে সঙ্গেই অনতিদূরের ব্যারাকে ব্যারাকে ঘন হয়ে জমে উঠবে ঢোলক আর করতাল সহযোগে অমার্জ্জিত গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত রামায়ণ বা হরিনাম কীর্ত্তন।

তারপর আসবে রাত। নিষ্প্রদীপের মুখোশপরা অন্ধকার আরও বেশী কালো হয়ে দেখা দেবে। ওরই উদার ও নিরাপদ আবরণের নীচে মানুষের লজ্জা ও সঙ্কোচের হাল্‌কা অন্তরবাসের অবশিষ্ট বন্ধনটুকুও টুপটুপ করে খসে পড়বে। বাইরের আলোকের অভাবের ক্ষতিপূরণ করে মনের ভিতরে গোলাপী আমেজটুকু রাঙা হয়ে, তপ্ত হয়ে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠবে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া গিয়ে উঠবে মাথায়। তখন আর কোন বাধা থাকবে না। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদমত্ত নারীকণ্ঠ বিকট উল্লাসে বেসুরের কসরৎ সুরু করে দেবে। উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জোয়ার ছুটবে তরতর বেগে। সঙ্গীত কোলাহল হয়ে উঠবে; কোলাহল ধাপে ধাপে উঠে যাবে

কলহের পর্য্যায়ে। মুখের সঙ্গে হাত চলবে; কুৎসিৎ, কুশ্রাব্য গালাগালির সঙ্গে চলতে থাকবে শাণিত ছুরিকা। কতজনের মাথা ফাটবে, খানায় পড়ে কতজনের হাত-পা ভাঙবে, অকারণে নির্য্যাতিতা মাতাল স্বামীর সাধ্বী স্ত্রীর তীক্ষ্ণ, আর্ত্ত ক্রন্দনধ্বনি শেষ রাত পর্য্যন্তও থেকে থেকে নৈশ প্রকৃতির স্তব্ধ শান্তিকে কাঁপিয়ে তুলতে থাকবে।

আজ শনিবার—মজদুরের সাপ্তাহিক হোলির বীভৎস উৎসবের দিন। কাল ছুটি; আজ 'হপ্তা' পাওয়া গিয়েছে। বাইরের বাঁধন আল্‌গা হতেই ভিতরের পশুটার মুখের বল্‌গা গিয়েছে খুলে। সামনে তার খোলা মাঠ,—সে ছুটে বেরিয়ে পড়বে উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে। ভোগশক্তিকেই পঙ্গু করে সংসারের সর্ব্বহারার দল জীবনকে আজ উপভোগ করবে,—শূন্য পাত্রের তলানীটুকুকে পর্য্যন্ত তারা নিঃশেষে পান না করে ছাড়বে না,—ক্ষণিকের বিস্মৃতির মধ্যে ব্যর্থ জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করবার জন্য অন্ধ আবেগে তরল আগুন গলায় ঢেলে মিইয়ে-পড়া স্নায়ুগুলিকে জিইয়ে তুলে তারা আজ উন্মত্ততার কদর্য্য, পূতিগন্ধময় পঙ্ককুণ্ডে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তারই আয়োজন ব্যারাকে ব্যারাকে, বস্তিতে বস্তিতে এখনই সুরু হয়ে গিয়েছে। বাক্সের ভিতর থেকে ধোপার ধোয়া জামা-কাপড় বের করা হয়েছে। মাচার উপর থেকে ঢোলক নেমে এসেছে নীচে। কলতলায় ঘষে ঘষে সাবান মেখে স্নান চলেছে মহাসমারোহে। মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘরে ঘরে পুরুষেরাও সাড়ম্বরে প্রসাধন সুরু করে দিয়েছে। চারদিকেই আজ একটা অসাধারণ সমারোহ; বাতাসেও আজ যেন একটা উৎসবের আমেজ।

কারখানার ছুটি হয়ে গিয়েছে ঘণ্টাখানিক আগেই। বৈকালে আর কাজ হবে না, রাতেও নয় এবং আগামীকালও নয়। যন্ত্রদানবের হৃদ্‌পিণ্ডটা এখন একেবারেই স্তব্ধ,—বয়লারের বিরাট জঠরে কয়লার খোরাক আর পড়েনি। ভিতরে লোকজন একেবারেই নেই। কারখানার প্রকাণ্ড ফটকটা এখন বন্ধ। বাইরে দারোয়ান টুলের উপর বসে ঝিমুচ্ছে—বেচারা দারোয়ান বলেই আজকের দিনেও ছুটি পায়নি।

আর ছুটি পায়নি কারখানার হাসপাতালের নার্স সুভদ্রাদেবী। তার হাতের কাজ এখনও শেষ হয়নি।

জেমসন-টমসন কোম্পানীর লোহার কারখানা যেমন বড়, তেমনি নামকরা। অনেকদিনের কারখানা, ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। এখন যুদ্ধের বাজারে আয়তনেও যেমন বেড়েছে, গুরুত্বেও তেমনি। মেয়ে-পুরুষে মিলিয়ে হাজার তিনেক মজদুর এখানে খাটে; দিন-রাত সমানে কাজ চলে; লাভ হয় বিস্তর।

এই কারখানারই হাসপাতালের নার্স সুভদ্রা,—বছর তিনেক যাবৎ এখানে সে কাজ করছে।

সেদিন শেষরাত্রেই হাসপাতালে সুভদ্রার ডাক পড়েছিল—ব্যারাক থেকে কোন এক মজদুরের আসন্নপ্রসবা যুবতী স্ত্রী অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে দায়মুক্ত হতে এসেছে। সুভদ্রা চা'টুকু পর্য্যন্ত খেয়ে আসতে পারেনি,—খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে এসেছিল। সেই থেকে সে নিশ্বাস ফেলবারও অবসর পায়নি।

ষোল-সতর বছর বয়সের হিন্দুস্থানী রোগা মেয়েটি প্রথম প্রসবের অসহ্য যন্ত্রণায় প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। সুভদ্রার চোখের সামনেই কি তার কাতরানি আর কি আর্ত্তনাদ! কখনও কাটা ছাগলের মুণ্ডহীন ধড়টার মত তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহটা খাটের উপর থেকে ছিটকে মাটিতে গিয়ে পড়েছে; আবার কখনও খাটের উপরেই শূলবিদ্ধ সাপের মত অক্ষম ক্রোধে কুণ্ডলী পাকিয়ে গোঁ গোঁ করে আর্ত্তনাদ করেছে সে। মাঝে মাঝে হয়ে গিয়েছে যেন পাগল। সুভদ্রা ধরতে এলে তাকে সে সজোরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, বেচারী ঝিকে মেরেছে লাথি, স্বামীকে উদ্দেশ করে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করেছে, বিয়ে দেওয়ার অপরাধের জন্য বাপকে দিয়েছে অভিশাপ, অনাগত সন্তানের মৃত্যুও কামনা করেছে। তারপর আবার সুভদ্রার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে আর্ত্তকণ্ঠে আবেদন করেছে—দিদিমণি, বিষ নেই তোমাদের? একটু আমার গলায় ঢেলে দিতে পার না—শুধু একটি ফোটা!

সুভদ্রাকে সবই সইতে হয়েছে,—সে তো কেবল শিক্ষিতা ধাত্রীই নয়, সে যে এ অঞ্চলের সকলেরই আদর ও আশ্রয়ের দিদিমণিও। সে একাই

মেয়েটির চিকিৎসা করেছে, শুশ্রূষা করেছে, আবার পরম আত্মীয়ার মত তাকে আশ্বাস এবং সান্ত্বনাও দিয়েছে। মাথা ঠিক রেখে, স্নায়ু ও পেশীগুলিকে লোহার মত শক্ত করে, সমগ্র অন্তরকে দুটি চোখের স্থির দৃষ্টির মধ্যে একাগ্র করে, জীবনের সমস্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দস্তানাপরা হাতদুখানির মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে ক্লেদ ও রক্তের ছোটখাটো একটি নরককুণ্ডের মধ্যে হাটু গেড়ে বসে শিক্ষিতা ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না ধাত্রীর কর্ত্তব্য তাকে সুচারুরূপেই সম্পন্ন করতে হয়েছে।

অবশেষে নিরাপদেই দুজন দু'ঠাঁই হয়ে গেল। নবজাত শিশু কেঁদে উঠল। প্রসূতীর তখন অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থা। সুভদ্রা চট্ করে তাকেও একবার পরীক্ষা করে নিলে,— বুঝলে যে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। দ্বিগুণ উৎসাহে সে তখন যথাশাস্ত্র শিশুর পরিচর্য্যা সুরু করে দিলে।

শিশু তো নয় যেন পাখা-ছাড়ানো একটা মুরগী বা হাঁস,—বিবর্ণ, কদাকার, জীবন্ত একটা মাংসপিণ্ড। তথাপি গরম জলের গামলা থেকে তুলে শুকনো কাপড় দিয়ে তার গা মুছিয়ে দেবার পর সুভদ্রা ঐ শিশুর দিকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। শিশুপালনের এই অভিজ্ঞতা তার জীবনে আজ নূতন নয়—কত নবজাত শিশুকেই সে এমন করে ধুইয়ে এবং মুছে তাদের মায়ের কোলে তুলে দিয়েছে। কিন্তু আজ এই অতি সাধারণ শিশুর মুখের উপর থেকেও তার চোখ যেন ফিরতে চাইল না। একটা নবলব্ধ অনুভূতি তার ঐ চোখদুটিতে হঠাৎ যেন একটা নেশা ধরিয়ে দিলে,— নূতন অভিজ্ঞতার রঙ ঠিকরে গিয়ে পড়ল পুরাতনের মুখের উপর। আর একজনের নবজাত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে একটি অনাগত শিশুর কথা সুভদ্রার মনে পড়ে গেল,—তার নিজের সন্তান যার আগমনের আভাষ-টুকু মাত্র সে পেয়েছে। নবজাত শিশুর মুখের উপর তার কৌতূহলী চোখ-দুটি স্থির হয়ে পড়ে রইল আর তার সক্রিয় মন রঙ আর রসের উপাদান দিয়ে ক্রমাগত জাল বুনতে বুনতে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলল,—অদূর ভবিষ্যতেই ঐ হিন্দুস্থানী মেয়েটির মতই তারও জীবনের পরম শুভদিন আসবে; দুঃসহ বেদনার ভিতর দিয়ে অন্তরের নীবিড় আনন্দ রূপে এবং রসে জীবন্ত হয়ে উঠবে; তার নারীজীবনের চরম সার্থকতা এমনই একটি

সুকুমার শিশুর রূপ পরিগ্রহ করে তারও কোলের উপর আলোর মত, ফুলের মত পরিপূর্ণ সুষমায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। এমনই একটি শিশু!—সুভদ্রার বিস্ফারিত, লুব্ধ চোখ দুটির স্বপ্নবিহ্বল দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল; তার মন যেন মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে বললে,—তার নিজের সন্তান হবে এই শিশুর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর, ঢের বেশী প্রাণবান,—ঠিক্ অরুণাংশুর নিজের কন্দর্পের মত রূপের অবিকল প্রতিরূপ।

কিন্তু শিশু কাঁদছিল,—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া!—কথা নয়, কেবল ধ্বনি। কিন্তু নবজাত শিশুর ঐ অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনির উপর দিয়েই যেন ছুটে এসে আর একটি ক্ষীণ, কাতর কণ্ঠস্বর সুভদ্রার জাগরণের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে। সে কণ্ঠস্বর জননীর,—আবেদনে করুণ, কিন্তু আশঙ্কায় ব্যাকুল।

পরদার ওপাশ থেকে প্রসূতী ক্ষীণস্বরে ডাকলে, দিদিমণি!—

সুভদ্রা চমকে উঠল; পরদা তুলে সে দ্রুতপদে চলে এল প্রসূতীর কাছে; একটু হেট হয়ে হেসে বললে, তোমার ছেলে হয়েছে,—দেখ কি সুন্দর!

প্রসূতীর মুদিত চোখ দুটি হঠাৎ খুলে গেল; ছেলেকে কোলে নেবার জন্য সে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিলে।

কিন্তু সুভদ্রা শব্দ করে হেসে উঠল; একটু পিছিয়ে গিয়ে কটাক্ষে প্রসূতীর মুখের দিকে চেয়ে সে পরিহাসের তীক্ষ্ণস্বরে বললে, এখন হাত বাড়াচ্ছ যে! দেব না—যাও!

প্রসূতীর পাণ্ডুর গাল দুটি লজ্জা ও আনন্দে রাঙা হয়ে উঠল; বিবর্ণ ঠোটের কোণে ফুটে উঠল অদ্ভূত কিন্তু ভারি মিষ্টি, হাল্‌কা একটুখানিক হাসি। কিন্তু হাত দুখানি সুভদ্রার দিকে আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে সে অস্ফুটস্বরে বললে, দিজিয়ে দিদিমণি,—মেরা লেড়কা!

কুটিল কটাক্ষে আরও কয়েক মূহূর্ত্ত মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর সুভদ্রা আবার হেসে উঠে বললে, আচ্ছা নাও।

হাসপাতালের ঝি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল; এইবার সে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে অনুযোগের স্বরে বললে, পরের ছেলে-মেয়ে নিয়ে এত আহ্লাদ কর দিদিমণি—তোমার নিজের একটি হলে কি ভালই না হত! কিন্তু বিয়ে তো করবে না তুমি!—

তুই থাম্,—সুভদ্রা ভ্রূভঙ্গী করে তাকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু ঝি দুষ্টামির হাসি হেসে বললে, কেন? অন্যায় কি বলেছি আমি? তো ঐ তোমাদের অরুণবাবু রয়েছেন। এত তো তোমার ভাব তার সাথে। এখন বিয়ে হলেই তো বেশ হয়।

সুভদ্রা তর্জ্জনী তুলে বললে, এবার মার খাবি তুই।

কিন্তু ছদ্ম বিরক্তির নীচে সবটুকু হাসি চাপা পড়ল না বুঝে প্রসঙ্গটাই বদলে দেবার উদ্দেশ্যে সে আবার বললে, এক কাপ চা যদি আমায় না খাওয়াও ঝি, তাহলে আমার এই দেহটাকে আর বাসায় নিয়ে যেতে পারব না,—এখানেই মরে পড়ে থাকব।

হাসি থামিয়ে ঝি বললে, তা দিচ্ছি বাছা,—এক কাপ কেন, তিন কাপ দিচ্ছি। কিন্তু তুমি আগে তোমার টুপি আর জামা ছেড়ে ফেল তো—মনে হচ্ছে যেন রক্তের সমুদ্দুরে ডুব দিয়ে উঠেছে!—

বাইরে যা'ই হোক না কেন, সুভদ্রার দেহের ভিতরে সমস্ত রক্ত সমুদ্রের মতই ফুলে এবং দুলে উঠেছিল এবং ওরই মধ্যে যেন বার বার ডুবে বার বার ভেসে উঠছিল তার নিজের মনটা। শোলার মত হাল্‌কা সেই মন। একটুও ক্রোধ নেই, একটুও বিরক্তি নেই,—আছে কেবল উল্লাস। ঝি'র কথাটা মনে করে কেবলই তার হাসি পেতে লাগল,—এমনি ওর অভ্যাস,—কারণে-অকারণে কেবলই বিয়ে আর বিয়ে,—খালি বলবে, বিয়ে কর না কেন, বিয়ে কর না কেন?—বিয়ের এখনও যেন কিছু বাকি রয়েছে!—

মিষ্টি রকমের একটু রাগও তার হল অরুণাংশুর উপর। কি অদ্ভুত লোক,—একেবারে সৃষ্টিছাড়া। বিয়ে সে কিছুতেই করবে না, এক বাড়ীতে একত্র থাকতে বললেও মুচকি হেসে উত্তর দেবে—দুর্লভ বলেই যে পাওয়াটা অমূল্য এবং প্রতিবারেই রঙে ও রসে অপূর্ব্ব, তাকেই একই ঘরের সঙ্কীর্ণ কোণে প্রতি মুহূর্ত্তের চাওয়ার আয়ত্তের মধ্যে সুলভ করে দিয়ে তার সব মূল্য তুমি নষ্ট করে দিতে চাও শুভা? আর বিয়ের কথা বললে তো কথাই নেই। ঠোঁটের ও চোখের হাসি এক নিমেষেই নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে; বিচারকের মত মুখ করে গম্ভীর স্বরে সে বলবে—শরতের আলোর মতই যা মধুর, আকাশের নীলিমার মতই যার স্বচ্ছ সৌন্দর্য্য, নির্ম্মল গগনের অসীম শূন্যে

আনন্দসঙ্গীতমুখর বিহঙ্গশিশুর মতই যা মুক্ত, আমাদের সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমকে বিবাহের শিকল দিয়ে বেঁধে দুঃখ, দৈন্য ও স্বার্থকলুষিত দৈনন্দিন জীবনের ধূলি ও পাঁকের মধ্যে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে চাও তুমি ?— এমন করে, এমন ভাষায়, এমন সব কথা সে বলবে যে কিছুতেই তার উত্তর দেওয়া যাবে না। অদ্ভুত—একেবারেই সৃষ্টিছাড়া। কোন নিয়ম, কোন বিধান, কোন বন্ধনই সে মানবে না। যেন—ভাবতে ভাবতে কতকটা কৌতুকে এবং কতকটা বিদ্রূপে সুভদ্রার ঠোঁটদুখানি অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে বেঁকে গেল—যেন বন্ধন মানবো না বললেই সব বন্ধন এড়িয়ে চলা যায় !—

আবার সঙ্গে সঙ্গেই সুভদ্রার বুকের মধ্যে মমতাও উথলে উঠল। সত্যই সে সৃষ্টিছাড়া। এতবড় বিদ্বান, এতবড় বড়লোকের একমাত্র সন্তান,—তবু না আছে ভোগের লিপ্সা, না যশের আকাঙ্খা। ঘরই তার নেই। সব ছেড়ে, মাতা-পিতা আত্মীয়-পরিজন সব ছেড়ে কুলিমজদুরের সঙ্গে তাদেরই মত খোলার ঘরে ছাতু আর রুটি খেয়ে দিন কাটাচ্ছে সে ; মজদুরের সেবা করাকেই করে নিয়েছে জীবনের একমাত্র ব্রত। ব্যারিষ্টার জীবনের অমন সম্ভাবনাসমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ সে দু'খানি খোলামকুচির মত অবহেলায় দূরে ঠেলে দিয়েছে ; পৈত্রিক সম্পত্তির সঙ্গে পিতার স্নেহও হয়তো হারিয়েছে ; অমন যে স্বাস্থ্য, তাও এখন সে হারাতে বসেছে,—আজ ক'মাস যাবৎই সে দুরারোগ্য আমাশয় রোগে ভুগছে। তবু তার সঙ্কল্প টলেনি। এমন বলেই না তাকে তার এত ভাল লাগে !

স্নানের পর গাউন আর টুপি খুলে সুভদ্রা কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের মধ্যে ঢেউএর পর ঢেউ উঠে তখনও তার বক্ষপিঞ্জরের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে। ওরই তালে তালে মনটাও উঠছে দুলে। একবার তার অরুণাংশুকে মনে পড়ছে, একবার মনে পড়ছে হিন্দুস্থানী মেয়েটির বিবর্ণ মুখের অমন উজ্জ্বল হাসিটুকু ; একবার মনে পড়ছে ঐ মেয়েটির নবজাত শিশুটিকে, আর হাওয়ার মত, আলোর মত ওতঃপ্রোতভাবে তার মনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তারই নিজের অনাগত সন্তান সম্বন্ধে তার সক্রিয় চিত্তের উদ্দাম কল্পনা। সুভদ্রার মনে হতে লাগল যে জগতের চেহারাটাই আজ হঠাৎ যেন আগাগোড়া বদলে গিয়েছে।

মুখ-হাত ধুয়ে চা খেতে বসেও সুভদ্রা উন্মনা হয়েই রইল,—উদ্বেগে নয়, উল্লাসে। নিজে সে কৃতবিদ্যা ধাত্রী এবং নার্স। বয়সের অনুপাতে তার অভিজ্ঞতা ঢের বেশী। কদিন আগেই তার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তার মনে একটা সন্দেহ হয়েছিল,—আজকের উত্তেজনার তাপে তাই দানা বেঁধে বিশ্বাস হয়ে উঠেছে। আজ সে নিঃসংশয়েই বুঝেছে যে তারই দেহের মধ্যে আর একটি নূতন জীবনের সঞ্চার হয়েছে,—মনের পুলক আর দেহের শিহরণের ভিতর দিয়ে তার আবির্ভাব সে খুব তীব্রভাবেই অনুভব করেছে।

শুধু জীবন,—নিরাকার, নিরাবয়ব হলেও তা জীবন। অপরিমেয় তার বিকাশের শক্তি, অসীম তার সম্ভাবনা। সুভদ্রার নিজের দেহের অভ্যন্তরেই আজকের ঐ অদৃশ্য প্রাণবিন্দুটি তারই দেহ থেকে তিল তিল করে উপাদান আহরণ করে ধীরে ধীরে রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করবে, প্রকাশের ও বিকাশের আগ্রহে একদিন সত্য সত্যই বদ্ধদ্বার অন্ধকার রাজ্যে হাতড়ে হাতড়ে বহির্গমনের পথ খুঁজে বেড়াবে; তারপর বিশেষ একটি শুভদিনে প্রকৃতির কাছথেকে দাবীর জোরে ছাড়পত্র আদায় করে নিয়ে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ স্পর্শের আলোকোজ্জ্বল এই জগতে সগৌরবে ও সাড়ম্বরে নেমে আসবে সুন্দর, সুকুমার ও সুপরিপুষ্ট মানবশিশুর মূর্তিতে। অজাত সন্তানের সেই রূপ সুভদ্রা তখনই যেন তার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে লাগল—চাঁপা ফুলের মত রঙ, টানা টানা চোখ, গ্রীসিয়ান প্যাটার্নের নাক নিয়ে সে যেন অরুণাংশুরই শিশুসংস্করণ।

ঝি'র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের আঘাতে সুভদ্রার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

—বাসায় যাবে না, দিদিমণি? বেলা যে গেল!—

সুভদ্রা চমকে উঠল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল, সত্যই গাছের মাথায় শীতের রৌদ্র ফিকে হয়ে এসেছে। এই যাই—বলে লজ্জিত মুখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে; অকারণেই কৈফিয়ৎ দিয়ে বললে, এত খাটুনি গিয়েছে আজ যে চলবার শক্তিও যেন আর নেই।

কথাটা যে সত্য, ঝি তার কোন প্রমাণ পেলে না। সুভদ্রা আবার প্রসূতির ঘরে গেল। নবজাত শিশুকে আর একবার সে কোলে নিয়ে আদর করলে। শিশু উত্তর দিলে কেঁদে। সুভদ্রা প্রসূতীর সঙ্গে হেসে হেসে

কিছুক্ষণ আলাপ করলে; তাকে তার নিজের ও শিশুর সম্বন্ধে উপদেশ দিলে বিস্তর। তারপর শিশুকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে সে বাসায় ফিরে চলল।

কিন্তু বারান্দায় পা দিতে না দিতেই সে থমকে দাঁড়াল।

বারান্দায় বেঞ্চের উপর বসে একটি যুবক খবরের কাগজ পড়ছিল। তার পরণে খাটো, আধময়লা ধুতি, গায়ে হাতকাটা একটি জামার উপর মোটা খদ্দরের চাদর; মাথার চুল একে ছোট এবং আগে-পাছে সমান করে ছাটা, তায় আবার রুক্ষ,—কতদিন যেন তাতে তেল পড়েনি; চোখে নিকেলের ময়লা ফ্রেমে আঁটা পুরু চশমা,—সব সুভদ্রার সুপরিচিত। তার বুকটা হঠাৎ ছাং করে উঠল,—থমকে দাঁড়াল সে।

যুবকটিও সাড়া পেয়ে চমকে মুখ তুলে চেয়েছিল, সুভদ্রাকে দেখেই তার রুক্ষ মুখখানি প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

অস্ফুট, কম্পিত স্বরে সুভদ্রা বললে, সুবোধবাবু!—

সুবোধ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুখানি কপালে ঠেকিয়ে হাসিমুখে বললে, নমস্কার।

কেবল একটি মুহূর্ত্ত।

তথাপি বিদ্যুদ্দীপ্তির মতই গত তিন বছরের ইতিহাস যেন সমগ্র একখানি ছবির মত সুভদ্রার চোখের সামনে ফুটে উঠল,—একটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঐ তিন বছরের জীবন সে যেন আবার যাপন করে নিলে।

তিন বছর আগের কথা।

মাত্র বাইশ বছর বয়সের মধ্যেই ঘুরে ঘুরে অনেক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে সুভদ্রা হুগলীর এই কারখানার হাসপাতালে চাকরি নিয়ে সুদূর যুক্তপ্রান্তের সুদূরতম প্রান্ত থেকে এখানে এসে সবেমাত্র কাজে যোগ দিয়েছে। তার জীবনের আগে এবং পিছনে সবটাই তখন ফাঁকা। মা-বাপ নেই,—কোন শৈশবে যে তাদের হারিয়ে সে অনাথা হয়েছিল, তা তার মনেও পড়ে না। ঘর বল, আশ্রয় বল,—আর্য্য সমাজের পরিচালিত যে অনাথ আশ্রমে সে মানুষ হয়েছে, তার সঙ্গেও সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েই সে হুগলীতে চাকরি করতে চলে এসেছিল। আশ্রমের কর্ত্তারা তাকে

যেতে বলেননি; বরং আদর করে, কদর করে রাখতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরে সুভদ্রা বলেছিল যে সে আশ্রমের বাইরে গিয়েই নিজের শক্তির পরীক্ষা করবে আর ঐ পরীক্ষার ভিতর দিয়েই তার আবাল্যের আশ্রয় ঐ আশ্রমেরও পরীক্ষা হবে। পরে কথায় কথায় নিজের কথাটাকে সে বিশদরূপে বুঝিয়ে বলেছিল,—আশ্রয় ছাড়া এদেশের মেয়েদের চলেই না; বাল্যে পিতার আশ্রয়, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের আশ্রয় মেয়েদের জন্য অপরিহার্য্য বলে মনু-মহারাজের নাকি নির্দ্দেশ রয়েছে; তাই মেয়েদের যা হয় তা ঐ আশ্রয়ের আওতায় টিকে থাকবার শিক্ষা,—মেয়ের পঙ্গুতার মাপেই মাপা হয় তার শিক্ষার সার্থকতা; কিন্তু নিজে সে আর একটি মাপকাঠি দিয়ে তার শিক্ষার সার্থকতা মেপে দেখবে,—পরীক্ষা করে দেখবে যে আশ্রমের আশ্রয় পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কেবল নিজের শক্তিতেই সংসার-সমুদ্রের মাঝখানে সে ভেসে থাকতে পারে কি না; যদি পারে তবে আশ্রমও বুঝতে পারবে যে আশ্রমবাসীদের মধ্যে আশ্রম ছেড়ে যাবার শক্তি সঞ্চার করেই আশ্রম নিজে টিকে থাকবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। এসব কথা শুনে আশ্রমের কর্ত্তা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু সুভদ্রাকে বাধা দেননি। তার পরেই সে অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল।

হুগলীতে যখন সে আসে তখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার আগের কয়েক বছর সে খুব হাবুডুবু খেয়েছে—এক একবার প্রায় ডোবে আর কি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিছক নিজের শক্তিতেই সে কূলে এসে উঠেছে। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করবার উদ্দেশ্যে সে দস্তরমত শুশ্রূষা বিদ্যা শিখেছে, স্বাধীনভাবে কিছুদিন ব্যবসাও করতে চেষ্টা করেছে; তারপর নিজেই চেষ্টা করে চাকরি সংগ্রহ করে আগ্রা থেকে হুগলীতে চলে এসেছে। এখন ঐ চাকরিটুকু ছাড়া তার আর কোন আশ্রয় নেই, কিন্তু বন্ধনও কিছু নেই। নূতন চাকরি, নূতন জীবন। পরিচিত জগতের সঙ্গে এক রকম সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েই সে চলে এসেছে। সামনে নির্দ্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই, পিছনেও কোন টান নেই। যে দুদশজন নরনারীর কথা তার মনে পড়ে, তারা পড়ে আছে হাজার মাইল দূরে। নূতন জায়গায় এক হাসপাতালের ডাক্তার আর কম্পাউণ্ডার ছাড়া আর কারও সঙ্গে তখনও তার পরিচয়ই হয় নি।

কোম্পানীর দেওয়া সাদাসিধে ছোট একতলা বাড়ীখানিতে একটি ঠিকা ঝি'র সাহায্যে সে সবেমাত্র তার একক জীবনের বৈচিত্র্যহীন গৃহস্থালিটুকু গুছিয়ে নিয়ে বসেছে। ঠিক এমনি সময়ে একদিন বৈকালে সুবোধ তার বাসায় এসে উপস্থিত হল।

সেদিনও এমনি দীনহীন তার বেশ,—দেখে মনে হয় যেন কারখানার মজদুরদেরই একজন। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কেবল তার চোখ-মুখের বলিষ্ঠ সজীবতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে কেবল তার অতুলনীয় গাম্ভীর্য্য।

হাত তুলে ছোট্ট একটি নমস্কার করে সুবোধ সুভদ্রাকে বললে, কোন রকম এত্তেলা না দিয়েই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি ; মাপ করতে যদি না পারেন, না-ই করবেন। কিন্তু আমাদের ইউনিয়নের মেম্বর আপনাকে অবশ্যই হতে হবে।

প্রথমে সুভদ্রা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল ; তারপর হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে বললে, বসুন। বসবার একখানা চৌকিও নিজেই সে সুবোধের দিকে এগিয়ে দিলে।

সুবোধ তার আগের অনুরোধেরই পুনরাবৃত্তি করে বললে আপনাকে আমাদের ইয়ুনিয়নের মেম্বর হতেই হবে, সুভদ্রাদেবী।

সুভদ্রা বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিসের ইয়ুনিয়ন ?

মজদুর ইয়ুনিয়ন,—সুবোধ উত্তর দিলে,—এই কারখানায় যত মজদুর কাজ করে, তাদের পঞ্চায়েৎ বলুন, জমায়েৎ বলুন,—একটা বড় রকমের সংগঠন আছে। আপনাকে আমি তারই মেম্বর করতে এসেছি।

কিন্তু আমি তো মজদুর নই।—

অল্প একটু হেসে সুবোধ উত্তর দিলে, রাগ করবেন না সুভদ্রা দেবী, —যারা কারখানায় কাজ করে, কারখানায় কেন, চাকরি যারা করে, তারা সবাই তো মজদুর। যন্ত্র অপরের, যন্ত্রী আর একজন,—আমরা তো কেবল জোগানদার। তা-ও যতদিন মালিকের খুশী ঠিক ততদিন পর্য্যন্ত। আমাদের আজকের চাকরি মালিকের হুকুমে কালই 'গয়া' হয়ে যেতে পারে। কাজেই সবাই আমরা মজদুর,—তফাৎ যা কিছু সে কেবল পোষাকের,—কেউ কালো পোষাকের মজদুর, কেউ সাদা পোষাকের। তবু চাকরি করেও যদি অভিমান

কারও থাকে যে সে মজদুর নয়, তবে তার সাথে তুলনা চলবে রবি ঠাকুরের সেই কুষ্মাণ্ডের যার 'মনে মনে' বড় অভিমান, বাঁশের মাচাটি তার পুষ্পক বিমান'।

কৌতুক বোধ করে সুভদ্রা নিজেও হেসে ফেলে বললে, আপনি বুঝি—

না, আমি কুষ্মাণ্ড নই,—সুবোধ দিব্য সপ্রতিভভাবে উত্তর দিলে,—কুষ্মাণ্ডের অভিমানটা অবশ্য জন্ম থেকেই আরও অনেকের মত আমাকেও ঘিরে ছিল; কিন্তু দুঃখ আর অপমানের তীক্ষ্ণ খোঁচা খেয়ে খেয়ে শূন্যগর্ভ বেলুনের মত সেটা অনেকদিন আগেই ফেটে গিয়েছে। এখন আমি মজদুর—তবে সাদা পোষাকের দলের।

আর ?—

আর তার উপর মজদুর সংঘের সেক্রেটারি। সেই হিসেবেই আপনি নূতন জায়গায় ঠিক হয়ে বসতে না বসতেই আপনাকে মেম্বর করবার জন্য ছুটে এসেছি। আমার নাম সুবোধ ব্যানার্জ্জি,—মজদুরেরা ডাকে ব্যানার্জ্জি বাবু।

সুভদ্রার মুখে তৎক্ষণাৎ উত্তর ফুটল না,—ঠিক আপত্তির জন্য নয়, সঙ্কোচে। শৈশব থেকেই সে পশ্চিমের আর্য্য সমাজের আওতায় মানুষ। সেবাধর্ম্মের শান্ত ও রুদ্ররূপ দুইই নিজের চোখেই সে অনেক দেখেছে। সমাজের ত্যাগী কর্ম্মীদের পরিচালনাধীনে নিজেও সে স্বয়ংসেবিকার কাজ নিতান্ত কম করে নি। ঐদিকে তার একটা ঝোঁক আছে বলেই জীবিকা অর্জ্জনের জন্যও সে নার্সের কাজ শিখতে গিয়েছিল। তাই সুবোধের প্রস্তাব শুনে মনে মনে সে একটু উৎসাহই বোধ করলে। তথাপি তার সঙ্কোচও হল।

প্রথম কারণ এই যে, মজদুর সংঘ জিনিষটার সঙ্গে তার কোন পরিচয় ছিল না। পশ্চিমে যে সব শহরে সে বাস করেছে, তার কোনটাই শিল্প কেন্দ্র নয়। তার পরিচিত আর্য্য সমাজের কর্ম্মী ও প্রচারকেরা তার চোখের সামনে যাদের সেবা করেছে, তারা হয় গরীব, নয় অন্ত্যজ—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুইই। ঠিক মজদুর বলতে যা বোঝা যায়, সে রকম লোককে ইতিপূর্ব্বে সে চোখেই দেখে নি। তাদের সংঘ জিনিষটা যে কি এবং তাদের নিয়ে কি ধরণের কাজ করা হবে, সে তা যেন ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিল

না। তা ছাড়া নূতন জায়গা,—অপরিচিত সব লোক—

সুভদ্রা কতকটা যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতই চুপ করে রইল।

সুবোধ উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে, তারপর চাঁদার খাতাখানা সুভদ্রার সামনে এগিয়ে ধরে কুণ্ঠিতস্বরে বললে, দয়া করে এখানে আপনার একটা সই দিন ; আর চাঁদা দিন অন্ততঃ চার আনা।

সুভদ্রা সঙ্কুচিত হয়ে একটু পিছিয়ে গেল, কুণ্ঠিতস্বরে বললে, কি উদ্দেশ্য, কি কাজ—সে সব কিছুই তো আমার জানা নেই !—

জানা নেই !—সুবোধ সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কথাটা যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু সুভদ্রার মুখের বিব্রত, কুণ্ঠিত ভাবটা লক্ষ্য করেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবার বললে, মজদুরের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করাই আমাদের এই সংঘের উদ্দেশ্য। তবে সেটা গৌণ ; আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী এই সমাজটাকে ভেঙ্গে ফেলে এমন একটা সমাজের প্রতিষ্ঠা করা যাতে ধনী আর দরিদ্রের ভেদ থাকবে না, শ্রমের মালিককে শোষণ করে ধনের মালিক বড়লোক হতে পারবে না, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষ যে সমাজের নরনারীকে যুদ্ধ্যমান হিংস্র দুটি দলে ভাগ করে রাখবে না।

এইটুকু ভূমিকা। তারপর সে মজদুর আন্দোলনের মূলনীতি ও ইতিহাস সংক্ষেপে সুভদ্রাকে বুঝিয়ে দিলে। বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে এল ; খোলা মাঠের মাঝখানেও সুভদ্রার বারান্দায় সন্ধ্যার ধূষর ছায়া গাঢ় হয়ে জমে উঠতে লাগল।

হঠাৎ এক সময়ে সুভদ্রা দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আপনি একটু বসুন, আমি আলো আনি।

আলো নিয়ে ফিরে এল সে মিনিট পাঁচেক পর। কিন্তু ততক্ষণে সুবোধ উঠে দাঁড়িয়েছে। সুভদ্রা ফিরে আসতেই অপরাধীর মত কুণ্ঠিতস্বরে সে বললে, রাত হয়ে গিয়েছে তা বুঝতেই পারি নি। আজ আমি আসি ; কথা আর একদিন হবে।

ক্রমে ক্রমে কথা অনেক হল। একদিন সুবোধ সুভদ্রাকে বললে, এ কাজে

হৈ চৈ অনেক আছে ; বিপদ-আপদও কম নেই। কিন্তু তার মধ্যে আপনাকে জড়াতে আসি নি। আপনাকে আমরা চাই নিছক সেবাকার্য্যের ক্ষেত্রে।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে, দেখুন, লোকে আমাদের বদনাম রটায়,—আমরা মজুরকে ক্ষেপিয়ে বেড়াই, তার ভাল করিনে, করি সর্ব্বনাশ—এই সব। কেউ যে তা করে না, তা আমি বলতে চাইনে। কিন্তু আমি এখানে এসে অবধি মজুরের ভাল করবার জন্যই চেষ্টা করছি। বক্তৃতা দিয়ে এদের আমি ভোলাতে চাইনে, সেবা দিয়ে জয় করতে চাই আর আপনাকে আমি চাই আমাদের সেই সেবার ক্ষেত্রে।

ভিতরের কুণ্ঠা পরিহাসের নীচে চাপা দিয়ে সুভদ্রা বলে উঠল, কিন্তু আমিও যে সেটা করতে চাই, সে কথাটা গোড়াতেই আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন?

সুবোধ অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে, আপনি যে নার্স, তাই। আমাদের দেশের মেয়েদের জীবনের নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, নির্ঝঞ্ঝাট, গতানুগতিক ধারাটাকে পরিত্যাগ করে আপনি নূতন একটা পথ বেছে নিয়েছেন, মাষ্টারণী হবার বিদ্যে না শিখে শিখেছেন সেবাধর্ম্ম। আমি কি ধরে নেব যে তা মাসে মাসে কেবল বেতন বা মজুরিবাবদ পঞ্চাশ-ষাটটি টাকা রোজগার করবার জন্য?

আনন্দে ও গর্ব্বে সুভদ্রার বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। নার্স হবার জন্য এতদিন সে লোকের কাছ থেকে পেয়েছে হয় ধিক্কার, নয় টিটকারি। সে নার্স, শুধু এইটুকু জানবার পরেই অধিকাংশ পুরুষই তাকে উপহার দিয়েছে হয় ঘৃণা, নয় তো লালসাপঙ্কিল দৃষ্টি। তার পেশাকে সেবাধর্ম্ম আর তাকে সেবিকা বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করলে সুবোধই প্রথম, আর তা-ও একেবারে প্রথম আলাপেই। সুভদ্রার মুখের উপর একটা রক্তিম আভা ফুটে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখদুটিও নত হয়ে পড়ল। কুন্ঠিতস্বরে সে বললে, আমার আগে যিনি এখানে ছিলেন, তিনি বুঝি আপনাদের মজদুর সংঘের জন্য খুব খেটেছেন?

সুবোধ লজ্জিতের মত উত্তর দিলে, না,—তা আমি বলতে পারি নে। কাজ করা দূরে থাক, তিনি আমাদের কাছেও ঘেঁষতেন না, আর আমরাও তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারতাম না।

বিস্মিতা সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে সুবোধ কথাটাকে শব্দ করলে, তবে কি জানেন?—তিনি ছিলেন এ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান। তার থাই আলাদা।

সুভদ্রা শব্দ করে হেসে উঠল, বললে, তবেই দেখুন,—নার্স হলেই তার সবাপ্রবৃত্তি থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আমার সম্বন্ধে অতখানি ধরে নেওয়া আপনার মত অভিজ্ঞ লোকের পক্ষে উচিৎ নি।

কিন্তু সুবোধ বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিলে, আপনি যা-ই বলুন, আমি ভুল করি নি। আপনি যে দিন আসেন সেই দিনই আপনাকে আমি দেখেছি। দেখলাম আপনার পরনে খদ্দরের শাড়ী—হোল্ড অল্‌টি পর্য্যন্ত খদ্দরের। তখনই বিশ্বাস হয়ে গেল যে সেবাকার্য্যের নিমন্ত্রণ পেলে আপনি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

কথাটা সত্য। সেই কারণেই সুভদ্রা আরক্তমুখে চুপ করে বসে রইল।

সুবোধ আবার চাঁদার খাতাখানা সুভদ্রার সামনে এগিয়ে ধরে কুণ্ঠিতস্বরে বললে, তা'হলে দয়া করে সইটা করে দিন!—

সুভদ্রার হাতখানা একবার এগিয়ে এসেও আবার সঙ্কুচিত হয়ে পেছনে সরে গেল। সেও কুণ্ঠিতস্বরে বললে, আজ থাক্,—আমি আরও একটু ভেবে দেখি।

সুবোধ নিরাশ হল, কিন্তু সেদিন সে আর পীড়াপীড়ি করলে না। বিদায় নিয়ে চলতে সুরু করেও সিঁড়ির কাছে থমকে দাঁড়িয়ে, সুবোধ আবার বললে, আপনি কিন্তু চমৎকার বাংলা বলতে পারেন।

সুভদ্রা সশব্দে হেসে উঠে উত্তর দিলে, বাংলা বলতে পারি, কি বলছেন—বাংলাই যে আমার মাতৃভাষা।

সুবোধ সবিস্ময়ে বললে, মাতৃভাষা!

তা বই কি!—সুভদ্রা হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে,—আমি তো বাঙ্গালী!

সুবোধ অবাক হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হ্যাঁ, আমি বাঙ্গালী,—একটু পরে সুভদ্রাই আবার বললে,—তবে আপনি যদি আমায় হিন্দুস্থানী মনে করে থাকেন তবে তাতেও ভুল হয়নি আপনার।

একরকম জন্ম থেকেই হিন্দুস্থানীদের মধ্যেই আমি মানুষ হয়েছি। মাতৃভাষা বাংলা হলেও আগে আমি হিন্দীই শিখেছিলাম। বাংলা শিখেছি পরে নিজের চেষ্টায়। মেডিকেল কলেজে যখন নার্সিং শিখতে যাই তখন অনেক বাঙ্গালী ডাক্তার ও ছাত্রদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল আমাকে। তাছাড়া ওখানেই আমি একজন অন্তরঙ্গ বাঙ্গালী বন্ধুও পেয়েছিলাম,—তার নাম কমলা। তারই সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাংলা কথা বলা অভ্যাস হয়েছে।

সুবোধ স্বপ্নাবিষ্টের মত বললে, আশ্চর্য্য! আমি কিন্তু আপনাকে হিন্দুস্থানীয় মনে করেছিলাম।

সুভদ্রা আবার হেসে উঠল; বললে, তাহ'লে আমার সাথে বরাবরই আপনি বাংলায় কথা বলছিলেন কেন?

কুণ্ঠিতভাবে একটু হেসে সুবোধ উত্তর দিলে, সেটা আমার উগ্র স্বাদেশিকতা বা প্রাদেশিকতার জন্য। বাঙ্গালীর বড় বদনাম যে বিদেশীর সাথে কথা বলতে হলেই বাঙ্গালীই আগেভাগে বিদেশী ভাষা ব্যবহার করে। তাই আমি পণ করেছি ভিন্ন রীতি অবলম্বন করবার। সেই পণ রক্ষা করবার জন্যই আপনার সাথে বাংলায় কথা সুরু করেছিলাম, বাংলায় উত্তর পেয়ে বরাবর বাংলাতেই কথা চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু আগাগোড়াই আমার মনে ধারণা ছিল যে আপনি হিন্দুস্থানী।

না, আমি বাঙ্গালী,—সুভদ্রা হাসিমুখে বললে,—আর আমি যে বাঙ্গালী সে কথাটা এত প্রতিকূল অবস্থাসত্ত্বেও ভুলতে পারি নি বলেই সুযোগ পেয়েই হাজারখানিক মাইল দূরের বাংলাদেশে চাকরি করতে এসেছি।

মনের মধ্যে অনেকখানি বিস্ময় এবং তার চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা নিয়ে সুবোধ সেদিন বাসায় ফিরে এল। এমনিতে যার সূত্রপাত তা অনুকূল পরিবেশের মধ্যে খুব সহজেই পরিণতির পথে এগিয়ে চলল। মন ঠিক করবার জন্য সুভদ্রাকে খুব বেশী ভাবতে হল না। ইয়ুনিয়নের মেম্বর হতে তার নিজের তেমন অনিচ্ছা ছিল না; তার উপর ছিল সুবোধের অক্লান্ত তাগিদ। সকলের উপরে ছিল তার নিঃসঙ্গ জীবনের কর্ম্মহীন অবসরটুকুকে কোন একটা কাজ দিয়ে পূর্ণ করবার প্রয়োজন। সুভদ্রা মাসখানিক যেতে না যেতেই মজদুর ইয়ুনিয়নের সদস্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থান হল ওর কার্য্যকরী

সমিতিতে। তার কাজ নির্দ্দিষ্ট হল সংঘের মজতুর সদস্যদের পরিবারের সঙ্গে একটা ছুশ্ছেদ্য হৃদয়ের বন্ধন স্থাপন করা, বিপদে আপদে তাদের দেখা, বৌদের মারফতে তাদের স্বামীদের উপর ইয়ুনিয়নের প্রভাব বিস্তার করা, তাঁদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের ছেলে মেয়েদের পাঠশালায় নিয়মিত হাজিরা দেওয়াবার ব্যবস্থা করা,—এই সব। এ সব কাজ সুভদ্রার কাছে একেবারে নূতন নয়। আর্য্য সমাজের আশ্রমে থাকতেই মুচি-মেথরদের পাড়ায় এই ধরনের কাজ সে অনেক করেছিল। সবটুকু আন্তরিকতা নিয়েই নূতন জায়গায় সে তার অভ্যস্ত কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার চেষ্টা সার্থকও হল সব দিক দিয়েই। বাইরের জীবনে তার অবসর কাণায় কাণায় ভরে উঠল। অন্তরে সে লাভ [illegible] কয়দিনের মধ্যেই সুভদ্রা এ অঞ্চলের ছোটবড় [illegible]

[illegible] ভিতর দিয়েই [illegible] ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। যে অপরিচিত [illegible] জাগিয়ে দিয়েছিল, কর্ম্মের ভিতর দিয়েই সে তার সত্যিকারের পরিচয় [illegible]

একেবারে দেশপাগলা এবং সেবাপাগলা ছেলে এই সুবোধ। কবে কি স্বপ্ন দেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, তারপর আর সে ঘরে ফিরে যায় নি। তারও মা-বাপ নেই। থাকবার মধ্যে আছে পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক জিলার অভ্যন্তরে কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ে একখানা পাকা পৈত্রিক বাড়ী ও কিছু জমিজমা, আর সেই সব আগলে আছেন তার এক দূর সম্পর্কের পিতামহী। তাঁর কথা বলতে বলতে সুবোধের চোখে মাঝে মাঝে জলও এসে যায়, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যও বাড়ীতে সে বড় এখন যায় না। কলেজে ভাল ছাত্র বলেই তার এককালে নাম ছিল, কিন্তু বি-এ পরীক্ষার আগেই হঠাৎ কি খেয়াল হওয়াতে পড়া সে ছেড়ে দিয়েছে। কিছুদিন লক্ষ্মীছাড়ার মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে পরে সে এই কারখানায় আসে নিম্নস্তরের একটি কেরানীর কাজ নিয়ে। তখন থেকেই মজতুর ইয়ুনিয়নের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুরু হয়। ইয়ুনিয়ন অবশ্য আগে থেকেই এখানে ছিল, কিন্তু সুবোধই তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। তার চেষ্টাতেই ইয়ুনিয়নের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে, ইয়ুনিয়ন আইনমত রেজেষ্টারি হয়েছে, আর সব চেয়ে বড় কথা, অমন

জবরদস্ত সাহেব কম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পর্য্যন্ত পেয়েছে। যে চাকরিতে পয়সা হয়, তার কারখানার সেই চাকরিটা গৌণ তার আসল চাকরি ঐ মজদুর ইয়ুনিয়নের, আর সেটা অবৈতনিক। এই ইয়ুনিয়ন যেন তার সব,—টাকাপয়সা, আরামবিলাস তো বটেই, তার মা-বাপ-ভাই-বোন-স্ত্রী-সন্তানের অভাবও যেন কেবল এই ইয়ুনিয়নটা দিয়েই পূর্ণ হয়েছে।

অবৈতনিক কাজটা সময় অভাবে সুষ্ঠুভাবে করা যায় না অজুহাতে একদিন সুবোধ কারখানার চাকরিটাই দিলে ছেড়ে। দেখেশুনে বিস্ময়ে সুভদ্রা থ' হয়ে গেল, কিন্তু সুবোধের প্রতি তার অন্তরের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল অনেক।

অদ্ভূত লোক,—অদ্ভুত তার নিষ্ঠা, অক্লান্ত তার কর্ম্মশক্তি। ঘুম থেকে উঠবার পর আবার ঘুমে চোখ দুটি বুজে না আসা পর্য্যন্ত এই ইয়ুনিয়নের কাজ নিয়েই সে মেতে থাকে। কাজে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে কোন মজদুরের জরিমানা হয়েছে,—তার তদ্বির করা; কে অকারণে বা সামান্য কারণে বরখাস্ত হয়েছে,—তার জন্য দরবার করা; কাজ করতে করতে কার হাত কি পা কেটে গিয়েছে,—তাকে ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়া; মজদুরের বেতন বৃদ্ধি, বাসস্থানের সুব্যবস্থা, চাকরির স্থায়িত্ব প্রভৃতি দাবী নিয়ে আন্দোলন করা প্রভৃতি নৈমিত্তিক কাজ থেকে নিয়ে চাঁদা তোলা, হিসাব রাখা, খাতা লেখা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম প্রায় একেলাই তাকে করতে হয়। এর উপর আবার বার মাসে তের পার্ব্বণের মত রাজনৈতিক উৎসব লেগেই আছে। জাতীয় কংগ্রেস আর মজদুরের কংগ্রেস থেকে 'দিবস' ইত্যাদি পালন করবার জন্য যত নির্দ্দেশ আসে তার প্রত্যেকটিই রীতিমত সমারোহ সহকারে পালন করা চাই। কাজ তার কাছে যেন জীবনের চেয়েও বড়। নিজের আহারনিদ্রা সম্বন্ধে সে উদাসীন। ইয়ুনিয়নের আপিস ঘরেই একখানা দড়ির চারপাই রাখা আছে। ওরই উপর একখানা সতরঞ্চি পেতে সে শয়নবিলাসীর সুখনিদ্রা উপভোগ করতে পারে। সেখানেই একটা বহু পুরাতন কুকার আছে। তাতেই সময় এবং সুবিধামত নিজের হাতেই দুটি ডাল-চাল সে ফুটিয়ে নেয়। সে সময় বা সুবিধাও আবার সব দিন হয় না,—মাসের প্রায় অর্দ্ধেক দিন তার কাটে বাজারের অখাদ্য পুরি-তরকারি

খেয়ে। সাজসজ্জা বা প্রসাধনের ধার সে ধারে না। তার বেশভূষা দারিদ্র্যের। ওর উপর আবার অন্ধ ঔদাসীন্যের সুস্পষ্ট ছাপ আঁকা,—অপরিচিত বা বেদরদীর চোখে তা কদর্য্য দেখায়। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যে লোকটার রুচিজ্ঞান একেবারেই নেই।

কাজ তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে—বিশ্রাম যেন তার গায়ে ভীমরুলের হুল ফুটিয়ে দেয়। কিন্তু কেবল কাজই নয়, প্রয়োজনটাই তার কাছে আসল। নিষ্প্রয়োজনে সে একটা কথা পর্য্যন্ত বলতে চায় না। পারিবারিক জীবন দূরে থাক, সামাজিক জীবনও তার নেই। তার সাংস্কৃতিক জীবনেরও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মজদুর ইয়ুনিয়ম, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল আর কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তার নিজস্ব কোন জীবন আছে কি নেই, সে সম্বন্ধে রীতিমত সন্দেহ হয়। হউক না সেটা কারখানা অঞ্চল,—তবু কাছেই শহর আছে, কারখানার এলাকার মধ্যেই ঐ কারখানার উঁচু দরের কর্ম্মচারীদের ছোটখাটো একটি ভদ্রসমাজও আছে,—তার ক্লাব আছে, খেলাধূলো আছে, সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চা আছে। কিন্তু সে জগৎ বা সে সমাজের সঙ্গে, সুবোধের কোন সম্বন্ধই নেই। খেলার মাঠে বা গানের আসরে কোনদিন তাকে দেখা যায় নি, তার কোন বন্ধু বা সহকর্ম্মী কোন দিন তাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে পারে নি। তার সমাজ কেবলই নিম্নস্তরের মজদুরদের নিয়ে, আর তা-ও মজদুরদের ব্যক্তিত্বের সেই দিকটাকে নিয়ে যে দিকটাতে তারা মজদুর ইয়ুনিয়নের সদস্য। ইয়ুনিয়নের কথা নিয়ে যাদের সঙ্গে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্ বক্ করতে পারে, যাদের এক আনা জরিমানা মকুব করাবার জন্য সে স্বর্গ-মর্ত্ত্য তোলপাড় করতে পারে, ঠিক তাদেরই ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ সম্বন্ধে সে নির্ম্মম ভাবে উদাসীন—সে সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই সে থতমত খেয়ে চুপ করে যায়, উত্তরে বলবার মত একটি কথাও সে যেন তার অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে খুঁজে পায় না।

কেমন যেন অ-মানুষ এই সুবোধ। তার ভিতরের জীবনটা যেন ভারসাম্য হারিয়ে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সে একেবারে সীমান্তের লোক। তার ত্যাগপ্রবৃত্তি মদের নেশার মত তীব্র, তেমনি আত্মঘাতী।

আদর্শনিষ্ঠা সীমারেখা ডিঙ্গিয়ে উন্মত্ততার কোঠায় গিয়ে পড়েছে। সংসারে কোমল, মধুর এবং সুন্দর যা কিছু আছে, তার সকলকেই সে যেন সযত্নে করে বর্জ্জন করেছে, মিতালী করেছে দুঃখের সঙ্গে। মনটাকে এমন করে পোষ মানিয়েছে যে, যতই সে নিজেকে বঞ্চিত করছে ততই ভাবছে যে তার জীবন সার্থকতার পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে।

ব্যতিক্রম আছে কেবল এক জায়গায়। সুবোধের অমন পাথরের মত কঠিন এবং নিরেট হৃদয়েও কি জানি কেন শিশুদের সম্বন্ধে সামান্য একটু দুর্ব্বলতা তখনও রয়ে গিয়েছে। মজদুরদের অমন যে সব নোংড়া, কুৎসিৎ ছেলে-মেয়ে, তাদের নিয়েও প্রায়ই সে ছেলেমানুষের মতই মেতে ওঠে। পাঠশালা করেছিল সে নিজে; তখন টাকা ছিল না, কাজ করবার দ্বিতীয় কোন লোকও ছিল না; কাজেই সুবোধ নিজেই সেখানে করত গুরুগিরি। এখন টাকা হয়েছে বিস্তর, বেতনভোগী শিক্ষকের কোন কমতি নেই। তবু আজও সময় পেলেই নিজে সে সেখানে পড়াতে যায়, বৈকালে অন্য কাজ না থাকলে ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে সে হা-ডু-ডু-ডু খেলে, না হয় আর কোন স্বদেশী খেলা; পয়সা জুটলে মাঝে মাঝে এক পাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে যায় চড়ুইভাতি করতে।

তবু সে অ-মানুষ,—মানে, সাধারণ মানুষের দোষ আর দুর্ব্বলতা এতখানি সার্থকতার সঙ্গেই সে জয় করেছে যে তার মনুষ্যত্বটুকু খুব সহজে কারও চোখে পড়ে না। সে যেন একটা যন্ত্র—অসাধারণ রকমের কর্ম্মক্ষম কিন্তু নিষ্প্রাণ। কর্ম্মক্ষেত্রে তাকেই সুভদ্রা গুরু বলে মানলেও তার সাধনার পদ্ধতি সুভদ্রার ভাল লাগে নি।

একবার কি একটা বিশেষ 'দিবসের' বার ঘণ্টাব্যাপী উৎসবের অবসানে সুবোধকে খালি জল আর গুড় দিয়ে ছাতুর ফলার করতে দেখে সুভদ্রা সবিস্ময়ে বলেছিল, এ আপনি কি করছেন সুবোধবাবু? সারাদিন এত খাটুনি গিয়েছে—তারপর এই খাওয়া! মারা যাবেন যে!—

সুবোধ স্মিতমুখে উত্তর দিয়েছিল, তাও কবিতায়—'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই!'—

সুভদ্রা তিক্তকণ্ঠে বলেছিল, এরকম করে লোকে প্রাণ দান করে না,

করে আত্মহত্যা। ফেলে দিন ঐ ছাতু; চলুন আমার বাসায়। আমি যা হয় দুটি ভাতে-ভাত আপনাকে খাওয়াতে পারব।

সুবোধ রাজী হয়নি। সুভদ্রার উত্তেজনা লক্ষ্য করে সে বিস্মিত হয়েছিল, অনুরোধ শুনে হয়েছিল বিব্রত। কিন্তু স্মিতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর সে মৃদু হলেও দৃঢ়স্বরেই উত্তর দিয়েছিল, আমায় মাপ করবেন সুভদ্রাদেবী। আরামের পথ বড্ড পিছল পথ, আর তার গতি নীচের দিকে। একবার ওপথে পা বাড়ালেই কেবলই নীচের দিকে গড়িয়ে যেতে হয়। আজ যদি ছাতু ফেলে ভাল খাবার খেতে যাই তবে পরে কাজ ফেলেও ঐ ভাল খাবার খেতেই ছুটতে হবে।

সুভদ্রা তাকে রাজী করাতে পারে নি,—সেদিনও নয়, পরেও কোন দিন নয়। কদাচিৎ কোন দিন দু'এক বাটি চা ছাড়া সুভদ্রার বাসায় সুবোধ অন্য খাদ্য গ্রহণ করে নি।

আর একদিন অন্য এক অবস্থায় আন্তরিক বিস্ময়ের সঙ্গে সুভদ্রা সুবোধকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা সুবোধবাবু, মানলাম আপনার ব্রত খুব মহৎ। কিন্তু এই লক্ষ্মীছাড়া জীবন-যাপন করে আপনি সুখ পান?

আন্তরিক বিশ্বাসের দৃঢ় স্বরে সুবোধ উত্তর দিয়েছিল, নিশ্চয়ই পাই। একটু পরে হাসতে হাসতে আবার বলেছিল, সুখ জিনিষটা ভিতরের, আর তা নিছকই মনের সৃষ্টি। ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরে তাকে খুঁজতে গেলেই ভিতরে তাকে হারাতে হয়!

কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সুভদ্রা ফিক্ করে হেসে ফেলে উত্তর দিয়েছিল, বৃথাই বাইরে আপনি বস্তুবাদী বলে নিজের পরিচয় দেন। ভিতরে ভিতরে আপনি দস্তুরমত আদর্শবাদী,—হয়তো মায়াবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী।

কিন্তু সন্ন্যাসীও যে মানুষ, বালি আর পাথরের নীচেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর স্নিগ্ধধারা তখনও যে তর্-তর্ করে বয়ে চলেছিল তার প্রমাণ পেতে খুব দেরী হল না।

পরিচিত প্রত্যেকটি লোককে রীতিমত অবাক করে দিয়ে একদিন সুবোধ বললে যে সে তার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে দেশে যাবে। ইয়ুনিয়নের

সহকারী সম্পাদক শ্যামাচরণকে সুভদ্রার কাছে নিয়ে এসে সে বললে, আপনারা দুজনে মিলে কাজটা কোনোরকমে চালিয়ে নেবেন। ফিরতে আমার মাসখানেক দেরী হতে পারে।

কিন্তু পনর দিন না যেতেই সে ফিরে এল।

সুভদ্রা খুশী হয়েও বিস্মিত স্বরে বললে, এত শীগগির ফিরলেন যে!—

পালিয়ে এলাম,—সুবোধ কুণ্ঠিত কৌতুকের স্বরে উত্তর দিলে,—গিয়ে দেখি, ঠাকুমা আমার জন্য বিয়ের একটি ফাঁদ পেতে রেখেছেন। আর কিছু-দিন ওখানে থাকলেই ফাঁদে পাদুটো জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তাই বন্ধন এড়াবার জন্য এখানে পালিয়ে এলাম।

সুভদ্রা ক্ষণকাল অবাক হয়ে সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; তারপর উদগত একটি দীর্ঘনিশ্বাস সযত্নে চেপে রেখে বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই সে বললে, বন্ধন এড়াবার কথা আপনি কি বলছেন সুবোধবাবু? আপনার ঠাকুরমা যদি আপনাকে বাঁধতেন, তবে সে বন্ধন হত ফুলের মালার। কিন্তু এখানে যে বন্ধনে আপনি অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছেন, তা যে গলার ফাঁসের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

কথাটা যে কত সত্য আর কি নির্মম অর্থেই সত্য তা ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগল।

যন্ত্রের মধ্যে হঠাৎ যেন প্রাণ সঞ্চার হল। সুবোধের মুখের হাসি আর চোখের দৃষ্টির রূপ গেল বদলে। তার আচরণের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল। পাঠশালার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তার মাতামাতি গেল বেড়ে। মজদুরদের চিত্তবিনোদনের জন্য একবার সে বায়না করে নিয়ে এল একটি যাত্রার দল, একবার তরজার। ব্যারাক আর বস্তিতে সে নিয়মিত রামায়ণ গান আর পাঁচালী পাঠের ব্যবস্থা করে দিলে। বিস্মিত সহকর্মী-দিগকে সে অসীম উৎসাহে বোঝাতে সুরু করলে যে, শুধু সভাসমিতির শুকনো পথ ধরেই নয়, শিল্প ও সাহিত্যের স্নিগ্ধ রসোজ্জল পথ ধরে এগিয়ে না গেলে জনচিত্তের মর্মস্থানটিতে কোনদিনই তারা পৌঁছতে পারবে না।

সুবোধের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে প্রথমে সুভদ্রা বিস্মিত হল, তারপর একদিন সে সবই বুঝতে পারলে।

নারীর সহজ অন্তঃদৃষ্টি দিয়েই একদিন সুভদ্রা দেখতে পেলে যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও মনের কোণে রঙ ধরেছে,—তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে মনের সেই রঙেরই গাঢ় একটি প্রতিবিম্ব। সুভদ্রা বুঝলে যে সুদীর্ঘ এক বৎসর ধরে যে রস বিন্দু বিন্দু করে সুবোধের অন্তরের প্রান্তে সঞ্চিত হচ্ছিল; তা-ই প্রবল উচ্ছ্বাসে উৎসারিত হয়ে তার বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রকে পর্য্যন্ত শ্যামল এবং সরস করে তুলেছে।

সুভদ্রা আরও বুঝলে যে সুবোধের প্রাণে রঙ ধরিয়েছে এবং রস সঞ্চার করেছে সে নিজে।

কিন্তু ঘটনাটা একতরফা। রঙ ধরেছিল একা সুবোধেরই মনে, সুভদ্রার নয়। সুদীর্ঘকাল নানারকম কাজের উপলক্ষে সুবোধের সান্নিধ্যে এসে তার কাছে সে শিখেছিল অনেক; গুরুদক্ষিণা হিসাবে দুঃখব্রতী সন্ন্যাসীর পায়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিতে হৃদয় তার কার্পণ্য করেনি; আত্মীয়স্বজনহীন হতভাগ্যের জন্য তার নারীহৃদয়ে বেশ একটু মমতাও জেগে উঠেছিল,—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। একাধিক বসন্ত তাদের দু'জনের মাথার উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে থাকলেও তা সুভদ্রার প্রাণে একটুও সাড়া জাগাতে পারেনি। আজন্মদুঃখিনী সুভদ্রা প্রথম যৌবনে অনাথ আশ্রমের বিস্বাদ অন্ন আধপেটা খেয়ে জীর্ণ, মলিন শয্যায় শুয়ে প্রতিরাত্রে যে স্বপনপুরীর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া কন্দর্পকান্তি রাজকুমারকে স্বীয় অন্তরের বাসরঘরে নিমন্ত্রণ করে এনে কম্পিত হস্তে গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিত, তার সঙ্গে সুবোধের একেবারেই কোন সাদৃশ্য ছিল না।

সুবোধ প্রায় সর্ব্বতোভাবেই ছিল সুভদ্রার আবাল্যের পরিচিত আর্য্যসমাজের সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের মত—যাদের শ্রদ্ধা করা যায় কিন্তু ভালবাসা যায় না। তাই সুদীর্ঘকাল এত কাছাকাছি বাস করেও সুবোধের দিকে তার অন্তর আকৃষ্ট হয়নি। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কোনমতেই সুবোধকে সে কোনদিনই উৎসাহিত করেনি। সুতরাং সেবার সুবোধের মনের ভাবটা আন্দাজ করেই সুভদ্রা চমকে উঠল। নিজের বুকের ভিতরটা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও তার কোন কোণেই সে সুবোধের জন্য একফোটা ভালবাসারও সন্ধান পেলে না। বরং সুবোধের সঙ্গে সহকর্ম্মী, বড় জোর, বন্ধুর সম্বন্ধ ছাড়া

নীবিড়তর ও মধুরতর আর কোন সম্বন্ধের কল্পনামাত্রেই কেমন যেন একটা দুর্বোধ্য বিতৃষ্ণায় তার মন বসল বেঁকে।

তথাপি সুবোধের মত অমন আদর্শপাগল, আত্মনিগ্রহে আস্থাবান, নীরস, সংসারবিমুখ পুরুষের শুষ্ক বক্ষে সে যে রসের প্রবাহ বহাতে পেরেছে, এই সত্য নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করে সুভদ্রার নারীহৃদয় সহসা দিগ্বিজয়ী বীরের মতই বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হল, তা কেবল অদ্ভুতই নয়, উদ্ভট। সহজ প্রবাহে বইতে পারলে ওর পরিণতি যে কি হত, বলা যায় না। কিন্তু তা হল না। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই হুগলীতে এসে উপস্থিত হল অরুণাংশু।

একেবারেই রূপকথার রাজপুত্র,—যেমন রূপ, তেমনি গুণ আর তেমনি তার ইতিহাস। চাঁপা ফুলের মত রঙ, দীর্ঘ, ঋজু, বলিষ্ঠ দেহ, নিখুঁত গঠন,—সে যেন যৌবন, স্বাস্থ্য ও পৌরুষের জীবন্ত একখানি আলেখ্য। তার প্রশস্ত ললাটে প্রতিভার ছাপ, অতুলনীয় ভাসা ভাসা টানা চোখ দুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি, ওষ্ঠপ্রান্তে চঞ্চল কিন্তু অনির্ব্বাণ হাস্যের দীপ্ত মাধুর্য্য। তার জ্ঞান অসীম,—অন্ততঃ আলাপ করলে তাই মনে হয়। তেমনি বিপুল তার অভিজ্ঞতা। গোটা ভারতবর্ষটা তো বটেই, সারা ইয়োরোপও সে ঘুরে এসেছে—সায় সোভিয়েট রুশিয়া। সে পড়েছে অনেক, ভেবেছে তার চেয়ে অনেক বেশী, দেখেছে বিস্তর। তার চিন্তার তাই একটা বৈশিষ্ট্য আছে; জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে আছে একটা সার্ব্বজনীনতার ছাপ। আসক্তি তার কিছুতেই নেই, অথচ বৈরাগ্যও নেই। দোকানের পুরি বা ছাতু খেয়ে, এমন কি, না খেয়েও সে দিনের পর দিন কাটাতে পারে; আবার ভাল খাবার পেলে তা-ও সে ছাড়ে না। নিরক্ষর মজদুরদের সঙ্গে সে যেমন সহজভাবে আলাপ করতে পারে, তেমনি সহজভাবেই সে অভিজাত সমাজে গিয়েও আসর জমাতে পারে। আহার-নিদ্রা ভুলে, পথের ধুলা মাথায় নিয়ে দিনের পর দিন অক্লান্ত আগ্রহে সে কাজ করে যেতে পারে, আবার কাজ না থাকলে সে তেমনি সাগ্রহেই সিনেমায় গিয়েও ছবি দেখতে পারে। মজদুর আন্দোলন নিয়েই সে থাকে; অথচ শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্রও বিতৃষ্ণা নেই। যতখানি আগ্রহের

সঙ্গে সে মজদুরের শোভাযাত্রা চালনা করে, ঠিক ততখানি আগ্রহের সঙ্গেই সে দেশবিদেশের কবিতা ও উপন্যাস পাঠ করে, নাটক দেখে এবং এস্রাজ বাজিয়ে ও গান গেয়ে নিজের সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলের মনোরঞ্জনও করতে পারে। সুবোধের মতই অরুণাংশু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ত্যাগ এবং কর্ম্ম-কুশলতায় একের সঙ্গে অপরের বিস্ময়কর সাদৃশ্য কারও চোখ এড়াতে পারে না; তথাপি সকলেই বুঝতে পারে যে অরুণাংশু একেবারেই সুবোধের বিপরীত।

সুভদ্রার জীবনের যুগসন্ধিক্ষণে এ হেন রহস্যময় অরুণাংশু তার বিস্ময়কর অতীতের রামধনু রঙের আলোর মুকুট মাথায় পরে সুভদ্রার ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল।

হুগলীতে তাকে নিয়ে এসেছিল সুবোধ নিজেই। সে আসবার আগেই সুভদ্রার কাছে তার পরিচয় দিয়ে বলেছিল, আমি বলেছি তা তাকে বলবেন না যেন সুভদ্রাদেবী,—কিন্তু এ কথা সত্য যে খুব ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের একমাত্র সন্তান এই অরুণাংশু,—বাপমায়ের সম্পত্তি পায়নি বলে তাদের বিপুল ধনসম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ছেড়ে হাসি মুখে সে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। তার নিজের ক্ষমতাও কম নয়। বাড়ী থেকে এক কপর্দ্দক মাত্র সাহায্য না নিয়েও সে সারা ইয়োরোপটা ঘুরে বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এসেছে। আজ যদি সে হাইকোর্টে যেতে সুরু করে তো দেখতে দেখতেই সে বড়লোক হয়ে যাবে। অথচ সেদিকে তার মন নেই। সমাজে যাদের স্থান সবচেয়ে নীচে,—খুঁটির মত গোটা সমাজটাকে অবলম্বন দিয়ে খাড়া রেখেছে বলেই যারা সবচেয়ে বঞ্চিত এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত, তাদেরই সেবায় নিজেকে সে উৎসর্গ করে দিয়েছে। কর্ম্মকুশলতায় তার জুড়ি এদেশে খুব বেশী পাওয়া যাবে না। আমি বাড়িয়ে বলছিনে, সুভদ্রাদেবী,—তার সাথে পরিচয় হলেই আপনিও বুঝতে পারবেন যে সত্যই এই অরুণাংশু এক অসাধারণ মানুষ।

প্রথমে সে এসেছিল বিশেষ একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে জনসভায় বক্তৃতা করতে। সেই দিনই সুভদ্রার মনে হয়েছিল যে, আকাশের বজ্র আর বিদ্যুৎই যেন মানুষের রূপ ধরে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে। তারপর আর একদিন সুবোধ তার বাসায় এসে হাসিমুখে তাকে সংবাদ দিয়েছিল, সে দিন সেই যে

অরুণাংশুর সাথে আপনার পরিচয় করে দিয়েছিলাম, সুভদ্রাদেবী, সে-ই এখানে আসছে আমার সহকর্ম্মী হয়ে, আমারই সাথে এই মজদুরের বস্তিতেই সে থাকবে, কাজ করবে এই অঞ্চলের মজদুরদের মধ্যে।

শুনেই সুভদ্রার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠেছিল; দেহের অনেকখানি রক্ত ছুটে এসেছিল তার মুখের উপর। রুদ্ধ নিশ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, এখানেই থাকবেন তিনি?

সুবোধ উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ—ঠিক আমারই মত কুকার আর পুরির দোকানের উপর নির্ভর করে।

আর কোন কথা ভেবে না পেয়ে সুভদ্রা বলেছিল, উনি বুঝি আপনার দলের লোক?

সুবোধ কুণ্ঠিতভাবে মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল, না সুভদ্রাদেবী, সে কম্যুনিষ্ট—আমি যা নই এবং যা আমি কিছুতেই হতে পারব না।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ গম্ভীর স্বরে সে বলেছিল, তাতে কিছু এসে যায় না, সুভদ্রাদেবী। তাকে আমার বড্ড ভাল লেগেছে। আর তাছাড়া, ইদানীং কিছুদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে এখানে খড় আর মাটি দিয়ে আমি মূর্ত্তিই কেবল গড়েছি, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি। অরুণাংশু তাই করতে পারবে।

সব কথা সেদিন সুভদ্রার কানে যায়নি। তার বুকের রক্ত এত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল যে সে কানেও ভাল শোনে নি, মুখেও কিছু গুছিয়ে বলতে পারে নি। তার অবস্থা দেখে সুবোধ বিস্ময়ের স্বরে বলেছিল, এ কি সুভদ্রাদেবী, আপনার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল মনে হচ্ছে যে। অরুণাংশু এখানে আসে, তা আপনি পছন্দ করেন না নাকি?

যান,—সুভদ্রা লজ্জায় চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিতস্বরে উত্তর দিয়েছিল,—তাই আমি বলেছি নাকি?

তারপর অসাধারণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে সে ক্ষীণস্বরে আবার বলেছিল, বেশ তো কাজ চলে যাচ্ছিল—কেন আবার আর একজনকে এখানে আনতে চাচ্ছেন—বিশেষতঃ আপনার দলের লোক যখন তিনি নন!—

সুবোধ স্মিতমুখে উত্তর দিয়েছিল, কাজের স্থান দলের অনেক উপরে।

অরুণাংশু এখানে এলে আমার কাজ অনেক এগিয়ে যাবে, পদ্ধতির হবে উন্নতি। বামপন্থী সকল দলের সম্মিলিত 'ফ্রন্ট' এখানে গড়ে উঠছে।

একটু থেমে মুচকি হেসে সে আবার বলেছিল, আর তা ছাড়া, জানেন তো সুভদ্রাদেবী, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেবার অনুমতির জন্য আমার দরখাস্ত মহাত্মাজীর কাছে চলে গিয়েছে। ভাগ্যক্রমে মঞ্জুর যদি হয় তো নিজে আমি জেলেই চলে যাব। তখন এখানে কাজ চালাতে পারবে বলেই তো অরুণাংশুকে আমি নিমন্ত্রণ করে এসেছি!—

তারপর এল অরুণাংশু,—একা নয়, আরও একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে এল সে। তার নাম বিমল। ইয়ুনিয়নের আপিস ঘরেই আরও দুখানা চারপাই পড়ল। খুব কাছে থেকে অরুণাংশুকে খুব ভাল করে দেখবার সুযোগ হল সুভদ্রার।

দেখে সে বুঝতে পারলে যে সুবোধ অরুণাংশুর সম্বন্ধে যা বলেছিল সে তা তো বটেই, তার উপরেও অনেক কিছু। তার রূপের তুলনা হয় না, গুণেরও অবধি নেই। এমন কোন বিষয় নেই যা তার অজানা। সকল ক্ষেত্রেই তার সমান কৃতিত্ব। এমন চমৎকার সে লিখতে পারে যে কাগজওয়ালারা মোটা দক্ষিণা দিয়ে তার লেখা কিনে নেয়। দেশী ও বিদেশী অনেকগুলি ভাষায় সে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারে। মঞ্চের উপর সে যখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়ায়, তখন তার চোখ আর মুখ থেকে আগুন যেন ঠিকরে বের হতে থাকে আর সেই আগুনের স্পর্শে শ্রোতাদের নির্জীব প্রাণগুলি শুকনো কাঠের মতই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আবার কারখানার সাহেব সুবাদের সঙ্গে মিঠিয়ে মিঠিয়ে কথা বলে দরদস্তুর করতেও তেমনি তার দক্ষতা। তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তার ক্ষুরধার যুক্তি, তার কৌশলের কাছে অতি বড় একগুয়ে এবং অত্যন্ত জবরদস্ত বড় সাহেবকেও হার মানতে হয়। পুঁজি আর শ্রমের দ্বন্দ্বে শ্রমিকের তরফ থেকে ওকালতি করতে গিয়ে তার নিজের মক্কেলকে সে নির্ঘাত দুপয়সা বেশী পাইয়ে দেয়। টাকা তুলতেও তার কৃতিত্ব অসাধারণ। অনেক বড়লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে তার পরিচয় আছে; তাছাড়া তার রূপ, শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা এমন যে, যে কোন বড়লোকের সঙ্গেই সে গিয়ে সমান হয়ে মিশতে পারে। এ হেন

সর্ব্বগুণসম্পন্ন অরুণাংশুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সত্যই যেন তাদের মজদুর ইয়ুনিয়ন ছোঁয়াচে প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। পরিবর্ত্তন যা হল, তা বৈপ্লবিক। শ্যামাচরণ, কুদ্দুস, কেশবলাল, আপ্পারাও প্রভৃতি ছোট ছোট কর্ম্মীরা তো বটেই, সুবোধ পর্য্যন্ত অরুণাংশুর বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল।

দিগ্বিজয়ী সীজরের মতই অরুণাংশু কর্ম্মক্ষেত্রে এসে যেন একটিবার শুধু চারদিকে চেয়ে দেখেই সব জয় করে নিলে,—কেবল কারখানার সাহেব ম্যানেজার আর মজদুর ব্যারাকের কুলি আর মিস্ত্রিদেরই নয়, অমন অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্য এবং দুর্জ্জয় শক্তির অধিকারিণী সুভদ্রাকেও।

সে এক অপার, অতল রহস্য। এতবড় একটা ঘটনা কেমন করে যে ঘটে গিয়েছিল তা সেদিনও সুভদ্রা বুঝতে পারে নি, পরেও নয়। সত্যই সে এক দুর্বোধ্য বিস্ময়। মাথার উপর নির্মেঘ, উজ্জ্বল আকাশে মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত সূর্য্য, পায়ের নীচে শুকনো, খটখটে, শক্ত, নিরাপদ মাটি; কোথাও কিছু নেই;—হঠাৎ কোথা থেকে যেন দুর্দ্ধর্ষ একটা বন্যা নেমে এল, আর তারই প্রবল টানে সুভদ্রা হাল্‌কা একটি তৃণখণ্ডের মতই ভেসে গেল। সে ভাববার সময় পেলে না, একটিবার পিছনের দিকে চেয়ে দেখতে পারলে না;—চক্ষের পলকে নিজের যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে সে একেবারে অতলে তলিয়ে গেল।

সেদিন ভাল-মন্দ, অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই বিবেচনা না করে স্বীয় অন্তরের একটা দুর্ব্বার প্রেরণার বশে অরুণাংশুর নিমন্ত্রণভরা হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে চেয়ে তারই কাছে নিজেকে সে নিঃশেষে সমর্পন করে দিয়েছিল;—দেনা-পাওনার হিসাব করে নি, দলিল-দস্তাবেজ দাবী করে নি, শুধু দেওয়ার আনন্দেই নিজের সমস্ত সম্পদ অরুণাংশুর পায়ের কাছে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল। অরুণাংশু যে তার আত্মদানের ঐ অর্ঘ্য গ্রহণ করেছিল, এই হয়েছিল তার বহুবাঞ্ছিত পুরস্কার।

তারপর এই এত বড় বিস্ময়, এত বড় বিপ্লবের জন্মরহস্য সম্বন্ধে মনে মনে অনেক গবেষণা করেও সুভদ্রা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে নি, অরুণাংশুকে প্রশ্ন করেও তার কাছ থেকেও সে কোন সন্তোষজনক উত্তর পায় নি। অরুণাংশুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেই সে হয় হেসে

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ইংরাজ কবির কবিতার তর্জমা করে উত্তর দিয়েছে— প্রথম চোখের দেখাতেই যে ভালবাসে নি, সে কি কখনও ভালবেসেছে স্থ? নয়তো হঠাৎ দুই হাতে সুভদ্রার আরক্ত মুখখানি নিজের বুকের উপর টেনে নিয়ে গুণ গুণ স্বরে তাকে বাঙ্গালী কবির কবিতা শুনিয়ে দিয়েছে—

'আমরা দুজনে ভাসিয়ে এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে—
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।'

মোট কথা, সুভদ্রা ও অরুণাংশুর ভালবাসার জন্ম-ইতিহাসটা তাদের দুজনের কেহই তর্কশাস্ত্রের বাঁধা নিয়মে ব্যাখ্যা করে অন্তরের কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করতে পারে নি। কিন্তু তার জন্য তাদের সতেজ ভালবাসার দুর্ব্বার গতি কোথাও ব্যহত হয় নি।

সুভদ্রার জীবনের আর একটা যুগসন্ধিক্ষণে অকস্মাৎ সুবোধকে নিজের চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পেয়ে বিজলীর একটা ঝিলিকের মতই সুদূর অতীতের সেই বিশেষ ঘটনাটি আদ্যোপান্ত সুভদ্রার মনে পড়ে গেল, মায় সুবোধের প্রতিক্রিয়া। সেও এক বিরাট বিস্ময়।

আশ্চর্য্য ঐ সুবোধ। আর কারও নয়, কেবল একা সুভদ্রারই চোখে পড়ল যে, যে চোখে একদিন অন্তরের রামধনুর সাতটি রঙই একসঙ্গে বিচিত্র হয়ে ফুটে উঠেছিল, সেই চোখেই হতাশ প্রেমিকের আহত ও রক্তাপ্লুত হৃদয়ের দুঃসহ বেদনা শ্রাবণ মেঘের কালো ছায়া হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু সে-ও দুদিনের জন্য। অত বড় একটা ঝড় সুবোধের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল, অথচ সে ভেঙ্গে পড়ল না। অত বড় একটা শক্ত আঘাতেও বেশ সহজেই সামলে নিয়ে আবার সে চলতে সুরু করলে,—একটু দম নিয়েই পথিক যেমন আবার বিদ্যুদ্বেগে চলতে সুরু করে। তার কাজের উৎসাহ গেল বেড়ে; তেমনি বেড়ে গেল আরাম আর বিশ্রামের বিরুদ্ধে তার স্বভাবসুলভ উপেক্ষা। তার আচরণে বিপরীত একটু যা প্রকাশ পেল তা সুভদ্রাকে এড়িয়ে চলবার একটা সংযত অথচ সযত্ন প্রচেষ্টা।

তারপর এল তার তীর্থযাত্রা। বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন

সুভদ্রার বাসায় হাজির হয়ে হাসিমুখে সে বললে, একটা শুভ সংবাদ দিচ্ছি, সুভদ্রাদেবী,—দরখাস্ত আমার মঞ্জুর হয়ে এসেছে। কাল সকালেই আমি রওনা হচ্ছি সত্যাগ্রহ করতে।

বিহ্বলের মত সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলে, কবে ফিরবেন?

সুবোধ হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, তা কেমন করে বলব! গান্ধিজীর হুকুম যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি করতে করতে পায়ে হেটে এগিয়ে যেতে হবে। পুলিশ যদি গ্রেপ্তার করে তো দায় তখনই চুকে গেল; কিন্তু না যদি করে তো যেতে হবে দিল্লী পর্য্যন্ত। কাজেই অবস্থা যা-ই হউক না কেন, দিন তারিখ ঠিক করে ফিরে আসতে পারব না নিশ্চয়ই!—

পরিণতিটা সুভদ্রার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত না হলেও ঠিক ঐ সময়েই সে এটা প্রত্যাশা করে নি। হঠাৎ এরকম একটা অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ঘাবড়ে গেল সে। তার মাথাটা গুলিয়ে গেল, বুকের মধ্যে উঠল ঝড়। মুখ ফুটে না পারল সে কোন উত্তর দিতে, না পারল প্রশ্ন করতে।

কিন্তু সুবোধ নিজেই একটু পরে হঠাৎ আবার ফিক্ করে হেসে ফেলে বেশ একটু কৌতুকের স্বরেই বললে, আমার অনুপস্থিতির এই ফাঁকে আপনাদের বিয়ে যদি হয়ে যায়, সুভদ্রাদেবী, তাহলে দয়া করে ইতর জনের প্রাপ্য মিষ্টান্নটুকু আমার জন্য তুলে রাখবেন।

সেও প্রায় আট ন'মাস আগের কথা।

তিন বৎসরের বিচিত্র এই ইতিহাস মুহূর্ত্ত মধ্যে বিস্মৃতির অন্ধকার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে যেন সুভদ্রার চোখের সামনে সজীব হয়ে উঠল।

সুভদ্রা নিঃসংশয়েই চিনতে পারলে যে এ সেই সুবোধ যে নীরবে তাকে ভালবেসেছিল, না পাওয়ার বেদনা নীরবেই সহ্য করেছিল এবং অবশেষে কোন প্রতিবাদ, কোন অভিযোগ না করে নিজের প্রিয়পাত্রীকে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে সমর্পন করে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র থেকেও অনেক দূরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

সেই সুবোধ আজ আবার ফিরে এসেছে।

সুভদ্রার পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্য্যন্ত অকস্মাৎ যেন বিদ্যুতের প্রচণ্ড একটা শিহরণ খেলে গেল।

অবাক হয়ে গিয়েছেন আপনি—না ? ভূত মনে করছেন না তো?—সুভদ্রার দিকে অল্প একটু এগিয়ে এসে সুবোধ বললে।

নিজেকে সামলে নিলে সুভদ্রা। স্তম্ভিত, প্রায় মূর্চ্ছিত মনটাকে সজাগ করবার উদ্দেশ্যে শরীরটাকে বেশ জোরে একবার নাড়া দিয়ে সে বললে,—অবাক হবার কথা নয়? কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ নিজেই একেবারে সশরীরে হাজির হয়েছেন। আগে একটা খবরও তো দেন নি!—

তা বটে,—সুবোধ ঈষৎ কুণ্ঠিতস্বরে বললে,—তবে কি জানেন?—ওরাও আমায় কোন খবর দেয় নি;—যেদিন ধরলে সেদিনও যেমন নয়, যেদিন ছাড়লে সেদিনও তেমনি।

একটু থেমে হেসে ফেলে কথাটাকে সে শেষ করলে, জেল থেকে বেরিয়েই সোজা চলে আসছি।

সুভদ্রা উত্তর দিলে না; বোধ করি সুবোধের সবগুলি কথা তার কাণেও গেল না। সে একদৃষ্টে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আশ্চর্য্য!—এই ক'মাসে সুবোধের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। তার মুখের রঙ গিয়েছে বদলে—ময়লা রঙ একটু যেন ফর্সা হয়েছে অথবা পাশুটে। সুভদ্রার মনে হল যে মাথায় সে যেন আগের চেয়ে খানিকটা বেড়ে উঠেছে। তবে সেটা আসলে উচ্চতারই বৃদ্ধি, না দেহ রোগা হবার জন্যই তাকে অমন ঢ্যাঙ্গা দেখাচ্ছে, তা সে ঠিক ধরতে পারলে না। সব চেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন দেখা গেল সুবোধের মুখের ভাবে। তার সাদাসিধে গঠনের মুখখানির উপর শেষের দিকে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যের যে কালো ছায়াখানি প্রায় কায়েমী স্বত্ব নিয়ে জুড়ে বসেছিল, তার লেশমাত্রও আজ আর সুভদ্রার চোখে পড়ল না। মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠলে আকাশের যে অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা তার মুখের; চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ,—কামনার অগ্নিশিখা যেমন তাতে নেই, তেমনি নৈরাশ্যের কুহেলিকাও নেই। যে সূক্ষ্ম অন্তরেন্দ্রিয় দিয়ে একদিন সুভদ্রা সুবোধের অন্তরের উত্তাপ সঠিকভাবে অনুভব করেছিল, সেই ইন্দ্রিয় দিয়েই আজও সুভদ্রা এক নিমেষেই জানতে পারলে যে, কালের শীতল, কোমল হাতের নিপুণ সেবায় সুবোধের অন্তরের ক্ষত সেরে গিয়েছে,—সে আজ সম্পূর্ণ সুস্থ।

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিপুল বিস্ময়। সুভদ্রা সবিস্ময়ে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সুবোধ চোখ নামিয়ে নিলে না, আগের মতই অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সুভদ্রার চোখের দিকে চেয়ে সকৌতুকস্বরে সে আবার বললে, এলাম তো অনেক আশা নিয়ে; কিন্তু এসে দেখছি সবই কেমন যেন খাপছাড়া। আপনার বাসায় গিয়ে দেখি—দোর বন্ধ। ইয়ুনিয়নের অপিসে গিয়ে দেখি—সেখানেও সেই অবস্থা। অনেকে তো আমায় চিনতেই পারলে না মনে হল; যাদের জিজ্ঞেস করলাম তারা কেউ কোন একটা সঠিক খবর দিতে পারলে না,—যা বললে, তা মনে হল দুর্ব্বোধ্য। শেষে ক্ষিদের জ্বালা আর সইতে না পেরে রহমানের দোকানে বসে খানিকটা গোস্ত্-রুটি খেয়ে নিলাম। তারপর আবার গেলাম আপনার বাসায়। দেখলাম তখনও দোরে আগের মতই তালা ঝুলছে। আন্দাজ করে খুঁজতে এলাম এখানে। সেই থেকে এই বারান্দায় শক্ত বেঞ্চের উপর চুপ করে বসে রয়েছি।—

হাত ঘড়িটির দিকে চেয়ে সুবোধ কথাটা শেষ করলে,—ঝাড়া দেড়টি ঘণ্টা—মাত্র দুমিনিট কম।

দে—ড় ঘণ্টা! সুভদ্রা যেন শিউরে উঠে বললে,—দেড় ঘণ্টা আপনি এখানে বসে আছেন? ভিতরে আমায় খবর পাঠান নি কেন?

শুনলাম একটা শক্ত কেস্ নিয়ে আপনি ব্যস্ত আছেন; তাই আপনাকে আর বিরক্ত করি নি,—সুবোধ স্মিতমুখে উত্তর দিলে; তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু ব্যাপার কি সুভদ্রাদেবী? ইয়ুনিয়নের আপিসে তালা কেন? এরা সব গেল কোথায়?

বিমলবাবু এখানে নেই,—সুভদ্রা উত্তরে বললে,—বাড়ী গিয়েছেন কদিন আগে,—কবে ফিরবেন কিছু ঠিক নেই। কিন্তু তার জন্য কিছু আটকাচ্ছিল না; শ্যামাচরণদা হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়াতেই সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

গ্রেপ্তার!—সুবোধ চমকে উঠে বললে,—শ্যামারণদা'কে ধরে নিয়ে গিয়েছে নাকি? কেন?

তাই তো বলছিলাম,—সুভদ্রা উত্তর দিলে,—শুনলে বিশ্বাস করবেন না

আপনি, কেউ বিশ্বাস করবে না,—শ্যামাচরণদা ধরা পড়েছে চুরির দায়ে। সে নাকি কারখানার কি সব যন্ত্রপাতি চুরি করেছে। নালিশ রুজু করেছে তাদের সেক্‌সনের পেশোয়ারী ওভারশিয়র। সবাই বলছে, অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যে—ইয়ুনিয়নের কাজ করে বলে একটা ছুতো ধরে এ তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা মাত্র। এদিকে এত সব কাজ আমার হাতে এসে পড়েছে যে তার জামিনের জন্য একটা চেষ্টাও আমি করতে পারি নি। জামিন দূরে থাক্, ঘরের কাছে বেচারী বউদির কি দশা হল, তা পর্য্যন্ত দেখে আসবার সময় আমি পাই নি।

শুনে সুবোধ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের মত চমকে উঠে বললে, কিন্তু অরুণাংশু—সেও কি এখানে নেই?

অরুণাংশুর নাম শুনেই লাল হয়ে উঠল সুভদ্রা; বিব্রতভাবে চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিতস্বরে সে বললে, উনি এখানেই আছেন, তবে তাঁরও অসুখ।

অসুখ!—সুবোধ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কি অসুখ?

পেটের অসুখ,—চোখ না তুলেই সুভদ্রা উত্তর দিলে,—অনেকদিন থেকেই এমেবিক্ ডিসেন্ট্রিতে ভুগছেন উনি। ইদানীং তো প্রায় শয্যাগত অবস্থা। সঙ্গে একটু জ্বরও আছে।

বলেন কি!—সুবোধ আরও বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে বললে,—কিন্তু কৈ? আপনার ওখানে তাকে তো দেখতে পেলাম না?

ধেৎ!—সুভদ্রা লাল হয়ে উঠে বললে,—আমার ওখানে তাঁকে দেখতে কেন পাবেন? তাঁর নিজের বাসা নেই?

অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে সুবোধ বললে, তাঁর নিজের বাসা!

তা নয় তো কি!—সুভদ্রা কুণ্ঠিতস্বরে উত্তর দিলে,—চিরকালই তো নিজের বাসা তাঁর আছে!—

তা ছিল জানি। কিন্তু আজকাল? আপনিও আজকাল ওখানেই থাকেন নাকি?

ধেৎ!—সুভদ্রা আবার লাল হয়ে উঠে বললে,—আমি কেন ওখানে থাকতে যাব!—

কিছুক্ষণ,—সুভদ্রার মনে হল যেন এক যুগ,—সুবোধ বিহ্বলের মত

সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার পর টেনে টেনে, থেমে থেমে বললে, আমি কিন্তু মনে করেছিলাম, সুভদ্রাদেবী, যে এসে দেখব বিয়ে আপনাদের হয়ে গিয়েছে।

সুভদ্রার গোটা শরীরটাই প্রথমে থর থর করে কেঁপে উঠল, মুখখানা হয়ে গেল বিবর্ণ। কিন্তু পরের মুহূর্তেই সোজা সুবোধের চোখের দিকে চেয়ে বেশ মিষ্টি রকমের একটু হেসে মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট স্বরেই সে বললে, ঠিকই তো,—ভুল তো হয় নি আপনার! বিয়ে আমাদের সত্যি হয়ে গিয়েছে।

সুভদ্রাকে অনুসরণ করে তারই বাসার দিকে নিঃশব্দে পথ চলতে চলতে সুবোধ এক সময়ে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠে বললে, আজ আপনারা বড্ড বোকা বানিয়েছেন আমায়। আমি সত্যি ভেবেছিলাম যে আপনাদের বিয়ে এখনও হয়নি। কিন্তু ব্যাপার কি, বলুন তো? বিয়ের পরেও আপনারা আলাদা বাসায় রয়েছেন কেন?

চলার গতিটা আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে সুভদ্রা বললে, বিয়ে হলেই একসঙ্গে এক বাসায় থাকতে হবে, তার কি মানে আছে?

তা হয় তো নেই,—সুবোধ হাসতে হাসতেই বললে,—তবে সব দম্পতীই একসঙ্গে থাকে কি না,—তাই কথাটা জিজ্ঞেস করলাম।

সুভদ্রা অস্ফুটস্বরে উত্তর দিলে, কিন্তু সবাই আর সকলের মত না-ও তো হতে পারে!

সুভদ্রা এগিয়েই চলেছিল,—সুবোধের মনে হল যে তার গতিও যেন বেড়েই চলেছে। কিছুক্ষণ বিস্মিতের মত তার দিকে চেয়ে থাকবার পর সুবোধ সহসা আবার শব্দ করে হেসে উঠে বললে, তা বটে—সংসারে দুএক-জনের উদ্ভটও তো হওয়া চাই!

সুভদ্রা উত্তর দিলে না, নিজে থেকে আর কোন কথাও বললে না সে। কিন্তু বাসার কাছাকাছি গিয়েই হঠাৎ ফিরে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে কতকটা অনুনয়, কতকটা প্রায় আদেশের স্বরেই সে বললে, সত্যি সুবোধবাবু, কথাটা কাউকে বলবেন না যেন। আপনার বন্ধুর কাছেও দয়া করে এর উল্লেখ করবেন না।

সুবোধের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না ; থমকে দাঁড়িয়ে সে বললে, কেন, বলুন তো ?

না, বলুন,—সুভদ্রা জিদের স্বরে উত্তর দিলে,—কথা দিন আগে। কাউকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলতে পাবেন না আপনি।

সুবোধ আরও কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল ; তার পর হঠাৎ ফিক্ করে হেসে বললে, ব্যাপার কি সুভদ্রাদেবী ? মা-বাপের সঙ্গে একটা আপোষ-রফার চেষ্টা চলছে নাকি ?

দেখতে দেখতে সুভদ্রার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; সে হেসে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, চলছে।

সেই জন্যই বিয়েটা বুঝি গোপন রাখা হয়েছে ?

ঠিক তাই।

বলেই সুভদ্রা ছুটে রোয়াকের উপর উঠে গেল।

নিতান্তই ছোট বাসা সুভদ্রার—মাঠের একটা কোণে একতলা ছোট একখানি পাকা বাড়ী। ঘণ্টা-দুএক আগে যেমন সুবোধ দেখে গিয়েছিল তখনও তেমনি রয়েছে। বাইরের দরজায় তালা। খালি বাড়ী—একটা চাকর বা ঝি পর্য্যন্ত নেই। সুভদ্রা নিজের হাতেই দোর খুললে। বিব্রত সুবোধের কুণ্ঠিত কণ্ঠের সরব প্রতিবাদকে স্মিতমুখে উপেক্ষা করে ক্যানভাসের হাল্কা আরাম চৌকীখানি নিজের হাতে বারান্দায় টেনে এনে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বললে, অপরাধ নেবেন না, সুবোধবাবু, একটু বসুন,—আমি চট্ করে স্নানটা সেরে আসি।

কিন্তু সুবোধ তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, বাড়ী তো দেখছি একেবারে খালি—ঝি-চাকর কোথায় গেল ?

ঝি-চাকর আবার কবে ছিল আমার ?—সুভদ্রা সশব্দে হেসে উঠে বললে,—এই ক'মাসেই সব ভুলে গেলেন নাকি ? একটা তো মোটে ঠিকে ঝি—সে কোন সকালে তার কাজ সেরে বাড়ী চলে গিয়েছে।

কিন্তু—সুবোধ ঢোক গিলে বললে,—আপনি তো শুনেছি সেই ভোর বেলায় হাসপাতালে গিয়েছিলেন। খাবেন কি ? এখন আবার রাঁধতে বসবেন নাকি ?

বাঃ—রাঁধতে হবে না ?—সুভদ্রা সুবোধের দৃষ্টি এড়িয়ে উত্তর দিলে,—নিজেকে নিয়ে যা খুশী করা যায় বলে কি অতিথিকে অভুক্ত রাখা চলে ?

সুবোধ মুচকি হেসে বললে, অতিথির জন্য আপনাকে ভারতে হবে না। অনেক আগেই রহমানের দোকানে তার ষোড়শোপচারের সেবা হয়ে গিয়েছে। আপনার নিজের খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে, তাই আগে বলুন।

কিন্তু প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে সুভদ্রা পাল্টা প্রশ্ন করলে, সত্যি বলছেন আপনি ? সত্যি খেয়ে এসেছেন ?

সত্যি, সত্যি, সত্যি,—সুবোধ এবার গম্ভীর হবার ভাণ করে উত্তর দিলে,—তিন সত্যি করে বলছি, আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে ; আর তা-ও যা-তা খাওয়া নয়, একেবারে সত্যিকারের গোস্ত-রুটি যা একবার পেটে গেলে আট ঘণ্টার কমে নীচে নামতে চায় না। কিন্তু আমার কথা থাক্। আপনি নিজে কি খাবেন, বলুন তো ? হেঁশেলে গিয়ে আবার হাঁড়ি ঠেলতে হবে নাকি ?

একটু ইতস্ততঃ করে সুভদ্রা উত্তর দিলে, না, আমার নিজের জন্য এই অবেলায় আমি আর রাঁধতে বসব না। কাজ আছে অনেক।

—কিন্তু খাবেন কি ?

সে আমি বুঝব'খন,—সুভদ্রা অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে,—ঘরে কিছু আছে নিশ্চয়ই—নয় তো দোকান থেকে আনিয়ে নেব। কিন্তু এখন পথ ছাড়ুন তো আপনি—স্নান না করলে আমি যে আর বাঁচি নে !—

সুভদ্রা চলে যাবার পর সুবোধ কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল ; খানিকক্ষণ ঐ ছোট বারান্দাটিতেই চঞ্চল হয়ে পায়চারি করলে সে ; তার পর আসনে আর না বসে নীচে নেমে দ্রুতপদে বাজারের দিকে চলে গেল। একটা মিঠাইএর দোকানে ফরমাস দিয়ে সে তাড়াতাড়ি কিছু লুচি আর আলু ভাজিয়ে নিলে ; আর একটা দোকান থেকে কিনে আনলে কিছু ফলমূল এবং সকলের শেষে বেছে বেছে কয়েকটি মিষ্টি কিনে সব জিনিষ একটা বড় ঠোঙ্গায় পুরে আবার সে সুভদ্রার বাসায় ফিরে গেল।

স্নানের পর সুবোধকে দেখতে না পেয়ে সুভদ্রা বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু তাকে অত সব খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ফিরে আসতে দেখে সে আরও বেশী

বিস্মিত হল। দু'পা পিছনে সরে গিয়ে সে বললে, সর্ব্বনাশ—এ আপনি করেছেন কি!

সুবোধ হেসে উত্তর দিলে, সর্ব্বনাশের কিছুই করি নি,—করেছি নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির একটা মামুলি কাজ। বাজারের খাবার খেয়েই যখন এবেলা আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে, তখন তাই খানিকটা কিনে এনেছি মাত্র—কাউকে তো বাজারে গিয়ে আনতেই হত!

তাই বলে আপনি গিয়ে কিনে আনবেন?—সুভদ্রা অত্যন্ত কুণ্ঠিত এবং বোধ করি খানিকটা ক্রুদ্ধ হয়েই বললে,—ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জায়ই আপনি আমায় ফেললেন! পয়সা পর্য্যন্ত—

—তার সময় তো এখনও যায় নি,—সুবোধ বাধা দিয়ে হাসতে হাসতেই বললে,—এখনও হিসেব করে এসবের দাম আপনি আমায় চুকিয়ে দিতে পারেন। এমন কি, বয়ে আনবার মজুরিটুকু পর্য্যন্ত।

না,—সুভদ্রা যেন একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বললে,—আপনার সাথে কারও পারবার জো নেই। কিন্তু এত জিনিষ যখন কিনে এনেছেন,—বলতে বলতে আবার সে সুবোধের চোখের দিকে তাকাল,—তখন আপনাকেও এখানেই আর একবার পাত পাততে হবে। আসুন ভিতরে, মুখহাত ধোবেন, আসুন।

কিন্তু সুবোধ হাত জোড় করে উত্তর দিলে, ঐটি মাপ করতে হবে, সুভদ্রাদেবী; সত্যি বলছি—ন স্থানং তিলধারণম্।

সুভদ্রা বিব্রতের মত কিছুক্ষণ সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার পর সহসা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বললে, এ তো আপনার চিরকালের গোঁ—আমার এখানে কিছুই মুখে দেবেন না। বেশ, বসুন তবে, আমি খেয়ে আসি। কিন্তু দেখবেন,—বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে আবার সুবোধের মুখের দিকে চেয়েই সে ফিক্ করে হেসে ফেললে,—এবার আবার পান কিনতে যাবেন না যেন—আমি পান খাইনে।

সুভদ্রা ভিতরে চলে যাবার পর সুবোধ ক্যানভাসের চৌকীখানিকে সরিয়ে নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সামনে মাঠ—ওপারে মজদুরদের ব্যারাক; চোখ ফিরালে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও তার ধারে সারি

সারি খোলার বস্তিও চোখে পড়ে। সেই দিকে চেয়ে সুবোধ তার অতীত ও বর্ত্তমানের কথা ভাবতে ভাবতে কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেল। আধঘণ্টাখানিক পর সুভদ্রা আবার যখন তার পাশে এসে দাঁড়াল তখনও তার উপস্থিতি সে জানতেই পারলে না।

কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকবার পর সুভদ্রা সকৌতুক কণ্ঠে ডাকলে, ও সুবোধবাবু,—বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?

সুবোধ সুপ্তোত্থিতের মতই চমকে উঠল; তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিতস্বরে বললে, কৈ, না তো! অমনি—

তবু ভাল,—বলে সুভদ্রা মুখ টিপে আবার একটু হেসে নিলে; তার পর একখানা চৌকী টেনে নিজেই তাতে বসে পড়ে আবার বললে, আগে বসুন আপনি। তার পর বলুন তো, অত তন্ময় হয়ে কি ভাবছিলেন?

আসনে বসে অনেকটা কুণ্ঠিতের মতই উত্তর দিলে সুবোধ, অনেক কথাই মনে পড়ছিল সুভদ্রাদেবী। এই তো সেদিন এখান থেকে আমি গিয়েছি, মনে হয় যেন কাল। তবু এই কটা দিনের মধ্যেই কত পরিবর্ত্তনই না এখানে হয়েছে!

তা আর আশ্চর্য্য কি!—সুভদ্রা একটু ঠেস দিয়েই উত্তর দিলে,—পরিবর্ত্তনই তো জগতের ধর্ম্ম!

তাই বলে এত পরিবর্ত্তন — আর এত তাড়াতাড়ি!

সুবোধের গলার আওয়াজে বেজে উঠল তার মনের বিষন্নতা। বুঝতে পেরে বিস্মিত হল সুভদ্রা। কিন্তু সে উত্তরে কোন কথা বলবার আগেই সুবোধ নিজেই সোজা হয়ে বসে একেবারে সুভদ্রার চোখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে আবার বললে, জানেন, সুভদ্রাদেবী, অনেকে আমায় চিনতেই পারলে না; যারা চিনেছে মনে হল, তাদেরও অনেকেই যেচে আমার সাথে একটি কথাও বললে না।

সুভদ্রার মুখ ম্লান হয়ে গেল। অপরাধটা যেন নিজের, এমনি ভাবে চোখ নামিয়ে দুঃখিতস্বরে সে বললে, অনেক দিন এরা আপনাকে দেখে নি কি না!

কিন্তু আমিও তো ওদের দেখি নি,—সুবোধ প্রতিবাদ করে বললে,—তবু আমি তো ওদের প্রত্যেকটি লোককেই চিনতে পেরেছি।

এর উত্তর সুভদ্রা আর ভেবে পেলে না ; কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সান্ত্বনা স্বরে সে বললে, হয়তো ভাল করে ওরা আপনাকে দেখতেই পায় নি,- আপনাকে দেখবার আশা তো করে নি কেউ !

তা নয়,— সুবোধ মাথা নেড়ে বললে,—চেনা না চেনার কথাই এ নয়। তার পরেই ফিক্ করে হেসে ফেলে সে আবার বললে,—আপনি যে এসব জানেন না, সুভদ্রাদেবী,—রাজনীতির ঘোলা জলের খবর আপনি জানবেন ? সেবার যাবার আগেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে এ জায়গা অন্ন আমার উঠেছে। এবার এসে আরও বুঝলাম। সংগঠনের কর্ত্তৃ যাদের হাতে চলে গিয়েছে, আমি তাদের দলের লোক নই বলেই এখানে আমি আর কাজ করতে পারব না।

বাজে কথা !—সুভদ্রা প্রতিবাদ করে দৃপ্তকণ্ঠে বললে,—আপনি থাকু এখানে,—দেখি কে আপনাকে বাধা দেয় !

সুবোধ প্রথমে চমকে উঠল, তার পর ফেললে হেসে ; কিন্তু তার পরে শরীরটাকে চৌকীর উপর হেলিয়ে দিয়ে বেশ একটু গম্ভীর হয়েই সে বললে এ সব পরিবর্ত্তনের কথা আমি তত ভাবি নি, সুভদ্রাদেবী,—আমি ভাবছিলা আরও বৈপ্লবিক মূল পরিবর্ত্তনের কথা।

সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে সে কথাটাকে শেষ করলে আচ্ছা, সুভদ্রাদেবী,—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নাকি ভারতেরও 'জনযুদ্ধ' হ উঠেছে ?

লাল হয়ে উঠল সুভদ্রার মুখ। ইঙ্গিতটি দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট ইদানীং অরুণাংশু এ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলেই ব্যাখ্যা করছে। তাই নিয়ে স্থানী কর্ম্মীদের মধ্যে মতভেদও দেখা দিয়েছে। সুভদ্রা নিজে অবশ্য পাকাপা কিছুই ঠিক করে নি। তার মন এ যুদ্ধকে "জনযুদ্ধ" বলতে চায় না, কি অরুণাংশুর বিশ্বাসটা ইতিমধ্যেই ইস্পাতের মতই শক্ত আর সম্পূর্ণ খড়্গে মতই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে বলে নূতন এই মতবাদটাকে একেবারে প্রত্যাখ্যানও করতে পারে না। এই জন্যই গত মাসখানিক কাল কর্ম্মক্ষেত্রে তার বিড়ম্বনার অবধি ছিল না। দ্বিধাবিভক্ত মনের সেই অস্বস্তিই সুবোধে প্রশ্ন শুনে হঠাৎ বড় বেশী প্রবল হয়ে উঠল।

চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিতস্বরে সে উত্তর দিলে, তাই তো শুনছি,—কেউ কেউ সেই কথাই বলছে বটে।

আর আপনি নিজে কি বলছেন?—সুবোধ কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

সুভদ্রা উত্তর দিলে না; প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই বললে, আমি কিছুই বলছিনে,—বলার কাজ আগেও আমার ছিল না, এখনও নেই।

হাসিভরা চোখে সুভদ্রার কুণ্ঠিত মুখের দিকে আরও কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর সুবোধ আবার গম্ভীর হয়ে বললে, ঐ মৌলিক পরিবর্তনের কথাই আমি বলছিলাম, সুভদ্রাদেবী। ঐ জন্যই এখানে থেকে আমি আর কাজ করতে পারব না,—ওরা আমায় বাধা দেবে।

কিন্তু এ কথা শুনে সুভদ্রা আবার গরম হয়ে উঠল, বললে, ইস্—বাধা দেবে বই কি! কে আপনাকে বাধা দেবে?

বাধা দেবে ঐ অরুণাংশুই,—সুবোধ মুচকি হেসেও বেশ একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই উত্তর দিলে,—আমার যা মত আর বিশ্বাস, তাই নিয়ে এখানে আমি কাজ করতে চাইলেই আপনাদের কাছ থেকে লাঠি না হলেও গলাধাক্কা খেয়ে আমায় বিদায় হতে হবে।

বহুবচনের শব্দটা শুনেই সুভদ্রার কানের কাছটা আবার লাল হয়ে উঠল। কিন্তু ওটা ভিতরের যে আগুনের শিখা, তারই উত্তাপ লেগেই সঙ্গে সঙ্গেই সুভদ্রার সারা শরীরটাই হাপরের উপরের বাঁকা লোহার শলাটির মতই এক নিমেষেই সোজা হয়ে গেল। দৃপ্ত ভঙ্গীতে মুখ তুলে সুবোধের ঠিক চোখের দিকে চেয়ে দৃঢ়স্বরে সে বললে, তা ভাববেন না সুবোধবাবু। জনযুদ্ধের প্রশ্ন নিয়ে এখানে দলাদলি যদি হয়, যদি কর্ম্মীরা দুশমান দুটি ফৌজের মতই পরস্পরের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দুই বিপরীত দিকে গিয়ে দাঁড়ায়, তবে—ঠিক বলছি আপনাকে—সেদিন আমাকে আপনি আপনার দলে ঠিক আপনার নিজের পাশেই দেখতে পাবেন।

পলেকের জন্য সুবোধ বিস্ময়ে একেবারে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল; কিন্তু তার পরেই সে ছেলেমানুষের মত হো হো করে হেসে উঠল এবং হাসির ফাঁকে ফাঁকে থেমে থেমে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, সর্ব্বনাশ!

কি বলছেন আপনি! এ যে—ঐ যাকে বলে—ঘরে আগুন লাগ ব্যাপার!—দাম্পত্যজীবনের শান্তি যে এতে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে. আর একথা অরুণাংশু জানতে পারলে—

কি যে ঘটবে তা বর্ণনা করবার ভাষা আর না পেয়েই যেন সুবোধ কথার মাঝখানেই হঠাৎ থেমে গিয়ে হাসি চাপবার জন্য মুখের উপর রুমাল চাপা দিলে।

ততক্ষণে নিজের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যটা সুভদ্রার নিজের কাছেও ধরা পড়ে গিয়েছিল; সে লজ্জিত হয়ে কুণ্ঠিতস্বরে বললে, আঃ!—থামুন তো আপনি—কি সব যা-তা বলছেন!—

না, না,—সুবোধ হাসির ফাঁকে ফাঁকে উত্তর দিলে,—ও হবে না, সুভদ্রাদেবী,—অরুণাংশু যা-ই হউক, যা-ই করে থাকুক না কেন, তার ঘর আমি ভাঙ্গতে পারব না—তার নিজের স্ত্রীকে তারই বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারব না আমি!—

কথাগুলি শোনাল পরিহাসের মতই। কিন্তু সুভদ্রার মুখ ম্লান হয়ে গেল। উত্তরে বিষণ্ন, গম্ভীর স্বরে সে বললে, না সুবোধবাবু, ওঁর উপর অবিচার করছেন আপনি। এখানে অন্যায় যদি কেউ করে থাকে, সে ঐ বিমলবাবু। তিনিই আমাদের এই সংগঠনের মধ্যে দলাদলির বিষ ছড়িয়েছেন। আপনি চলে যাবার পর—সত্যি বলছি আপনাকে—উনি আপনার জন্য খুব দুঃখ করেছেন। আপনাকে আবার দেখলে আজ উনি খুশীই হবেন।

তা জানি,—সুবোধ ঘাড় কাৎ করে উত্তর দিলে,—কিন্তু একজনকে দেখে খুশী হলেই তাকে নিয়ে একত্র কাজ করা যায় না। কম্যুনিষ্ট অরুণাংশু কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট সুবোধের সঙ্গে একত্র কাজ করতে এসে গোড়াতেই উস্‌খুস্ করছিল। তার উপর মতের পার্থক্যটা আজ যখন এতই স্পষ্ট আর এতই বিস্তৃত হয়েছে তখন সে আমাকে একেবারেই সইতে পারবে না।

সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলে; তিক্তকণ্ঠে বললে, অনেক কথাই আপনি গোড়াতেই ধরে নিচ্ছেন সুবোধবাবু;—প্রায় এক বছর ওঁর সাথে তো

আপনার দেখাই হয় নি! আগে দেখা করুন, কথাবার্তা হউক,—তারপর যা হয় ঠিক করবেন।

সুবোধ বুঝলে যে সুভদ্রা রাগ করেছে, অন্ততঃ ক্ষুণ্ণ যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বিব্রতের মত একটু চুপ করে থাকবার পর মুখখানি হাসবার মত করে সে বললে, বেশ, কথা তো বলবই—সেই জন্যই তো এখানে আসা। তবে আজকের মত বিদায় হই এখন। দিনের আলো থাকতে থাকতেই বস্তিগুলো একবার ঘুরে আসতে চাই।

কিন্তু এরও উত্তরে সুভদ্রা বিরক্ত হয়েই বললে, বস্তিতে ঘুরলেই সব হয়ে যাবে নাকি? থাকা-খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?

সুবোধ হেসে উত্তর দিলে, খাওয়ার ভাবনা সুবোধ ব্যানার্জ্জীকে আজ পর্য্যন্ত কখনও ভাবতে হয়নি। আর থাকা? তা আগে যেখানে হত, এখনও সেখানেই হতে পারবে। ইয়ুনিয়নের আপিসঘরের চাবিটা কার কাছে আছে তা বলতে পারেন?

চাবির জন্য আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে না,—সুভদ্রা বললে,—ও চাবি আমার কাছেই আছে। আর বস্তিতেও পরে গেলে চলবে। আগে ওর সাথে দেখা করুন তো—আমিও সেখানেই যাচ্ছি—চলুন আমার সাথে।

পাগল হয়েছেন!—সুবোধ ঠোটের কোণে হাসি চেপে পরিহাসের স্বরে বললে,—ধূমকেতুর মত একটা তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি জোর করে চাপিয়ে দিয়ে আপনাদের এমন সন্ধ্যেটা মাটি করতে যাব আমি! তাহলে অভিশাপ কুড়াতে হবে যে!—

সুভদ্রার কানের কাছটা আবার লাল হয়ে উঠল; সে মুখ ফিরিয়ে বললে, যান,—এত কথা আপনি শিখলেন কোথায়? এমন ভাল মানুষ ছিলেন—এত দুষ্টুই বা হয়ে উঠলেন কেমন করে!

যেন সুভদ্রার কথা সে শুনতেই পায় নি এমনি ভাবে তার আগের কথারই সূত্র ধরে সুবোধ আবার বললে, চাবিটাই আমায় দিন, সুভদ্রাদেবী—ঘরটা খুলে আমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থাটা আগে ঠিক করে নি। তারপর অরুণাংশু আপনার কাছ থেকে ছুটি পেলে আমি নিরিবিলিতে তার সাথে গিয়ে দেখা করব'খন।

মিনিট পনর পর সুভদ্রার কাছ থেকে চাবি নিয়ে সুবোধ একেলাই বস্তির দিকে চলে গেল।

কারখানার গা ঘেঁষে, ময়দানের ধার দিয়ে সোজা হুগলীর দিকে চলে গিয়েছে শেরশাহী আমলের যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, তারই এক দিকে কোম্পানীর গড়া মজদুরদের পাকা ব্যারাক, আর একদিকে কাঁচা বস্তি। ব্যারাক উঠেছিল তখন, কারখানা যখন ছিল খুব ছোট। শো-পাঁচেক লোকের বাসস্থান ঐ পাকা ব্যারাকের অনেকগুলি কামরাই তখন বাসিন্দা অভাবে খালি পড়ে থাকত। তার পর কারখানার পরিণতি আর মজদুরদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শূন্য কামরাগুলি ভরে গিয়েও আরও বাসস্থানের জন্য যখন চাহিদা উঠল অথচ তা মিটাবার দায়িত্ব কোম্পানী স্বীকার করলে না, তখন আবির্ভাব হল টাকাওয়ালা এক তৃতীয় পক্ষের। আশপাশের পতিত জমিগুলির বিলিব্যবস্থা এক রকম রাতারাতিই হয়ে গেল। জমিদার পেলে মোটা সেলামি। তার পর একটির গা ঘেঁষে আর একটি বস্তি উঠতে লাগল। এক দিকে রেলের পথ এবং আর এক দিকে গঙ্গা পর্যন্ত খালি জমি যা পড়ে ছিল তার প্রায় সবটুকুই দেখতে দেখতে ভরে উঠল। ব্যারাকবাড়ীর তেতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলে এখন ময়দানের স্বল্পপরিসর জমিটুকু ছাড়া মাটি আর বড় চোখে পড়ে না; দেখা যায় কেবল রুক্ষ, পাটকিলে রঙের খোলার চালের তরঙ্গিত শ্রীহীনতা,—আকাশের নীলিমা আর দিগন্তের স্নিগ্ধ শ্যামশ্রীর পটভূমিকায় হৃদয়হীন, রুচিজ্ঞানহীন মানুষের অপরিমেয় অর্থলোলুপতার কদর্য্য ও হিংস্র দ্রংষ্টাবিকাশ।

ছোট ছোট ঘর, নীচু খোলার চাল, স্যাঁৎসেঁতে কাঁচা মেঝে; ভিতরে দিনের বেলাতেও প্রায় রাত্রির অন্ধকার; যত দূর চোখ যায় তত দূর গায়ে গায়ে ঘেঁষা সারি সারি এমনই সব বাড়ী। প্রতি দুই সারি বাড়ীর মাঝখানে তাদেরই পক্ষপুটের অন্ধকার আশ্রয়ে অত্যন্ত সরু, কাঁচা পায়ে চলার পথ। তাই আবার একাধারে পয়ঃপ্রণালীও। বর্ষা নামলেই এই

হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায় আর জল শুকিয়ে এলেই কাদা জমে। যখন জল বা কাদা কিছুই থাকে না, তখন ধূলার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবু সেই পথ দিয়েই দিবারাত্রি পিপীলিকার সারির মত লোকজন যাতায়াত করে; ভিতরের আলো-হাওয়ার প্রবেশপথহীন মৌমাছির চাকের এক একটা খোপের মত ঘরের মধ্যে এক বা একাধিক পরিবারের পাঁচ-সাতটি নরনারী দিনের পর দিন কারখানার একঘেয়ে শ্রমের অবসরে সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের হীন প্রহসন অভিনয় করতে থাকে। জগতের মধ্যে এ যেন এক স্বতন্ত্র জগৎ,—মানুষের আবাসস্থান নয়, মজদুরের বস্তি। যেমন কুৎসিৎ তেমনি অস্বাস্থ্যকর। আলো নেই, হাওয়া নেই, সবুজের একটা ফোটাও কোথাও নেই; এমন কি, মাথার উপরের অমন যে উদার, নীল আকাশ, তা-ও ভিতর থেকে ভাল চোখে পড়ে না।

ব্যতিক্রম কেবল সীমান্তে—যেখানে বস্তি শেষ হয়ে জলো জমি স্বরু হয়েছে। সেখানেও বস্তি যতটুকু, সেটুকু বস্তিই,—তেমনি নীচু, ছোট, অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে ঘর, তেমনি সরু পথ, তেমনি কদর্য্যতা, তেমনি অস্বাস্থ্যকর পূতিগন্ধ। বরং বস্তি সেখানেই শেষ হয়েছে বলে ভিতরের চেয়েও যেন বেশী নোংরা। সেখানেই প্রকাণ্ড বস্তিটার সব ক'টি অলি-গলি থেকে ময়লা জলের ঢল নেমে আসে, হাজার কয়েক গৃহস্থ ঘরের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা নির্ব্বিবাদে পচবার জন্য সেখানেই এসে স্তূপীকৃত হয়ে জমে ওঠে। তথাপি ভিতরের তুলনায় সে জায়গাটা বেশ খোলা-মেলা। সেখানে দাঁড়ালেই দূর দিগন্তে গাছপালার শ্যামল সমারোহ চোখে পড়ে, মাথার উপর আকাশের আলো অজস্র ধারায় বর্ষিত হতে থাকে, খোলা মাঠ আর জলো জমির উপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া এসে উত্তপ্ত ললাট করে দিয়ে যায়। বস্তির অনৈসর্গিক জগতের সীমান্তে সে জায়গাটা যেন স্বর্গ।

সেই সীমান্তেরই একখানা বাড়ীতে অরুণাংশু থাকে।

বাড়ী অবশ্য মামুলী ধরণের। একখানি মাত্র খোলার ঘর, দুধারে সরু সরু এক এক ফালি বারান্দা, ভিতরের দিকে ছোট একটি উঠান। তবু ওরই মধ্যে ওতে একটু বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। বাড়ীওয়ালাকে

অনেক তোয়াজ করে, নিজের গাট থেকে টাকা দিয়ে অরুণাংশু ঘরখানির দুদিকে দুটি জানালা খুলিয়েছে,—তারই ভিতর দিয়ে জলো মাঠ আর খোলা আকাশেরও খানিকটা চোখে পড়ে। ভিতরের উঠানে সারি সারি টব বসিয়ে সে তাতে নানারকমের ফুল আর পাতাবাহারের গাছ লাগিয়েছে। ঘরের ভিতরের সাজসজ্জাও অসাধারণ;—এ বস্তির কোন ঘরেই যা নেই, তা সেখানে আছে। দড়ির খাটিয়ার উপর খদ্দরের রঙীন ছাপা চাদর, দু'দুখানি টেবেল, তার উপর নানা আকার ও নানা ভাষার বইএর গাদা; খানকয়েক চৌকীও আছে; আর আছে ঘরের কোণে রঙীণ কামিজপরা একটি এস্‌রাজ।

সুবোধকে বিদায় দিবার পর অরুণাংশুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য সুভদ্রা এই ঘরের মধ্যেই প্রবেশ করলে। তার মুখে-চোখে উত্তেজনার সুস্পষ্ট চিহ্ন।

তখন সন্ধ্যার খুব বেশী দেরী নেই। শীতের সূর্য্য—গঙ্গার পশ্চিম তীরে গাছপালার নীচে ঢলে পড়েছে। সে জায়গাটাতে তখন বর্ণের বিচিত্র সমারোহ। বিপরীত দিকে পূবের দিগন্তে প্রতিফলিত আলোকের বৈচিত্র্য ও ঔজ্জ্বল্যও নিতান্ত কম নয়। সেখান থেকেই আবার খানিকটা গোলাপী আভা ঠিকরে এসে অরুণাংশুর ঘরের খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরের আবছায়া অন্ধকারকে যেন রাঙিয়ে তুলেছিল।

খাটিয়ার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে কি একখানা বই পড়ছিল অরুণাংশু। তার গায়ে একটা গরম কাপড়ের সার্ট, কোমর পর্যন্ত গরম কম্বলে ঢাকা মুখখানি রোগা দেখাচ্ছে; বর্ণে পাণ্ডুরতার আভাষ। তবু অপূর্ব্ব সুন্দর সে মুখ,—গোলাপী রঙের ছোঁয়াচ-লাগা আবছায়া অন্ধকারে বিচিত্র দেখাচ্ছিল।

সেই মুখের উপর চোখ পড়তেই সুভদ্রা দোরের কাছেই থমকে দাঁড়াল।

সুভদ্রার পায়ের শব্দ অরুণাংশুর চেনা; কানে যেতেই মুখ না ফিরিয়েই হেসে সে বললে, এত দেরী হল যে!—

সুভদ্রা এগিয়ে এসে কুণ্ঠিতস্বরে বললে, আটকা পড়ে গিয়েছিলাম, । কিন্তু তুমি শুয়ে রয়েছ কেন?

বই বন্ধ করে অরুণাংশু সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে । প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি শুভা? চোখে দেখছি আলো নাচছে।—

যাও,—বলে সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে অরুণাংশুর দিকে একটু এগিয়েও এল। একখানি চৌকী টেনে প্রায় ঘেঁষে বসে সে আবার বললে, সত্যি দেরী হয়ে গিয়েছে আমার। যা ঝড় আজ গিয়েছে আমার মাথার উপর দিয়ে—সেই সকাল নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলবার অবসর পাইনি। এমন একটা শক্ত প্রসবের এসেছিল হাসপাতালে—

উহুঁ—হুঁ না,—অরুণাংশু বাধা দিয়ে, ঘাড় নেড়ে সংশয়ের স্বরে বললে,—ব্যাখ্যাটা ঠিক সন্তোষজনক হল না, শুভা। হাসপাতালের কাজে হতে পারে। কিন্তু এই উত্তেজনা—এর কারণটা কি, বল তো?

তাই উত্তেজিত হয়েছিল সুভদ্রা। সকালের সেই অনুভূতিটা,—সেই তার উপলব্ধি—সুবোধের সঙ্গে কথাবার্ত্তার ফলে আরও মধুর, আরও ঘন উঠেছিল। ওরই সঙ্গে, অমনি নীবিড় হয়ে উঠেছিল অরুণাংশুর নিজের একাত্মবোধ। সারাটা পথ মনে মনে সে বলতে বলতে আজ অরুণাংশুকে সব কথা সে খুলে বলবে—তার পাওয়ার তার দাবীর কথা, সব নিঃশেষে, নির্ব্বিচারে প্রকাশ করে, এত দিনের গোপনতার অবসান করে দিয়ে সুস্থ, সহজ, সর্ব্বজনস্বীকৃত জীবনের প্রতিষ্ঠা করবে সে।

অপরিস্ফুট মনের ভাব অস্ফুট ভাষায় প্রকাশ হয়ে পড়ল,—তোমার আজ আমার অনেক বোঝাপড়া আছে, জান?—সুভদ্রা দূর থেকে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিতস্বরে বললে,—অনেক কথাই আজ শুনতে হবে; আর বলতেও হবে অনেক কথা।

বল কি!—আঁৎকে উঠবার ভাণ করে অরুণাংশু উত্তরে বললে,—কিন্তু অত পরিশ্রম আমার সহ্য হবে তো?—আমার যে অসুখ শরীর!—

খুব হবে,—সুভদ্রা হাসি মুখে উত্তর দিলে,—আর না যদি হয়, অসুখ যদি বেড়ে যায়, তবু তা আমি সারিয়ে নিতে পারব।

সত্যি—ঠিক বলছ তো?—বলতে বলতে অরুণাংশু চোখ তুলে তাকালো সুভদ্রার চোখের দিকে।

সে চোখে তখনও আলো জ্বলছে,—ঠিক আলো হয় তো নয়,—আগুনের ফুলকির মত অজস্র হাসির কণা যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। সত্যই সুভদ্রার অবস্থা তখন অসাধারণ। তার বুকের মধ্যে চলেছে ঝড়; ওরই ঝাপ্‌টার সাথে সাথে তার পরিণত বুক উঠছে আর নামছে; নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে; কালো মুখখানি হয়তো বা লালই হয়ে উঠেছে।

সেই মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেই অরুণাংশু হঠাৎ দুহাত বাড়িয়ে সুভদ্রাকে তার বুকের উপর টেনে নিলে।

সুভদ্রা প্রথমে চমকে উঠল, বাধা দিবার চেষ্টা করে বললে, আঃ ছিঃ—কর কি!—তোমার যে অসুখ শরীর!—

হোক অসুখ,—অরুণাংশু বললে ফিস্ ফিস্ করে; বলতে বলতে সুভদ্রাকে সে আরও জোরে চেপে ধরলে। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গাঢ় স্বরে ডাকলে, সু!—

সুভদ্রা ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলে, কি?—

কি কথা বলবে তুমি? বল না—বলবার এই তো সময়।

সুভদ্রার গোপনতম অন্তরের মধুরতম উপলব্ধি ফেণিয়ে ভাষা হয়ে তার কণ্ঠের কাছে উঠে এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন রাজ্যের সমস্ত লজ্জা একত্র হয়ে এসে তার মুখ চেপে ধরলে,—অরুণাংশুর চোখের দিকে চেয়ে তারই জাত সন্তানের মাতৃত্বের স্বীকৃতি সুভদ্রা নিজের মুখে কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারলে না। লজ্জায় লাল হয়ে, ঘেমে, চোখ বুজে, বিব্রত মুখখানি তৎক্ষণাৎ আবার অরুণাংশুর বুকের মধ্যেই লুকিয়ে ফেললে।

অস্ফুট স্বরে হেসে উঠল অরুণাংশু; চুপি চুপি বললে, কেমন, বোঝা-পড়া হয়ে গেল তো?

শিশুর মত আধ-আধ ভাষায় সুভদ্রা উত্তর দিলে, হ্যাঁ—হয়ে গেল বই কি!—কিছুই বলা হল না,—তার আবার—

অরুণাংশু বললে, তবে বলছ না কেন? তোমার মনে যত কথা আছে সব অবিরাম কলকণ্ঠে বলে যাবার এই তো সময়।

যাও,—বলে সুভদ্রা অরুণাংশুকে আস্তে একটা ধাক্কা দিলে। কিন্তু একটু পরে নিজে থেকেই আবাব সে বললে, কেন—আমায় বলতে হবে কেন? আমি না বললে বুঝতে পার না তুমি?

না,—অরুণাংশু পরিহাসের স্বরে উত্তর দিলে,—সেকালের ঋষিদের মত আমার তো অন্তর্দৃষ্টি নেই!—

আমারও নেই,—সুভদ্রা হেসে বললে,—তবু তোমার মনের কথা সব আমি বুঝতে পারি।

অরুণাংশু এবার আর কোন উত্তর না দিয়ে সুভদ্রাকে আরও জোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরলে।

সুভদ্রার মনে হল যে তাব শরীরটা গলে যেন জল হয়ে যাচ্ছে। তবু তারই মধ্যে নিজেকে একটু শক্ত করে নিয়ে অস্ফুটস্বরে সে বললে, একটা কথা শুনবে?

অরুণাংশু সহাস্যকণ্ঠে উত্তব দিলে, বল না,—শুনতেই তো চাচ্ছি।

একবার ঢোক গিলে সুভদ্রা বললে, আর বাসায় যাব না আমি,—এখানেই থাকব।

বেশ তো—সে তো খুব ভাল কথা,—অরুণাংশু এবার শব্দ করেই হেসে উঠে বললে।

সুভদ্রা মাথা ঝেঁকে বললে, না ঠাট্টা নয়, এরকম করে আর চলবে না। এই লুকোচুরি আর ভাল লাগে না আমার। যা সত্য, তা দশ জনকে জানতে দিতে হবে।

অরুণাংশুর সুদৃঢ় বাহুবন্ধন হঠাৎ যেন আল্‌গা হয়ে গেল; কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ জোরে সুভদ্রাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে সে বললে, কি হল শুভা—কি বলছ তুমি?

লুকানো মুখখানিকে যেন আরও ভাল করে লুকাবার চেষ্টা করতে

করতে সুভদ্রা অস্ফুট, কম্পিত স্বরে বললে, নূতন কথা কিছু নয় গো,—যা চিরকাল বলে এসেছি, তাই। বাড়ীতে পুরুত ডাকতে তোমার সত্যি যদি অত আপত্তি থাকে, চল, না হয়, দুজনে রেজিষ্ট্রারের আপিসেই যাই।—

অরুণাংশু উত্তর দিলে না; সে বুঝলে যে সুভদ্রার কথায় বা স্বরে পরিহাসের আভাষমাত্রও নেই। তাতেই অরুণাংশু বিব্রত হয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ সে কোন উত্তর ভেবেও পেলে না।

কিন্তু সুভদ্রাই আবার বললে, কি বলছ?

অরুণাংশুর বাহুবন্ধন আবার শিথিল হয়ে আসছিল; সে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আবার এ কথা কেন, শুভা? রেজিষ্ট্রারের হাত দিয়ে হলেও সে-ও তো বিয়েই হবে,—সে-ও তো হবে সাধ করেই শিকল পরা!—

কিন্তু উত্তরে সুভদ্রা সহজ ভাবেই বললে, বেশ, তাতেও যদি তোমার আপত্তি থাকে, না হয় সে অনুষ্ঠানটুকুও আমি বাদ দেব। কিন্তু আলাদা আর আমি থাকতে পারি নে। এখন থেকে তোমার সাথে একই থাকব আমি—সে তো আর অনুষ্ঠান নয়!—

কিন্তু তা-ও বন্ধন।

বন্ধন!—

সুভদ্রার গলার আওয়াজে শুধু চমক নয়, আর্ত্তনাদেরও যেন ক্ষীণ একটা রেশ বেজে উঠল। একটু চুপ করে থেকে অরুণাংশু গম্ভীর স্বরেই বললে, একথা তো আমি অনেক দিন বলেছি, শুভা,—ভালবাসাকে হাতে, পায়ে, গলায় শক্ত করে বেঁধে যা অকালে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে, তা তো ঘরের কোণের ঐ বাঁধাধরা দৈনন্দিন জীবনের সর্ব্বনাশা এক-ঘেয়েমি। বিয়েটা তো একটা বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র—জেলখানার যেমন দেউড়ি। আসল বন্ধনই তো ভিতরের ঐ গার্হস্থ্য জীবন।

অরুণাংশু থেমে থেমে কথাগুলি বললে যেন ভয়ে ভয়ে বলছে। মনে মনে তার আশঙ্কা ছিল যে, শুনে হয়তো সুভদ্রা রাগ করবে—যেমন আগেও সে করেছে। কিন্তু আজ যা ঘটল, তা অভূতপূর্ব্ব।

সুভদ্রার মুখ, হাত, সব এতক্ষণ অরুণাংশুর বুকের নীচে ঢাকা পড়ে ছিল,—কুণ্ডলী পাকিয়ে সে নিজেই যেন গিয়ে ঢুকেছিল অরুণাংশুর বিশাল বুকের উষ্ণ ও নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে। কিন্তু অরুণাংশু থামতে না থামতেই সে হঠাৎ দুই হাত বাড়িয়ে শক্ত করে অরুণাংশুর গলা জড়িয়ে ধরলে; মুখ বের করে নিয়ে গেল প্রায় অরুণাংশুর মুখের কাছে; কুটিল কটাক্ষে তার মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, আর এ?—এ বুঝি বন্ধন নয়?

অরুণাংশুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না; অভিভূতের মত সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বিহ্বল স্বরে সে বললে, এ তোমার কি হল আজ? হঠাৎ এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠলে যে?

প্রশ্নটি অত বেশী সোজা বলেই সুভদ্রা প্রতিক্রিয়ায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি অরুণাংশুর গলা ছেড়ে দিয়ে নিজেও একটু দূরে সরে গিয়ে বেশ একটু ঝাঁজের স্বরেই সে বললে, না, কিছু না।

অরুণাংশু আরও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর ফিক্ করে হেসে ফেলে বললে, একটা কথা রাখবে, শুভা? এখান থেকে আমার সাথে আর কোন জায়গায় পালিয়ে যেতে পারবে তুমি?

এরও উত্তরে সুভদ্রা খুব জোরে মাথা ঝেঁকে বললে, না।

অরুণাংশু আবার কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর গম্ভীর হয়ে বললে, ঠাট্টা নয়, শুভা,—সত্যি এখান থেকে আমি পালিয়ে যেতে চাই—এই আজই রাত্রে। যাবে আমার সাথে—যেতে পারবে?

অরুণাংশুর গলার আওয়াজ বদলে গেল বলেই সুভদ্রা তার কথাগুলিকে আর উপেক্ষা করতে পারলে না; বিস্মিত হয়ে বললে, কি বলছ তুমি?

অরুণাংশু আরও বেশী গম্ভীর হয়ে বললে, সত্যি, এখান থেকে আমি পালিয়ে যেতে চাই।

বিস্ময়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতুকও বোধ হল সুভদ্রার; অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে [illegible] এবার মুচকি হেসে বললে, চল তবে,—যেতেই

যদি হয় তবে এর চেয়ে ভাল সময় আর পাওয়া যাবে না। এ যার রাজত্ব তিনি নিজেই যখন ফিরে এসেছেন তখন তারই হাতে রাজদণ্ড ফিরিয়ে দিয়ে চল আমরা বনবাসেই যাই।

অরুণাংশু চমকে উঠল; শেষের কথাটাকে উপেক্ষা করেই বিস্মিত আগ্রহের স্বরে সে বললে, কে ফিরে এসেছে?

সুবোধবাবু গো,—সুভদ্রা হাসিমুখে উত্তর দিলে,—আমাদের সুবোধ-বাবু। প্রথমে আমিও তোমারই মত চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ সত্যকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না! সত্যি তিনি ফিরে এসেছেন,—এই দুপুরবেলায়। সেই জন্যই তো আসতে এত দেরী হল আমার।

শুনতে শুনতে অরুণাংশুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সেটা সুভদ্রার চোখ এড়াল না। চকিতে সুবোধের কথাগুলিও তার মনে পড়ে গেল,—জনযুদ্ধের কথা, মতান্তরের কথা, দলাদলির কথা। আশঙ্কা হল তার যে সুবোধ অতিশয়োক্তি হয় তো করে নি। তথাপি মুখের হাসি আর পরিহাসের স্বরটা বজায় রেখেই সে আবার বললে, ব্যাপার কি হয়েছে, জান? সুবোধবাবুর মনে কেমন একটা ধারণা হয়েছে যে এখানে তিনি আর কাজ করতে পারবেন না,—তুমিই ওঁকে এখানে কাজ করতে দেবে না।

অরুণাংশু শুধু বললে, হুঁ; তার পরেই সে পা ছড়িয়ে খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়ল।

সুভদ্রা আর হাসতে পারলে না, ঈষৎ কম্পিত স্বরেই সে বললে, কি বল তুমি? উনি এখানে থাকলে গোলমাল হবে নাকি?

তোমার কি মনে হয়?—অরুণাংশু কাষ্ঠহাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলে।

একটু ইতস্ততঃ করে সুভদ্রা উত্তর দিলে, আমার যা মনে হয় তা আমি সুবোধবাবুকে বলেই দিয়েছি।

কি বলেছ?

বলেছি যে এখানকার সংগঠন তিনিই গড়েছেন তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে; এ তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র; এখান থেকে তাঁকে তাড়ায়, এমন সাধ্য কার?

অরুণাংশু কোন উত্তর দিলে না, কিন্তু তার গম্ভীর মুখ আরও বেশী গম্ভীর হয়ে উঠল।

এটাও সুভদ্রার চোখ এড়াল না। তথাপি, অথবা হয়তো ঐ কারণেই সে অরুণাংশুর দিকে বেশ একটু ঝুঁকে সনির্ব্বন্ধস্বরে বললে, দেখ, আমার মুখ রাখতে হবে তোমায়,—ওঁর সাথে আগের মতই মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

মুখ না ফিরিয়েই অরুণাংশু বললে, যদি তা না পারি?

তাহলেও ওঁর সাথে গোলমাল করা চলবে না,—এখানকার যথাসর্ব্বস্ব ওঁকেই ছেড়ে দিতে হবে।

এবার সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল অরুণাংশু; হঠাৎ চোখদুটি তার চিক্ চিক্ করে জলে উঠল; হেসে ফেলে সে বললে, যথাসর্ব্বস্বই সুবোধকে ছেড়ে দিতে হবে? সঙ্গে তোমাকেও না কি?

বিব্রতভাবে চোখ নামিয়ে সুভদ্রা বললে, ধেৎ!—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তার সমগ্র মুখখানি পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল; চোখ তুলে দৃপ্তকণ্ঠে সে বললে, এমন কথা মুখে আনতে পারলে তুমি? জিভে আটকে গেল না?

এতটা অরুণাংশু আশা করে নি; ঘাবড়ে গিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, বাঃ রে!—একটা ঠাট্টার কথাও বুঝতে পার না?

না, ঠাট্টা করেও এরকম কথা মুখে আনতে নেই,—বলে সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কিছুক্ষণ অপ্রতিভের মত চুপ করেই বসে রইল অরুণাংশু; তার পর আবার সোজা হয়ে বসে বললে, থাক্—ঠাট্টা আর করব না। কিন্তু সুবোধ এসেছে বলছিলে তুমি,—কোথায় আছে সে? তাকে সাথে নিয়ে এলে না কেন?

সুভদ্রা নড়ে বসল; গম্ভীর স্বর যথাসম্ভব সহজ করেই সে উত্তর দিলে, তিনি আপিসে গিয়েছেন,—সন্ধ্যের পর নিজেই এখানে আসবেন বললেন।

তার পরেই সোজা অরুণাংশুর চোখের দিকে চেয়ে আবার রীতিমত

গম্ভীর স্বরেই সে জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ গা,—এ যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ' হয়ে উঠেছে, এ কথা সত্যি বিশ্বাস কর তুমি ?

অরুণাংশু চমকে উঠল ; আবার ঘাবড়ে গেল সে ; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, এ কথা আজ আবার কেন ?

না, বল তুমি,—সুভদ্রা দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলে,—আমি শুনতে চাই।

তথাপি অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরেই বললে, সত্যি শুনতে চাও ?

সুভদ্রা বললে, হ্যাঁ—এক্ষুনি।

বিব্রতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর অরুণাংশুও গম্ভীরস্বরেই বললে, তাহলে আমিও সত্য কথাই বলছি। এ যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ' হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস ; কিন্তু তা যদি এ না-ও হয়ে থাকে, তবু একে আমাদেরও 'জনযুদ্ধে' পরিণত করবার জন্য এখন থেকেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

সুভদ্রা কোন উত্তর দিলে না, কিন্তু তার বিষণ্ণ, গম্ভীর মুখ আরও যেন বেশী বিষণ্ণ, বেশী গম্ভীর হয়ে উঠল।

আড়চোখে সেই মুখের দিকে চেয়ে অরুণাংশু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি একথা মান না, শুভা ?

মৃদু কিন্তু দৃঢ়স্বরে সুভদ্রা বললে, না।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অরুণাংশু ; তার পর মুখখানিকে হাসবার মত করে পরিহাসের লঘু স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, শুভা, যুদ্ধকে আমি 'জনযুদ্ধ' বলছি বলে আমার অনেক বন্ধুই তো আমায় ত্যাগ করছে ; শেষে তুমিও আমায় ত্যাগ করবে না তো ?

চমকে মুখ ফিরালে সুভদ্রা ; কুঞ্চিত ভুরুদুটির নীচে তার চোখদুটি হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিলে সে ; শেষ পর্য্যন্ত অল্প একটু হেসেই সে বললে, দেখ, আমার ভালবাসা অত ঠুনকো জিনিষ নয় যে মতান্তরের হাল্কা আঘাতেই তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে !—

অরুণাংশুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; উৎফুল্ল স্বরেই সে বললে, তাহলে আমার কোন ভাবনা নেই, শুভা,—জগতের আর সকলে বিমুখ হলেও সে ক্ষতি আমি হাসিমুখেই সইতে পারব।

বলেই হাত বাড়িয়ে সুভদ্রার একখানি হাত সে ধরে ফেলতে চাচ্ছিল; বুঝেই সুভদ্রা খানিকটা সরে গিয়ে বললে, যাও !—

অরুণাংশু শব্দ করে হেসে উঠল; বললে, যাবার কথাই তো বলছিলাম শুভ্রা,—তুমিই যত সব অবান্তর কথা তুলে সব কাজের কথা গুলিয়ে দিলে। এখন শোন তবে,—আজ রাত্রেই এখান থেকে আমি পালিয়ে যদি না যাই তবে কালই গ্রেপ্তার হয়ে যাব।

চক্ষের পলকে সুভদ্রার মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল, অস্ফুট স্বরে সে শুধু বললে, অ্যাঁ !—

কিন্তু অরুণাংশু হাসিমুখেই উত্তর দিলে, না,—পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবার কথা বলছিনে আমি। কিন্তু যিনি আমায় গ্রেপ্তার করতে আসছেন তিনি পুলিশের চেয়েও জবরদস্ত—তিনি আমার মা।

সুভদ্রা যেন আরও বেশী বিহ্বল হয়ে পড়ল; চৌকিখানা আবার খাটিয়ার কাছে টেনে এনে শুষ্ক, জড়িত স্বরে সে বললে, কি বলছ তুমি? হেঁয়ালি না করে কথাটা খুলে বল তো !—কি হয়েছে ?

বালিশের নীচে থেকে একখানা চিঠি বের করে সুভদ্রার হাতে দিয়ে অরুণাংশু বললে, আমার মা কাল এখানে আমার এই বাসায় আসছেন আমায় বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য। চিঠি পড় তুমি—তাহলেই বুঝতে পারবে।

চিঠি খুব বড় নয়, কিন্তু অর্থপূর্ণ। উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু তার প্রত্যেকটি শব্দ থেকে স্নেহ যেন টপ টপ করে ঝরে পড়ছে। অভিযোগ কোথাও নেই,—আছে কেবল অনুনয়; আর আছে সংক্ষিপ্ত একটু ইতিবৃত্ত। অভিমানী পিতার বিমুখ হৃদয়ের কাছে স্নেহময়ী জননীর আবেদন এতদিনে সার্থক হয়েছে,—অবাধ্য পুত্রকে ক্ষমা করে তারই জন্য কেবল ঘরের দ্বারই নয়, হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারও তিনি মুক্ত করে দিয়েছেন। আজ অরুণাংশুকে নিজের কাছে পাবার জন্য তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত নেই। তাঁর শরীর খারাপ,—হয় তো তাঁর সংসারের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। তাঁর শেষ সাধ মিটাবার জন্য অরুণাংশুকে ঘরে ফিরে যেতেই হবে। পাছে চিঠির আবেদন তার হৃদয় স্পর্শ না করে, পাছে আর কেউ এসে সে তাকে রিক্ত হস্তে ঘরে ফিরিয়ে দেয়, এই আশঙ্কায় সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম

করে তিনি নিজেই তাকে নিতে এসেছেন। তাঁর আশা আছে এবং তার চেয়েও বেশী আছে বিশ্বাস যে অরুণাংশু তার নিজের মাকে তার ঘরের দোর থেকে অপমান করে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

সুভদ্রার চিঠি পড়া শেষ যখন হল তখন সে যেন আর এক মানুষ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে এত জোরে এমন একটা বন্যা তার মনে এসেছে যে ওর নীচে আর সব গিয়েছে তলিয়ে,—নিজেকেই সে যেন ভুলে গিয়েছে।

উজ্জ্বল চোখ দুটি অরুণাংশুর মুখের উপর বিন্যস্ত করে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বললে, তাই তো—সত্যি তো দেখছি, মা আসছেন! কিন্তু এই এত বড় খবরটা তুমি আমায় সকলের আগে বল নি কেন? ওমা—কি লোক তুমি! মা আসবেন,—আর তুমি কি না—

কিন্তু অরুণাংশুর মুখ দেখে সে থতমত খেয়ে গেল,—সে মুখে আনন্দ বা উৎসাহের চিহ্নমাত্রও নেই,—কি যে আছে তা-ও যেন ঠিক বোঝা যায় না।

কিন্তু কথার মাঝখানেই সুভদ্রাকে থামতে দেখে অরুণাংশু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিলে; মুখখানি হাসবার মত করে সে বললে, এ খবর পেয়ে তুমি খুশী হয়েছ শুভা?

হব না!—সুভদ্রার কণ্ঠে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রতিবাদ বেজে উঠল,—তুমি হও নি?—সে উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করলে। কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই পুনরায় সে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, কিন্তু দেখ,—আমার কথা কেমন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। বলেছিলাম না আমি যে মা-বাপ কিছুতেই ছেলেমেয়ের উপর চিরদিন রাগ করে থাকতে পারে না? কেমন—ফললে না আমার কথা?

অরুণাংশু উদ্‌ভ্রান্তের মত শব্দ করে হেসে উঠে বললে, তা ফলেছে বটে!—

তবে?—সুভদ্রার চোখ-মুখ যেন বিজয়ের উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে ভ্রূভঙ্গী করে বললে, আমায় খাওয়াবে তো? খাওয়াতেই হবে—নইলে ছাড়ব না বলছি।

অরুণাংশু হাসবার জন্য একবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বোধ করি বা ঐ ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সুভদ্রা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলে না, তাগিদও দিলে না। তার

অস্থির চোখ দুটি চকিতে একবার ঘরের চারদিকে ঘুরে এল। তার পর অসহায়ের মত কতকটা যেন আপন মনেই সে বললে, ওমা—এই ঘরের মধ্যে মাকে তুমি বসাবে কেমন করে? ছিঃ ছিঃ—কি শ্রীই না করে রেখেছ ঘরখানার! আর চাকরটাও এমন হয়েছে!—না, ওঁর আসবার আগেই একে ঝেড়ে-মুছে অন্ততঃ চলনসই করে তুলতে হবে। তবু ভাল যে কাল রবিবার—হাসপাতালে আমার কাজ তেমন বেশী—

কথাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই 'শুভা' বলে অরুণাংশু তার মুখের দিকে ফিরে তাকাল; অদ্ভুত একরকমের হাসি হেসে তিক্ত কণ্ঠে সে বললে, ঘরের জন্য এত ভাবনা কেন তোমার? আমার মা তো এই ঘরে থাকতে আসবেন না—আসবেন এই ঘর থেকে আমায় নিয়ে যেতে।

তা হলই বা!—সুভদ্রা উদ্ধতভাবে উত্তর দিলে। তার পরেও আরও কি সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা দিয়ে, তার উত্তরটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই অরুণাংশু আবার বললে,—আর আমার মাকে তো তুমি চেন না শুভা! দূর থেকে তাঁকে আমি উপেক্ষা করতে পারি, অমান্যও করতে পারি; কিন্তু আমার কাছে এসে যদি তিনি বলেন,—বাড়ী চল্, রুণু,—তবে উত্তরে 'না' কথাটা কিছুতেই আমার মুখ থেকে বের হবে না—সুড়সুড় করে আমায় তাঁর পাছে পাছে গাড়ীতে গিয়ে উঠতে হবে।

তাই নাকি!—সুভদ্রা ফিক্ করে হেসে ফেলে বললে,—সে তো বেশ হবে—খুব মজা হবে—আচ্ছা জব্দ হবে তুমি—যেমন এতদিন তাদের মনে কষ্ট দিয়েছ!—

কিন্তু অরুণাংশু হাসলে না, কথাও বললে না: কেবল হতবুদ্ধির মত ক্ষণকাল সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে চিৎ হয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সুভদ্রা বিস্মিত হল; হাসি থামিয়ে বললে, কি হল তোমার? হঠাৎ শুয়ে পড়লে যে!—

মুখ না ফিরিয়েই অরুণাংশু উত্তর দিলে, তুমি কিচ্ছু বোঝ না, শুভা—কি ছেলেমানুষই যে তুমি রয়েছ!—

সুভদ্রা আবার হেসে ফেললে; বললে, বেশ তো—না হয় মেনেই

নিলাম তোমার কথা। কিন্তু ছেলেমানুষকে বুঝিয়েই দাও না কি সে বুঝতে পারে নি।

অরুণাংশু এবার একটু বিরক্ত হয়েই বললে, তুমি বোঝ না যে মা'র সাথে দেখা যদি আমার হয় তবে তার সাথেই আমায় যেতেও হবে?

হবেই তো,—সুভদ্রাও বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললে,—কেন?—যেতে তুমি চাও না নাকি?

অরুণাংশু উত্তর দিলে না; কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের ভাবটা নিরীক্ষণ করে সুভদ্রাই হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠে বললে, ও হরি! তাই তুমি পালিয়ে যাবার কথা বলছিলে! সত্যি তো বুঝতে পারি নি আমি!—

তার পরেই সুভদ্রার মুখের ভাব ও কথার স্বর দুইই বদলে গেল। খপ করে অরুণাংশুর একখানা হাত নিজের কোলের উপর টেনে নিয়ে কতকটা অনুনয় ও কতকটা আবদারের স্বরে সে বললে, না, ছিঃ! লক্ষ্মীটি—পাগলামি করো না তুমি। এতদিন পর ওদিকের দোর যদি খুলেছে, এদিক থেকে তুমি আবার দোর বন্ধ করে দিও না। বাবা মাপ করেছেন, মা নিজে তোমায় নিতে এসেছেন; আর এদিকে তুমি বলছ, যাবে না? না, তা হবে না; আমি বলছি বাড়ীতে তোমায় যেতেই হবে।

অরুণাংশু নিজের হাত টেনে নিয়ে উঠে বসল; আগের চেয়েও বেশী বিরক্ত হয়ে সে বললে, তুমি কি কিছুই বুঝবে না শুভা? মা তো আমায় কেবল বাড়ীতে ফিরিয়ে নিতে আসছেন না, ফিরাতে চাচ্ছেন আমায় সংসারের গোলক ধাঁধার মধ্যে। তার মধ্যে ঢুকে যাওয়া যত সোজা, তা থেকে বের হওয়া তত সোজা নয়।

কিন্তু এবারও সুভদ্রা হেসেই উত্তর দিলে, না-ই বা হল!—বেরুতে তুমি চাওই বা কেন?

বেশ যেন জোরের সঙ্গেই কি একটা কথা বলতে গিয়েও অরুণাংশু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিলে; তার জলজলে চোখদুটিতে দেখতে দেখতে অসহায়ের কাতর দৃষ্টি ফুটে উঠল; তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিষণ্ণ স্বরে সে বললে, যে ঘরে এরা আমায় ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছেন, সে ঘর যে কি, তা তুমি জান না শুভা। সেখানে অর্থ আছে, সম্ভ্রম আছে, আরাম

আছে, সূক্ষ্ম সংস্কৃতি, আছে—নেই কেবল আলো আর হাওয়া,—নেই চলা-ফেরা করবার স্থান। সে ঘরে ঢুকলে ঘরের বাইরে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আমার যে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র গড়ে উঠেছে সেখানে আর হয়তো আমি ফিরেই আসতে পারব না। রুগ্ন বাপ আর প্রৌঢ়া মায়ের বটের আঠার মত শক্ত আর চট্‌চটে স্নেহ হয়তো জন্মের মতই আমায় সেই বদ্ধ ঘরের দেয়ালের সাথে সেঁটে দেবে।

শুনে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাক, সুভদ্রা খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, বেশ হয়েছে তোমার। এমন খুশী আমি হয়েছি, সে কি আর বলব! যেমনি বন্ধন তুমি এড়াতে চাচ্ছিলে তেমনি চারদিক থেকে বন্ধন এসে তোমায় ঘিরে ফেলেছে। এড়াও দেখি এবার—তখন বুঝব তোমার কত ক্ষমতা! ইস্—ইচ্ছে করলেই সংসারের বন্ধন বুঝি অমনি এড়ানো যায়!

অরুণাংশু অসহায়ের মত বললে, শুভা—

থাম তুমি,—সুভদ্রা ভ্রূভঙ্গী করে উত্তর দিলে,—এত বড় বিপ্লবী তুমি, আর এইটুকুতেই মুষড়ে পড়ছ? দেশের কত লোককে মাতিয়ে বেড়াচ্ছ তুমি, আর নিজের মা-বাপের মত ফিরাতে পারবে না? না, ওসব খাম-খেয়ালি আর নয়। মা যখন নিজে এসেছেন তখন তাঁর সাথেই তোমায় নিশ্চয়ই যেতে হবে।

অরুণাংশু গম্ভীর স্বরে বললে, সুভদ্রা, অবস্থাটা তুমি বুঝতে পারছ না—

বেশ বুঝতে পেরেছি আমি,—সুভদ্রা আবার বাধা দিয়ে বলে উঠল এবং পরক্ষণেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে খপ্ করে অরুণাংশুর একখানা হাত চেপে ধরে অনুনয়ের কোমল স্বরে সে আবার বললে, লক্ষ্মীটি, পাগলামি করো না; মা-বাপ-স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করলে কি দেশের কাজ আর করা যায় না? সন্ন্যাসী বা লক্ষ্মীছাড়া না হলে কেউ দেশের কাজ করতে পারে না,—এ তো সেকালের কথা। তুমিও কি সেই প্রাচীন সংস্কারের ঠুলিই চোখে বেঁধে সারা জীবন ঘুরপাক খেয়ে বেড়াবে? না না,—মা'র সাথে—

বাবুজী—

সুভদ্রার কথা শেষ হবার আগেই বাইরে একটি হিন্দুস্থানী বালকের গলা শোনা গেল, —বাবুজী, ব্যানার্জ্জীবাবু আয়ে হৈঁ।

সুবোধবাবু—বলে সুভদ্রা তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল; অরুণাংশুও চমকে উঠে বললে, কে—সুবোধ্‌!—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পথপ্রদর্শক ছেলেটির অনুসরণ করে সুবোধ হাসি মুখে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলে।

সুভদ্রারই মুখের দিকে চেয়ে সুবোধ বললে, যে অপরাধটি করতে চাই নি ঠিক তাই করে ফেললাম। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে আপনি শ্যামাচরণ-দার বাসায় চলে গিয়েছেন,—সন্ধ্যের আগেই যাবেন বলেছিলেন কি না!

বিব্রত ভাবটা কাটাবার জন্যই সুভদ্রা কণ্ঠস্বরে একটু অতিরিক্ত রকমের জোর দিয়ে বললে, উঠতে কি পারি! দেখুন তো কি কাণ্ড! মা ওঁকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য কত দূর দেশ থেকে এখানে এসেছেন, আর উনি এদিকে গোঁ ধরে বসেছেন—বাড়ী তো যাবেনই না, বলছেন, মা'র সাথে দেখা হবার আগেই এখান থেকে উনি পালিয়ে যাবেন।

বলেন কি!—সুবোধ মুচকি হেসে বললে, হাসি মুখে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে কথাটাকে সে শেষ করলে, সত্যি নাকি অরুণাংশু?

সত্যি আবার নয়!—সুভদ্রাই অরুণাংশুর হয়ে উত্তর দিলে,—আমার হাতে জাজ্জ্বল্যমান প্রমান রয়েছে যে! দেখুন না,—মা'র নিজের হাতের চিঠি।

কিন্তু চিঠি দেখা দূরে থাক, নেবার জন্যও সুবোধ কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ করলে না; কেবল তার সকৌতুক কণ্ঠের সশব্দ হাসিই এবার উঁচু হয়ে ফেটে পড়ল।

অপ্রস্তুতের মত একবার সুভদ্রা ও একবার সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণাংশু অবশেষে একটু বিরক্ত হয়েই বললে, বাঃ, বেশ তো! আমাকে বোকা বানিয়ে দুজনে বেশ তো হেসে নেওয়া হচ্ছে! কিন্তু বাইরে থেকে কেউ শুনতে পেলে আমাদের সবাইকে পাগল মনে করবে যে!

ফল ফলল সঙ্গে সঙ্গেই। সুবোধ হাসি থামিয়ে বললে, তা বটে!

অরুণাংশু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, বোস, সুবোধ।

সুভদ্রা পাশের চৌকিখানি সুবোধের দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে নিজে আরও একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু সুবোধ না বসেই সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনিও বসুন না,—দেরী যখন আপনার হয়েইছে তখন আরও একটু দেরীতে দুজনে না হয় একসঙ্গেই শ্যামাচরণদার বাসায় যাওয়া যাবে !

না, না,—সুভদ্রা সবেগে মাথা নেড়ে উত্তর দিলে,—বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে আমার। আপনি বসুন, আমি এখন যাই।

তখন রাত হয়েছে। একে কৃষ্ণপক্ষ, তায় আবার নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা। পথে আলোর সংখ্যা এমনিতেই খুব বেশী নয় ; যা আছে, তা-ও আবার টুপি-পরা। দূরে দূরে ফোটার মত এক একটা আলোর চারদিকে রাত্রির অন্ধকার আরও যেন নীবিড় হয়ে উঠেছিল !

কিন্তু এ রাত শনিবারের। আলো না থাক, মেলা তখনও ভাঙ্গে নি। কণকণে শীতের হাওয়াসত্বেও বড় রাস্তায় তখনও লোকে লোকারণ্য। উৎসবের স্রোতে তখনও ভাটা পড়ে নি। একটা ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে একটি সুন্দরী যুবতী তার পুরুষ সঙ্গীটির গলায় বাঁধা হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে তাল রেখে তখনও নেচে নেচে গান গাচ্ছিল,—তার চারদিকে দর্শকের গোলাকার ভীড় জমে উঠেছে। মিঠাই আর তেলে-ভাজার দোকানে দোকানীরা যেন নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ পাচ্ছে না। তাড়ির দোকানে ভীড় তখনও বেড়েই চলেছে। ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচির অন্ত নেই। দুএক জায়গায় মত্ততা এরই মধ্যে হিংস্র হয়ে উঠেছে।

কিন্তু পথ চলতে সুভদ্রার কোন অসুবিধা হল না। চেনা পথ,— কেউ তাকে বাধাও দিলে না। এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই তাকে চেনে,— সবাই সসম্ভ্রমে তাকে পথ ছেড়ে দিলে। কেউ কেউ তাকে হাসিমুখে 'দিদিমণি' বলে নমস্কারও করলে। কিন্তু এ সব সে নিজে বড় একটা লক্ষ্যই করলে না। তার মন তখন অনৈসর্গিক এক কল্পলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অরুণাংশুর নির্ব্বাসিত জীবনের এমনি একটা পরিণতি চিরদিনই সে কল্পনা করে আসছিল—সেই কল্পনা এবার সত্য হতে চলেছে। উল্লাসে সে আজ অধীর,—একেবারে আত্মবিস্মৃত।

সে নিঃসংশয়েই জানে যে অরুণাংশুকে সে পেয়েছে। অরুণাংশুর

সঙ্গে তার মনের যে একাত্মবোধ, তার কোথাও কোন ফাঁক নেই। একটু আগেই অরুণাংশুর মাকে 'মা' এবং বাবাকে 'বাবা' বলতে মুখে তার একটুও বাধে নি। তার সক্রিয় কল্পনা অবিরাম বেগে সৃষ্টিও করে চলেছে।

মা আসবেন—অনিশ্চিত সুদূর ভবিষ্যতে নয়, কালই। অরুণাংশু ঘরে ফিরে যাবে, তার বাপের আর কোন অভিমান থাকবে না, মা তাকে হাসিমুখে বুকে তুলে নেবেন, অভিশপ্ত অতীতের স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত বিগতরাত্রির দুঃস্বপ্নের মত শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এ হবে যেন শাপগ্রস্ত দেবতার শাপমোচন। তার পর তার জীবনের আর একটা অধ্যায় সুরু হবে।

অরুণাংশুর সেই ভবিষ্যৎই সুভদ্রা যেন তার কল্পনার চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। অতীত থেকে বিশ্লিষ্ট কিম্ভূতকিমাকার নূতন একটা সৃষ্টি তা নয়,—অতীত আর ভবিষ্যতের সে এক মহিমময় সমন্বয়—এই অরুণাংশুরই সে সুপরিণত রূপ। বিপুল তার কর্ম্মক্ষেত্র, বিরাট তার প্রতিষ্ঠা, অপরিমেয় তার সিদ্ধি;—তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে,—লক্ষ লক্ষ নরনারীর সে অবিসংবাদিত নেতা। কিন্তু আজকের মত ছন্নছাড়া সে আর নেই। প্রকাণ্ড বাড়ী, মা-বাপ-আত্মীয়-স্বজন ও দাসদাসীতে জমজমাট সোনার সংসার, আর ওরই কেন্দ্রস্থলে অরুণাংশুর রাজসিংহাসন। সে সিংহাসন একা অরুণাংশুরই নয়, ওতে অরুণাংশুর ঠিক পাশেই সুভদ্রার নিজের অবিসংবাদিত স্থান।

স্বপ্নেই যেন সুভদ্রা তার আবাল্যের স্বপ্নের রূপায়ন প্রত্যক্ষ করছিল।

কেবল সে নিজে আর অরুণাংশুই সে স্বপ্নের বিষয়বস্তু নয়,—একটি অজ্ঞাত শিশুর সুকুমার কান্তিও ঐ স্বপ্নের মধ্যে থেকে থেকে রেখাচিত্রের মত ফুটে উঠছিল। একবার সুভদ্রার মনে হল যে আজই অরুণাংশুকে কথাটা জানিয়ে এলেই ভাল হত। কিন্তু তখনই লজ্জায় তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে মনেই মাথা নেড়ে অনুচ্চারিত ভাষায় সে বললে, ছিঃ! নিজের মুখে এ কথা কি প্রকাশ করে বলা যায়!—

পরমুহূর্ত্তেই কল্পনার উদ্দাম স্রোত তার মনের ক্ষোভটুকুকে তার অলক্ষ্যেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

(২)

নিজেকে বাদ দিলে তিনটি মাত্র লোক নিয়ে শ্যামাচরণের পরিবার—বর্ষীয়সী স্ত্রী সারদাসুন্দরী, বড় ছেলে ফটিক আর ছোট একটি মেয়ে তারা। বড়টির বয়স ষোল পার হয়ে গিয়েছে, ছোট মেয়েটির বয়স বছরসাতেক। মাঝে অবশ্য আরও কয়েকটি ছেলে-মেয়ে হয়েছিল,—তারা আর নেই। সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটি,—তারার ছোট ভাই,—তিনের কোঠা পার হবার আগেই গেল বছর নিউমোনিয়া হয়ে মারা গিয়েছে। মৃত্যুর পর তাকে বাঁশের খাটিয়ায় তুলে দিয়ে সারদা মাটিতে লুটিয়ে আর্ত্তনাদের সুরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল—ঠাকুর, আমার সাধ মিটেছে, আর যেন কাউকে আমার কোলে পাঠিয়ো না। তার সে দরখাস্ত না-মঞ্জুর হবার কোন লক্ষণ এপর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নি। সুতরাং সর্ব্বকনিষ্ঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট মাতৃবক্ষের স্নেহস্নিগ্ধ বিশেষ স্থানটুকু সাতবছরের তারাই এখনও সগৌরবে অধিকার করে রয়েছে।

শ্যামাচরণের এই পরিবার বস্তিতে থাকে না, থাকে কোম্পানীর খাসমহাল ব্যারাকে। নীচের তলায় একখানি কুঠরীতে তাদের বাস।

একখানা চারপাই, খানকয়েক কাপড়-চোপড়, খানদুই চাটাই, কয়েকখানা কাঁথা, দুচারটি ঘটি-বাটি, রান্নার জন্য কয়েকটি মাটির হাঁড়ি আর একটা তোলা উনোন,—এই নিয়ে শ্যামাচরণের সংসার। ঘরেই রান্না এবং খাওয়ার ব্যবস্থা। তবে নীচের তলা বলে একটা মস্ত সুবিধা আছে—উনোনটা বাইরে থেকে ধরিয়ে আনা যায়; বৃষ্টি-বাদল না থাকলে চারপাইখানা দিনে তো বটেই, রাত্রেও বাইরে ফেলে রাখা চলে,—তাতে ঘরের আয়তন বেড়ে যায়। তবে অসুবিধারও অন্ত নেই। খোলা উঠানে দিনরাতই লোকের ভীড়,—পায়রার খোপের মত একখানা ঘরের সংসারে সম্ভ্রম ও শালীনতা বজায় রেখে চলার উপায় নেই।

আগে অবশ্য এ অবস্থা তাদের ছিল না। মেদিনীপুর জিলার এক গ্রামে তাদের প্রচুর জমিজমা ছিল, পুকুর এবং বাগানসহ প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, ঐশ্বর্য্যের যেমন, সম্ভ্রমেরও তেমনি অভাব ছিল না। কিন্তু সে সব এখন সারদার কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়। বছরদশেক যাবৎ তারা সপরিবারে

বস্তি বা ব্যারাকে এইরকম যাযাবরের লক্ষ্মীছাড়া জীবনই যাপন করে আসছে।

তবু সুখে-দুঃখে সারদার দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু শ্যামাচরণ হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়াতেই তার ভিতরে ও বাইরে একটা বড় রকমের বিপর্য্যয় ঘটে গেল।

এ দুটি দিন তার কেমন করে যে কেটেছে তা নিজেই সে জানে না। নিজের নাওয়া-খাওয়া দূরে থাক্, ছেলে-মেয়ের মুখের দিকেও সে তাকিয়ে দেখে নি। ছেলেটাকে তো সে বকে বকে বাড়ী থেকে দূরই করে দিয়েছিল; ছোট মেয়েটাও তার অহেতুক ক্রোধের হিংস্র আক্রমণ থেকে রেহাই পায় নি। পাশের ঘরের হিন্দুস্থানী বৌটি এ দুদিন তারাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে বলেই মেয়েটি খেতে পেয়েছে; সেই বৌটিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজ সারদাকে রাঁধতে রাজী করিয়েছে।

তাই সুভদ্রা এসে তাকে ঘরের ভিতরে উনোনের ধারে দেখতে পেলে।

কিন্তু সুভদ্রাকে দেখে সারদা নিজেও ঐ উনোনের মতই হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল।

—এখনও সাধ মেটে নি তোমার?—সুভদ্রার মুখের কাছে হাত নেড়ে সারদা প্রায় চীৎকার করে বলে উঠল,—জেলে তো তাকে পাঠিয়েছ! তবু আবার এখানে কেন? মজা দেখতে এসেছ বুঝি? যাও, যাও,—দূর হয়ে যাও আমার ঘর থেকে। যাও—

কিন্তু সুভদ্রা রাগ করলে না। প্রথমতঃ, রাগ করা তার স্বভাবই নয়; দ্বিতীয়তঃ, ভাল করতে গিয়ে এরকম অভ্যর্থনা লাভ করা তার কাছে নূতন কোন অভিজ্ঞতা নয়; তৃতীয়তঃ, সারদাকে সে চেনে। শ্যামাচরণ ও সারদার জীবনের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই তার অজানা নেই। সে জানে যে শ্যামাচরণের সংসারে মন নেই; আর তার চেয়েও বেশী জানে যে স্বামীর এই উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যই সারদার জীবনের সব চেয়ে বড় দুঃখ। ঘরকে বাদ দিয়ে বাইরেটাকে নিয়ে শ্যামাচরণের ঐ যে উন্মত্ততাকে কিছুতেই সে সংশোধন করতে পারেনি, তার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর থেকে আরম্ভ করে পরিচিত কাউকেই সে অভিসম্পাত দিতে বাকি রাখে নি। হুগলীতে

সুবোধের উপরেই সারদার রাগ ছিল সব চেয়ে বেশী; সুবোধ চলে যাবার পর সেটুকু অরুণাংশুর উপর না পড়ে গিয়ে পড়েছিল সুভদ্রারই ঘাড়ে। একথা সুভদ্রার অজানা নেই। তার সঙ্গে সঙ্গেই এ কথাও সে জানে যে শ্যামাচরণকে সারদা যা ভালবাসে, তা এই সীতা-সাবিত্রীর দেশেও খুব সুলভ নয়; আর শ্যামাচরণকে সে ভালবাসে বলেই শ্যামাচরণের যারা সহকর্মী এবং শ্যামাচরণ যাদের শ্রদ্ধা করে, তাদের প্রতি সারদার কোন আন্তরিক বিদ্বেষ নেই।

এ সব জানা ছিল বলেই খুব অল্প সময়ে আর খুব সহজেই সারদাকে সে বশ করে ফেললে,—সাপুড়ে সাপকে যেমন বশ করে কতকটা তেমনি।

ঝড়টা কেটে যেতেই সারদা সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে কাতরস্বরে বললে, ওঁর কি হবে দিদিমণি?

সুভদ্রা বুঝলে। তার নিজের মুখও ম্লান হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে সান্ত্বনার স্বরে সে বললে, তুমি কিছু ভেবো না বউদি,—শ্যামাচরণদা নিশ্চয়ই খালাশ হয়ে আসবে।

সারদার চোখের অবরুদ্ধ অশ্রু এবার ঝর ঝর করে তার দুই গালের উপর ঝড়ে পড়ল। কম্পিত, বিকৃত স্বরে সে বললে, ওঁকে জেলে নিয়ে গিয়েছে সেজন্য আমার তত দুঃখ নেই দিদিমণি। কিন্তু এই যে শুনছি যে সে চুরি করেছে!—

মিথ্যে কথা,—সুভদ্রার চোখদুটি হঠাৎ আগুণের শিখার মত জ্বলে উঠল,—যে এ কথা বলেছে সে নিজেই চোর হবে।

তাই বল তো দিদিমণি—এমন মানুষ কি চুরি করতে পারে? নিজের রাজার ঐশ্বর্য্য যে দুহাতে বিলিয়ে দিলে, সে কি না চুরি করতে যাবে দুটি লোহার বল্টু আর দুখানি ডাণ্ডা?

এ সব কথা সুভদ্রা জানে। রাজার ঐশ্বর্য্য না হউক, ঐশ্বর্য্য শ্যামাচরণের নিশ্চয়ই ছিল। সে সব সে ইচ্ছা করেই হারিয়েছে। দেশে থাকতে লোকের ভাল করবার নাম করে যে কেউ এসে তার কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে, সে-ই কিছু না কিছু পেয়েইছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশ্রমেই কত যে সে দান করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারপর, মানে দেশে অসহযোগ আন্দোলন সুরু

হবার পর সে প্রায় তার যথাসর্বস্বই দেশের কাজে উজার করে ঢেলে দিয়েছে। তার কতক সম্পত্তি সে দিয়েছে দান করে, কতক আদালতের পেয়াদা এসে কেড়ে নিয়েছে জরিমানার দায়ে। এখনও দেশে যেটুকু সম্পত্তি তার আছে তা-ও তার আত্মীয়-স্বজনেরাই উপভোগ করছে। এহেন লোক যে কারখানার দুটি লোহা-লক্করের মাল আত্মসাৎ করবার জন্য চুরি করতে পারে না, সে কথা সুভদ্রাকে বিশ্বাস করাবার জন্য যুক্তি বা প্রমানের প্রয়োজন ছিল না।

তাই সারদার কথার প্রতিবাদে সুভদ্রা জোর গলায় বললে, কক্ষনো না, বৌদি, শ্যামাচরণদা নিজেও যদি এসে আমায় বলে যে সে চুরি করেছে তবু সে কথা আমি বিশ্বাস করব না। হাকিমও বিশ্বাস করবে না। তুমি ঠিক জেনো যে শ্যামাচরণদা খালাস হয়ে আসবে।

একটু থেমে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে সে আবার বললে, তুমি ভেবো না, বৌদি; সোমবারেই তাকে আমরা জামিনে খালাস করে নিয়ে আসব। এ কদিন লোকজন ছিল না, তাই কিছু করতে পারি নি। কিন্তু এখন তো আর ভাবনা নেই— সুবোধবাবু যখন এসে গিয়েছেন—

কে!—সারদা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে।

সুবোধবাবু গো,—সুভদ্রা হাসিমুখে উত্তর দিলে,—আজ দুপুরে ফিরে এসেছেন তিনি। এসে সকলের আগেই তিনি শ্যামাচরণদার খোঁজ করেছেন,—শ্যামাচরণদা যে তাঁর ডান হাতের মত। তুমি ঠিক জেনো, সোমবার শ্যামাচরণদাকে জামিনে খালাস করে না এনে সুবোধবাবু মুখে জলও দেবেন না।

সারদা সাগ্রহে কথাগুলি শুনলে। কিন্তু শুনতে শুনতেই সে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। একটু পরে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ছেড়ে সে বললে, আর এলেই বা কি হবে!—এই সব হাঙ্গাম-হুজ্জোত তো সে ছাড়বে না। আমার যে কষ্ট তা তেমনি থাকবে,—বেড়েই যাবে হয় তো!—

ঐ ছোট্ট নিশ্বাসটি, ঐ অল্প কয়েকটি কথা,—এদের পিছনে কত ব্যথা, কত আশাভঙ্গের স্মৃতিই যে লুকানো রয়েছে তা বুঝতে পেরে সুভদ্রা ম্লান মুখে চুপ করেই রইল। একটু পরে সারদাই তাকে জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ দিদিমণি, সুবোধবাবু কি আবার এখানেই থাকবেন?

বোধ হয় থা কহেন,—বলে সুভদ্রা কৌতুহলের চোখে সারদার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সারদা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর সহসা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁ দিদিমণি, এই তোমাদের সুবোধবাবু, ঐ ব্যারিষ্টার অরুণবাবু, ঐ যে আর একটি কি বাবু,— এদের কি কারও ঘরসংসার নেই ?

সুভদ্রা বুঝলে সারদার উত্তাপটা কোথায় এবং তা কিসের জন্য। ঠোটের কোণে হাসি চেপে সে উত্তর দিলে, কি জানি,—বোধ হয় না।

সেই জন্মই বুঝি এরা অন্তের সংসারে আগুণ লাগিয়ে বেড়ায় ?—সারদার মুখের ভাব ও কথার স্বরে এবার তার অন্তরের উষ্মা স্পষ্টই প্রকাশ হয়ে পড়ল ;—তুমি হাসছ, দিদিমণি,—কিন্তু একে আগুণ লাগানো ছাড়া আর কি বলবে ? আমার কথা না হয় ছেড়েই দাও। কিন্তু চোখের সামনেই তো দেখলাম, গত ক'বছরে এদের পাল্লায় পড়ে কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। সেই সেবারের ধর্ম্মঘটের কথা মনে নেই তোমার ? কোথাও কিছু নেই, লোকে হপ্তায় হপ্তায় মাইনে পাচ্ছে, কারখানায় নতুন সায়েব এসেছেন যেন দেবতা,—আর তারই মধ্যে এরা হুজুগ তুললে, ধর্ম্মঘট করতে হবে। দিলে সবাই কাজ ছেড়ে। কিন্তু তার পর কত লোকের চাকরি গেল, কত সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল, বল দেখি !—

সুভদ্রা উত্তর দিলে না,—সে তখন মুখ নামিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঐ গোপন করবার চেষ্টা সত্ত্বেও তার হাসিটুকু সারদার চোখে ধরা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের চেহারা বদলে গেল ; মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে হতাশ স্বরে সে বললে, আর তোমায় এসব কথা বলেই বা কি হবে—তুমি নিজেও তো ওদেরই দলে।—

কিন্তু তার এই নিস্পৃহ ভাবটা বেশীক্ষণ বজায় রইল না। একটু পরেই সুভদ্রার দিকে বেশ একটু ঝুঁকে পড়ে সনির্ব্বন্ধ স্বরে সে বললে, কিন্তু দিদিমণি,—তুমি তো মেয়েমানুষ ; তোমার বুকভরা এত মায়া-মমতা,—তুমি কেন ঘরসংসার না করে এই লক্ষীছাড়াদের সাথে হৈ হৈ করে বেড়াও ? ছিঃ—মেয়েমানুষের কি এই সব সাজে ! লক্ষীর অংশ তুমি—তোমার কাজ সকলকে লক্ষীমন্ত করা। অথচ তুমি নিজেই কি না উস্‌কে দিচ্ছ ওদের !—

এরও উত্তর দিলে না সুভদ্রা,—উত্তর সে ভেবেই পেলে না। সে জানত সারদা

যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে তা নিয়ে অন্ততঃ আজকের দিনে তর্ক করা চলবে না। সারদার যা মনের অবস্থা, তাতে প্রতিবাদ করলেই সে হয় চটে যাবে, নয় মনে আরও দুঃখ পাবে। তাছাড়া প্রতিবাদ করবার প্রবৃত্তিও তার হচ্ছিল না,—তার নিজের মনটাও আজ যেন ঐ সুরেই বাঁধা। সারদার কথা শুনতে শুনতে তার বরং মনে পড়ছিল যে একটু আগেই সে নিজেও অরুণাংশুকে প্রায় ঐরকম কথাই বলে এসেছে।—

চট্ করে একটা মতলব তার মাথায় এসে গেল। প্রসঙ্গটাকে একেবারে বদলে দিবার উদ্দেশ্যে হঠাৎ একগাল হেসে সুভদ্রা বললে, একটা কথা রাখবে বৌদি—রাত্রের মত চাট্টি খেতে দেবে?

সারদা থতমত খেয়ে থেমে গিয়েছিল, শেষ পর্য্যন্ত বিহ্বল স্বরে বললে, সত্যি এখানে খাবে, দিদিমণি?

ওমা!—সুভদ্রা বিস্ময়ের ভাণ করে বললে,—তুমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলে যে! আগে কোনদিন তোমার বাড়ীতে আমি খাই নি নাকি? সর তুমি,—তরকারিটা আমিই নামাচ্ছি।

সারদা আরও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার পর শরীরটাকে বেশ জোড়ে একবার নাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে বললে, থাক্—তরকারি তোমায় আর নামাতে হবে না, দিদিমণি; উপরে উঠে ঠিক হয়ে বোস তুমি—এদিকে যা করবার তা আমিই করছি।

খাওয়ার পর সারদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুভদ্রা যখন উঠে দাঁড়াল তখন সারদার অবস্থা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। পথে এসে সুভদ্রারও মনে হল যে তারও লাভ নিতান্ত কম হয় নি। সেদিন ঘটনার পর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তার মনটা অস্বাভাবিকরকমে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। সে যেন এক রকমের জ্বর,—যন্ত্রণা না থাকলেও তার উত্তাপ ছিল,—আর ছিল অস্থিরতা। উপলক্ষের বৈচিত্র্য থাকলেও এতক্ষণ সুভদ্রা নিজেকে অতিক্রম করে উর্দ্ধে উঠতে পারে নি,—শুধু নিজের চারিদিকেই মাতালের মত ঘুরে ঘুরে মন তার ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এখন সারদাকে সান্ত্বনা দিবার উপলক্ষে তার সেই মন নিজের ছোট্ট গণ্ডিটুকুর ভিতর থেকে বাইরের খোলা হাওয়ায় গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। সারদার পারিবারিক জীবনের ছোটখাটো সুখদুঃখের সরস কাহিনীর মধ্যে এতক্ষণ পর সে যেন সত্যি-

কারের বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেয়েছে, ছোটখাটো হাসি-পরিহাসের মধুর রস যেন ভিতরে ভিতরে তাকে স্নান করিয়ে সুস্থ করে তুলেছে।

উৎফুল্ল কিন্তু শান্ত মন নিয়েই সুভদ্রা বাসায় ফিরে গেল।

পর দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠবার পর আগের দিনের ঘটনাগুলি যখন সুভদ্রার মনে পড়ল তখন প্রথমে সে ভাবলে যে বোধ হয় সারা রাতই সে স্বপ্ন দেখেছে—বোধ হয় আসলে এত সব ঘটনার একটাও ঘটে নি। কিন্তু তার মনের এ ভাবটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। ঠিকা ঝি তাকে দেখেই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, রাত্রেও কি কিছু খাও নি দিদিমণি? হেঁসেল যে যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনি রয়েছে!—

লজ্জিত স্বরে সুভদ্রা উত্তর দিলে, খেয়েছি বৈ কি—শ্যামাচরণদার ওখান থেকেই খেয়ে এসেছিলাম। রাত্রে আর রাঁধবার দরকার হয় নি।

ঐ একটা অসাধারণ ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল যে আগের দিনের অন্যান্য অসাধারণ ঘটনাগুলিও অবশ্যই ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ল যে আজ মা আসবেন, আর তাঁর আসবার আগেই তাকে অরুণাংশুর বাসায় গিয়ে ঘরখানাকে অন্ততঃ চলনসই রকমে গুছিয়ে তুলতে হবে। দুটুকরো কাঁচা রুটির সঙ্গে কোনও রকমে এক বাটি চা গলায় ঢেলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল সে।

কিন্তু হাসপাতালের কাজ যত তাড়াতাড়ি সে সারতে পারবে আশা করেছিল তত তাড়াতাড়ি শেষ হল না। মাঝে অরুণাংশুর চাকরটি হাসপাতালে এসে অরুণাংশুর নামে তাকে একবার তাগিদ দিয়ে গেল; কিন্তু খুব হাত চালিয়ে কাজ করেও সুভদ্রা বেলা এগারটার আগে বাসায় ফিরতে পারলে না। রান্নাঘরে আয়োজন সব ঠিকই ছিল, কিন্তু আজও সে ঘরে সুভদ্রা মোটে ঢুকলই না। তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নিয়েই সে দোরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সেটা রবিবার—বড় রাস্তার দুধারে সকাল থেকেই মেলা লেগে রয়েছে। মজুরেরা সাজগোজ করে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ তাদের কাজের তাড়া নেই,—নাওয়া-খাওয়ার তাগিদও যেন সে জন্য অনেক কম। মেয়েরাও অনেকেই আজ পথে।

ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল সুভদ্রা। কিছু দেখবার বা কারও সঙ্গে গল্প করবার আগ্রহ তার মোটেই ছিল না। তবু এক রকম পদে পদেই তাকে থামতে হল,—কেউ হাত তুলে তাকে নমস্কার করছে, তাকে প্রতিনমস্কার করতে হবে; কেউ 'দিদিমণি' বলে তাকে সম্ভাষণ করছে, প্রত্যুত্তরে তাকেও হাসিমুখে দুটি কথা বলতে হবে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকে ছোটখাটো একটা সালিশ মীমাংসাও করে দিতে হল।

কিন্তু তখন তার মন চলে গিয়েছে অরুণাংশুর কাছে। মনে মনে সে ভাবছে যে বৈকালে মা এখানে এসে উপস্থিত হবার আগেই সে অরুণাংশুকে তার অজাত সন্তানের খবরটা জানিয়ে দিবে,—মুখ ফুটে বলা নিতান্তই সম্ভব যদি না হয় তবে একখানা কাগজে ছোট্ট একটি ছত্র লিখে এক হাতে অরুণাংশুর মুখ চেপে ধরে আর এক হাতে ঐ লেখা কাগজখানি তার চোখের সামনে তুলে ধরবে। তার পর কি ঘটবে তাই নিয়ে তার কল্পনা বিচিত্র বর্ণ আর বন্ধনের জাল বুনে চলেছিল।

কিন্তু অরুণাংশুর বাসার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল সুভদ্রা; তার বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটাও হঠাৎ যেন নিশ্চল হয়ে গেল। তার চোখে পড়ল—অরুণাংশুর বড় তোরঙ্গটা বারান্দায় রাখা রয়েছে, ওর উপরে তার এসরাজটি; একটা বিছানা সতরঞ্চি দিয়ে বাঁধা; একটি থার্মোফ্লাস্ক এবং আরও কয়েকটি টুকিটাকি জিনিষ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে। তার কতক অরুণাংশুর নিজের আর কতক নয়। কোণের দিকে একখানি চৌকির উপর প্রৌঢ়গোছের এক অপরিচিত ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে চুপ করে বসে রয়েছেন।

চোখ তুলে তাকাতেই সেছুটি খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে মহিমময়ী এক নারীমূর্তির উপর গিয়ে পড়ল। যৌবন তার বহুদিন অতীত হয়ে গিয়েছে; মাথার চুলে পাক ধরেছে; চোখের কোণে, চিবুকের নীচে, ললাট ও গণ্ডের অগনিত রেখার মধ্যে নিষ্ঠুর কালের কুৎসিৎ পদচিহ্ন এত দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়। তথাপি তাঁর রূপের অন্ত নেই। পাকা সোনার মত তার রঙ, নিখুঁত গঠন, অতুলনীয় সৌষ্ঠব—ঠিক অরুণাংশুরই মত টানা টানা দুটি চোখ। সমগ্র মুখখানিতে একটা প্রখর ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ; ঐ ব্যক্তিত্বই সে মুখের বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য। দুর্গাপ্রতিমার মত মহিলাটির রূপ—সৌম্য কিন্তু প্রদীপ্ত। স্নিগ্ধ মাধুর্য্য আর শান্ত গাম্ভীর্য্যের সে যেন এক অতুলনীয় সমন্বয়।

সুভদ্রা বুঝলে যে ঐ মহিলাটিই অরুণাংশুর মা। সে আরও বুঝলে যে অরুণাংশু কাল একটুও অতিশয়োক্তি করে নি,—এঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এঁর মুখের কথা অগ্রাহ্য করবে, এমন সাধ্য কারও নেই।

একটা দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়ে সুভদ্রা দ্রুতপদে ঘরের ভিতর গিয়ে মাটিতে মহিলাটির পায়ের কাছে হাটু গেড়ে বসে তাঁর পা ছুঁয়ে তাকে প্রণাম করলে।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হয়ে গেল। অরুণাংশু চারপাইয়ের উপর কাৎ হয়ে শুয়ে ছিল,—সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সোজা হয়ে উঠে বসল। মহামায়াদেবী চমকে পা সড়িয়ে নিলেন।

ওমা!—কর কি!—কে?—কে মা তুমি?—বলে তিনি তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর বিস্ফারিত চোখের বিহ্বল দৃষ্টি সুভদ্রার মুখের উপর গিয়ে পড়ল। সুভদ্রাও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে,—লজ্জা, আনন্দ ও কুণ্ঠায় তার শ্যামবর্ণ মুখখানিও তখন বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সে-ও চোখ তুলে তাকাতেই মহামায়াদেবীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল।

এক সেকেণ্ডের মাত্র দেখা,—হয় তো তারও কম। কিন্তু ঐটুকুর মধ্যেই সুভদ্রা নিঃসংশয়ে অনুভব করলে যে, একটু আগেই যে পরম সুন্দর মুখখানি চুম্বকের মতই তাকে আকর্ষণ করেছিল, সেই মুখখানিই এখন যেন একেবারে বদলে গিয়েছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এখন যেন পাণ্ডুর; পাতলা ঠোটদুখানি চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে; মুখের শান্ত গাম্ভীর্য্য এখন ভয়ঙ্কর; আয়ত চোখদুটির সুধাবর্ষী স্নিগ্ধ দৃষ্টি হঠাৎ যেন সন্দেহে কুটিল ও অনুসন্ধিৎসায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। সেই দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি গিয়ে মিলতেই সুভদ্রার চোখদুটি কুণ্ঠাভরে নত হয়ে পড়ল। তার বুকের ভিতরটা উঠল কেঁপে; অথচ বাইরে মুহূর্ত্তমধ্যেই তার শরীরটা যেন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেল।

মহামায়াদেবী সুভদ্রার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে আবার বলে উঠলেন, কে—কে মা তুমি?

কিন্তু তার মুখ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে মুখ ফিরিয়ে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে তিনি ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে রে রুণু—মেয়েটি কে?

কিন্তু তার পরেই ঘরের মধ্যে সীসার মত ভারী হয়ে নিস্তব্ধতা নেমে এল। দুঃসহ সেই প্রতীক্ষা। বাতাস যেন আর নেই—স্তব্ধতার ক্রমবর্দ্ধমান চাপে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কতটুকুই বা অবসর—হয় তো আধ মিনিটও নয়। কিন্তু সুভদ্রার

মনে হল যে সে যেন একটা যুগ। অরুণাংশুর মুখের দিকে তাকাবার জন্ম তার বুকের মধ্যে আগ্রহ অধীর হয়ে উঠল। কিন্তু চোখের পাতাদুটিকে কিছুতেই সে টেনে তুলতে পারলে না। অথচ ভিতরে তার দেহের স্নায়ুগুলি গুণ-দেওয়া ধনুকের ছিলার মত শক্ত আর সোজা হয়ে উঠল।

ওরই মধ্যে অরুণাংশুর ক্ষীণ কণ্ঠের অস্ফুট ধ্বনী তার কাণে এসে প্রবেশ করলে, উনি নার্স।

নার্স!—এবার মহামায়াদেবীর গলার আওয়াজ সুভদ্রার কানে গেল।

অরুণাংশু উত্তর দিলে, হ্যাঁ মা, নার্স। দরকার হয় না আমার? কতদিন থেকে অসুখে ভুগছি। উনিই তো শুশ্রূষা করে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন!—

এমনি সব কথা অরুণাংশু অনর্গল বলে যেতে লাগল। কিন্তু অধিকাংশই সুভদ্রার কানে গেল না। কেবল একটি কথাই সে স্পষ্ট শুনতে পেলে,—নার্স। কথা তো নয় যেন সুতীক্ষ্ণ বর্শার নির্ম্মম একটা খোঁচা। তা-ও লেগেছে একেবারে মর্ম্মস্থলে। এক অক্ষরের একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে তার বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠেও কণ্ঠের কাছে এসে যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। সে নড়তেও পারলে না, কথাও বলতে পারলে না। শুধু আহত পশুর কাতর দৃষ্টি দিয়ে একটিবার অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে দেখেই আবার চোখ নামিয়ে সে আগের মতই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অথচ তাকেই উপলক্ষ করে মা আর ছেলের মধ্যে কথাও চলতে লাগল।

অরুণাংশু কতকটা যেন পাগলের মত অনর্গল বলেই যাচ্ছিল,—হঠাৎ এক সময়ে তার কথার মধ্যেই মহামায়াদেবী বলে উঠলেন, ওমা—তুই স্নান করবি সে কথা এতক্ষণ বলিস নি কেন? আমিই তো তোকে স্নান করিয়ে দিতে পারতাম।—

না, না,—অরুণাংশু প্রতিবাদ করে বললে,—তুমি এ সব পারবে কেন? ঘটি করে মাথায় জল ঢালা তো নয়,—এ স্নান বিছানায় শুয়ে শুয়ে। একি,—তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রইলে কেন, সুভদ্রা?—বোস।—কিন্তু গরম জলটা—

অরুণাংশু উদ্ভ্রান্তের মত একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখে হঠাৎ চীৎকার করে ডাকলে, হরিয়া—

বাবুজী—বলে হরিয়া চাকর ভিতর থেকে ঘরের মধ্যে ছুটে এল।

জল গরম করেছিস?

না তো বাবুজী—

হারামজাদা, শূয়োর,—অরুণাংশু আরও জোরে চীৎকার করে উঠল ; হরিয়ার কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করে বললে, না তো বাবুজী !—কেন, মনে নেই তোর যে আজ স্নানের জল গরম করতে হবে ? ষ্টোভ ধরিয়ে জল চাপা শীগগির।—বলতে বলতে অরুণাংশু নিজেই উত্তেজনার আতিশয্যে খাটিয়া ছেড়ে নীচে নেমে দাঁড়াল।

বিহ্বল হরিয়া হুকুম তামিল করতে ঘরের কোণে ছুটে গেল। মহামায়াদেবী উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, তুই আবার উঠলি কেন, রুণু ?

উত্তর না দিয়ে অরুণাংশু বললে, তুমি একটু বাইরে গিয়ে বোস মা,—আগে স্নানটা আমার হয়ে যাক্।

তা এত ব্যস্ত কেন হচ্ছিস তুই ?—মহামায়াদেবী এবার একটু বিরক্ত হয়েই বললেন,—চুপ করে বোস খাটের উপর—আমিই তোকে স্নান করিয়ে দিচ্ছি।

না, তুমি পারবে না,—অরুণাংশু অধৈর্য্য কণ্ঠে উত্তর দিলে,—বলছি, তুমি একটু বাইরে গিয়ে বোস।

বাপ্ !—বলে ঘরের কোণে হরিয়া হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে তাড়াতাড়িতে ষ্টোভের বাটিতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী স্পিরিট ঢেলে দিয়েছিল ; বাটি থেকে তা উপচে পড়েছিল ষ্টোভের গায়ে ; পরে জলন্ত দেশলাই কাঠির ছোঁয়া লাগতেই সমস্ত ষ্টোভটাই দপ্ করে জলে উঠেছে। সেদিকে একবার চেয়েই অরুণাংশু ছুটে গিয়ে হরিয়ার গালের উপর ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিলে,—গাধা কোথাকার—এতদিনে ষ্টোভটা পর্য্যন্ত ধরাতে শিখিস নি !—বলতে বলতে নিজেই সে ষ্টোভের ধারে মাটিতে বসে পড়ল।

মহামায়াদেবী শঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন, সরে আয় রুণু—এ কি করছিস তুই ? পুড়ে মরবি যে !—

অরুণাংশু সরল না ; কিন্তু এতক্ষণ পর সুভদ্রার অসাড় দেহটা নড়ে উঠল। ষ্টোভ তখন দাউ দাউ করে জলছে—সমস্ত ঘরখানিই সেই আগুনের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সুভদ্রা চকিত দৃষ্টিতে একবার মহামায়াদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই দ্রুতপদে অরুণাংশুর কাছে গিয়ে শান্ত কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললে, সর তুমি,—আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

মুখ ফিরিয়ে সুভদ্রাকে দেখেই অরুণাংশুর চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে

খুশীর স্বরে বললে, আঃ—এসেছ তুমি! বেশ বেশ,--তুমিই তাহলে এদিকে দেখ। আমি—

উঠে তখনই ছুটে গিয়ে পর পর দুটি জানালাই সে বন্ধ করে দিলে; তার পর মহামায়াদেবীকে উদ্দেশ করে বললে, মা, তুমি একটু বাইরে গিয়ে বোস। যাও শীগগির!—

ইতিমধ্যে মহামায়াদেবীর মুখখানি বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মতই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল; তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন—অরুণ—

তাঁর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই অরুণাংশু নিজেও যেন হঠাৎ ঐ ষ্টোভটার মতই দপ্ করে জ্বলে উঠল।—তোমার অরুণ তো কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না; মা!—সে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে,—এই ঘরের মধ্যেই সে থাকবে; আর এত আড়ম্বর করে তোমরা যখন তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে এসেছ তখন সে যাবেও তোমাদেরই সাথে। এখন আধঘণ্টাখানিককাল তুমি দয়া করে বাইরে গিয়ে বোস। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

ইতিমধ্যে বাইরের সেই ভদ্রলোকটি দোরের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল; মহামায়াদেবীর মুখে উত্তর ফুটবার আগেই তিনি তাঁকেই উদ্দেশ করে অনুনয়ের স্বরে বললেন, আপনি বাইরেই এসে বসুন, বৌদি। ওঁর স্নান করাতে কত সময়ই বা লাগবে!—

যে কথাটা মহামায়াদেবীর মুখে এসেছিল তা আর তাঁর বলা হল না। নিজেকে সামলে নিলেন তিনি; শুধু ঘরের কোণে আনতমুখী সুভদ্রার দিকে একটিবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেই তিনি ক্ষিপ্রপদে বাইরে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই অরুণাংশু সশব্দে ঘরের দোর বন্ধ করে দিলে।

সুভদ্রার আসবার পর দশটি মিনিটও হয়তো হয় নি। অথচ এইটুকু সময়ের মধ্যেই এত সব ঘটনা ঘটে গেল। তার না আছে সঙ্গতি, না আছে সৌন্দর্য্য। যে তিনটি লোক নিয়ে এই কাণ্ড তাদের একজনও যেন সমস্ত ব্যাপারটিকে ভাল করে বুঝতেই পারলে না। অথচ মাত্র ঐ কটি মিনিটের মধ্যেই প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই প্রত্যেকের মন রীতিমত বিষিয়ে উঠল।

ঘরের মধ্যে তখন এক অস্বাভাবিক অবস্থা। জানালা আর দরজার সঙ্গে বাইরের আলোর প্রবেশের পথ প্রায় সব কটিই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভিতরটা

অন্ধকার ; কিন্তু জ্বলন্ত ষ্টোভের নীলাভ আলোকে সেই অন্ধকারই অনৈসর্গিক রকমে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। সেই আলোকে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে ;— দোরে পিঠ দিয়ে অরুণাংশু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তার দিকে পিছন ফিরে ষ্টোভের কাছে মাটিতে তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে আছে সুভদ্রা,— মাথাটা তার নীচের দিকে এত বেশী ঝুঁকে পড়েছে যে একরাশ কালো চুল ছাড়া তার মুখের কিছুই আর চোখে পড়ে না। আবছায়া আলোকে দুজনকেই মনে হয় দুই অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি। কারও মুখেই কোন কথা নেই,— শব্দের মধ্যে কেবল জ্বলন্ত ষ্টোভের একটানা সাঁ সাঁ শব্দ।

ঐ অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সুভদ্রাই প্রথমে কথা বললে। বোধ করি বা ফুটন্ত জলের দুএকটি ফোটা হঠাৎ তার গায়ে এসে পড়েছিল,—সে চমকে উঠে দাঁড়াল ; অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, আমার জল হয়ে গিয়েছে ; তুমি বিছানায় যাও।

অরুণাংশুও চমকে উঠল ; মুখ তুলতেই সুভদ্রার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে চোখ নামিয়ে নিলে। তার পর কতকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতই সে খাটিয়ার দিকে চলতে আরম্ভ করলে, কিন্তু দুপা এগিয়েই সে একটা জড়-পিণ্ডের মত একখানা চৌকির উপর বসে পড়ল।

আবার বসে পড়লে যে!—ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুভদ্রা বললে,—বিছানায় যাও। দরকার না থাকলেও নার্সের হাতের স্পাঞ্জিং আজ তোমায় নিতে হবে। আমায় যতখানি অপমান করবার তা তো তুমি করেইছ ; তার উপর আবার স্নানের নাম করে মাকে ঘর থেকে বিদায় করে দিয়ে নার্সকে নিয়ে ঘরের দোর বন্ধ করার পরেও নিজে অস্নাত থেকে আমার বাকি মুখটুকুতেও তোমায় আমি কালি মাখাতে দেব না।

অরুণাংশুর বিবর্ণ মুখখানি আরও বিবর্ণ হয়ে গেল ; অসহায়ের মত সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে শুকনো ঠোটদুটি শুকনো জিভ দিয়ে ভিজাবার চেষ্টা করতে করতে সে অস্ফুটস্বরে বললে, শুভা—

থাক্,—আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথাটা বলে সুভদ্রা তাকে থামিয়ে দিলে,— নাম ধরে আর ডাকতে হবে না,—নার্স বললেই চলবে।

—কিন্তু ও ছাড়া আমার যে আর উপায় ছিল না—

কি!—উপায় ছিল না?

না, ছিল না ; আমায় বিশ্বাস কর, তোমায় আমি ছোট করতে চাই নি।

নার্সকে নার্স বললে তাকে ছোট করা হয় না, তা আমি জানি।

সে কথা বলছি নে আমি—

কোন কথাই তোমায় বলতে হবে না। আমি তোমার কৈফিয়ত শুনতে চাই নি,—তুমি বিছানায় যাও।

শুভা,—বলতে অরুণাংশুর গলার স্বর কেঁপে গেল ; এমনভাবে সুভদ্রার মুখের দিকে সে তাকাল যে সুভদ্রা আবার একটা ধমক দিবার উপক্রম করেও কুণ্ঠিতভাবে থেমে গেল।

এইটুকুতেই উৎসাহ পেয়ে অরুণাংশু হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে সুভদ্রার কাছে এগিয়ে এল ; সনির্ব্বন্ধ স্বরে বললে, কোন পক্ষকেই তৈরী করবার সময় পাই নি আমি। কাল ছেলেমানুষি করে আমার কথাটা আমায় তুমি বলতেই দিলে না। আজও সময় থাকতেই সমস্ত সমস্যাটা তোমায় বুঝিয়ে বলবার জন্য তোমায় ডেকে আনতে আমি লোকও পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এমনি দুর্দ্দৈব যে তোমারও আসতে দেরী হয়ে গেল আর মা-ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই এখানে এসে পড়লেন। কাউকেই কথাটা বুঝিয়ে বলবার আগেই তোমাদের দুজনের যখন দেখা হয়ে গেল তখন মা'র অমন একটা প্রশ্নের উত্তরে তোমার আর কি পরিচয় দিতে পারতাম আমি।

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যে অবস্থা তার হয় কতকটা যেন তেমনি অবস্থা হল সুভদ্রার। তার চোখদুটি বিস্ফারিত হতে হতেই হঠাৎ নত হয়ে পড়ল।

অরুণাংশু আগ্রহের স্বরে আবার বললে, বল শুভা, একটা ভিন্ন যুগ আর ভিন্ন সমাজের অধিবাসিনী আমার এই মা'র বোধগম্য ভাষায় আর কি আমি বলতে পারতাম ?

ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে সুভদ্রা উত্তর দিলে, না, কি আর বলবে ! কারও কাছেই কিছু বলবার মুখ তো রাখ নি তুমি,—তোমারও নয়, আমারও নয়।

অরুণাংশু চমকে উঠল—যেন সপাং করে তার মুখের উপর একখানা চাবুক এসে পড়েছে। সুভদ্রার দিকে আরও একটু এগিয়ে এসে সে বললে, থাক্, শুভা, তুমি ভেবো না ; আমার ভুল আমি এখনই শুধরে নেব।

সুভদ্রা মুখ তুলে তাকাল, ভুরু বেঁকিয়ে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ স্বরে সে বললে, কি করবে, শুনি ?

মাকে সব কথাই আমি খুলে বলব।

কি বলবে?—বলবে যে আমি তোমার উপপত্নী?

ছিঃ!—

তবে কি বলবে?

বলব যে তুমি আমার স্ত্রী!

সুভদ্রা হঠাৎ উদ্ভ্রান্তের মত শব্দ করে হেসে উঠল; বললে, একটা মিথ্যে ঢাকবার জন্য আর একটা মিথ্যে বলবে? কিন্তু শেষের মিথ্যেটা আবার কি দিয়ে ঢাকবে? প্রমানই বা করবে কি দিয়ে? কোন দলীল, কোন অনুষ্ঠানের নজীর আছে তোমার?

অরুণাংশুর মুখে আবার যেন একখানা চাবুক এসে পড়ল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে দৃঢ় স্বরে সে বললে, কোন নজীরের দরকার নেই,—আমার মুখের কথাই যথেষ্ট।

পরিপূর্ণ উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সুভদ্রা আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দিলে, থাক্—তোমার মুখের কথার কদর যথেষ্ট জানা গিয়েছে। আর বাহাদুরি করতে হবে না।

অরুণাংশু বিবর্ণমুখে কয়েক সেকেণ্ড কাল চুপ করে থাকবার পর প্রায় আর্ত্ত কণ্ঠে বলে উঠল, শুভা, তুমি আমায় অবিশ্বাস করছ?

সুভদ্রা চকিতে একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেই আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে; মৃদু এবং অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে সে বললে, না, আমি কিছুই করছি নে; শুধু বলছি, তুমি বিছানায় যাও—দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু অরুণাংশু বিছানার দিকে একবার তাকিয়েও দেখলে না; সুভদ্রার কথাটাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই সে বললে, সত্যি বলছি তোমায়—মাকে আমি ফিরিয়ে দেব। আর কারও জন্যই তোমায় আমি ছাড়তে পারব না।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে তাকিয়ে গর্ব্বিত স্বরে সুভদ্রা উত্তর দিলে, আর আমার জন্য মা-বাপকে তুমি ছাড়বে,—না? কিন্তু তাহলে সুভদ্রাকে তুমি এখনও চেন নি। তার জন্য তোমায় মা-বাপ ছাড়তে অনুরোধ করবার আগে নিজে সে মরবে।

অরুণাংশু যেন ভয় পেয়েই দুপা পিছিয়ে গেল, পাশের চৌকির পিঠটা হাত বাড়িয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে সে আঁকড়ে ধরলে যেন নিজের দেহটার পতন নিবারণ করবার

জন্ত। মাটির দিকে চেয়ে পুরো একটি মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে; তার পর সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে সঙ্কল্পের দৃঢ় স্বরে সে বললে, তবে আমার সিদ্ধান্ত আর সমাজসংস্কার এবারের মত তোলাই থাকল, শুভা,—বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েই তোমায় আমি আমার আর আমার বাপ-মায়ের নিজের করে নেব। মাকে এক্ষুনি আমি খুলে বলব যে তোমায় আমি ভালবাসি আর তোমাকেই আমি বিয়ে করব।

সুভদ্রা উত্তর দিলে না; বিহ্বলের মত কয়েক সেকেণ্ডকাল অরুণাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে সে ষ্টোভের কাছে চলে গেল। যেন কিছুই ঘটে নি, এমনিভাবে কেৎলিটা ষ্টোভের উপর থেকে সে নামিয়ে নিলে; একটা গামলার মধ্যে গরম জল আর ঠাণ্ডা জল একত্র মিলিয়ে গামলাটা খাটিয়ার কাছে নিয়ে একখানা চৌকির উপর রাখলে; কুলুঙ্গি থেকে সাবান বের করলে, দড়ির আলনা থেকে তোয়ালেখানা টেনে নিয়ে চৌকির হাতলের উপর ঝুলিয়ে রাখলে। এমনিভাবে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করে সে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, এস তুমি,—আমার হয়ে গিয়েছে।

সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে অরুণাংশুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না,—একটু আগেই যে সুভদ্রাকে দেখে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল, এ যেন সে সুভদ্রাই নয়। উত্তেজনা বা বিরক্তির চিহ্নমাত্রও সে মুখে আর নেই,—আছে কেবল একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য। অরুণাংশু অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

একটু পরে সুভদ্রাই আগের চেয়েও শান্ত কণ্ঠে আবার বললে, বিছানায় শুতে না চাও, জামা খুলে ঐ চৌকিখানার উপরেই বোস। আমার জল এদিকে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

এবার ঢোক গিলে কুণ্ঠিত স্বরে অরুণাংশু বললে, কিন্তু আমার কথাটা—

তোমার কথা এখন থাক্,—সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললে,—যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে; আজ আর তোমায় কিছু করতে হবে না, কিছু বলতেও হবে না। কারও আজ মাথার ঠিক নেই। আজ তুমি গুছিয়ে কিছু বলতে পারবে না; মা বোঝা দূরে থাক্, শান্তভাবে কিছু শুনতেও পারবেন না। কাজেই যা করবার, তা বাড়ী গিয়েই করো!

না,—অরুণাংশু মাথা ঝেঁকে বলে উঠল,—বাড়ী আমি যাব না।

সুভদ্রার চোখ দুটি আবার জলে উঠল; ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে,

আমার মুখে আর কত কালি মাথাতে চাও তুমি? না, না,—ওসব পাগলামি আর নয়। বাড়ীতে তোমায় যেতেই হবে। এখন জামা ছেড়ে বিছানায় গিয়ে শোও।

প্রতিবাদ করতে অরুণাংশু যেন সাহসই পেলে না। সুভদ্রাও আর কোন কথা না বলে শয্যাগত রোগীর মতই সাবান-জল দিয়ে অরুণাংশুর গা মুছিয়ে দিতে লাগল। এই উপলক্ষেই অনেক দিন পর আজ আবার অরুণাংশুকে ভাল করে দেখতে পেলে সে। স্পষ্টই তার চোখে পড়ল—অরুণাংশু বড় বেশী রোগা হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ এক সময়ে হাতের কাজ বন্ধ করে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে মনের কথাটা সে বলেই ফেললে, দেখ, একটা কথা আজ এখনই আমায় দিয়ে যেতে হবে,—'না' বলতে পাবে না তুমি।

অরুণাংশু সবিস্ময়ে বললে, কি ?

বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ তুমি,—সুভদ্রা উত্তর দিলে,—বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসবার চেষ্টা করো না যেন। সেখানে অভাব তো কিছুরই নেই,—ভাল করে চিকিৎসা করিয়ো।

অরুণাংশুর চোখদুটি পড়ে ছিল সুভদ্রারই মুখের উপর ; একদৃষ্টে আরও কিছুক্ষণ সেই মুখের দিকেই চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ খপ্ করে সুভদ্রার একখানি হাত চেপে ধরে গাঢ়স্বরে সে বললে, আমার একটি কথার উত্তর তোমায় আগে দিতে হবে, সু,—আমায় তুমি ভুল বোঝ নি তো ?

না, ছিঃ!—বলে সুভদ্রা চমকে, ঈষৎ রাঙ্গা হয়ে উঠেই, তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিলে ; কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত, মৃদু স্বরে সে আবার বললে, আগে যদি তোমায় ভুল না বুঝে থাকি তবে আজও ভুল বুঝব না। কিন্তু ভুল যদি আগেই হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আজকের বোঝা বা না-বোঝায় কিছুই এসে যাবে না।

অরুণাংশু উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, তুমি ঠিক জেনো, শুভা, যে বাড়ীতে দুদিন থেকেই আমি এখানে চলে আসব।

সুভদ্রা উত্তরে মাথা নেড়ে বললে, না, তা করো না ; যা করবার, ওঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, ওঁদের মত নিয়ে তবে করো।

কিন্তু ওঁরা যদি অবুঝ হন ?—

সে সব পরের কথা পরেই হতে পারবে, বলতে বলতে সুভদ্রা উঠে দাঁড়াল ;—

অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বেশ স্পষ্ট করেই সে আবার বললে, এখন এ সব কথা থাক্। আমার হয়ে গিয়েছে,—তুমি কাপড় ছেড়ে জামা গায়ে দাও।

অরুণাংশুকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই সুভদ্রা তখনই দ্রুতপদে গিয়ে সশব্দে একটা জানালা খুলে ফেললে, তারপর আর একটা এবং তার পর বাইরের দিকের দরজাও। খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিশেষ কারও মুখের দিকে না চেয়েই সে বললে, আপনি ঘরে আসুন,—আমার হয়ে গিয়েছে। তার পর আবার অমনি ক্ষিপ্রপদে ছুটে গিয়ে বিপরীত দিকের দোর খুলে জলের গামলাটা হাতে তুলে নিয়ে সে ভিতরের প্রাঙ্গণে চলে গেল।

সে ফিরে এল মিনিট পাঁচেক পর। ততক্ষণে মহামায়াদেবী ভিতরে এসে বসেছেন। কিন্তু তাঁর দিকে না তাকিয়েই সুভদ্রা অরুণাংশুকে লক্ষ্য করে বললে, আমি এখন যাই।

অরুণাংশু উত্তর দিবার আগেই মহামায়াদেবী বললেন, ইস্—তোমার কাপড়-জামা যে একেবারে ভিজে গিয়েছে, নার্স। ও রুণু, তোর এখানে ছেড়ে পড়বার মত একখানা শুকনো কাপড় নেই?

সুভদ্রা চমকে তাঁর মুখের দিকে তাকাল; কিন্তু তখনই আবার মুখ ফিরিয়ে মৃদু স্বরে সে বললে, কিছু দরকার নেই। বাসায় গিয়েই আমি কাপড় ছাড়ব'খন।

তবে একটু দাঁড়াও বাছা,—বলে মহামায়াদেবীই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অরুণাংশু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, কি মা?—

উত্তরে শুধু 'আসছি' বলেই মহামায়াদেবী তখনই আবার বাইরে বেরিয়ে গেলেন; ফিরে এলেন মিনিটখানিক পর।

তার পর অরুণাংশু কিছু বুঝবার আগেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে মহামায়াদেবী বললেন, কি বলে যে তোমায় আমি ধন্যবাদ দেব, বাছা,—রোগে শুশ্রূষা করে তুমি আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলেছ—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। তবু তোমার প্রতি আমার নিজের একটা কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু আগে তো আমি সব কথা জানতাম না—তোমায় খুশী করে দেবার মত কিছু আমি সঙ্গে আনি নি। তবু যা আমার আছে,—তোমার পরিশ্রমের সামান্য একটু পারিতোষিক হিসাবে এইটুকু তুমি আজ নাও।

বলতে বলতে একখানা দশটাকার নোট বের করে তিনি সুভদ্রার সামনে টেবেলের উপর রাখলেন।

মহামায়াদেবীর কথা শুনতে শুনতে সুভদ্রা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু নোটখানার উপর চোখ পড়তেই তার নিষ্প্রভ চোখদুটি আগুনের দুটি শিখার মতই ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল। নোটখানা টেবেলের উপর থেকে তুলে তখনই মহামায়াদেবীর পায়ের কাছে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে গর্ব্বিত, দৃপ্ত কণ্ঠে সে বললে, আমরা নার্স,—কাজ করে আমাদের ন্যায্য মজুরি আমরা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নি, কিন্তু বখশীষ নিই নে। আমার মজুরি আমি বুঝে পেয়েছি। আপনার দয়ার দান ঐ বখশীষ আপনি আর কাউকে দেবেন। আচ্ছা আসি,—নমস্কার।

বলেই তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তখন বেলা পড়ে এসেছে ; পথের দুধারে মেলা জমে উঠেছে আরও জমকালো হয়ে। নূতন দোকান এসেছে আরও কয়েকটি। কেবল মাটিতে চাটাইএর উপর মালপত্র বিছিয়ে দিয়েই তাদের প্রদর্শনের সখ মিটে নি---পিছনে দড়ি টাঙিয়ে তারও উপর তারা রকমারি কাপড়-চোপড় ভাঁজ ভেঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছে। চারিদিকেই সমারোহ—অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য কারও চেষ্টার বিরাম নেই।

কিন্তু কিছুই সুভদ্রার চোখে পড়ল না, কিছুই তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলে না। কোন দিকে না চেয়ে, কারও সঙ্গে একটি কথাও না বলে সে বড় রাস্তা পার হয়ে ময়দানের ভিতর দিয়ে সোজা নিজের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। রান্নাঘরের দোর খুলতেই রান্নার সব আয়োজন আবার তার চোখে পড়ল ; কিন্তু একবারের বেশী সেদিকেও সে চেয়ে দেখলে না। গায়ের ভিজা কাপড়খানা পর্য্যন্ত না ছেড়ে একগ্লাস কুঁজোর জল ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলে শোবার ঘরে গিয়ে সে দোর বন্ধ করে দিলে। তার পর চৌকি একখানা জানালার কাছে টেনে নিয়ে ওরই উপর বসে খোলা জানালা দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকাল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই।

পরিষ্কার দিন। আকাশ উজ্জ্বল নীল,—যতদূর চোখ যায় কোথাও একটুকরা হাল্কা, সাদা মেঘ পর্য্যন্ত নেই। শীতের রৌদ্রে দশদিক উদ্ভাসিত। দূরে বড় বড় গাছের সবুজ মাথাগুলি সোণালী রৌদ্রে ঝলমল করে জ্বলছে,—নীচে চলেছে আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বড় রাস্তার অনেকখানি চোখে

পড়ে। সেখানে সমারোহের অন্ত নেই। মেলা ক্রমশঃ আরও ঘন, আরও বিচিত্র, আরও মুখর হয়ে জমছে। থেকে থেকে এক একখানা বাস্ দশদিক কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। রিক্সার ঘণ্টার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভেঁপো বাঁশীর আওয়াজ বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু এর কিছুই আজ সুভদ্রার চোখে পড়ল না, কোন শব্দই তার কানে গেল না। দূরের পথের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে অনেকক্ষণ সে পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফোঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

জীবন চলে। নটিনীর মত নেচে নেচে, তটিনীর মত এঁকে বেঁকে, কখনও এগিয়ে, কখনও পিছিয়ে গতিশীল এই জগৎটার মতই সে ছুটে চলে। সে চলার বিরাম নেই। দুর্ব্বার তার জয়যাত্রা। হিমালয়ের মত বাধাকেও সে অবহেলায় অতিক্রম করে যায়; অসীম শূন্যের নিরাবয়ব নীলিমার উপর ভর দিয়েই ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর লোকে লতিয়ে ওঠে; নীবিড় অন্ধকারের বুক চিরে আলোকের অবরুদ্ধ উৎসকে মুক্ত করে দেয়; মৃত্যুর মুখ থেকেই অমৃতের পাত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে।

সে হারও মানে না, থামতেও জানে না।

মানুষকে নিয়ে বিচিত্র তার লীলা। যেমন তার দাবী, তেমনি আবেদন। বাইরে আকাশে-বাতাসে তার মদির আবেদন ছড়িয়ে রয়েছে; ভিতরে উষ্ণ রক্তের আলোলিত নৃত্যছন্দে নিরন্তর ঝঙ্কৃত হচ্ছে তার অনমনীয় ও অপূরণীয় দাবী। সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু, আশা-নিরাশার নাগরদোলায় দোলাতে দোলাতে মানুষকে নিয়ে নিরন্তর সে নিরুদ্দেশের পথে ছুটে চলেছে।

গতিই তার ধর্ম্ম। তার যে ঝড় নির্ম্মম আঘাতে উদ্ধত মাথাটিকে মাটিতে লুটিয়ে দেয়, তাই আবার সামনের দিকে এগিয়েও নিয়ে চলে।

অসীম তার শক্তি, দুর্জ্জেয় তার রহস্য। তার যে হাত অবলীলাক্রমে শাণিত খড়্গ হানতে পারে, সেই হাতই আবার পরম স্নেহে বিস্মৃতির সুধাপাত্রও ঠোঁটের কাছে বয়ে নিয়ে আসে।

এ যেন জননীকে নিয়ে দুর্দ্দান্ত, অবোধ শিশুর অন্তহীন ক্রীড়াকৌতুক। যে হাত

দিয়ে শিশু আঘাত করে, সেই হাত দিয়েই সে আবার গলাও জড়িয়ে ধরে ; যে দাঁত দিয়ে হয়তো বা নাকের ডগায় কামড়ে রক্ত ঝড়িয়ে দেয়, সেই দাঁতকটি দিয়েই আবার হেসে সে অঙ্কুরস্তধারায় সঞ্জীবনী সুধাও বর্ষণ করতে থাকে। মধ্যাহ্নের শান্ত অবসরের মুহূর্ত্তে শ্রান্ত দেহ যখন এলিয়ে পড়তে চায়, অথবা দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় দুই চোখ যখন জলে ভরে ওঠে, তখনও দুর্দ্দমনীয় শিশু ভোলানাথের মতই সে দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে এসে বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,—হাসি ও কান্নার তরঙ্গ তুলে ঝঞ্ঝার মত, বন্যার মত, নির্ম্মম আঘাতে স্থিতিকে ছিন্নভিন্ন করে গতির প্রবাহে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

জীবনের দুর্ব্বার স্রোত সুভদ্রাকেও এগিয়ে নিয়ে চলল।

বিছানায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা সে জানতেও পারে নি। ঠিকা ঝির ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে সে যখন দোর খুলে দিলে তখন সন্ধ্যা হয় হয় অবস্থা। তাকে দেখেই ঝি উদ্বেগের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, এ কি দিদিমণি —আজও যে হেঁসেল অমনি পড়ে আছে!

সুভদ্রা কুণ্ঠিত, মৃদু স্বরে উত্তর দিলে, রাঁধবার সময় করতে পারি নি ঝি,—হাতে এত কাজ ছিল—

কাজ না ছাই!—ঝি মুখ কালো করে বললে,—আর কাজ আছে বলে নাওয়া-খাওয়াও ছাড়তে হবে নাকি? এত অনিয়ম করলে শরীর টিকবে কেন?

সুভদ্রা উত্তর না দিয়ে মুখ ধোবার অছিলায় স্নানের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করলে; ফিরে এল একেবারে স্নান সেরে।

ঝি আবার কাছে এসে বললে, তা দিদিমণি, রান্নাটা না হয় আমিই করে দিয়ে যাই আজ—ওবেলায় যখন তোমার খাওয়া হয় নি—

না, তার দরকার নেই,—এবারও সুভদ্রা কুণ্ঠিত স্বরেই উত্তর দিলে,—তবে তুমি বরং আমার উনোনটা ধরিয়ে দিয়ে যাও।

রাঁধতে হল, খেতে হল, বিছানায় গিয়ে শোবার পর এক সময়ে ঘুমও এসে গেল।

পরদিন তার ঘুম ভাঙল খুব ভোরেই। কিন্তু প্রথমেই তার মনে পড়ল যে অরুণাংশু আজ আর এখানে নেই। আগের দিনের প্রত্যেকটি ঘটনাই একে একে তার মনে পড়তে লাগল। সব মিলে সে যেন প্রাকৃতিক একটা বিপর্য্যয়,—তেমনি আকস্মিক, তেমনি ভয়ঙ্কর। উঠি-উঠি করেও তখনই সুভদ্রা বিছানা ছেড়ে উঠতে

পারলে না। তার দেহ ও মন দুইই অত্যন্ত ক্লান্ত। তার মনে হতে লাগল যে কালবৈশাখীর প্রবল একটা ঝড় এসে তাকে একেবারে ভূমিসাৎ করে দিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে উঠতেই হল। মুখ-হাত ধুয়ে সে যখন জানালার কাছে এসে দাঁড়াল তখন চারদিক রোদে ছেয়ে গিয়েছে।

তার মনে পড়ল যে তাকে হাসপাতালে কাজে যেতে হবে।

কিন্তু তার আগেই তার বাসায় এসে উপস্থিত হল সুবোধ।

সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়েই ব্যস্ত হয়ে সে বলে উঠল, আপনার কি অসুখ করেছে, সুভদ্রাদেবী ?

কৈ—না তো,—সুভদ্রা এক পা পিছনে সরে গিয়ে কুণ্ঠিত মুখখানি নত করে উত্তর দিলে ; কিন্তু তখনই আবার মুখ তুলে বেশ দৃঢ় স্বরেই সে আবার বললে, না, বেশ ভালই তো আছি আমি,—সারা রাত এমন ঘুমিয়েছি।—

সুবোধের বিশ্বাস হল না, কিন্তু প্রসঙ্গটিকে সে টেনে বাড়ালেও না। একটু ইতস্ততঃ করেই সে সোজা কাজের কথাটারই অবতারণা করলে।

—শ্যামাচরণদার জামিনের ব্যবস্থা করতে শ্রীরামপুর যাব বলে বেরিয়েছি। কিন্তু জানেন তো,—এ সব হল টাকার খেলা। এক্ষেত্রে সেই অতি-প্রয়োজনীয় জিনিষটি সরবরাহ করবে কে ?

কেন,—সুভদ্রা একটু যেন বিস্মিত হয়েই বললে,—টাকা দেবে ইয়ুনিয়ন।

সে সম্বন্ধে বেশ একটু সন্দেহ আছে আমার,—সুবোধ অল্প একটু হেসে বললে,—মানে, শ্যামাচরণদা তো আর জনযুদ্ধের দলে গিয়ে ভিড়ে নি, তাই। তাছাড়া, ইয়ুনিয়নের কোন কাজের জন্যও তো সে গ্রেপ্তার হয় নি! তার পক্ষসমর্থনের জন্য ইয়ুনিয়ন টাকা যদি মঞ্জুর না করে ?—

না করলেই হল আর কি!—সুভদ্রা বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই উত্তর দিলে,—না হয় চুরির দায়েই সে গ্রেপ্তার হয়েছে,—কিন্তু সে তো মিথ্যে অভিযোগ। সহকারী সম্পাদকের এই বিপদের সময় ইয়ুনিয়ন তাকে এই সাহায্যটুকু করবে না ? নিশ্চয়ই করবে। তার মামলার খরচ কমিটি থেকে আমিই মঞ্জুর করিয়ে দেব।

সুবোধ এবার সুভদ্রার চোখের দিকে চেয়ে বললে, সে তো পরের কথা,—কিন্তু নগদ টাকা আজই কিছু না পেলে আমি যে কিছুই করতে পারব না!—

ও—তা বটে!—বলতে বলতে সুভদ্রা লজ্জিতভাবে চোখ নামিয়ে নিলে,—কথাটা আমার মাথায়ই ঢোকে নি।

তার পরেই চোখ তুলে সে আবার বললে, তা সেজন্যও আপনি ভাববেন না সুবোধবাবু। কাজ চালাবার মত টাকা আমিই আগাম দিচ্ছি।

সুভদ্রার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সুবোধ তখনই শ্রীরামপুর চলে গেল; ফিরে এল সন্ধ্যার একটু আগে। তার সঙ্গে শ্যামাচরণ।

তাকে দেখে সুভদ্রার ম্লান মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে আঃ—এসেছ তুমি!—

শ্যামাচরণের মুখে-চোখেও হাসি দেখা দিল; সে বললে, হ্যাঁ দিদিমণি।

সুভদ্রার প্রতি শ্যামাচরণের অগাধ শ্রদ্ধা, আর মমতাও তেমনি গভীর। সুভদ্রার কাছ থেকে সে অনেক কিছু পেয়েছে, কিন্তু সুভদ্রাকে দিয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে নিজের সঙ্গে সুভদ্রার সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য বেশী থাকলেও এই আত্মীয়স্বজনহীনা মেয়েটিকে সে নিজের পরম আত্মীয়ার মতই ভাল না বেসে পারে নি। কাজেই প্রয়োজনের সম্বন্ধটাই কালে মধুর হয়ে জমে উঠেছে। সে সম্বন্ধ অনেকটা যেন পিতাপুত্রীর—যদিও অন্য দশজনের মত শ্যামাচরণও সুভদ্রাকে 'দিদিমণি' বলেই ডাকে। সুভদ্রা শ্যামাচরণকে ডাকে শ্যামাচরণদা।

—তোমাকে দেখে কি খুশীই যে হয়েছি, শ্যামাচরণদা,—সুভদ্রা তার মুখের দিকে চেয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে,—এই তো মোটে তিন-চারদিন তুমি এখানে ছিলে না,—তবু মনে হচ্ছিল যেন এক যুগ।

আমারও তাই মনে হচ্ছিল, দিদিমণি,—শ্যামাচরণও হাসিমুখে উত্তর দিলে।

আর এদিকে তো তোমার অভাবে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড আর কি!—সুভদ্রা ফিক্ করে হেসে বললে। সারদাকে তার মনে পড়ে গেল; মনে পড়ল তার রাগ, তার অভিমান, তার চোখের জল,—সে রাত্রের আগাগোড়া সম্পূর্ণ ঘটনাটি। হাসতে হাসতেই সে আবার বললে, এদিকে কাজকর্ম্ম সব বন্ধ—সে জ্বালা তো আছেই। তার উপর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি নে,—সবাই বলে আমারই কুমন্ত্রণায় পড়ে শেষে তোমায় জেল খাটতে হল। এখন তোমায় দেখে ধড়ে প্রাণ এল যাহো'ক। তার পর,—জেলে ছিলে কেমন শ্যামাচরণদা? মনে হচ্ছে যেন বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ তুমি।

না তো, দিদিমণি,—শ্যামাচরণ প্রতিবাদ করে বললে,—বেশ ছিলাম সেখানে। তিন বেলা পেট পুরে গরম ভাত খেতে পেতাম, আর পড়ে পড়ে কেবল ঘুমোতাম। এখন মনে হচ্ছে যে জামিন না হলেই ভাল ছিল—বাইরে যা ঝঞ্ঝাট :—

কেন শ্যামাচরণদা?—সুভদ্রা সকৌতুক স্বরে বললে,—বৌদি ঝাঁটাপেটা করেছে নাকি?

শ্যামাচরণও হেসেই উত্তর দিলে, সে আমাকে ঝাঁটাই মারবে, দিদিমণি। তবে রক্ষা এই যে, এখনও সুযোগ পায় নি—দেখা তো হয় নি এখনও।—

ওমা!—সুভদ্রা চমকে উঠে উদ্বিগ্ন স্বরে বললে,—সে কি কথা! এখনও বাড়ী যাও নি তুমি? না, এ তোমার ভারি অন্যায় শ্যামাচরণদা। ওদিকে বৌদি যে তোমার জন্য অন্নজল পরিত্যাগ করে পড়ে রয়েছে!—না, না,—আর একটি কথাও এখন নয়,—তুমি শীগগির আগে বাড়ী যাও। কথাবার্ত্তা সব কাল হবে।

শ্যামাচরণ যখন নিজের ঘরে গিয়ে পৌছল তখন সারদা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালবার আয়োজন করছে। গোধূলীর অস্পষ্ট আলোকে শ্যামাচরণকে দেখে প্রথমটা সে যেন নিজের চোখদুটিকেই বিশ্বাস করতে পারলে না। মেঝের উপর যেমন সে বসে ছিল তেমনি বসে থেকেই অবাক হয়ে শ্যামাচরণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

দেখে পরিহাসের লোভ সামলাতে না পেরে শ্যামাচরণ মুচকি হেসে বললে, অমন করে চেয়ে রইলে কেন? মরে ভূত হয়ে আমি তোমায় ভয় দেখাতে আসি নি;—আমি জলজ্যান্ত শ্যামাচরণ—কানুনমাফিক জামিন দিয়ে জেল থেকে খালাস হয়ে এসেছি।

রাম রাম!—মধুসূদন মধুসূদন!—বলতে বলতে সারদা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল; দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করলে সে; তার পর এগিয়ে এসে শ্যামাচরণের পায়ের কাছে টিপ্ করে প্রণাম করে তার পায়ের ধুলা মাথায় তুলে নিলে।

কর কি বউ!—বলে শ্যামাচরণ শশব্যস্তে দুপা পিছনে সরে গেল।

সারদা উত্তর দিলে না। কিন্তু উঠে যখন সে দাঁড়াল তখন তার মুখের চেহারা বদলে গিয়েছে। শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে অস্ফুট, কম্পিত স্বরে সে বললে, সর্ব্বনাশের কিছুই তো বাকি রাখ নি তুমি!—তবু আমার চরম সর্ব্বনাশটুকু না করতে পারলে তোমার কি সাধ মিটবে না?

শ্যামাচরণের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল ; থতমত খেয়ে সে বললে, কেন—কি হয়েছে ?

এই ভর সন্ধ্যেবেলায় অমন অলক্ষুণে কথা কেউ মুখে আনে নাকি ?—বলতে বলতে সারদা ঝর ঝর করে কেঁদেই ফেললে ।

আরও কয়েক সেকেণ্ডকাল সারদার মুখের দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে থেকে শ্যামাচরণ অবশেষে হো হো করে হেসে উঠে বললে, শোন কথা !—বললেই কিছু হয় নাকি ? ঠাকুরদেবতারা কি এতই বোকা যে একটা তামাসার কথাও বুঝতে পারবেন না ? চল চল,—ঘরে চল, লোকে দেখলে কি ভাববে, বল তো ?

অনেকক্ষণ অনেক চেষ্টার পর সারদার চোখের জল যদিও বা থামল, তার মুখের কথা আর থামতে চায় না । প্রশ্ন করে করে শ্যামাচরণকে সে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে,—জেলে এতদিন সে কেমন ছিল, কি খেতে দিত সেখানে, তাতে পেট ভরত কি না, মারধর করত না তো—এই সব । শ্যামাচরণ কতক প্রশ্ন হেসে উড়িয়ে দিলে, কতকগুলির জবাব দিলে, তার পর বিরক্ত হয়ে বললে, ভাল আপদ ! ঢেকী স্বর্গে গিয়েও কেবল ধানই ভানবে নাকি ? জেলের বাইরেও জেলকে তুমি ভুলতে দিবে না দেখছি ! কদিন জেল খেটে বাড়ী এলাম—কোথায় ভালমন্দ দুটি খেতে দেবে, না তোমার জেরাই শেষ হয় না । এদিকে খিদেয় পেট যে আমার জ্বলে গেল !—

সারদা অপ্রতিভ হয়ে উঠে দাঁড়াল ; একবার বললে, এই দিই ; কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ম্লান করে বিষন্ন স্বরে সে আবার বললে, কিন্তু তোমায় আরও একটু বসতে হবে । ঘরে তো কিছুই নেই—বাজার থেকে কিনে আনতে হবে ।

তখনই কুলুঙ্গির মধ্যে খোঁজাখুঁজি সুরু হয়ে গেল ; আর হাতের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগল সারদার মুখ,—কোথায় যে গেল হতচ্ছাড়াটা—সাত দিন তার টিকিটি দেখবার জো নেই,—ছেলে তো নয়, আমার জন্মজন্মের শত্তুর,—আর মেয়েটিও দেখাদেখি ঠিক ঐ রকমেরই হচ্ছে । হবেই বা না কেন ?—যেমন রক্ত, সেই রকমেরই হবে তো !—

শ্যামাচরণ কিছুই বুঝতে পারছিল না, কিছুক্ষণ পরে সে বলেই ফেললে, আবার কি হল তোমার ? অত খুঁজছই বা কি ?

খুঁজছি আমার মাথা আর মুণ্ডু,—সারদা মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলে,—এত করে

লুকিয়ে রেখেছিলাম একটা আধুলী আর একটা সিকি। এখন দেখছি সিকিটি গিয়েছে। গিয়েছে আর কি—তোমার গুণধর পুত্রই সরিয়েছে।

শ্যামাচরণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। একটু পরে সারদাই আবার বললে, কিন্তু দেখ তো তার আক্কেলটা! সেই দুপুরে খেয়ে বেরিয়েছে—এখনও ফিরবার নামটি নেই। খাবারটুকু এখন আমি কাকে দিয়ে আনাই?

দাও না, আমি নিজেই নিয়ে আসছি,—বলতে বলতে শ্যামাচরণ উঠে দাঁড়াল।

সারদা বললে, না, তার দরকার নেই; তুমি বোস, আমিই ব্যবস্থা করছি;—বলে শ্যামাচরণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও নিজেই সে দোকানে চলে গেল।

এক হাতে খাবারের একটা ঠোঙ্গা এবং আর এক হাতে তারার হাত ধরে সারদা ফিরে এল মিনিট পনর পর।

দেখ, তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখ,—শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে রুক্ষ কণ্ঠে সে বললে,—গিয়েছে সেই পথে—কোন দিন যে গাড়ীচাপা পড়ে মারা যাবে!—

পিতা ও পুত্রীর মিলনের তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসের নীচে শুধু কৈফিয়তের প্রয়োজন মাত্রই নয়, অভিযোগের অনুচ্চারিত কথাগুলিও পরমুহূর্ত্তেই চাপা পড়ে গেল। বাপকে দেখেই তারা ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে; মেয়েকে বুকে চেপে শ্যামাচরণ বললে, এস মা, এস,—আমি যে কখন থেকে তোমায় খুঁজছি!—

মেয়ে উত্তর দিলে অভিমান করে,—জেল থেকে আমার জন্য কি এনেছ বাবা?

শ্যামাচরণ তার দুগালে দুটি চুমো খেয়ে বললে, এই।

হ্যাঁ—খালি এই বুঝি!—তারা ঠোঁট ফুলিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে,—মা বলেছিল তুমি কত কিছু আমার জন্য নিয়ে আসবে!—

হ্যাঁ—বলেছিলাম বই কি!—সারদা ধমক দিয়ে মেয়েকে থামিয়ে দিলে,—সর এখন—ওঁকে খেতে দে আগে।

কাঁসার থালায় দোকানের পুরী-তরকারি এবং দুরকমের দুটি মিষ্টি স্বামীর সামনে এগিয়ে দিয়ে সারদা আবার বললে, তুমি এটুকু মুখে দিয়ে আগে জল খাও—কথাবার্ত্তা পরেও বলতে পারবে।

শ্যামাচরণ বেশীর ভাগ খাবার তারাকেই খাওয়ালে। নিজে দুএক টুকরা মুখে দিয়েই ঢক্ ঢক্ করে এক ঘটি জল খেয়ে সারদার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে

বললে, আর কিছুর জন্ত যদি না-ও হয় বৌ, তবু কেবল তোমার এই জলখাবারের লোভেই বার বার জেলে যেতে সাধ হয় আমার। বাপ্‌—এমন মণ্ডা-মিঠাই দিয়ে আগে কস্মিনকালেও তুমি তো আমায় জল খাওয়াও নি!—

মিথ্যুকের কথার জবাব দিই নে আমি,—বলে সারদা হাসি গোপন করবার জন্ত অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

শ্যামাচরণ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এ কথাটা যদি মিথ্যেই হয়ে থাকে তবে একটা সত্যি কথা বলছি, শোন। মুগের ডালের খিচুরী আগে অনেকদিন তুমি আমায় রেঁধে খাইয়েছ। আজ যদি সেই জিনিষটি আবার রাঁধ তবে এই শীতের রাতে গরম ঘি দিয়ে আমার মুখে খুব ভাল লাগবে।

সারদা মুখ ফিরিয়ে আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি বলছ?—খিচুরী খেতে চাও তুমি?

শ্যামাচরণ হাসিমুখে উত্তর দিলে, চাই বলেই তো বললাম। কিন্তু তোমায় খিচুরী রাঁধবার অবসর দেবার জন্ত এখন আমি একটু বাইরে বেড়াতে যাব। কারও সাথে এখনও তো দেখা হয় নি আমার!

এমনি করেই তখনকার মত যে কথাটা চাপা পড়ে গেল তারই সূত্র ধরে গভীর রাত্রে সারদা স্বামীকে আবার জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ গা,—সত্যি বলছ তো—তোমায় আবার জেলে নিয়ে আটকাবে না?

শ্যামাচরণ উত্তর দিলে, না বোধ হয়,—উকীল তো জোর করেই বললে যে মামলা টিকবে না।

সারদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর আলগোছে স্বামীর গায়ের উপর ডান হাতখানা রেখে অনুনয়ের স্বরে বললে, দেখ, একটা কথা আমার রাখ। জীবনে অনেক তো করলে,—এবার এসব ছাড়।

শ্যামাচরণ উত্তর দিলে না, ভিতরে ভিতরে সে খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

সারদাই আবার বললে, চুপ করে রইলে যে?

কুণ্ঠিত স্বরে শ্যামাচরণ বললে, কি বলব?

এ সব এবার ছাড়লে হয় না? বয়সও তো কম হল না!—

একটি নিশ্বাস ফেলে শ্যামাচরণ উত্তর দিলে, কি ছাড়তে বলছ, বৌ? জীবনে অন্যায় তো আমি একটাও করি নি!—

সারদা বললে, তা জানি,—জানি বলেই তো এত দুঃখ সইতে পেরেছি। কিন্তু আর তো পারি নে!

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে, দেখ, আমার নিজের জন্য তোমার আমি কিছু বলছি নে। কিন্তু এই যে গুড়োদুটো রয়েছে, তাদের মুখের দিকেও কি তুমি চেয়ে দেখবে না?

শ্যামাচরণ একটু দেরীতে উত্তর দিলে; মৃদু স্বরে সে বললে, আমি চেয়ে দেখলেও কোন লাভ হবে না। মজুরের ছেলে-মেয়ে এইরকমই হয়।

উদগত দীর্ঘনিশ্বাসটি সযত্নে চেপে গেল সারদা; তার পর বললে, দেখ, একটা কথা অনেক দিন আমার মনে উঠেছে,—আজ বলি, শোন। এই মামলাটা চুকে গেলে চল আমরা দেশে ফিরে যাই। সেখানে কিছু জমিজমা এখনও তো আমাদের আছে—তাতেই দুঃখে-কষ্টে আমাদের দিন চলে যাবে।

শ্যামাচরণ সারদার দিকে পাশ ফিরে বেশ একটু উৎসাহের স্বরেই বললে, বেশ তো,—সে তো খুব ভাল কথা। ওদের দুজনকে নিয়ে তুমি না হয় দেশেই গিয়ে থাক।

আর তুমি?

আমি এখানেই থাকব,—আমার কি যাবার উপায় আছে!—

সারদার দেহটা হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল,—তার স্পর্শ থেকেই শ্যামাচরণ সেটা বুঝতে পারলে। কিন্তু সেটা নিতান্তই সাময়িক। প্রতিক্রিয়া সুরু হতে দেরী হল না এবং সেটা বেশ প্রবল হয়েই এল।

স্বামীর গায়ের উপর থেকে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে, নিজেও খানিকটা দূরে সরে গিয়ে সারদা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলে, আমি সেই কথা বলেছি নাকি? তুমি একা এখানে পড়ে থাকবে আর আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে গিয়ে সুখে বাস করব? ঝাঁটা মারি সে সুখের মাথায়!—

শ্যামাচরণের হাসি পেল; কিন্তু সেটা গোপন করেই সে বললে, তা রাগ করছ কেন, বউ? তুমি দেশে যাবার কথা তুললে বলেই না ও কথা আমি বলেছি!—

তা আমি কি আমার যাবার কথা বলেছি?—সারদা বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর দিলে,—আমি বলেছি, তুমি দেশে ফিরে চল।

শ্যামাচরণ গম্ভীর স্বরে বললে, না, তা হয় না,—এ জায়গা আমি ছেড়ে যেতে পারব না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সারদা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, তবে আর কি করব,—আমারও যাওয়া হবে না তাহলে।

শ্যামাচরণ উত্তর দিলে না; সারদাও চুপ করে রইল। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পর স্বামীর কাছাকাছি সরে এসে আবার তার গায়ের উপর ডান হাতখানি রেখে মৃদু কিন্তু গাঢ় স্বরে সে বললে, যত দুঃখই তুমি আমায় দাও না কেন, তবু তোমার কাছেই আমি পড়ে থাকব। তোমায় ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আমার সুখ হবে না।

শ্যামাচরণ কোন উত্তর না দিয়ে কেবল নিজের ডান হাতখানি সারদার গায়ের উপর তুলে দিলে।

(৩)

প্রথমে সুভদ্রা একেবারেই মুষড়ে পড়েছিল।

যা ঘটে গেল তা যেমন আকস্মিক, তেমনি ভয়ঙ্কর,—যেন একটা ভূমিকম্প।

বুকের মধ্যে মিলনের আনন্দ নীবিড় হয়ে জমে উঠেছে; ব্যাকুল হৃদয়ের সকল চাওয়ার অবসান হয়েছে একটা পরিপূর্ণ প্রাপ্তির মধ্যে; অথচ সেই সময়েই এল কি না নিদারুণ বিচ্ছেদ!—

অরুণাংশুর চলে যাওয়াটা অবশ্য সুভদ্রার কাছে নূতন কিছু নয়। আগেও কত বার সে হুগলী ছেড়ে গিয়েছে, যাবার আগে সুভদ্রাকে বলে পর্য্যন্ত যায় নি; একখানা চিঠি দিয়েও জানায়নি যে সে কোথায় আছে। তাতেও সুভদ্রা কখনও উতলা হয় নি। কিন্তু এবার সে যেন একেবারে এলিয়ে পড়ল।

তার কেবলই মনে হতে লাগল যে, অরুণাংশুর এবারের যাওয়াটা একেবারে আর এক জাতের;—এর পটভূমিকাটাই আলাদা, আর তা ভয়ঙ্কর।

যাবার আগের ছোট্ট ঘটনাটি বার বার সুভদ্রার মনে পড়ে; দুর্গাপ্রতিমার মত রূপবতী যে মহিলাটির পায়ের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধাভরে তার নিজের মাথাটিই লুটিয়ে পড়েছিল, তাঁরই দুই চোখের সংশয়কুটিল দৃষ্টি তীক্ষ্ণধার শূলের মত নিরন্তর যেন মর্ম্মস্থলে গিয়ে বিঁধতে থাকে; মনে পড়ে অরুণাংশু মায়ের কাছে যেদিন তার যে পরিচয় দিয়েছিল,—সে নার্স।

মনে পড়লেই রাগে সুভদ্রার সারা শরীরটা রি রি করতে থাকে; অথচ সঙ্গে সঙ্গেই অনির্দ্দিষ্ট একটা আশঙ্কায় তার বুক দুরু দুরু কেঁপে ওঠে।

—অরুণাংশুর মা-বাপ যদি তাকে পুত্রবধূ বলে বরণ করতে রাজী না হয়!—যদি অরুণাংশু তাঁদের কাছে সাহস করে সত্য কথা খুলে বলতে না পারে!—

কখনও বা সচেতন চিত্তের সমস্ত অনুশাসন উপেক্ষা করে, সকল বেড়া ডিঙিয়ে সব চেয়ে বড় আশঙ্কাটিও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে,—যদি অরুণাংশু নিজেই তাকে পরিত্যাগ করে,—যদি এখানে সে আর ফিরে না আসে!—

কিন্তু এ 'যদি' অতি ভয়ঙ্কর। ওটা তার মনের কোনও কোণে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেই যেন বিশ্বের সকল আলো, সকল সৌন্দর্য্য একসঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে যায়, পায়ের নীচে মাটি কেঁপে ওঠে, আর ঠিক যেন তার চোখের সামনেই অন্ধকার, অতলস্পর্শ একটা গহ্বর বিকট হাঁ করে তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়।

মুশকিল আরও যে বুকের ভিতরটা তুষের আগুনে জ্বলে খাক্ হয়ে যেতে থাকলেও মনের কথা কারও কাছে মুখ ফুটে বলবার উপায় নেই। চোখের জল চোখের মধ্যেই চেপে রেখে তাকে দশজনের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হয়; যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাবেই তাকে নিত্যনৈমিত্তিক সকল কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হয়।

বিপদের উপর বিপদ ঐ সুবোধ। তার কাছে সুভদ্রাকে করতে হয় রীতিমত অভিনয়। সেই প্রথম দিন ঝোঁকের মাথায় সুবোধকে সে বলে ফেলেছিল যে, অরুণাংশুর সাথে বিয়ে তার হয়েই গিয়েছে। অসতর্ক মুহূর্ত্তের সেই একটি উচ্ছ্বসিত উক্তির জের তাকে এখনও টেনে চলতে হচ্ছে। সে যে কি বিড়ম্বনা তা সে সেই-দিনই বুঝতে পেরেছিল। সেই জন্যই পরদিন অরুণাংশু তার মায়ের কাছেও আবার ঐ কথাটা বলতে চাইলে সে তাকে তা বলতে দেয় নি। সত্য হয়েও সে উক্তি মিথ্যা। সেই প্রথম দিনই মর্ম্মে মর্ম্মে সে বুঝতে পেরেছিল যে প্রমানহীন সত্যকে সত্য বলে ঘোষণা করা এ জগতে একটা মারাত্মক ভুল। কিন্তু সেই ভুলের মাশুলই আজও তাকে কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করতে হচ্ছে। যে কথাটা বলা হয়ে গিয়েছে, তা আর ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। তাই এখনও সুবোধের কাছে নিপুণা অভিনেত্রীর মতই তাকে দিনের পর দিন অরুণাংশুর বিবাহিতা স্ত্রীর ভূমিকাটুকু নিখুঁৎভাবেই অভিনয় করে যেতে হচ্ছে।

বেদনাক্লিষ্ট মন আর অকর্ম্মণ্য দেহ নিয়েও চোখের জল চোখের মধ্যেই চেপে

রেখে দিবানিশি এই সহজ জীবন, এই হাসিখুশীর অভিনয় করতে গিয়ে প্রথমে সুভদ্রা হাঁফিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু ঐ পথেই অবশেষে সে মুক্তি পেলে। অদৃষ্টের অভিশাপই যেন তার দিন যেতে না যেতেই দেবতার আশীর্ব্বাদ হয়ে উঠল। চারিদিকের ডাকাডাকিতে মন তার আত্মকেন্দ্রিকতার বিড়ম্বনা কাটিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

চলতে গিয়ে সে পেলে নিষ্কৃতি,—খেলতে গিয়ে পেলে মোহ।

বে-পরোয়া ভাবের অভিনয় করতে গিয়ে শেষে সত্য সত্যই সুভদ্রা যেন বে-পরোয়া হয়ে উঠল। অরুণাংশুর সম্বন্ধে মনে যে তার বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা নেই, তার বিরুদ্ধে একটুও ক্ষোভ বা অভিমান নেই, এই ভাবটা বজায় রাখতে গিয়ে হঠাৎ এক সময়ে তার মনে হল যে, এ রকম কিছু থাকবার সত্যি কোন কারণও নেই। যাবার দিনের সেই ক্ষুদ্র কিন্তু ভয়ঙ্কর ঘটনাটুকুই তো তার আর অরুণাংশুর সম্বন্ধের সমগ্র ইতিহাস নয়! অতীত যে তার সুখের স্মৃতিতে ভরা,—সে যে একটা নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ারই ইতিহাস! তাই ঐ শেষের দিনের ঘটনার স্মৃতিটাতে ঘা খেলেই তার আহত ও সন্ত্রস্ত মন ছুটে গিয়ে অতীতের সহস্র সুখস্মৃতির মধ্যে আশ্রয় নিতে লাগল। তার পর ক্রমশঃই তার মনে হতে লাগল যে, ঠিক যাবার দিনটিতেও অরুণাংশু যা তাকে দিয়ে গিয়েছে, তার মূল্যও নিতান্ত কম নয়। শেষে মনে মনে নিজেকে সে ভৎর্সনাও করলে, আশার প্রাসাদ গড়বার এত সব উপাদান বর্ত্তমান থাকতেও সে কি ছেলেমানুষের মতই না উতলা হয়ে উঠেছিল।—

তার পর আবার দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভেই একটা অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা তার ক্লিষ্ট মনটাকে বেশ জোরে জোরে দোল দিয়ে সজাগ ও সজীব করে তুললে।

যা কোন দিন ঘটে নি সেদিন তাই ঘটল,—সুভদ্রার বাসায় এল অতিথি।

সে তার বন্ধু কমলা। সে-ও নার্স। বাঙ্গালীর মেয়ে—একেবারে বাংলাদেশের; কিন্তু ধর্ম্মে খৃষ্টান। বাপ-মা-মরা মেয়ে পূর্ববঙ্গের কি একটা গাঁয়ে কাকার সংসারে মানুষ হয়েছিল। তার পর তার বিয়েও হয়েছিল রেলের এক কেরাণীর সঙ্গে। স্বামীর সঙ্গে সে সংসার করতে গিয়েছিল মোগলসরাই। ভালই ছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মাত্র ব্যবধানে পর পর স্বামী ও শিশুপুত্রকে হারিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে স্থানীয় এক খৃষ্টান মিশনের পরামর্শ ও সাহায্যে সে লক্ষ্ণৌএর হাসপাতালে ধাত্রী ও শুশ্রূষাবিদ্যা শিখতে

গিয়েছিল। সেখানেই সুভদ্রার সঙ্গে তার পরিচয়। সে পরিচয় অল্প দিনেই প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। কমলা বয়সে বছর পাঁচেকের বড় হলেও তাদের সম্বন্ধটা খুব তাড়াতাড়িই 'আপনি' থেকে 'তুমি'র ঘরে এগিয়ে এসেছিল,—শেষে তো একেবারে 'তুই'এর। পরে স্থানকালের ব্যবধানও তাদের সে বন্ধুত্বকে নষ্ট করতে পারে নি। দেখা যখন তাদের হত না, তখনও চিঠিপত্র চলত। সুভদ্রা যখন হুগলীর চাকরী নিয়ে পশ্চিম ছেড়ে চলে আসে তখন কমলা ঐ অঞ্চলেই একটা চাকরী করত। পরে সুভদ্রা জেনেছিল যে কমলা চাকরী ছেড়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করছে। সেই কমলাকে আজ হঠাৎ একেবারে নিজের দোরগোড়ায় দেখতে পেয়ে সুভদ্রার বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। কিন্তু তার আনন্দ তার বিস্ময়কেও ছাড়িয়ে গেল।

কমলা নিজেই বুঝিয়ে বললে, চলে এলাম, সুভদ্রা। ওখানে প্র্যাকটিসের মোটেই কোন সুবিধে হচ্ছিল না। শুনলাম যে, আজকাল কলকাতায় পথে-ঘাটে টাকার ছড়াছড়ি। তাই ভাবলাম যে, যাই,—কিছু কুড়িয়ে আনি গে। বাধা দেবার কেউ তো নেই—তাই যেমন মনে হওয়া অমনি দে ছুট। কলকাতায় এসেছি এই মোটে দিন সাতেক।

সুভদ্রা অবাক হয়ে ক্ষণকাল কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; তার পর অভিমানের স্বরে বললে, কি আশ্চর্য্য মেয়ে তুমি—এত বড় একটা ব্যাপারের খবরটুকু পর্য্যন্ত আমায় জানাও নি!—

কি দরকার!—কমলা হাসিমুখে উত্তর দিলে,—আগ্রা থেকে রওনা হবার আগের দিনই তোমায় একখানা চিঠি লিখেছিলাম; কিন্তু ডাকে দেবার আগেই নিজেই সেটা ছিড়ে ফেললাম। ভাবলাম যে সশরীরে তোমার বাসায় এসে একেবারে তোমায় তাক লাগিয়ে দেব।

তা, ভাই, সত্যি তাক্ লাগিয়ে দিয়েছ,—সুভদ্রা ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলে,—কিন্তু খুশী করেছ তার চেয়ে ঢের বেশী। সত্যি,—তোমায় দেখে কি আনন্দই যে আমার হয়েছে! কিন্তু—কলকাতায় তুমি উঠেছ কোথায়?

আপাততঃ নার্সদের একটা মেসে—সিষ্টার চারুশীলার নার্সিং হোম—বিবেকানন্দ রোডের উপর বেশ বড় বাড়ী। আসতে হবে তোমায় একদিন সেখানে। কবে আসবে?

কিন্তু কমলা,—প্রশ্নটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই সুভদ্রা হঠাৎ খাপছাড়া রকমের

উদ্বিগ্ন স্বরে বললে,—এ সময়ে তুমি কলকাতায় এলে কেন? কলকাতা শুনছি খালি হয়ে গেল। সবাই বলছে, বোমা পড়বে। আর তুমি কি না!—

ফুঃ!—কমলা সুভদ্রার কথার মাঝখানেই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে উঠল,—বোমা না আরও কত কি পড়বে! আর পড়লেই বা কি? অন্যের মাথায় যদি পড়ে তবে আমি পাব টাকা। আর আমার মাথায় যদি পড়ে, আমি খুশীই হব,—সব দুঃখকষ্ট একবারে ঘুচে যাবে।

না, ছিঃ!—সুভদ্রা শিউরে উঠে বললে,—কি যে বল তুমি!—

কমলার ব্যর্থ জীবনের শোচনীয় ইতিহাসটা তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়ে গেল। ম্লান হয়ে গেল তার মুখ।

কিন্তু কমলা কুটিল কটাক্ষে তার মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, কেন—মরতে আমি ভয় পাব কেন? তোমার মত আমার ঠোঁটের কাছে তো আর সুধার পাত্রটি তুলে ধরা নেই!—

তার পরেই দুই বাহু দিয়ে সুভদ্রার গলা জড়িয়ে ধরে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে সে আবার বললে, মাইরি বলছি, ভাই—তোর হবু-বরকে একবার দেখাতে হবে কিন্তু। সেই জন্যই এখানে আমার আসা।

সুভদ্রা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে ছোট একটি 'ধেৎ' বলে সজোরে নিজেকে মুক্ত করে নিলে এবং পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললে, এই যা—সব ভুলে বসে আছি। তুমি একটু বোস ভাই—আমি এক্ষুনি চা করে আনছি।

কিন্তু কমলা তার পিছনে পিছনে রান্নাঘরে ঢুকে বললে, ওমা!—তুমি নিজেই চা করবে নাকি?

লজ্জিত হাসিমুখে সুভদ্রা উত্তর দিলে, কেবল চা কেন—রান্নাও আমিই করব। ঠাকুর-চাকর আমার নেই,—কেবল একটি ঠিকা ঝি।

কেন—টাকা জমাচ্ছিস নাকি?

হ্যাঁ।

বাঃ—বেশ তো!—কমলা সশব্দে হেসে উঠে বললে,—বরও জুটিয়েছিস আবার এদিকে টাকাও জমাচ্ছিস। দুদিকেই লাভ করছিস দেখি!—

তার পর হাসি থামিয়ে সে আবার বললে, তবে এস,—আজ দুজনে মিলেই রাঁধা যাক্।

সুভদ্রা আপত্তি করলে ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হারই মানতে হল তাকে।

তার পর আরম্ভ হল দুজনের রাঁধাবাড়া আর ওরই সঙ্গে দুজনের গল্প। সে গল্পের না আছে সঙ্গতি, না আছে শেষ। কত দিন পর দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাক্ষাৎ হয়েছে,—উভয়েরই বুকের মধ্যে অতীতের সহস্র স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠল। পাঁচ-সাত বছর আগেকার জীবনের কত শত ছোটখাটো ঘটনার পুনরাবৃত্তি উপলক্ষে পরিণত-বয়স্কা দুটি বন্ধনহীনা রমণীর তরুণীসুলভ লঘু পরিহাসে আর প্রাণখোলা কলহাস্যে সুভদ্রার ছোট বাসাবাড়ীখানি থেকে থেকে মুখরিত হয়ে উঠতে লাগল।

গল্পের জোয়ারে গা এলিয়ে দিলেও একটা বিষয় সম্পর্কে সুভদ্রা কিন্তু আগাগোড়া সতর্ক হয়েই রইল। যে কথাটা বলবার তার প্রয়োজন ছিল সব চেয়ে বেশী সেই কথাটাই কমলাকে সে খুলে বলতে পারলে না। প্রথম থেকেই সে ঠিক করে রেখেছিল যে, সেদিন অতর্কিতে সুবোধের কাছে যে ভুল সে করে ফেলেছিল, কমলার কাছে কিছুতেই সে তার পুনরাবৃত্তি করবে না। সারাদিনই ঐ সঙ্কল্পে সে অটল হয়ে রইল। ইতিমধ্যে অরুণাংশুকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে তা-ও সে প্রকাশ করে বলতে পারলে না,—কোথায় যেন তার বাধ বাধ ঠেকতে লাগল।

তাই বৈকালের দিকে কমলা আবার যখন তার 'হবু-বরকে' দেখবার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করে দিলে এবং প্রশ্নটাকে সে কিছুতেই এড়াতে পারলে না, তখন সে অতি সংক্ষেপে বললে, তিনি এখানে নেই।

কোথায় গিয়েছেন ?

উত্তরে সুভদ্রা মনগড়া একটা জায়গার নাম করলে ; তার পর ঐ প্রসঙ্গটিকে ওখানেই শেষ করবার উদ্দেশ্যে নিজে থেকেই সে আবার বললে, ফিরে এলে খবর দেব,—তখন এসে দেখে যেয়ো।

কমলা মুচকি হেসে বললে, আসব—আলবৎ আসব। কিন্তু আজ আমি যে আগে এলাম তার রিটার্ণ ভিজিট কবে দেবে তুমি ? তোমায়ও একবার আমাদের মেসে আসতে হবে। কবে আসবে—বল।

কতকটা ক্ষুণ্ন, কতকটা কুণ্ঠিত স্বরে সুভদ্রা উত্তর দিলে, যেতে কি সাধ হয় না ভাই ? দুদিন বাইরে গিয়ে বিশ্রাম করতে পারলে নিজেই আমি বেঁচে যাই। কিন্তু অবসর পাই কোথায় ? আমার কাজ কি কম ? শোন তবে—

সন্ধ্যার একটু আগে সুভদ্রা কমলাকে কলকাতার বাসে তুলে দিলে।

সেদিন সুবোধকে দেখে অরুণাংশুও সত্য সত্যই খুশী হয়েছিল। রাজনৈতিক তর্ক সে উঠতেই দেয় নি। সুবোধের আশঙ্কাটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে প্রথমে সে জোর করে বলেছিল যে যুদ্ধের স্বরূপ সম্বন্ধে মতানৈক্য তাদের থাকলেও একই ইয়ুনিয়নের কর্ম্মক্ষেত্রে একত্র কাজ করার কোনই অসুবিধা হবে না; পরে বলেছিল যে দ্বন্দ্ব যা আছে তার মীমাংসা হবে সে নিজে ফিরে আসবার পর। শেষ পর্য্যন্ত সুবোধের কাছ থেকে সে প্রতিশ্রুতিই আদায় করে নিয়েছিল যে, সে নিজে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সুবোধ হুগলীতেই অপেক্ষা করবে; নিজের দলের তরফ থেকে নিজেও সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তার অনুপস্থিতিতে তার দলের কেউ জনযুদ্ধের প্রচারকার্য্যকে ইয়ুনিয়নের কাজের সঙ্গে একত্র মিলিয়ে সুবোধকে বিব্রত করবে না।

বিদায়কালে সুবোধের ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে বেশ জোরে চেপে ধরে হাসিমুখে অরুণাংশু বলেছিল, কিছু ভেবো না সুবোধ,—তোমার মতের স্বাধীনতা ও কর্ম্মের সুযোগ এখানে অব্যাহত থাকবে—অন্ততঃ আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তো নিশ্চয়ই।

কিন্তু অরুণাংশু চলে যাবার পর দুপাঁচ দিন যেতে না যেতেই সুবোধ বুঝলে যে গোড়ায় যে আশঙ্কাটা তার মনে জেগেছিল তা অমূলক মোটেই নয়,—এখানকার অন্নজল তার উঠেছে। সুভদ্রা তো গিয়েইছে, তার নিজের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া অমন যে মজদুর ইয়ুনিয়ন, তা-ও তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক,—সুবোধ স্পষ্টই দেখতে পেলে। সংগঠনের আকার বদলেছে, নূতন নূতন নিয়ম কানুনের প্রবর্ত্তন হয়েছে। ওর অনেক কিছুই সুবোধের ভাল লাগল না। কিন্তু যা তার বুকে সব চেয়ে বেশী বাজল তা হচ্ছে ইয়ুনিয়নের মধ্যে সংহতির অভাব। সুবোধ দেখলে যে তার অবর্ত্তমানে কর্ম্মীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে দলাদলির স্পৃহা। নূতন কর্ম্মী যারা এসেছে তাদের প্রায়-সকলেই এবং পুরাতন কর্ম্মীদেরও কয়েকজন যেন বিশেষভাবে একজোট। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীটাই যেন আলাদা। তারা যেন চিন্তা করে বিশেষ একটা পদ্ধতিতে, কথাও বলে যেন তাদের বিশিষ্ট নিজস্ব একটা ভাষায়। ঠিক তাদের নিজেদের সুনির্দ্দিষ্ট চক্রটির অন্তর্ভুক্ত যারা নয় তাদের সঙ্গে এদের খিটমিটি যেন লেগেই রয়েছে। ৮

সমস্যা যেমনি হউক না কেন তা নিয়ে অপরের সঙ্গে এদের মতান্তর হওয়া প্রায় অনিবার্য্য। কাজেই কার্য্যকরী সমিতির সাপ্তাহিক বৈঠক প্রায়ই হয় মেছোহাটা, নয় তো মোরগের কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়। দেখে শুনে সুবোধের মনে হতে লাগল যে তার অবর্ত্তমানে একটা ইয়ুনিয়নের মধ্যেই যেন আর একটা পৃথক ইয়ুনিয়ন গড়ে উঠেছে।

বিশেষ করে এরাই সুবোধের ফিরে আসা এবং থেকে যাওয়াটাকে যেন প্রীতির চোখে দেখতে পারলে না। সেটা যদি নিস্ক্রিয় একটা 'নেতি' ভাব মাত্র হত, তাহলে সুবোধ হয়তো সেটাকে উপেক্ষা করতে পারত,—হয়তো জিনিষটা তার চোখেও পড়ত না। কিন্তু সেটা প্রায় রাতারাতিই রীতিমত সক্রিয় হয়ে উঠল। সুবোধ বুঝতে পারলে যে এরা গোড়াতেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। সুবোধের প্রত্যেকটি গতিবিধি পর্য্যন্তও তারা যেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল,—পুলিশ যেমন সন্দেহভাজন লোকদের উপর চোখ রাখে, অনেকটা সেইরকম।

সুবোধের মনে হতে লাগল যে সে যেন ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছে।

অরুণাংশু যেদিন যায়, সেদিন বিমল ওখানে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু এক সপ্তাহ পুরতে না পুরতেই বিমল ওখানে ফিরে এল। তার পরেই অবস্থাটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল।

তার পর একদিনের সভায় খুব একটা অপ্রীতিকর ঘটনাই ঘটে গেল।

বলা নেই, কওয়া নেই,—বিমল সেদিন কার্য্যকরী সমিতির সভায় হঠাৎ একটা প্রস্তাব নিয়ে এল যার অর্থ ইয়ুনিয়নের তরফ থেকে এ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করা।

প্রথমে সুবোধ বিস্ময়ে একেবারে যেন বিহ্বল হয়ে গেল। কিন্তু তার পর সে উঠে দাঁড়াল প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে।

কিন্তু সে দুচার কথা বলতে না বলতেই বিমলের দলের একজন লোক বাধা দিয়ে বলে উঠল, সুবোধবাবু তো আমাদের কমিটির সদস্য নন,—এ সভায় কথা বলার ওঁর কি অধিকার আছে?

কথাটা নির্ম্মম, কিন্তু সত্য। অপ্রিয় একটা সত্য কথা এত নির্ম্মম করে বলা হল যে, প্রায় মিনিটখানিক কাল কারও মুখেই কোন কথা ফুটল না। স্বয়ং বিমলের পর্য্যন্ত মাথা হেট হয়ে গেল।

অবশেষে সুবোধ নিজেই ঐ অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে অল্প একটু হেসে বললে, ঠিক বলেছেন আপনি,—আমি চুপ করছি।

কিন্তু সভার সভাপতি ঘটনাটাকে অত সহজে হজম করতে পারলেন না। নিজে বিমলের লোক হলেও কুণ্ঠিত হয়েই সে বললে, সে কি কথা! আপনি বলুন, সুবোধ-বাবু। ভোটই না হয় আজ আপনার দেবার অধিকার নেই—মেম্বর যখন আপনি নন; কিন্তু আপনার মত পুরাতন একজন কর্ম্মীর কথা বলবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। আপনি বলুন, সুবোধবাবু,—সভাপতি হিসাবে আমি আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি।

তথাপি সুবোধ আগের মতই অল্প একটু হেসে কুণ্ঠিত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললে, না,—এ সভায় কথা বলবার অধিকার সত্যি তো আমার নেই!—

সুভদ্রা এতক্ষণ চুপ করে ছিল; কিন্তু আর থাকতে না পেরে দৃপ্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল,—কিন্তু আমার তো অধিকার আছে! আমিই বলি, শুনুন, বিমলবাবু,—আপনার এ প্রস্তাব আমরা কিছুতেই পাশ করব না।

সবাই চমকে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল। বিমল নিজে চমকে উঠল সব চেয়ে বেশী। খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা বিব্রত হয়ে সে অস্ফুট স্বরে বললে, কিন্তু এ তো একা আমারই মত নয়—অরুণদার মতও তো এই।

কিন্তু কথাটা শুনেই সুভদ্রা আগুনের মত জ্বলে উঠল; অধিকতর দৃপ্ত কণ্ঠে সে বললে, হলই বা আপনার অরুণদার এই মত। কিন্তু আমরা সবাই তো আর তাঁর গাধাবোট নই যে, তাঁরই পাছে পাছে আমাদেরও অবশ্যই ছুটতে হবে। আমাদের খুশী আমরা এ প্রস্তাব পাশ করব না।

তার পর মুখ ফিরিয়ে একাদিক্রমে উপস্থিত সব কজনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সে আবার বললে, আমার অনুরোধ, আপনারা সবাই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিন।

এর পর বিমল আর জেদ করবার সাহস পেলে না; প্রস্তাবটির আলোচনা সেদিনের মত স্থগিত থাকল।

কিন্তু সুভদ্রার উত্তেজনা ওতেও যে শান্ত হয় নি তার প্রমাণ সুবোধ পেলে সভা শেষ হবার অল্প একটু পরেই। পথে এসেই সুবোধকে সে বললে, আপনি কিছু মনে করবেন না, সুবোধবাবু। আজ যা আপনাকে শুনতে হয়েছে, তা এখানকার

মজদুরদের জনমত কক্ষনো নয়। এ ঐ বিমলবাবুর কাজ; তিনিই তার চেলা-চামুণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়ে আপনার অপমান করিয়েছেন। কিন্তু তারা তো মুষ্টিমেয় লোক,—সত্যি, আঙ্গুলে গোনা যায়, এমনি তাদের সংখ্যা। আমি ঠিক জানি যে স্রোতের মুখে হাল্‌কা এক খণ্ড কুটোর মতই জনমতের স্রোতে তাদের ভেসে যেতে হবে।

সুবোধ অল্প একটু হেসে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনি এত উত্তেজিত হলেন কেন, সুভদ্রাদেবী?

হব না?—সুভদ্রা আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে বললে,—যাদের জন্য আপনি প্রাণপাত করে খেটেছেন তারাই আপনাকে অপমান করবে? তা আমি কিছুতেই হতে দেব না। এ ইয়ূনিয়ন আপনার সৃষ্টি,—এ কর্ম্মক্ষেত্র আপনার। এখানে ঐ বিমলবাবুকে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসতে দেব না,—ওকেই আমি এখান থেকে তাড়াব।

কিন্তু বিমলের তো প্রতিধ্বনিমাত্র,—সুবোধ সহাস্য কটাক্ষে সুভদ্রার চোখের দিকে চেয়ে কৌতুকের স্বরে বললে,—আসল ধ্বনি যার তাকে তো আর তাড়াতে পারবেন না!—

কথাটা সুভদ্রা প্রথমে ধরতে পারলে না, বিহ্বলের মত সুবোধের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বললে, দরকার হলে তাঁকেও তাড়াব বই কি!—আপনাকেই এবার আমরা ইয়ূনিয়নের সভাপতি করব।

সুবোধ হো হো করে হেসে উঠে বললে, না সুভদ্রাদেবী,—না; ওসব কিছুই আপনাকে করতে হবে না। আগামী নির্ব্বাচনের আগেই হয়তো নিজেই আমি এখান থেকে সরে পড়ব।

সরে পড়বেন!

হ্যাঁ, সরেই পড়ব মনে করছি,—ছোট একটা ইয়ূনিয়নের জন্য দলাদলি করে শক্তির অপচয় করতে ইচ্ছে হয় না।

সুভদ্রা তখন কোন উত্তর দিলে না; কিন্তু খানিকটা এগিয়ে যাবার পর সে শান্ত কণ্ঠে বললে, সুবোধবাবু, আমি এ জায়গার মজদুরদের চিনি। আমি ঠিক জানি যে তাদের আস্থা আপনি হারান নি।

তা আমিও জানি, সুভদ্রাদেবী,—সুবোধ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে,—তাইতেই তো মনের মধ্যে কোন ক্ষোভ না রেখে হাসিমুখে সবার কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পারব !—

ইস্ !—বলে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সুভদ্রা ; কুটিল কটাক্ষে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বললে,—যাবেন বই কি !—আমরা আপনাকে যেতে দিলে তো যাবেন !—

সুবোধ চমকে মুখ তুলে তাকাতেই দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দুই জোড়া চোখই আবার কুণ্ঠাভরে নত হয়ে পড়ল। সুভদ্রা তখনই চলতে সুরু করলে, সুবোধ কোন উত্তর দিলে না।

কিন্তু খানিকটা পথ এগিয়ে যাবার পর সুবোধ হঠাৎ বলে ফেললে, আজ কদিন থেকে বারবারই কেবল একটা কথা আমার মনে উঠছে।

কুণ্ঠিত বিস্ময়ে সুভদ্রা বললে, কি ?

—মনে হচ্ছে যে, কেবল ক্ষতিগুলোকেই ফাঁপিয়ে বড় করে না দেখে মানুষ যদি তার ছোটখাটো লাভগুলোর উপরেও চোখ রাখতে পারত তাহলেই সে বুঝত যে সংসারে সে যা হারায়, সারা জীবনে পায় তার চেয়ে ঢের বেশী।

তার মানে ?

হাসিমুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে সুবোধ উত্তর দিলে, মানেটা আজ থাক্, সুভদ্রাদেবী। আমার কাজ আছে,—আমি এখন আসি !

প্রথমে সুভদ্রা বুঝতে পারে নি ; কিন্তু একটু পরেই তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে বুঝলে যে, সত্যি, সভায় এবং সভার বাইরে সে বড় বেশী উত্তেজনা প্রকাশ করে ফেলেছে,—হয়তো তার ব্যবহারটা হয়ে গিয়েছে বড় বেশী নাটুকে ধরণের। ভাগ্যিস সুবোধ কথাটা শেষ করেই দ্রুতপদে পাশের গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে !—সুভদ্রা লাল হয়ে উঠে ভাবলে,—এখানে সে উপস্থিত থাকলে তার মুখের দিকেও আর তাকান যেত না। নিজের কাছেই নিজের তার লজ্জা করতে লাগল।

কিন্তু ঐ সঙ্গেই তার রক্তের মধ্যে আনন্দের একটা রেশও যেন বেজে বেজে উঠতে লাগল। সে বুঝলে যে সুবোধকে আজ সে খুশী করতে পেরেছে। বুঝতেই তার নিজের বুকের ভিতরটাও তৃপ্তিতে ভরে উঠল।

একটু হাসি, একটি চকিত কটাক্ষ, মৃদু, গাঢ় স্বরের দুচারটি মাত্র কথা নিয়ে পথের মাঝের ছোট একটি ঘটনার স্মৃতি সেদিন আগুনের মতই সুভদ্রার মনকে রাঙিয়ে এবং তাতিয়ে তুললে। অতীতের সব কথা আবার তার মনে পড়ে গেল। এই সুবোধ কত বড় প্রত্যাশা নিয়েই না এক দিন তার কাছে ছুটে এসেছিল! মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারে নি; তবু মনে মনে সে তার যথাসর্ব্বস্বই পাবার আশা করেছিল। কিন্তু সব জেনে এবং বুঝেও সেদিন নিজে সে তাকে কিছুই দিতে পারে নি; বরং তারই চোখের সামনে তার বাঞ্ছিত সুধাপাত্রটি আর একজনের মুখে তুলে দিয়ে তাকে সে নির্ম্মমভাবে আঘাতই করেছিল। সেই আহত হৃদয়ে আজ সে নিজের হাতে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগাতে পেরেছে—সুবোধকে অবশেষে সে খুশী করতে পেরেছে—এ যে এক অনির্ব্বচনীয় উল্লাস!—

অথচ কত অল্পে!—ভেবে সুভদ্রার বিস্ময় বোধ হতে লাগল। একটু সহানুভূতি আর জনসভার ক্ষেত্রে সামান্য একটু সমর্থন বই তো নয়! অরুণাংশুকে সে যা দিয়েছে তার তুলনায় এ অতি সামান্য; সুবোধ এক দিন যা তার কাছে চেয়েছিল তার সঙ্গে এর তুলনাই হতে পারে না। অথচ এইটুকু পেয়েই আজ সুবোধের কত উল্লাস, কত কৃতজ্ঞতা, কত স্তুতিবাদ!—

এ কদিন যা ছিল ইচ্ছা, আজ এই বিশেষ ঘটনাটির উপলক্ষে তা-ই সুভদ্রার সঙ্কল্প হয়ে উঠল। সুভদ্রা ঠিক করলে যে অন্ততঃ এই ইয়ুনিয়নের ব্যাপারে সুবোধের মনে সামান্য একটু ক্ষোভও সে থাকতে দেবে না,—বাইরে যে দ্বন্দ্বের আভাষ দেখা দিয়েছে তা যদি সে মেটাতে না-ই পারে, তবে সুবোধকেই ওতে জিতিয়ে দিয়ে তার পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রে আবার তাকে সে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করবে।

অরুণাংশুর অসন্তুষ্টি বা বিরুদ্ধাচরণের সম্ভাবনাটাকে সে তেমন আমলই দিলে না।

তার হৃদয়ের ক্ষতটা এ কয়দিনে শুখিয়ে এসেছিল। তাছাড়া সে এক রকম ধরেই নিয়েছিল যে এখানকার মজদুর পল্লীতে দীনহীনের মত অরুণাংশুকে আর বাস করতে হবে না। কাজেই আজ তার কল্পনার উপাদানের অভাব হল না। সে মনে মনে ঠিক করলে যে অরুণাংশুকে সে সুবোধের সঙ্গে অন্ততঃ এই বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রটিতে কিছুতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেবে না। সে ভাবলে যে আর একটা ক্ষেত্রে সুবোধের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অরুণাংশুর যখন অবিসংবাদিত জয় হয়েছে তখন

এই ক্ষেত্রটিতে অরুণাংশু সুবোধকে জয়ী হতে দেবে না কেন? সত্যি, অরুণাংশুর তো অভাব কিছুরই নেই! হুগলী জিলার এই অখ্যাত কারখানাটির হাজার কয়েক মজদুর নিয়ে এই যে সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রটুকু, এরই মধ্যে আটকে থাকবার জন্য তো অরুণাংশুর জন্ম হয় নি! গোটা ভারতবর্ষটাই তো তার কর্ম্মক্ষেত্র,—সোণার কাঠির মত তার ব্যক্তিত্বের সামান্য একটু ছোঁয়া দিয়েই তো সে যে কোন জায়গাতেই এই রকম কত মজদুর ইয়ুনিয়ন গড়ে তুলতে পারবে। হুগলীর এই স্বল্পায়তন কর্ম্মক্ষেত্রটুকু সুবোধকে ছেড়ে দিয়ে গেলে তার একটুও লোকসান হবে না।

উত্তেজিত মনের বিশৃঙ্খল চিন্তা। কখন যে খেই হারিয়ে গেল সুভদ্রা তা বুঝতেই পারলে না। সুবোধকে হুগলীতে ফেলে রেখে অরুণাংশুর সঙ্গে সে মনে মনেই দেশবিদেশে দিগ্বিজয় করে ফিরতে লাগল।

দিন দুই পর বৈকালে ষ্টোভ ধরিয়ে সুভদ্রা সবেমাত্র কেতলিটা তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে, এমন সময় বাইরে থেকে কড়া নাড়ার শব্দ এল; দোর খুলেই সে দেখলে—সুবোধ বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নমস্কার করে সুবোধ বললে, কালও এই রকম সময়ে একবার এসেছিলাম—আপনার দেখা পাই নি।

সুভদ্রা কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলে, বাসায় ছিলাম না আমি—গিয়েছিলাম মহিমবাবুর বাসায়। মহিমবাবুকে মনে নেই আপনার? আমাদেরই কারখানার কেরাণী,—সেই যে সেবার ধর্ম্মঘটের সময় কেরাণীদের মধ্যে একা যিনি ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর বাসায় যেতে হয়েছিল।

তার পর নিজে থেকেই সে বুঝিয়ে বললে,—মহিমবাবুর মেয়ে টগরের বড্ড অসুখ; বছরখানিক যাবৎ ভুগছে মেয়েটি,—এখন একেবারে শেষ অবস্থা—দুচার দিনের মধ্যেই হয়তো সব শেষ হয়ে যাবে। তাই কদিন যাবৎই তাকে সেখানে যেতে হচ্ছে, রাতও জাগতে হচ্ছে,—ওর মা একা আর পেরে উঠছে না।

কিন্তু আপনিই বা পেরে উঠবেন কেন?—সুবোধ উদ্বিগ্ন হয়ে বললে,—আপনার সাধারণ কাজও তো কম নয়!—

সুভদ্রা হাসিমুখেই উত্তর দিলে, আমি যে নার্স,—সারা দিন খাটবার পরেও এমন কত রাত জাগতে হয় আমাদের !—

একটু চুপ করে থেকে সুবোধ বললে, শুশ্রূষার অ, আ, ক, খ আমারও তো জানা আছে,—আমি গেলে হয় না ?

না,—ঘাড় নেড়ে সুভদ্রা উত্তর দিলে,—মেয়েদের শুশ্রূষা পুরুষকে দিয়ে হতে পারে না।

তার পর সে জিজ্ঞাসা করলে, কথা আছে নাকি কিছু ? কি ?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ছিল একটা কথা। কিন্তু আপনার যখন কাজ রয়েছে !—

না,—সুভদ্রা উত্তরে আবার ঘাড় নেড়ে বললে,—আমার কাজ সেই রাত্রে। আপাততঃ কি করব তা-ই বরং ভেবে পাচ্ছিলাম না আমি। ভালই হল আপনি এসেছেন। চা খাবেন একটু ?

তার পরেই সে সশব্দে হেসে উঠে আবার বললে, মানে, আমার এখানে কখনও কিছু তো মুখে দিতে চান না আপনি,—তাই বলতে ভয় হচ্ছে। কিন্তু আজ আপনি চা না খেলে আমাকেও ওটা বাদই দিতে হয়। অথচ কত আশা করেই না আমি ষ্টোভের উপর কেতলি চাপিয়েছি !—

ও সেই কথা !—বলে সুবোধও শব্দ করে হেসে উঠল,—সে তো এক যুগ আগের ইতিহাস। আপনার সে অবস্থা তো আজ আর নেই,—সুভদ্রাদেবীর চা আর বৌদির চা'তে তফাৎ যে অনেক !—

মুখ লাল করে সুভদ্রা বললে, যান,—বলেই সে দ্রুতপদে ভিতরে চলে গেল।

চা খেতে খেতেই এক সময়ে সুবোধ রীতিমত গম্ভীর হয়ে বললে, সেদিনের ব্যাপারটা আমি খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি, সুভদ্রাদেবী। যা হয়ে গিয়েছে তা-ই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে আমাকে আপনার আর সমর্থন করা উচিত হবে না।

সুভদ্রা বুঝলে যে সুবোধ পরিহাস করছে না ; কুণ্ঠিত হয়ে সে বললে, কেন সুবোধবাবু ?

—কারণ আমি ঠিক জানি যে, আমার যা বিশ্বাস, অরুণাংশুর বিশ্বাস তা নয়।

সুভদ্রা নত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তার পর মুখ তুলে বললে, তা আমিও জানি। কিন্তু তাঁর যা বিশ্বাস, আমার বিশ্বাস যদি তা না হয় ?

তাহলে আপনার বিশ্বাস বদলাতে হবে।

কেন?

অল্প একটু হেসে সুবোধ উত্তর দিলে, এই কেন'র জবাবও কি আমায় দিতে হবে, সুভদ্রাদেবী? দড়িতে টান বেশী পড়লে দড়ি ছিড়ে যাবার আশঙ্কা আছে যে!—

শক্ত দড়ি হলে সে আশঙ্কা থাকে না,—বলে সুভদ্রা হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কিন্তু এরই উত্তরে সুবোধ আবার গম্ভীর হয়ে বললে, না সুভদ্রাদেবী,—হাসির কথা এটা নয়। কি দরকার এই গোলমালের—অরুণাংশুর মত যখন আলাদা!—

বাঃ রে!—সুভদ্রা কতকটা বিস্ময় ও কতকটা প্রতিবাদের স্বরে বললে,—আলাদা বলেই তো এ প্রশ্ন আজ উঠেছে। তার মত যদি আমার ভাল না লাগে তবু তা আমায় মেনে নিতে হবে নাকি?

কিন্তু আপনাদের যা সম্বন্ধ তাতে তো পরস্পরের মতের অমিল হওয়ার কথা নয়!—

কিন্তু যদি হয়?—আর হয়েছেও তো তাই!—

তাতেই তো বলছি যে, অরুণাংশুর মতটাই আপনার মেনে নেওয়া উচিত।

বাঃ রে!—সুভদ্রার বিব্রত কণ্ঠস্বর এবার তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল,—বেশ তো বলছেন আপনি! আপনিও তো সেই কায়া আর ছায়ার যুগের কথা বলছেন, সুবোধবাবু!—

না, না,—সুবোধ কুণ্ঠিত হয়ে বললে,—ঠিক সে কথা বলি নি আমি। আমি বলছিলাম যে—

বুঝিয়ে আর বলা হল না; বোধ করি বলবার কথাটা ভেবে না পেয়েই সুবোধ বিব্রতভাবে একেবারে চুপ করে গেল।

কিন্তু সুভদ্রা শব্দ করে হেসে উঠে বললে, ঐ দেখুন,—আপনি মনে মনে ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন। আসল কথা হচ্ছে যে মুখে আপনারা যত বিপ্লবের কথাই বলুন না কেন, আপনাদের মনোভাব রয়েছে ঠিক আপনাদের ঠাকুমা'দের যুগের পুরুষের মনোভাব। কেন? তাঁর মতে আমি মত দিতে যাব কেন? তিনি আমার মতে মত দেবেন না কেন?

সুবোধ বিপন্ন মুখে অল্প একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে বললে, বেশ তো,—না হয় তাই তাকে বলুন,—নিজের মতেই দীক্ষা দিন তাকে।

সুভদ্রা ঘাড় নেড়ে বললে, তাই আমি করব। কিন্তু তাঁর মত যদি না-ই বদলায়, আমি জুলুম করতে যাব না নিশ্চয়ই। তেমনি তাঁর মত যদি আমরা না মানি তবে আমার মতটাও তাঁকে সইতে হবে। এতটুকু পরমতসহিষ্ণু তিনি হতে পারবেন না কেন?

একটু চুপ করে থেকে সুবোধ মৃদু স্বরে বললে, দেখুন, পরমতসহিষ্ণু হতে পারে তারাই যাদের নিজেদের মতের কোন বালাই নেই। যার নিজের মত অলস মুহূর্ত্তের মানসিক একটা বিলাসমাত্র নয়, তার মতের সাথে বিরুদ্ধ মতের সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

কিন্তু সুভদ্রা হেসেই উত্তর দিলে, বেশ তো, মতের সাথে বিরুদ্ধমতের সংঘর্ষ যদি অনিবার্য্যই হয় তো হউক সে সংঘর্ষ। কিন্তু তার জন্য মানুষের সাথে মানুষেরও সংঘর্ষ হবে কেন?

সুবোধ কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগে সুভদ্রাই আবার বললে, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, বলুন তো! মানুষের মত বদলায় ঘড়ি ঘড়ি;—কালকের মত আজ উল্টে যায়; আবার আজকের মত রাত পোহালেই ভুল মনে হতে পারে। এমনি আকাশের মেঘের মতই যা হাল্‌কা আর পরিবর্ত্তনশীল, মানুষের সেই মতটাই কি মানুষের চেয়েও বড় হয়ে উঠবে? মতের অমিল হলেই মনান্তরও অমনি অনিবার্য্য হতে হবে নাকি? মানুষ বুঝি কেবল কতকগুলো মতামতের বাণ্ডিল?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, সে কথা আমি বলি নি, সুভদ্রাদেবী। আমি বলছিলাম,—মানে, আমার ভয় হচ্ছে যে, পাছে আপনাদের এই মতান্তর শেষে মনান্তরে গিয়ে পরিণত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাই হয় কি না!—

সে হয় তাদের,—সুভদ্রা হাসিমুখে উত্তর দিলে,—যাদের সত্যিকারের মনের মিল আগে কখনও হয় নি। আমাদের সে রকম হবে না।

সুবোধ অপ্রতিভের মত ক্ষণকাল চুপ করে বসে রইল; তার পর সংশয়ের স্বরে বললে, সত্যি বলছেন, সুভদ্রাদেবী? বাইরে আপনাদের মত হবে বিপরীত, চলার পথ হবে আলাদা, পরস্পর হয় তো ঝগড়া করবেন, তবু ঘরে আপনাদের মধ্যে অপ্রীতিকর কিছু ঘটবে না? মনের মিল আপনাদের অক্ষুন্নই থাকবে?

লজ্জিত মুখ নত করে সুভদ্রা সংক্ষেপে উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

প্রায় আধমিনিটকাল সেই মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবার পর সুবোধ অস্ফুট স্বরে বললে, কি জানি—এ আমি বুঝতেই পারি নে।

হঠাৎ হাসির আলোকে ঝলমল করে উঠল সুভদ্রার মুখ। সশব্দে বসবার চৌকিখানিকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, পারবেন, সুবোধবাবু,—আমার একটি ছোট বোন যেদিন আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে, সেদিন আমাদেরই মত আপনিও বুঝতে পারবেন যে মতের অমিল হলেই স্বামী-স্ত্রীর মনেরও অমিল হয় না।

সুবোধ নিজেও বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, যান—কি যে বলেন!—

সুভদ্রা সশব্দে হেসে উঠে বললে, ঐ একটা কথার কথা। কিন্তু বসুন আপনি। এই বাসনগুলো আমি ভিতরে রেখে আসি। আর ঐ ফাঁকে ভাতের হাঁড়িটাও উনোনের উপরে চাপিয়ে দিয়ে আসব। একটু দেরী যদি হয়, পালিয়ে যাবেন না যেন।

সুবোধ পালিয়ে গেল না বটে, কিন্তু মিনিট দশেক পর সুভদ্রা ফিরে আসতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজ আমি উঠি।

সুভদ্রা সবিস্ময়ে বললে, এখনই উঠবেন?

হ্যাঁ,—সুবোধ অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে,—একটু কাজ আছে আমার; এক জায়গায় যেতে হবে।

কিন্তু চলতে সুরু করেও সে আবার থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, অরুণাংশু কবে ফিরবে?

প্রশ্নটি আকস্মিক; থতমত খেয়ে সুভদ্রা উত্তর দিলে,—ঠিক জানিনে তো!

লিখে নি কিছু?

না।

একটু চুপ করে থেকে সুবোধ আবার জিজ্ঞাসা করলে, তার শেষ চিঠি আপনি কবে পেয়েছেন?

আগের চেয়েও বেশী কুণ্ঠিত হয়ে সুভদ্রা উত্তর দিলে, চিঠি আমি পাই নি;

চিঠি পান নি?

না।

একখানাও নয়?

না।

তার পর দুজনেই চুপচাপ,—ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা অনৈসর্গিক স্তব্ধতা নেমে এল।

নীরবতা ভাঙ্গলে সুভদ্রাই। শাড়ীর আঁচলটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে হঠাৎ হাসবার মত একটা শব্দ করে সে-ই আবার বললে, আশ্চর্য্য হচ্ছেন যে বড় ? চিঠি দেবার অভ্যাস আছে নাকি তাঁর ? আপনারই তো বন্ধু,—জানেন না আপনি ?

সুবোধ কতকটা বিহ্বল, কতকটা কুণ্ঠিত স্বরে বললে, তাহলেও—মানে, এত-দিনের মধ্যে একখানাও চিঠি দেয় নি সে ? এ যেন কেমন—

বাঃ রে !—সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললে,—'এতদিন' কি বলছেন ? কতদিন হয়েছে ? গুণে দেখুন তো—এক মাসও তো হয় নি এখনও—তিন সপ্তাহেরও বরং কম।

সুবোধ আবার ক্ষণকাল অবাক হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর ফিক্ করে হেসে ফেলে বললে, আপনাদের সবই অদ্ভুত !—

তার পরেই সে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সুভদ্রা সেখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতদিন এ কথাটা তার মনে পড়ে নি,—পড়লেও ঠিক এমনভাবে নয়। অরুণাংশু চলে যাবার পর প্রায় তিন সপ্তাহ পার হতে চলেছে,—অথচ ফিরে আসা দূরে থাক্, নিজের খবর দিয়ে একখানা চিঠিও সে দেয় নি। তি—ন সপ্তাহ ! নিতান্ত কম সময় নয়। যে যুক্তি দিয়ে সুবোধকে সে ভুলিয়ে বিদায় করতে পেরেছে, তাথেকে এখন নিজে সে এক বিন্দু সান্ত্বনাও আহরণ করতে পারলে না। অনেক দিন পর আবার তার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। সুবোধের মুখের ঐ 'অদ্ভুত' কথাটা থেকে থেকেই যেন তার কানের কাছে বেজে বেজে উঠতে লাগল।

অদ্ভুতই বটে !—সুভদ্রা অস্বীকার করতে পারলে না। যা ঘটে গিয়েছে এবং ঘটছে, তার সবই অদ্ভুত। কিন্তু সে 'অদ্ভুত' হাসির উপাদান নয়, ভয়ঙ্কর একটা বিভীষিকা,—ওর কল্পনামাত্রেই দেহ ও মন অসার হয়ে যায়।

কিন্তু রান্নাঘর থেকে পোড়া ভাতের তীব্র গন্ধ তার নাকে এসে তাকে সচেতন

করে তুললে। তার মনে পড়ল যে এখনই খেয়ে তাকে মহিমবাবুর বাসায় যেতে হবে,—তার মেয়ে টগরের মর মর অসুখ।—

দিন তিনেক পর আবার দুজনের সাক্ষাৎ হল,—এবারও সুভদ্রারই বাসায়।

বাস্ থেকে নেমে সুবোধ একরকম ছুটতে ছুটতে সুভদ্রার বাসায় এসে উপস্থিত হল। দেখা হতেই বললে, একটা সুখবর যদি দিই, সুভদ্রাদেবী, কি খাওয়াবেন, বলুন তো!—

সুভদ্রা অবাক হয়ে গেল। সুবোধের এমন হাসিখুশী ভাবে আগে সে কোন দিনই দেখে নি। বিশেষতঃ তার পক্ষে ঐ যেচে খেতে চাওয়া—এ একেবারেই নূতন। ব্যাপারটা অভূতপূর্ব্ব বলেই সুখবরটা যে কি তা সে আন্দাজ করতে পারলে না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত সে বললে, কি সুবোধবাবু?

শ্যামাচরণদা রেহাই পেয়ে গেলেন,—সুবোধ উৎফুল্ল স্বরে উত্তর দিলে,—মিথ্যে মামলা, টিকবে কেন? হাকিম ওদের কথা একটাও বিশ্বাস করে নি।

সুভদ্রা সত্যই খুশী হল; তার মনের আনন্দ উপচে উঠল তার চোখে মুখে।—সত্যি সুখবর এনেছেন সুবোধবাবু,—সে বললে,—ভালমানুষের কি হয়রাণিই না গিয়েছে এতদিন! যাক্—এখন সে তার চাকরিটা ফিরে পেলে হয়।

তার পর এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সে আবার বললে, কৈ সে? তাকে দেখতে পাচ্ছি নে তো!—

সে বাসায় গিয়েছে,—সুবোধ উত্তর দিলে,—সেদিন বকেছিলেন না আপনি?—তাই আজ সে আগেই বৌএর সাথে দেখা করতে গিয়েছে।

সুভদ্রা হেসে বললে, তা ভাল,—বৌদি খুব খুশী হবে আজ।

তার পরেই সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কুন্ঠিত স্বরে আবার বললে, সত্যি আমার এখানে একদিন খাবেন, সুবোধবাবু? চা নয়,—সত্যিকারের খাওয়া—এই ভাত-ডাল?

নিজের বিব্রত ভাবটা ঢাকবার জন্যই সুবোধ একটু বেশী জোরে হেসে উঠে বললে, ঐ দেখুন,—একটু ঠাট্টা করেছি আর অমনি আপনি—

কেন ?—সুভদ্রা কথার মাঝখানেই বলে উঠল,—আপনি তো ঠাট্টাই করেছেন, জানি। কিন্তু আমি যদি ঠাট্টা না করে সত্যিকারের নিমন্ত্রণ করি? আগে কখনও খাননি এখানে,—তাই বলতে সাহস হয় নি। কিন্তু একথা কতদিন আমি ভেবেছি—রোজই নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খান!—

আপনিও তো তাই,—সুবোধ হাসিমুখে উত্তর দিলে,—আপনার রান্নাও তো আর কেউ রেঁধে দিয়ে যায় না!—

আমার কথা আলাদা,—বলে সুভদ্রা হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কেন ?—সুবোধ পরিহাসের স্বরটা বজায় রেখেই বলে চলল,—আলাদা হবে কেন? হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়াটা যদি একটা কষ্টের ব্যাপার হয় তবে তো ও আমার কাছে যেমন কষ্টের, আপনার কাছেও তেমনি!

তা কেন ?—আমি তো বরাবরই রাঁধি।

আমিও তাই,—অন্ততঃ এত বেশীদিন যাবৎ আমি নিজের হাতে রাঁধছি যে তা বরাবরের সামিল হয়ে গিয়েছে। ওতে এখন আমার কষ্ট হয় না।

তার পর একটু হেসে সুবোধ আবার বললে, আসল কথা, আমি যাকে বলি মেয়েদের ট্রেড্ ইয়ুনিয়ন মনোবৃত্তি, তাই আপনার মধ্যে সজাগ হয়ে রয়েছে। রান্না ব্যবসাটা আপনারা একচেটিয়া করে নিয়েছেন বলেই পুরুষের রেঁধে খাওয়াটাকে আপনারা কায়েমী স্বার্থে হস্তক্ষেপের মত ভয়ঙ্কর একটা অপকর্ম্ম মনে করেন। আর সেই মনোভাবটাকেই আপনারা এমনভাবে প্রকাশ করেন যাতে পুরুষের প্রতি দরদও দেখান হয়, রন্ধনবিদ্যায় নিজেদের কৃতিত্বের গর্ব্বও প্রকাশ করা চলে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ আপনাদের রান্নাঘরে বন্দী করে রেখেছে বলে পরোক্ষভাবে পুরুষের উপর এক হাত চালও চেলে নেওয়া যায়।

সুভদ্রা সহাস্য কটাক্ষে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে তার বক্তৃতা শুনছিল; কথা শেষ হতেই সে বেশ একটু খোঁচা দিয়ে বললে, হল তো?—মেয়েরা পুরুষের উপর হাত চালিয়ে নিক্ বা না নিক, আপনি নিজে আমার উপর এক হাত চেলে নিলেন তো? বেশ, আমি না হয় ভাল রাঁধতে পারি বলে গর্ব্বই করছি। কিন্তু আমার সে গর্ব্ব যে মিথ্যে গর্ব্ব, না হয় সেই কথাটা প্রমাণ করবার জন্যই একবেলা আমার এখানে পাত পেতে বসুন।

তার পর হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে আবার বললে, ঠাট্টা নয় সুবোধবাবু,—

খাবেন একদিন আমার বাসায়? শ্যামাচরণদাকেও আমি বলব,—এ হবে তারই অভিনন্দনের ভোজ।

সুবোধ রাজী হয়ে গেল।

রবিবার রাত্রের জন্য ব্যবস্থা। সুভদ্রা আগের দিনই ঝিকে বলে রাখলে যে রবিবার সারা দিন তাকে তার বাসায় থাকতে হবে। পরদিন হাসপাতাল থেকে সকাল সকাল ফিরে এসেই সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। অনেক যত্ন করে অনেক জিনিষ সে নিজের হাতে রাঁধলে। সব কাজ শেষ করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। স্নান সেরে তৈরি হতে একেবারে রাত।

কিন্তু তখনও সুবোধের দেখা নেই। সে যখন এল তখন রাত প্রায় আটটা। সুভদ্রা অভিযোগ করে বললে, দেখুন তো, কত দেরী করে ফেললেন—শ্যামাচরণদা এসেছেন সেই কখন। এদিকে খাওয়ার জিনিষ সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সুবোধ উত্তর দিলে, সে তো আমার দোষ নয়, সুভদ্রাদেবী। রাতের নিমন্ত্রণের খাবার দিনেই রাঁধা হয়ে যাবে তা আমি কেমন করে জানব? তবে আপনার কোন ভয় নেই। খাবার জিনিষ জুড়িয়ে জল কেন, বরফ হয়ে গিয়ে থাকলেও হাড়িতে একটি দানাও আমি অবশিষ্ট থাকতে দেব না।

কথাটা যে অতিশয়োক্তি নয়, সেটা প্রমাণ করবার জন্যই যেন সে বার বার এটা সেটা চেয়ে নিতে লাগল। কিন্তু খাওয়ার জন্য সে যত মুখ নাড়লে, খেতে খেতে কথা বলবার জন্য সে মুখ নাড়লে তার চেয়ে ঢের বেশী। তার বেশীর ভাগই সুভদ্রার রন্ধননৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। মোচার ঘণ্টটা একাদিক্রমে তিনবার চেয়ে নিয়ে নিঃশেষ করবার পর সুবোধ অবশেষে হেসে বললে, আপনার নিজের জন্য একটুও রইল না বলে দুঃখ করবেন না, সুভদ্রাদেবী। তার বদলে আমি আপনাকে সার্টিফিকেট দিয়ে যাচ্ছি যে, আমরা, পুরুষেরা, সাত জন্ম হাঁড়ি ঠেললেও সামান্য কলার মোচা দিয়ে এমন অমৃত তৈরী করতে পারব না।

যান,—মুখ লাল করে সুভদ্রা বললে,—কি তোষামোদই যে আপনি করতে শিখেছেন!—

তার পর স্মিতমুখে সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে সে আবার বললে, গত এক বছরে আপনি খুব বদলে গিয়েছেন, সুবোধবাবু।

বদলে গিয়েছি !—সুবোধ থতমত খেয়ে বললে,—সত্যি ?

খু—ব। এত বেশী যে চেনাই যায় না।

তার পর শ্যামাচরণকে সাক্ষী মেনে সে আবার বললে, আচ্ছা, তুমিই বলতো, শ্যামাচরণদা—সুবোধবাবু খুব বদলে যান নি ?

শ্যামাচরণ উত্তর না দিয়ে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে কেবল একটু হাসলে,—সেটা সম্মতির হাসি।

খাওয়ার পরেও কি একটা কথার উপলক্ষে সুভদ্রা আবার বললে, সত্যি, সুবোধবাবু—এবার প্রথম থেকেই আপনার পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করছি। মনে হচ্ছে যে আপনি যেন এক নূতন মানুষ। এমন চঞ্চল, এমন হাসিখুশী, এমন পরিহাস-প্রিয় আপনি আগে ছিলেন না। কি হয়েছে, বলুন তো ?—

কিচ্ছু হয় নি,—সুবোধ কুণ্ঠিত হাসিমুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে উত্তর দিলে,—নূতন কিছু যদি আপনার চোখে পড়ে থাকে, তার দায়িত্ব আমার নয়, আপনার চোখের।

ইস্—তা বই কি !—সুভদ্রা ভ্রূভঙ্গী করে বলে উঠল ; তার পর হাসিভরা চোখে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, সত্যি বলছি সুবোধবাবু,—আগে আপনি ছিলেন যেন একটি যন্ত্র ; এবার হয়েছেন মানুষ। একটা বিয়ে করলেই এখন আপনার ষোল কলা পূর্ণ হয়।

সুবোধ চমকে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল ; তার পরেই হাসিতে ফেটে পড়বার মত হয়ে সে বললে, এ কি বলছেন, সুভদ্রাদেবী ? সেদিনও তো এইরকমেরই একটা খাপছাড়া কথা বলে ফেলেছিলেন। এ আপনার হল কি ? এক বছরে আপনিও তো কম বদলে যান নি দেখতে পাচ্ছি !—

কেন—অন্যায় বলেছি নাকি কিছু ?—সুভদ্রা হাসতে হাসতে উত্তর দিলে,—তুমিই বল তো, শ্যামাচরণদা, সুবোধবাবুর যদি বিয়ে হয়, দুজনে ছোট্ট একটি সংসার পেতে এখানে কাজ করতে থাকেন,—খুব ভাল হয় না ?

শ্যামাচরণ হাসিমুখে প্রথমে সুবোধের ও পরে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে, সে বেশ হয়, দিদিমণি।

সুভদ্রা যেন বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হয়ে বললে, ঐ শুনুন।

কিন্তু এর পরেই শ্যামাচরণের সুর বদলে গেল ! হাসি থামিয়ে বিষণ্ন স্বরে সে বললে, কিন্তু, দিদিমণি, কে কাকে বলে, আর কে কার কথা শোনে ! মেয়েমানুষ

হয়েও নিজেই তুমি সংসার পাতলে না,—তা সুবোধবাবুকে বললে তিনি তোমার কথা শুনবেন কেন ?

চকিতে সুবোধ ও সুভদ্রার চোখাচোখি হয়ে গেল, কিন্তু চাপা হাসির বিদ্যুতালোকে সুবোধের চোখদুটি চিক্ চিক্ করে জ্বলে উঠল।

কিন্তু এসব শ্যামাচরণের চোখে পড়ল না। একটু থেমে সশব্দে একটি নিশ্বাস ছেড়ে সে আবার বললে, আর শুনতে আমি বলিও নে, দিদিমণি। নিজে তো আমি সারা জীবনই সংসার করলাম,—তারার মাকে যখন ঘরে এনেছিলাম তখন ভাল করে আমার চোখই ফোটে নি। কিন্তু চোখ ফুটতেই বুঝলাম যে দুটি পায়েই আমি শিকল পড়েছি। এখন চলতে গেলেই সে শিকল ঝম্ ঝম্ করে বাজতে থাকে,—চলতেই পারি নে আমি। সারা জীবনটাই এই রকম চলছে। তোমার কথা অবশ্য আলাদা; তুমি মেয়েমানুষ—সংসার করাই তোমার ধর্ম্ম। কিন্তু সুবোধবাবুর মত পুরুষেরাও সবাই যদি সংসারে জড়িয়ে যায়, তবে দেশের-দশের কাজ আর কে করবে ?

সুবোধ আর হাসি চাপতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠল।

শ্যামাচরণ চমকে উঠে বললে, কি সুবোধবাবু ?

অপাঙ্গে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে সুবোধ উত্তর দিলে, তুমি খাঁটি সত্য কথা বলেছ, শ্যামাচরণদা। সংসারে সব মেয়েরাই যদি বিয়ে করত আর সব ছেলেরাই সন্ন্যাসী হয়ে দেশের-দশের কাজ করতে বেরুত, তবে আমাদের দেশটা এতদিনে ঠিক স্বাধীন হয়ে যেত।

তার পর সুবোধ আবার হো হো করে হেসে উঠল।

সুভদ্রা অপ্রতিভের মত একবার সুবোধের ও একবার শ্যামাচরণের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে শেষে নিজেও হেসে ফেলে বললে, এই দেখুন। তবু আপনি বলবেন, বদলে যান নি। আচ্ছা, এই রকম কথা আগে কখনও বেরিয়েছে আপনার মুখ থেকে ? এই রকম প্রাণ খুলে আগে কখনও হেসেছেন আপনি ? আচ্ছা, তুমিই বল তো, শ্যামাচরণদা, মিথ্যে বলছি আমি ?

শ্যামাচরণ এবার স্বীকার করলে, সত্যি, দিদিমণি, সুবোধবাবু খুব বদলে গিয়েছেন।

তবে ?—বলে সুভদ্রা বিজয়গর্ব্বে আবার সুবোধের মুখের দিকে তাকাল,—আচ্ছা, কি হয়েছে আপনার—বলুন তো !—

হাসি থামিয়ে সুবোধ একটু চুপ করে রইল; তার পর বললে, আসল কথা কি জানেন ?—জীবনের সাথে একটা রফা করে নিয়েছি। নিজেকে প্রাণপণে বঞ্চিত করে দেখেছি, আবার প্রাণপণে চেয়েও দেখেছি। বুঝেছি যে দুইই বিড়ম্বনা। নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করলে বঞ্চনাই কেবল লাভ হয়; আবার চলার পথে থমকে দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদের জন্য দুহাত তুলে কাঁদতে থাকলেও তাই। পথের দু-ধারের ছোটখাটো পাওনাগুলোকেই দুহাতে কুড়িয়ে নিয়ে পথ চলতে পারলেই মোটের উপর লাভ হয় অনেক বেশী।

সুভদ্রা টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললে, বেশ তো, তাহলে পথের ধারে একটি বউ যদি কুড়িয়ে পান, তাকে নিতে অমত করবেন না তো ?

সুবোধ আবার সশব্দে হেসে উঠে বললে, ঐ দেখুন,—আবার সেই কথা! এ আপনার হল কি সুভদ্রাদেবী ? এ যে দেখছি ভয়ঙ্কর শ্রেণীসচেতনতা! সত্যি সত্যি মেয়েদের একটা ট্রেড্ ইয়ুনিয়ন করেছেন নাকি আপনি ? না, পালাতে হচ্ছে এবার—

সঙ্গে সঙ্গেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে; শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে আবার বললে, চল, শ্যামাচরণদা। তোমার মেয়ের চোখদুটো যে ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে এসেছে, তা-ও দেখতে পাচ্ছ না ?—

ডাক্তারের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং সুভদ্রার নিপুণ হাতের নিরলস শুশ্রূষা সত্ত্বেও মহিমবাবুর মেয়ে টগর মারা গেল আর তা-ও সুভদ্রার ঠিক কোলের উপরেই।

দিন তিনেক পর মহিমবাবু সুভদ্রার বাসায় এসে বললে, টগরের মা তো শয্যা নিয়ে পড়ে আছেন,—একবারটি তাকে দেখা দিয়ে আসতে পারবে না দিদি ? আজই আমরা চলে যাচ্ছি কি না!—

চলে যাচ্ছেন!—সুভদ্রা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কোথায় ?

দেশে যাচ্ছি, দিদি,—মহিমবাবু উত্তর দিলে,—আপাততঃ এক মাসের ছুটি নিয়েছি। কিন্তু ঠিক করেছি যে ফিরে আর আসব না,—চাকরিই ছেড়ে দেব।

সুভদ্রা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। একটু পরে একটি নিশ্বাস ফেলে মহিমবাবুই আবার বললে, আর কিসের জন্য এখানে থাকব, দিদিমণি ? মেয়েটার

বিয়ের কথা ভেবেই মুখ গুঁজে এখানে পড়ে ছিলাম। তা সে-ই যখন ফাঁকি দিয়ে গেল তখন এই বোমার বাজারে প্রাণ হাতে নিয়ে কেন আর এখানে পড়ে থাকব! —শেষে কি ছেলেটাকেও হারাব? তাই ঠিক করেছি যে দেশে ক্ষুদকুড়ো যা জোটে তাই খেয়ে পৈত্রিক বাড়ীতেই পড়ে থাকব।

খবরটা সুবোধ শুনলে সুভদ্রার মুখেই। কিছুক্ষণ ম্লান মুখে চুপ করে থাকবার পর সে বললে, মহিমবাবু এত বড় একটা আঘাত পেয়েছেন—তিনি তো যেতেই পারেন। যাদের কোন পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে নি তারাও তো বেশীর ভাগই বোমার ভয়ে দেশে পালিয়ে যাচ্ছে।

সুভদ্রাও একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, ভয় পাবারই তো কথা—রেঙ্গুণের খবর যা কাগজে বেরিয়েছে!—

একটু ইতস্ততঃ করে সুবোধ বললে, একটা কথা কদিন থেকেই আমার মনে উঠছে, সুভদ্রাদেবী। আজ কথাটা যখন উঠলই—তখন—আমি বলি কি—আপনিও —অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য না হয় অন্য কোথাও গিয়ে থেকে আসুন।

আমি!—সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে।

সুবোধ উত্তর দিলে, গেলেই তো ভাল হয়। বিপদের একটা আশঙ্কা যখন রয়েছে!—

বলেন কি, সুবোধবাবু! সত্যি আমায় বলছেন আপনি? বোমার ভয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে বলছেন?

সুবোধ হেসে উত্তর দিল, না হয় বোমার ভয়ে না-ই হল,—না হয় পালিয়ে আপনি না-ই গেলেন। আমি তো পালিয়ে যেতে বলছি নে আপনাকে,—বলছি শুধু যেতে।

কিন্তু চাকরি রয়েছে যে! চাকরি ছাড়ব কেমন করে?

না-ই বা ছাড়লেন। ছুটি তো আপনার কম পাওনা হয় নি! ছুটি নিয়েই না হয় যান।

কিন্তু যাব কোন চুলোয়?—সুভদ্রা হঠাৎ উদ্ভ্রান্তের মত হেসে উঠল,—জগতে আমার যাবার কি কোন জায়গা আছে, সুবোধবাবু?

এবার সুবোধ আর কোন উত্তর দিলে না,—কেবল সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে সে হাসতে লাগল।

হাসি দেখে অপ্রতিভ হয়ে সুভদ্রা বললে, বাঃ, হাসছেন যে বড় ! মিথ্যে বলেছি আমি ? মহিমবাবু বা আর সকলের মত আমার কি বাড়ীঘর আছে, না দেশই আছে ? আশ্রয় বলতে তো আর্য্যসমাজের সেই অনাথাশ্রম। তা সেখানেও কি আর আশ্রয় মিলবে ? এ সব কথা জানেন না আপনি ?

জানি বলেই তো বলছি,—সুবোধ হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে,—আপনি এলাহাবাদে যান।

কোথায় !

এলাহাবাদ।

সুভদ্রা প্রথমে বুঝতে পারে নি, কিন্তু এবার বুঝলে। চক্ষের পলকে তার মুখখানি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেই পরক্ষণেই আবার বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেল।

কিন্তু সেটা সুবোধের চোখে পড়ল না ; পড়লেও সেটাকে উপেক্ষা করে হাসতে হাসতেই সে আবার বললে, অরুণাংশুকে একটা 'তার' করে দিন আপনাকে নিয়ে যেতে। আর তার চেয়েও ভাল হয়, আপনি নিজেই এলাহাবাদে চলে যান। তার পর বোমার ভাবনা, চাকরির ভাবনা, আশ্রয়ের ভাবনা,—কোন ভাবনাই আর আপনাকে ভাবতে হবে না।

সুভদ্রা কথাটা বুঝেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল, এখন সে মৃদু, প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে, না, তা হয় না।

হয় না !—সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে,—কেন ?

চৌকির হাতল দুটি দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরে মরিয়ার মত সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, কি যে বলেন, সুবোধবাবু—এমন সময়ে কি আমার অন্যত্র যাওয়া চলে ! এ সময়েই তো নার্সের দরকার সব চেয়ে বেশী।

মন্ত্রের মত কাজ হয়ে গেল। মনে মনে আরও বেশী বিস্মিত হলেও সুভদ্রার ঐ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুবোধ পরিহাস করা দূরে থাক্, যাওয়ার কথাটাও আর মুখে আনতে পারলে না। অপ্রতিভভাবে চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বলতে, তা বটে !—

এমনিভাবে সুভদ্রা তখনকার মত সঙ্কটটা কাটিয়ে উঠল বটে, কিন্তু সুবোধ বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর সে আর আত্মসংবরণ করতে পারলে না। মনটা তার দুর্ব্বল হয়েই ছিল—টগরের শোচনীয় মৃত্যু বড় বেশী নাড়া দিয়েছিল তাকে ; আজকের

আকস্মিক আঘাতে তার আহত মন একেবারেই ভেঙে পড়ল। সুবোধের পরামর্শটা মনে হল যেন নির্ম্মম একটা পরিহাস,—যেখানে সে তাকে যেতে বলেছে সেখানে যাবার অধিকারই যে এখন পর্য্যন্ত তার হয় নি! অতীতে এই রকম অবস্থায় পরিহাসের আশ্রয় নিয়েই সে আত্মরক্ষা করে এসেছে; কিন্তু আজ পরিহাসের কথা একটাও তার মুখে আসে নি। সুবোধের সামনে অনেক চেষ্টায় নিজেকে সে সংযত করে রেখেছিল। কিন্তু সুবোধ চলে যেতেই তার অবরুদ্ধ অশ্রু দুই চোখ ছাপিয়ে তপ্ত ধারায় তার গাল বেয়ে ঝড়ে পড়তে লাগল।

সেদিন গভীর রাত্রে সেই ভয়ঙ্কর 'যদি'টা আবার তার মনের কোণে মাথাচাড়া দিয়ে জেগে উঠল। তার মনে হতে লাগল যে অনেক দিন পর সেই অন্ধকার, অতল-স্পর্শ গহ্বরের বিকট মুখটা হঠাৎ যেন তার পায়ের কাছে আবার খুলে গিয়েছে—হয়তো এখনই সে তার অতল তলে তলিয়ে যাবে।—

আর একবার শুনে দেখেছিল সুভদ্রা,—অরুণাংশু চলে যাবার পর পুরা একটি মাস পার হয়ে গিয়েছে। দেখে রাত্রেই সে ঠিক করেছিল যে নিজেই অরুণাংশুকে সে চিঠি লিখবে। কিন্তু দিনের আলোকে তার উৎসাহ ক্রমেই কমে আসতে লাগল। তার পর অপরাহ্নে ঘরের দোর বন্ধ করে সে যখন কাগজকলম নিয়ে সত্য সত্যই লিখতে বসল তখন সবই উলটপালট হয়ে গেল। তার বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠল অভিমান; মনের বিভিন্ন কোণ থেকে বিপরীতধর্ম্মী বিভিন্ন আবেগ হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেই গর্জ্জন করতে করতে ছুটে এসে হিংস্র জানোয়ারের মত পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরলে। তার বুকের ভিতরটা হয়ে উঠল যেন ভয়ঙ্কর এক কুরুক্ষেত্র; মাথাটা একেবারেই গুলিয়ে গেল। অনেক চেষ্টায় দুচার লাইন লেখা যা বেরুল তা তার পছন্দ হল না। একাদিক্রমে তিনখানা চিঠির কাগজ নষ্ট করবার পর অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ঐ অসময়েও সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ পর বাইরে থেকে পরিচিত কণ্ঠের একটা ডাক তার কানে এল—দিদিমণি!—সঙ্গে সঙ্গেই দোরে মৃদু করাঘাতের শব্দ।

কে—শ্যামাচরণদা!—বলে সুভদ্রা উঠে গিয়ে দোর খুলে দিলে।

শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ঘুমিয়েছিলে দিদিমণি?

হ্যাঁ ভাই,—হঠাৎ ঘুম এসে গেল। তুমি বোস একটু,—আমি মুখ ধুয়ে আসছি।

ফিরে এল সে মিনিট পাঁচেক পর। কিন্তু তখনও তার মুখের দিকে চেয়ে শ্যামাচরণ ঈষৎ উদ্বেগের স্বরে বললে, দিদিমণির কি কোন অসুখ করেছে ?

হ্যাঁ, শ্যামাচরণদা,—ক্লান্ত কণ্ঠে সুভদ্রা উত্তর দিলে,—কদিন থেকেই শরীরটা তেমন ভাল নেই আমার।

কিন্তু তার পরেই সোজা হয়ে বসে সে আবার বললে, তা হউক,—তেমন গুরুতর আমার কিছু হয় নি। তোমার নিজের খবর আগে বল। বড় সাহেবের সাথে দেখা হল তোমার ?

শ্যামাচরণের ঠোঁটের কোণে ম্লান মত একটু হাসি ফুটে উঠল ; সে ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ, দিদিমণি। কিন্তু কোন লাভ হল না—বড় সাহেবও কবুল জবাব দিয়ে দিলে।

শ্যামাচরণ আদালতের বিচারে খালাস হলেও কারখানার চাকরি আর ফিরে পায় নি। ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্ম্মচারী তাকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিল যে এ কারখানায় তার চাকরি তো আর হবেই না, হয়তো এ অঞ্চলের অন্য কোন কারখানাতেও সে আর চাকরি সংগ্রহ করতে পারবে না। তার পর সুভদ্রার পরামর্শমত তার আপিল নিয়ে সে খোদ বড় সাহেবের দরবারে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তাতেও কোন ফল হয় নি ; সাহেব কবুল জবাব দিয়ে বলেছে, তাকে আর চাকরিতে বহাল করা হবে না। একটু ব্যঙ্গ করতেও ছাড়ে নি,—এখন থেকে সে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে ইয়ুনিয়নের কাজ করতে পারবে।

শুনে সুভদ্রা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তার পর জিজ্ঞাসা করলে, ওঁদেরকে সব কথা বলেছ ?

এবারও শ্যামাচরণ সেই রকমই হেসে উত্তর দিলে, বলতে কাউকেই বাকি রাখি নি, দিদিমণি। কিন্তু কেশবলাল বললে বিমলবাবুকে বলতে ; বিমলবাবু কথাটা যেন গায়েই মাখলেন না ; সুবোধবাবু শুনে বললেন যে ইয়ুনিয়নের যারা কর্ম্মকর্ত্তা, তারা কিছু না করলে তিনি আর কি করতে পারবেন !—

সুভদ্রা বিরক্ত হয়ে বললে, করব না বললেই হবে নাকি ? না, শ্যামাচরণদা,—তুমি কিছু ভেবো না ; তোমার কেস্ নিয়ে ইয়ুনিয়নকে অবশ্যই লড়তে হবে।

শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, না হয় ইয়ুনিয়ন আমার তরফ থেকে লড়বেই, না হয় মানলাম চাকরিও আমি ফিরে পাব। কিন্তু সে তো ভবিষ্যতের কথা, দিদিমণি, —তত দিন আমার চলে কেমন করে?—

অপ্রতিভ হল সুভদ্রা; লজ্জিত স্বরে সে বললে, মাফ কর, শ্যামাচরণদা; আসল কথাটা আমার মাথায়ই ঢোকে নি—আর মাথারই কি আমার কিছু ঠিক আছে ছাই! যাক্—সেজন্যও তোমায় ভাবতে হবে না। ইয়ুনিয়ন থেকেই তোমার একটা ভাতার বন্দোবস্তা করে দিতে পারব আশা করি। আর তা না-ও যদি পারি,—বলতে বলতে সুভদ্রা শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হাসলে,—তাহলেও তোমার এই গরীব দিদিমণিই কিছুদিন তোমাদের খাওয়াতে পারবে।

শুনে শ্যামাচরণ যেন আরও বেশী কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল; বললে, তা আমি জানি, দিদিমণি। তবে তোমার আশীর্ব্বাদে কারও কাছ থেকেই কিছু নেবার প্রয়োজন এখনও আমার হয় নি। আজ আমি আর একটা জিনিষ তোমার কাছে চাইতে এসেছিলাম।

কি শ্যামাচরণদা?—সুভদ্রা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে না শ্যামাচরণ; বেশ একটু পরে অনেকটা অপরাধীর মত কুণ্ঠিত, মৃদু স্বরে সে বললে, জানই তো দিদিমণি,—তোমাদের আশীর্ব্বাদে দেশে এখনও আমার দুটি ক্ষুদকুড়োর সংস্থান আছে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে তারার মা যদি দেশে গিয়ে থাকে তবে অন্ততঃ দুবেলা দুমুঠো ভাত ওদের জুটবেই। আমি একা মানুষ এখানে যাহোক করে নিজের পেটের ভাতের সংস্থান করতে পারব। এই সব ভেবেই তারার মাকে আমি দেশে গিয়ে থাকতে বলেছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হয় না।

কেন—কি বলে সে?—সুভদ্রা বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলে।

শ্যামাচরণ আবার একটু হেসে উত্তর দিলে, এই মেয়েমানুষ চিরকাল যা বলে থাকে—স্বামীকে ছেড়ে স্বর্গেও যাব না,—এই সব আর কি! তাই ভাবছিলাম যে তুমি গিয়ে তাকে যদি একটু বুঝিয়ে বলতে!—

সুভদ্রার মুখ এবার গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে সংশয়ের স্বরে সে বললে, আমার কথায় কি কোন কাজ হবে, শ্যামাচরণদা? তোমার কথাই যখন বৌদি রাখে নি!—

কিন্তু তোমার কথা সে রাখবে,—শ্যামাচরণ উৎসাহের স্বরে বললে,—হাজার হলেও আমি হলেম গিয়ে ঘরের লোক,—আমার কথা ওর কাছে কথাই নয়। কিন্তু তোমার কথা অত সহজে সে ঠেলতে পারবে না,—তোমায় সে খুব মানে কি না! আর—একটা চক্ষুলজ্জাও আছে তো!—

সুভদ্রা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলে; তার পর বললে, বেশ, তুমি যখন বলছ—দেখাই যাক একবার চেষ্টা করে। চল, আজই যাই।

খুশী হয়েও কুণ্ঠিত স্বরে শ্যামাচরণ বললে, আজই যাবে, দিদিমণি? কিন্তু তেমন তাড়াতাড়ি তো নেই! তোমার শরীরটাও যখন তেমন ভাল নয়!—

তাতে কিছু এসে যাবে না,—সুভদ্রা উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—শরীরটাকে আয়েশ দিতে গিয়ে দেখেছি—ও তাতে আরও ভেঙে পড়ে। তার চেয়ে খানিকটা ঘুরে এলে, একটু কথাবার্ত্তা বললে শরীরের এই ম্যাজম্যাজ ভাবটা কেটে যেতে পারে।

কাপড় ছেড়ে তৈরী হয়ে এসে সুভদ্রা আবার বললে, কিন্তু তোমার বাসায় যাবার আগে, চল, বিমলবাবুর সাথে একবার দেখা করে যাই। আজ তাকে বেশ করে দুকথা আমি শুনিয়ে দেব। কোম্পানী অকারণে তোমার মত একজন কর্ম্মীকে বরখাস্ত করবে—আর ইয়ূনিয়ন তাতে একটা কথাও বলবে না! ইয়ূনিয়ন তাহলে আছে কিসের জন্য?

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ভিতর দিকের বারান্দায় একা বিমল কিছু চাল-ডাল আর তরিতরকারি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পাশেই ইক্‌মিক্ কুকারের খালি বাটিগুলি। সুভদ্রাকে দেখে ঈষৎ বিস্মিত, ঈষৎ লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, কি ব্যাপার সুভদ্রাদি? এই অসময়ে?

অসময়েই বটে!—সুভদ্রা রান্নার সরঞ্জামগুলির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে উত্তর দিলে,—কিন্তু আপনি একা কেন বিমলবাবু? আপনাদের মধ্যে যিনি দ্রৌপদীকেও হার মানিয়েছেন, সেই সুবোধবাবু কোথায়?

তিনি বেরিয়েছেন,—বিমলও হেসে ফেলে বললে,—এ সময়টিতে কোনদিনই তো তিনি বাসায় থাকেন না!—

বাঃ, বেশ তো!—সুভদ্রা রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেল,—রোজই একা আপনাকেই রাঁধতে হয় নাকি?

উত্তরে বিমল বললে, রোজই রাঁধতে হয় বটে, তবে দুবেলাই নয়। আমরা

নিজেদের মধ্যে পালা ঠিক করে নিয়েছি। দিনের বেলার ভার নিয়েছেন সুবোধদা,—তখন চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের আয়োজন হয়। আর রাত্রের ভার আমার—তখন কেবলই ভাতে-ভাত।

তা মন্দ ব্যবস্থা নয়,—সুভদ্রা হেসে বললে,—যদিও আমার নিজের ব্যবস্থাটা উল্টো। কিন্তু আপনাদের পরিবারে রাত্রের ভারটাই যখন হাল্‌কা তখন সুবোধবাবু এটা নিলেন না কেন?

আগে তাই তিনি নিয়েছিলেন,—বিমল উত্তরে বললে,—কিন্তু দিন পনর হল সুবোধদা নিজেই রুটিনটাকে উল্টে দিয়েছেন। বৈকালে কোথায় যেন তাঁকে যেতে হয়,—উনি বলেন যে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি হবার প্রতিশ্রুতি পেলেও সন্ধ্যা-বেলাটায় উনি ঘরে বসে আলু-চচ্চরি রাঁধতে পারবেন না।

বলেন কি!—সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে,—সন্ধ্যে বেলায় কোথায় যান তিনি?

তা জানি নে,—বিমল উত্তর দিলে,—জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাই নি। ব্যাপারটাকে উনি যেন একটা রহস্যের জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।

কিন্তু শ্যামাচরণ বললে, আমি জানি, দিদিমণি,—ফরাসডাঙ্গার দিকে গঙ্গার ধারের একটা বাগানবাড়ীতে তিনি যান।

বাগানবাড়ী!—কার বাগানবাড়ী?—

তা জানি নে, দিদিমণি,—জিজ্ঞেসও করি নি। তবে সেদিন আমার সামনেই তিনি বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেলেন,—তা-ই শুধু দেখেছি।

সুভদ্রা কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল,—মিনিটখানিক কাল কারও মুখেই কোন কথা ফুটল না। কিন্তু তার পর সুভদ্রাই নিজের শরীরটাকে বেশ জোরে একবার নাড়া দিয়ে বলে উঠল, যাক্‌ সে কথা। সুবোধবাবুর জন্য আমি এখানে আসি নি, বিমলবাবু,—এসেছি আপনারই কাছে।

কেন সুভদ্রাদি?—বিমল ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়ে বললে,—কিন্তু তাহলে চলুন,—ঘরে গিয়েই না হয় বসি।

ঘরে গিয়ে সুভদ্রা বললে, আমি এই শ্যামাচরণদার কথা বলতে এসেছি বিমলবাবু,—কোন কসুর নেই অথচ বেচারার চাকরি যাচ্ছে; এর একটা প্রতি-বিধান করা চাই তো!—

বিমলের মুখ দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে গেল। একটু ইতস্ততঃ করে সে বললে,

ইয়ুনিয়ন থেকে আমরা একটা প্রতিবাদ করতে পারি। তার বেশী আর কি করব? এই নিয়ে তো আর একটা ধর্ম্মঘট করানো যায় না!—

বিরক্ত হয়ে বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই সুভদ্রা বললে, যায় না যে, তা আপনি একা ঠিক করলেই তো হবে না, বিমলবাবু! ব্যাপারটাকে আমাদের কমিটিতে একবার পেশ করুন,—এ নিয়ে একটা আলোচনা হউক!—

বিমল কুণ্ঠিত স্বরে বললে, সেটা তাহলে কেশবলালকে একবার বলতে হয়—সভার আলোচ্য বিষয় সব সে-ই ঠিক করে কি না!—

তা বটে!—সুভদ্রার কণ্ঠে এবার বিদ্রূপ ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠল,—কেশবলাল তো আপনারই গ্রামোফোণ। আপনি না বললে সে কি আর কিছু করবে!—

বিমলের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল; আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর সুভদ্রার দৃষ্টি এড়িয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, আসল কথাটা বলছি, শুনুন। নিজেদের মধ্যে ঘরোয়াভাবে এই নিয়ে আমাদের অনেক আলোচনা হয়েছে। অধিকাংশেরই মত এই যে এই নিয়ে সাহেবের সাথে একবার মুখোমুখি আলাপ হওয়া দরকার। কিন্তু সে কাজ একা অরুণদা ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না।

সুভদ্রা বিহ্বলের মত বললে, কিন্তু তিনি তো এখানে নেই!—

ঠিক সেই জন্যই আমরা এখন আর এগুতে পারছি নে,—বিমল উত্তরে অল্প একটু হেসে বললে,—আমি ভাবছি যে, অরুণদাকে আসবার জন্য আমি একটা চিঠি লিখে দেব—তাঁর অভাবে আমাদের আরও অনেক জরুরী কাজ বন্ধ হয়ে আছে।

সুভদ্রা বিব্রত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; তার পর সহসা সোজা হয়ে বসে সে বললে, তবে তাই দিন,—চিঠি কেন, একটা 'তার'ই করে দিন। ঠিকই তো; তিনি হলেন গিয়ে সভাপতি,—তিনি এত দিন অনুপস্থিত থাকলে এখানে কাজই বা চলে কি করে! অন্ততঃ এ বিষয়ে তাঁর মতামতটা স্পষ্ট করে তাঁকে জানিয়ে দিতে বলুন।

বিমল তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বললে, তা আমি করব,—কালকের ডাকেই চিঠি চলে যাবে। আর এদিকে ইয়ুনিয়নের তরফ থেকে শ্যামাচরণদার এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে সাহেবকেও আমি একখানা চিঠি লিখে দেব। আমাদের প্রতিবাদটা হয়ে থাকবে,—তার পর অরুণদা ফিরে এসে যা হয় করবেন।

শ্যামাচরণ সমস্ত আলোচনাটা নিঃশব্দেই শুনে গেল। কিন্তু ব্যবস্থাটা যে তার মনঃপূত হয় নি. তা বাইরে গিয়েই সুভদ্রাকে সে জানিয়ে দিলে ; বললে, আসল কথা কি, জান দিদিমণি ? ব্যাপারটাকে এরা ধামাচাপা দিতে চাচ্ছেন। এ সব তারই ফন্দি।

সুভদ্রা আমতা আমতা করে বললে, না শ্যামাচরণদা,—ধামাচাপা কেন দিতে চাইবেন !

তা আর বোঝ না, দিদিমণি ?—শ্যামাচরণ উদ্ধত স্বরে উত্তর দিলে,—আমি যে সুবোধ বাবুর দলের লোক—জনযুদ্ধের মন্ত্রে এখনও যে আমি দীক্ষা নিই নি !

উত্তর শুনে সুভদ্রা স্তব্ধ হয়ে গেল ; কিন্তু একটু পরেই সবেগে মাথা নেড়ে বেশ জোরের সঙ্গেই সে বললে, না শ্যামাচরণদা, তা নয়। এ বরং ভালই হয়েছে। তুমি ঠিক জেনো,—অরুণবাবু তোমার জন্য খুব লড়বেন।

শ্যামাচরণ আর প্রতিবাদ করলে না। অরুণাংশুর সম্বন্ধে সুভদ্রার যে দুর্ব্বলতা আছে, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই যে সে বিশ্বাস করতে চায় না, এ অভিজ্ঞতা শ্যামাচরণের নূতন নয়। কাজেই অরুণাংশুর নামটা আলোচনায় ঢুকে যেতেই সে চুপ করে গেল। তাছাড়া, ততক্ষণে আর একটা আসন্ন লড়াইয়ের সম্ভাবনা তাকে রীতিমত উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।

ব্যারাকের কাছে এসেই সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললে, আজ না হয় তারার মায়ের কাছে তুমি না-ই গেলে, দিদিমণি। আজ রাতও হয়েছে আর শরীরটাও তোমার যখন তেমন ভাল নেই !—

সুভদ্রা বললে, না, শ্যামাচরণদা, কাজটা আজই শেষ করে যাই। এত দূর যখন এসেই গিয়েছি—

একটু চুপ করে থেকে শ্যামাচরণ গম্ভীর স্বরে বললে, তবে আমি আর তোমার সাথে যেতে চাই নে, দিদিমণি। আমার সাক্ষাতে হয়তো তেমন খোলাখুলি কথা হতেই পারবে না।

এইবার আসল কথাটা বুঝতে পারলে সুভদ্রা। অন্ধকারেও শ্যামাচরণের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই শব্দ করে হেসে উঠে সে বললে, তোমার বুঝি ঝাঁটার ভয় হয়েছে—না শ্যামাচরণদা ? তা বেশ তো,—তুমি না হয় আড়ালেই থাক।

আজকের ঝাঁটাখানা আমার পিঠেই ভাঙুক। আমার অভ্যাস আছে,—তেমন লাগবে না।

সারদা সুভদ্রাকে দেখে তেমন বিস্মিত হল না; হয়তো বা তার উদ্দেশ্যটাও মোটামুটি সে আন্দাজও করে নিলে। তাই সুভদ্রা যখন অনেকগুলি অবান্তর কথার ফাঁকে ফাঁকে সুকৌশলে তার প্রস্তাবটাকে প্রকাশ করে বলবার পর অবশেষে সারদার মত জিজ্ঞাসা করে বসল তখন অল্প একটু চুপ করে থেকেই সারদা উত্তর দিবার পরিবর্ত্তে পাল্টা প্রশ্ন করলে, এই কথা বলবার জন্য উনিই বুঝি তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন ?

সুভদ্রা স্বীকার করতে পারলে না, সোজাসুজি কথাটা অস্বীকারও করতে পারলে না। সারদার প্রশ্ন ও দৃষ্টি দুটোকেই এড়িয়ে সে বললে, চাকরি হল না সেই কথাই শ্যামাচরণদা আমায় বলতে গিয়েছিলেন, বৌদি। কথায় কথায় কত কথাই উঠল—এই অভাব-অভিযোগের কথা, তোমার ভয়ের কথা, এই সব কত কি! আর নিজেও তো দেখছি—কত লোক স্ত্রীপুত্রকে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাই ভাবলাম—যাই, দেখি একবার বৌদির সাথে কথা বলে—সে তো আর অবুঝ নয়!—

সারদা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল; তার পর শান্ত, গম্ভীর স্বরে বললে, তোমায় আমি 'দিদিমণি' বলে ডাকি, গুরুজনের মত মান্য করি। আবার তোমার বয়স কম বলে মাঝে মাঝে মনে হয় যে তুমি আমার ছোট বোন কি পেটের মেয়ে। সেই সাহসেই আজ তোমার মুখের উপরেই স্পষ্ট করেই আমি বলব,—অনেক লেখাপড়া শিখেছ, অনেক কিছু তুমি জান; তবু স্বামী যে কি জিনিষ তা জানতে এখনও বাকি আছে তোমার। জানলে এ কথা তুমি আমায় বলতে না।

শুনতে শুনতে সুভদ্রার মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল; উত্তর দেওয়া দূরে থাক্, চোখ তুলে সারদার মুখের দিকে সে তাকাতেও পারলে না।

তার সেই আনত মুখের দিকে চেয়ে একটু পরে সারদাই আবার বললে, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, দিদি, শীগগিরই যেন তুমি স্বামী পাও। কিন্তু তার আগে স্বামী যে কি বস্তু তা তুমি বুঝতে পারবে না।

সুভদ্রার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল; তাড়াতাড়ি মুখ তুলে সে বললে, আমি সে কথা বলি নি বৌদি; আমি শুধু ভেবেছিলাম যে শ্যামাচরণদার চাকরি গেল,—এখন এতগুলি পেট সে চালাবে কেমন করে।

এরও উত্তরে সারদা শান্ত কণ্ঠেই বললে, সেজন্যও তোমার কোন ভাবনা নেই, দিদিমণি,—আর তাকেও ভাবতে মানা করে দিও তুমি। আমি আমার নিজের গতর খাটিয়েই দুবেলা না হউক, একবেলার দুটি মোটাভাতের সংস্থান করতে পারব। কারখানার বাবুদের ঘরে ঘরে ঠিকে ঝি'এর দরকার। দুতিনটি বাসায় এরই মধ্যে আমি কথা কয়ে রেখেছি। এখন গিয়ে কাজ সুরু করতেই যা বাকি। লেগে যাব দুএক দিনের মধ্যেই।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে, সারা জীবন যার রোজগার খেয়েছি, আজ তার বিপদের দিনে নিজে রোজগার করে তাকে দুটি খাওয়াতে পারব না? বাবুদের গিন্নী তো আমি নই,—আমি যে মজদুরের বৌ!

পরদিন শ্যামাচরণকে নিজের বাসায় ডাকিয়ে এনে সুভদ্রা গম্ভীর স্বরে তাকে বললে, বৌদিকে দেশে যাবার কথা আর কোনদিন বলো না, শ্যামাচরণদা। আর কথাটা তুমি মনেও এনো না। যাওয়া যদি কোন কারণে অনিবার্য্যই হয়ে ওঠে তবে দুজনে একসঙ্গেই যেয়ো।

রাত্রে শ্যামাচরণের সঙ্গেও সারদার হয়তো কথা হয়ে থাকবে,—শ্যামাচরণ আর প্রতিবাদ করলে না।

যাবার আগে শ্যামাচরণকে সুভদ্রা বলে দিলে, সুবোধবাবুকে বলো অবসরমত একবার আমার সাথে দেখা করতে।

সুবোধ এল পরদিন দুপুরবেলায়। সুভদ্রা তখন সবেমাত্র খেয়ে উঠেছে। সুবোধকে দেখে সে সবিস্ময়ে বললে, ওমা!—ডেকেছি বলেই কি এই দুপুর রোদ মাথায় করে ছুটে আসতে হবে?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, কাজকর্ম্ম তো নেই, তাই—

তাই বলে এ সময়ে? কাজকর্ম্ম না থাকলেও বিশ্রাম আছে তো!—এটা কি কথা বলবার সময়?

তবে থাক্—আপনি বিশ্রাম করুন,—আমি আর এক সময় আসব!—বলেই সুবোধ ফিরবার উপক্রম করছিল, সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললে, না, তার দরকার নেই;

এসেছেন যখন—আমার তো দুটোমাত্র কথা। কিন্তু বৈকালে এলেই তো হত—এক কাপ চা-ও অমনি খেয়ে যেতে পারতেন।

সুবোধ চোখ নামিয়ে উত্তর দিলে, বৈকালে আমার একটা কাজ আছে কি না!—

ও—তা-ই বটে,—বলতে বলতে সুভদ্রা হেসে ফেললে,—ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। বৈকালে আপনার সময় হয় না, না? কিন্তু কোথায় যান, বলুন তো। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির পদের জন্যও নাকি ঐ সময়টা আপনি দিতে পারেন না?

সুবোধ লজ্জার হাসি হেসে বললে, বিমল বলেছে বুঝি?

যে-ই বলুক, শুনেছি আমি ঠিকই,—ফরাসডাঙ্গার কাছে গঙ্গার ধারের একটা বাগানবাড়ীতে আপনি রোজ যান। কেন, বলুন তো!—কার বাড়ী ওটা?

সুবোধের লজ্জিত চোখের পাতাদুটি এবার নত হয়ে পড়ল। সে কোন উত্তর দিলে না।

সুভদ্রা বিস্মিত হল, তার কৌতূহল গেল বেড়ে। অনুনয়ের সঙ্গে খানিকটা আবদার মিশিয়ে সে বললে, বলুন না সুবোধবাবু—কার বাড়ী ওটা? ওখানে কি কাজ থাকে আপনার?

এড়াবার উপায় নেই বুঝেই সুবোধ সলজ্জ কণ্ঠে বললে, যাই একজনকে দেখতে।

দেখতে যান!—কাকে সুবোধবাবু?

সে একটি মেয়ে।

মেয়ে!—সুভদ্রা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

তার ঐ ভাব দেখেই সুবোধ সশব্দে হেসে উঠে বললে, হ্যাঁ, সুভদ্রাদেবী, একটি মেয়েকে দেখতে যাই আমি। কেন—বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার?

সুভদ্রার মুখখানি কেমন যেন হয়ে গেল। অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর অবশেষে সে ঘাড় নেড়ে বললে, না,—সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে না।

সুবোধ আরও জোরে হেসে উঠে বললে, অথচ এ একেবারে খাঁটি সত্য। যাকে দেখতে যাই এবং না গেলে কিছুতেই আমার চলে না, সে সত্যি একটি মেয়ে। দেখাব একদিন এনে আপনাকে—দেখাব বলেই এতদিন কিছু বলি নি। দেখলে

তাক্ লেগে যাবে আপনার,—মানতে হবে যে, তাকে একবার দেখলে আর না দেখে থাকা যায় না।

সুভদ্রা আরও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর মুখখানা হাসবার মত করে বললে, আপনার কোন কথাই বিশ্বাস করলাম না সুবোধবাবু। তবে এ কথা যদি সত্য হয় তবে খুব খুশী হব আমি,—সত্যি বলছি, হয় তো আপনার চেয়েও বেশী।

বলেই সে দ্রুতপদে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ফিরে এল মিনিট তিনেক পর। আগের প্রসঙ্গটির উল্লেখ পর্য্যন্ত না করে দুখানা দশ টাকার নোট সুবোধের সামনে টেবেলের উপর রেখে সে সহজ স্বরে বললে, আপনাকে ডেকেছিলাম এই জন্য। শ্যামাচরণদার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট যাচ্ছে। অথচ সে বা তার বৌ আমার কাছ থেকে কিছুই নেবে না। তাই ভাবলাম যে আপনি হয় তো কোন ফন্দি করে টাকাটা ওদের কাউকে গছিয়ে দিতে পারবেন।

দিন তিনেক পর সুভদ্রা হাসপাতালের কাজ সেরে ঠিক বাসায় ফিরবার মুখেই নূতন একটা কাজে আটকে গেল। একটা নূতন কেস্ এল ষ্ট্রেচারে—কারখানার ভিতর থেকে। কি একটা যন্ত্রের মধ্যে অসাবধানে লোকটির কাপড় আটকে গিয়েছিল আর সেই কাপড়ের টানে চক্ষের নিমেষে সে নিজেই ঐ যন্ত্রের গায়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। তার পর যা হবার তাই হয়েছে। হাতের কটা আঙ্গুল একেবারে নেই; একটা পায়ের পাতা থেৎলে গিয়েছে; শরীরের কত জায়গায় যে আঘাত লেগেছে তার লেখাজোখা নেই; রক্তে সব ভেসে যাচ্ছে; প্রাণ যে আছে তা-ও চেষ্টা করে নির্দ্ধারণ করতে হয়।

লোকটির দিকে একবার তাকিয়েই সুভদ্রা শিউরে উঠে বললে, ওমা—একি কেস্! একে বড় হাসপাতালে পাঠায় নি কেন? উত্তরে ছোট ডাক্তার তিক্ত কণ্ঠে বললে, তাহলে কোম্পানী আমাদের মাইনে দিচ্ছে কেন? বড় হাসপাতালের ডাক্তার কি আর আমাদের মত রিপোর্ট দিতে পারবে? ওয়ার্কমেনস্ কম্‌পেনসেসন এ্যাক্টের ভাবনা নেই সায়েবের? আসুন—স্নায়ুগুলিকে শক্ত করে নিন,—আমরাই সুরু তো করে দিই; তার পর ডাক্তার চৌধুরী এসে যদি বলেন তো দেখা যাবে।

লোকটি জোয়ান হিন্দুস্থানী—তার উপর তার ভাগ্যও বোধ করি ভাল। পরীক্ষা করতেই দেখা গেল যে তার শরীরের আসল যন্ত্রগুলি সবই অক্ষত এবং অব্যাহত আছে। তবু কাটাছেঁড়ার ব্যাপার—সব কাজ শেষ করতে বেলা তিনটা বেজে গেল। সুভদ্রা যখন বাসায় ফিরল তখন বেলা প্রায় চারটে।

এই অবেলা পর্য্যন্ত তার খাওয়া হয় নি; শরীরটা ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে? তবু তার সকল ইচ্ছাকে দাবিয়ে কেবল স্নান করার ইচ্ছাটাই তার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। ফেব্রুয়ারি মাস—এরই মধ্যেই গরম পড়ে গিয়েছে। শুধু সেই কারণেই অস্বস্তির অন্ত নেই। তার উপর একাদিক্রমে প্রায় তিন ঘণ্টা তার কেটেছে অপারেশন টেবেলের ধারে। মুখে, হাতে, বুকে, বৃষ্টির ধারার মত তাজা রক্ত ছিটকে ছিটকে এসে পড়েছে। টিংচার আয়োডিন, ক্লোরোফর্ম আর আয়ডোফর্মের গন্ধ তার পরণের কাপড়ে যেন লেপ্‌টে লেগে রয়েছে। সুভদ্রার কেবলই মনে হতে লাগল যে সে স্নান করবে,—খাওয়া নয়, বিশ্রাম নয়, কেবল স্নান—স্নানের ঘরে দোর বন্ধ করে কলের নীচে বসে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল প্রাণ ভরে স্নানই করবে।

কিন্তু বদ্ধ ঘরের রুদ্ধদ্বারকে অতিক্রম করে, চাবি-খোলা কলের জলের একটানা ঝর ঝর শব্দকেও ডুবিয়ে সুবোধের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর তার কানে গিয়ে প্রবেশ করলে,—ও সুভদ্রাদেবী, কোথায় আপনি? স্নানের ঘরে নাকি? শীগগির বেরিয়ে আসুন—দেখুন, কাকে নিয়ে এসেছি।

সুভদ্রার বুকের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রটা অকস্মাৎ দ্রুততর তালে চলতে আরম্ভ করলে। কলটা বন্ধ করে, পা টিপে টিপে দোরের কাছে এসে দুখানা কবাটের সূক্ষ্ম ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়ে সে বাইরের দৃশ্যটি দেখতে চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুই তার চোখে পড়ল না; শুধু তার কানে এল সুবোধের অস্পষ্ট গম্ভীর স্বর,—সে যেন কাকে কি বলছে; আর ওরই সঙ্গে সুবোধের কথার মাঝখানেই অত্যন্ত মধুর ও কোমল আর একটি কণ্ঠস্বর হঠাৎ তরল, উচ্ছ্বসিত হাস্যে ফেটে পড়ল। অতুলনীয় সেই স্বরমাধুর্য্য—ফোয়ারার কলকলের সঙ্গে ছড়িয়ে-পড়া এক মুঠা স্বর্ণমুদ্রার টুংটাং ধ্বনি ঐকতানে মিশলে যেমন হয় কতকটা সেই রকম। কিন্তু পরক্ষণেই সুবোধের অধৈর্য্য কণ্ঠ আবার শোনা

গেল,—ও সুভদ্রাদেবী,—স্নানের ঘরে আছেন নাকি আপনি? একটা সাড়া তো অন্ততঃ দিন—এ যে ভূতের বাড়ী মনে হচ্ছে।

পা টিপে টিপেই আবার কল পর্য্যন্ত ফিরে গিয়ে সুভদ্রা গলাটা চড়িয়ে উত্তর দিলে, একটু বসুন সুবোধবাবু,—আমি যাচ্ছি।

কিন্তু দোর খুলে বাইরে আসতেই এক নিমেষেই পাদুটি তার অচল হয়ে গেল। তার চোখে পড়ল—অদূরে হলঘরের উন্মুক্ত দ্বারপ্রান্তে স্নানের ঘরের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে সুবোধ; আর তার ঠিক সামনেই, তার পাদুটি ঘেঁষে পিছন দিকে দুই হাত বাড়িয়ে সুবোধের হাত দুখানি ধরে তারই মত সামনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাস্যমুখী একটি মেয়ে।

সাত-আট বছর বয়সের চট-পটে, ফুট-ফুটে একটি মেয়ে।

ঘন, এলায়িত, সাপের মত ফণাধরা, কুঞ্চিত একরাশ কালো চুলের মধ্যে নিটোল, নিখুঁৎ, কাঁচা সোনার রঙের কচি ঢলঢলে একখানি মুখ। চোখের কোণে কৌতুহলের সঙ্গে দুষ্টামির হাসি চঞ্চল বিদ্যুৎরেখায় খেলে বেড়াচ্ছে। পাতলা, টুকটুকে ঠোঁটদুটিতে যেন তা'ই প্রতিফলিত দীপ্তি। শৈশবের কমনীয়তা পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের আলোকে উদ্ভাসিত। কাচের কলমের ভিতর সূর্য্যের আলোর মত শিশুচিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ বর্ণের সমারোহ দিয়ে তাকে আরও বিচিত্র করে ফুটিয়ে তুলেছে। অনবদ্য সেই সৌন্দর্য্য। বর্ণের ললিত সুষমার তুলনা হয় না। সুসঙ্গত গঠনের পারিপাট্যে চিবুক, ঠোঁট, নাক, চোখ,—সব মনে হয় যেন সঞ্জীবিত শিল্পশ্রী। বিশেষ করে সূক্ষ্ম ও মসৃণ জোড়া ভুরুর নীচে কাজল-আঁকা ডাগর চোখদুটির প্রাণময় সৌন্দর্য্যের মধ্যে শারদ মধ্যাহ্নের রৌদ্রোজ্জ্বল নির্ম্মল আকাশের মতই কি যেন একটা অপার্থিবতার আভাষ। সে মুখের দিকে একবার তাকালে চোখ আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

সুভদ্রার পাদুখানির মত চোখের তারাদুটিও যেন অচল হয়ে গেল।

কিন্তু তাকে দেখেই ঐ মেয়েটিই তার ছোট হাতদুখানি কপালে ঠেকিয়ে বাঁশীর মত মিহি সুরে বলে উঠল, নমস্কার।

সুভদ্রার বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন প্রকাণ্ড একটা ঢেউ উঠে তার পাঁজরার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দুহাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে সে বুকে তুলে নিলে।

হাসিমুখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুবোধ বললে, কেমন দেখছেন? মিছে বলেছিলাম সেদিন?

প্রজাপতির মত ফুটফুটে মেয়েটি,—মাথার চুল, চোখের তারা, গায়ের ফ্রক্ ও ত্বকের বর্ণে ইন্দ্রধনুর মতই বিচিত্র; বিদ্যুতের একটি শিখার মতই প্রদীপ্ত ও চঞ্চল, দক্ষিণের এক ঝলক দমকা হাওয়ার মতই দুর্দান্ত,—গঙ্গার ধারে খোলা মাঠের মধ্যে উড়ন্ত একটি প্রজাপতির পিছনে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে;—এমনি অবস্থায় মেয়েটির সঙ্গে সুবোধের প্রথম দেখা।

সুবোধ নদীর ধার দিয়ে ফরাসডাঙ্গায় যাচ্ছিল; মেয়েটিকে দেখে থমকে দাঁড়াল সে।

একবার পতঙ্গটি একটু দূরে ঘাসের উপর বসে পড়ল; মেয়েটিও থেমে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দূর থেকে দেখলে—প্রজাপতির পাখাদুটি অল্প অল্প কাঁপছে। আশায় ও আনন্দে মেয়েটির চোখের তারাদুটিও যেন নেচে উঠল। কচি হাতদুখানি একত্র মিলিয়ে ঢাকার মত করে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল সে; চাপা উত্তেজনায় তার মুখের সোনালী রঙ গোলাপের মত রাঙা হয়ে উঠল; কালো চোখের আলো যেন ঠিকরে পড়তে লাগল কাটা হীরার দ্যুতির মত। কাছাকাছি গিয়ে সে একটু থমকে দাঁড়াল; তার পরেই যেন সহসা সবুজ ঘাসের বুকে রামধনুর মত ঢেউ উঠল একটা; ফোয়ারার জলধারার মত তরল হাসির একটা উচ্ছ্বাস হঠাৎ যেন ছিটকে উপরের দিকে উঠেই জলতরঙ্গের সুমিষ্ট ঝঙ্কার তুলে চূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দূর থেকে সুবোধ দেখলে—দুই হাত বাড়িয়ে মেয়েটি ঘাসের উপর উপুর হয়ে শুয়ে পড়েছে।

কিন্তু প্রজাপতিটি ধরা পড়ে নি,—সে তখন উড়ছে ঐ মেয়েটিরই মাথার উপরের আকাশে। তবু ধরা পড়েছে মনে করেই মেয়েটি শুয়ে শুয়েই তার শূণ্য হাতের মুঠা দুটিই আরও শক্ত করে ওরই মধ্যে উড়ন্ত পতঙ্গটিকে অনুভব করবার চেষ্টা করলে। পিঠটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে বুকের নীচে তাকিয়ে দেখলে,—সেখানেও কিছু নেই। তার পর আকাশের দিকে একবার তাকিয়েই সে বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়াল।

ঝাঁকড়া, কালো, কোঁকড়া চুলের রাশি তখন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে তার মুখের উপর

ছড়িয়ে পড়েছে। ওরই নীচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে তার চোখদুটি। অসহিষ্ণুর মত কেবল মাথাটাকে দিয়েই সে যেন একবার ঘুরপাক খেয়ে নিলে। তাঁতেও হল না দেখে দুই চঞ্চল হাতে অবশিষ্ট কয়েক গুচ্ছ চুল মুখের উপর থেকে দুই কানের পাশ দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিয়ে আর একবার সে উপরের দিকে তাকাল। গোধুলির রঙিন আকাশের আলো তার মুখের উপর এসে ছড়িয়ে পড়ল এক মুঠা হাল্‌কা আবিরের মত। প্রজাপতিটি তখন ঠিক তার মাথার উপরে উড়ছে। মেয়েটি দুই হাত বাড়িয়ে অধীর আগ্রহে একটা লাফ দিয়ে আর একবার সেটাকে ধরতে চেষ্টা করলে। পতঙ্গটি অবশ্য ধরা পড়ল না; হয়তো বেশ একটু বিরক্ত হয়েই গঙ্গার দিকে উড়ে চলল সে; আর ওরই দিকে তাকিয়ে উর্দ্ধমুখী মেয়েটি ছুটে চলল ওরই পিছনে পিছনে।

শীতের গঙ্গা। নরম পলিমাটির অনেকটা সমতল জমি পার হলে তবে জল। তবু নদীর যেটা পাব, সেটা খাড়া। উপরের ঘাসে-আঁটা মাঠ বিশেষ একটা সীমা-রেখায় এসে হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে। মেয়েটি উড়ন্ত প্রজাপতিটির অনুসরণ করে ঠিক সেই সীমারেখাটির দিকেই ছুটে আসছিল। চোখ তার উপরের দিকে,—আর একটু পরেই হয়তো সে নিজের গতির বেগেই হুড়মুড় করে নীচে পড়ে যাবে।

দূর থেকে তাই আশঙ্কা করে সুবোধ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির পথ রোধ করে দাঁড়াল।

হঠাৎ বাধা পেয়ে মেয়েটিও থেমে গেল; অসহিষ্ণুর মত বলে উঠল সে,—মেরা—; ফুটন্ত ফুলের মত কচি মুখখানিকে উঁচু করে চকিতে একবার সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে চলবার উপক্রম করে সে অধৈর্য্য কণ্ঠে আবার বললে, মেরা তিতলি—

দুদিকে দুহাত বাড়িয়ে মেয়েটির গতি রোধ করে হাসতে হাসতে সুবোধ বললে, কি বলছ খুকী,—এক্ষুণি পড়ে যাবে যে!—

মেয়েটি আবার সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বললে, মেরা—আমার পরজাপতি—ওহ্‌—হটিয়ে না—আঃ, ঐ উড়ে যাচ্ছে—ঐ যে—ধরে দিন না—ঐ—; বলতে বলতে সে সুবোধের সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে অধীর আগ্রহে প্রায় লাফাতে সুরু করে দিলে।

সে যেন বর্ণের একটা সরোবর—অকস্মাৎ চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গে নেচে উঠেছে।

সুবোধ কুণ্ঠিত চোখে একবার চারদিকে চেয়ে দেখলে,—কেউ কোথাও নেই। তার পর সে হঠাৎ ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে বসে প্রসারিত বাহুদুটি দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে বললে, এই তো ধরেছি।

মেয়েটি বিহ্বলের মত চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বললে, কৈ—কোথায় ধরেছেন ?

এই তো—এই যে—আমার হাতের মধ্যেই তো,—তুমিই তো প্রজাপতি।

মেয়েটি এবার সুবোধের মুখের দিকে তাকাল; পলেকের জন্য তার ডাগর, নীল চোখের চঞ্চল তারাদুটি যেন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। কিন্তু তার পরেই হাসির ঝঙ্কারে দশদিক কাঁপিয়ে সে বললে, ধেৎ—আমি বুঝি পরজাপতি!—কিচ্ছু জানেন না আপনি। আমি তো মীনু।

সুবোধ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম বুঝি মীনু ?

না,—মেয়েটি ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে,—সবাই আমায় ঐ বলে ডাকে। আমার আসল নাম মীণাক্ষী।

ও—তা বাড়ী কোথায় তোমাদের ?

ঐ—বলে মেয়েটি পিছনের একটি বাগানবাড়ী দেখিয়ে দিলে।

ঐ তোমাদের বাড়ী ?—সুবোধ সবিস্ময়ে বললে,—নিজেদের বাড়ী তোমাদের ? বরাবর ওখানেই থাক তোমরা ?

এমনিভাবে আলাপের সূত্রপাত। মীনুর কাছ থেকেই সুবোধ জানতে পারলে, বাড়ী তাদের পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলায়। তার বাপ কনট্রাক্টর। কলকাতার বালিগঞ্জে তারা থাকত; মাত্র মাসখানিক হল বোমার ভয়ে সহরের বাইরে এই বাগানবাড়ীতে উঠে এসেছে। বাপ ব্যবসাটা গুটিয়ে নিলেই তারা সবাই দেশে চলে যাবে। বাড়ীতে তার ভাই-বোন আর কেউ নেই। তার মা-ও বিকেল হলেই প্রায়ই তার বাপের সাথে কলকাতায় চলে যায়—এক এক দিন ফিরতে বেশ রাতই হয় তাদের। কলকাতায় মীনুর অনেক খেলার সাথী ছিল—সবাই বাঙ্গালী,—তাদের কাছেই তো সে বাঙ্গলা বলতে শিখেছে। কিন্তু এখানে তার সাথী একটিও নেই। রোজই বৈকালে একা একাই সে এই মাঠে খেলা করে। কোন দিন দারোয়ান সাথে আসে, কোন দিন আসে না। এলেও সে কোন দিনই তার সাথে খেলতে চায় না,—

কেবল এক জায়গায় বসে খৈনী টিপতে থাকে। তাতে অবশ্য মীনুর কোন অসুবিধা হয় না,—একা একাই অনেক রকমের খেলা খেলতে পারে সে।

শেষের কথাটা শুনে সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমার সাথে খেলবে তুমি ?

খেলবেন আপনি ?—মেয়েটি আগ্রহের স্বরে বলে উঠল,—আসুন তবে। কি খেলবেন, বলুন—কিৎ-কিৎ—চোর-চোর—না কুমীর-কুমীর ?

সুবোধ একটু ভাববার ভাণ করে পরে বললে, চোর-চোরই ভাল ; কিন্তু বুড়ী কে হবে ?

কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করে মীনু উত্তর দিলে, তার জন্য কিছু ভাবনা নেই। গাছের ঐ গুঁড়িটাই হবে আমাদের বুড়ী। কিন্তু চোর হবেন আপনি। আসুন,—চোখ বেঁধে দিই আপনার। রুমাল আছে ?—বলে মেয়েটি নিজেই সুবোধের পকেট খুঁজতে সুরু করে দিলে।

কিন্তু খেলা সুরু হবার আগেই বাধা পড়ল। মীনুদের হিন্দুস্থানী দারোয়ান কোথা থেকে যেন ছুটতে ছুটতে এসে বললে, ঘর চলো বব্‌নী,—জলদি ;— তার পর সুবোধের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আপ কৌন হৈঁ, বাবুসাব !—

সুবোধের হয়ে মীনুই উত্তর দিলে, উনি আমার কাকাবাবু।

দারোয়ান মুখখানা হাসবার মত করে বললে, বহুত আচ্ছা ; আপ ঘর চলিয়ে।

নেহি জাউঙ্গী—মীনু মাথা ঝেঁকে বলে বসল।

কিন্তু সুবোধ দাঁতে জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললে, না, মীনু—তুমি এখন বাড়ী যাও।

দারোয়ানও তাড়া দিয়ে বললে, জলদি চল্‌ চলিয়ে ; মাইজী বোলা রহী হৈঁ।

মীনু তার মুখের দিকে চেয়ে সংশয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, মাতাজী আয়ী হৈঁ ?

উত্তর হল, হাঁ জী—বহুত দের হুয়া আয়ী—উন্‌হোনে হি তো আপকো বোলায়ী।

সুবোধ আবার বললে, যাও মীনু—এখন বাড়ী যাও।

কিন্তু মীনু তার হাত চেপে ধরে বললে, তবে আপনিও চলুন কাকাবাবু।

সে কি!—সুবোধ বিব্রত হয়ে বললে,—আমি কোথায় যাব?

মীনু উত্তরে রীতিমত আবদার সুরু করে দিলে, চলুন, কাকাবাবু—আপনাকে যেতেই হবে আমাদের বাড়ীতে। বেশী দূর তো নয়—ঐ তো!—

যেতেই হল। মীনু কিছুতেই তার হাত ছাড়লে না,—টানতে টানতে একেবারে সুবোধকে তার মায়ের কাছে নিয়ে হাজির করলে।

এমনিভাবে ঐ ছোট মেয়েটির মধ্যস্থতায় তার মা-বাপের সঙ্গে ঐদিনই সুবোধের পরিচয় হয়ে গেল। তারা পাঞ্জাবী হিন্দু; দুজনেই উচ্চশিক্ষিত, দুজনেই উদার মতাবলম্বী। সুবোধকে তারা সমাদর করে অভ্যর্থনা করলে। সে চাকরি নিয়ে কেরাণীপাড়ার বাস না করে মজদুরের বস্তিতে থেকে শ্রমিক আন্দোলন চালায় শুনে তাদের কারও ভুরুই উঁচু হয়ে উঠল না। ট্রেড্ ইয়ুনিয়ন, বর্ত্তমান যুদ্ধ এবং কংগ্রেসের রাজনীতি সম্বন্ধে তারা বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আলোচনা করলে। পরম আন্তরিকতার সঙ্গে সুবোধকে তারা চা ও জলখাবার খাওয়ালে এবং নিজেরাই অনুরোধ করে মীনুকে দিয়ে দুখানা গানও গাওয়ালে। এই সব অনুষ্ঠানের পর বিদায় নেবার জন্য সুবোধ যখন উঠে দাঁড়াল তখন রাত প্রায় নটা।

মীনুর দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে সুবোধ বললে, চললাম মীনু।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মীনু একটা কাণ্ড করে বসল।

তরাক্ করে সোফার উপর লাফিয়ে উঠে দুহাতে সুবোধের গলা জড়িয়ে ধরে কতকটা আবদার, কতকটা হুকুম ও কতকটা ক্রন্দনের স্বরে সে বললে, না, যেতে দেব না তো আপনাকে—না, কক্ষনো না;—আগে বলুন, কাল আবার আসবেন? শুধু কাল নয়, রোজ রোজ;—রোজ এসে আমার সাথে খেলবেন—তবে; নইলে কিছুতেই যেতে দেব না;—বলুন,—হ্যাঁ কাকাবাবু, বলুন না।—

সুবোধ বিব্রত হয়ে পড়ল। তার কোন উত্তর না পেয়ে মীনু অবশেষে তার মায়ের কাছেই আবেদন পেশ করলে, বলে দাও না, মা,—হ্যাঁ মা, তুমি বল না কাকাবাবুকে—রোজ আসতে বলে দাও।

ভদ্রমহিলাটি হাসিমুখে সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, শুনলেন তো মেয়ের হুকুম? ও আপনাকে তামিল করতেই হবে। যে কটা দিন আমরা এখানে আছি সে কদিন রোজ বৈকালে এখানে আপনার আসা চাইই।

ভদ্রলোকটিও ঐ অনুরোধ সমর্থন করে বললে, বড় সুখী হব মিঃ ব্যানার্জ্জী— সময় করে আসতে যদি পারেন—মানে, মেয়েটার স্বভাবই ঐ।

উত্তরে সুবোধ মীনুর কপালে একটা চুমো খেয়ে তাকেই সম্বোধন করে বললে, আমি ঠিক আসব, মীনু,—রোজ আসব,—একদিনও বাদ যাবে না।

সেই থেকেই গঙ্গার ধারের ঐ বাগানবাড়ীখানি সুবোধের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। বৈকাল হলেই মীনুর টানে সে ঐ বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। তার পর কোথায় থাকে তার মজদুর ইয়ুনিয়ন, কোথায় থাকে জনযুদ্ধ, আর কোথায় থাকে ঐ নিয়ে দলাদলি! সাত-আট বছরের ঐ শিশুটির হাত ধরে সে যেন চক্ষের নিমেষে প্রায় দুইটি যুগ অতিক্রম করে নিজের বিস্মৃত শৈশবের খেলাঘরে আবার ফিরে যায়,—দুই অসমবয়সী খেলার সাথীর আনন্দকলরবে জনশূন্য গঙ্গাতীর রোজই মুখরিত হয়ে উঠতে থাকে।

এসব সুবোধ পরে খুলে বললে; কতক আবার সুভদ্রা নিজেই আন্দাজ করে নিলে। প্রথমে সুবোধ এমন ভাব দেখালে যেন সুভদ্রার উপর দিয়ে মস্ত বড় একটা বাজি সে জিতে নিয়েছে। পরাজিতের মুখ থেকে একটিমাত্র স্বীকারোক্তি আদায় করেই তার তৃপ্তি হল না। সে আবার বললে, এমনটি আগে কখনও দেখেছেন, সুভদ্রাদেবী? সত্যি বলুন,—ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলুন তো!—

সুভদ্রা মীনুর মুখের দিকে চেয়েই উত্তর দিলে, দেখেও যদি থাকি তো এমন আগে কখনও কোলে নিই নি নিশ্চয়ই।—বলতে বলতে মীনুকে সে আরও জোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরলে।

মীনুর দিব্য সপ্রতিভ ভাব। সুভদ্রার আদর সে পুরাপুরিই উপভোগ করলে; আরও একটু আদায় করে নেবার জন্যই যেন সে ছোট হাতদুখানা বাড়িয়ে সুভদ্রার গলা জড়িয়ে ধরে তার ডান কাঁধের উপর দিয়ে নিজের মুখখানা তার ঘাড়ের কাছে ভিজে, খোলা চুলের আড়ালে পলকের জন্য লুকিয়ে ফেললে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মুখ বের করে ঈষৎ একটু ঘাড় বেঁকিয়ে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সহাস্য চোখের কালো তারাদুটিকে নাচাতে নাচাতে সে বললে, আমি জানি,—কাকীমা,—না কাকাবাবু?

সুবোধ ও সুভদ্রা একসঙ্গেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল; এক সঙ্গেই দুখানা মুখই লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সুবোধ সশব্দে হেসে উঠে বললে, কাকীমাই বটে—তবে আর এক কাকাবাবুর। জান মীনু ?—তোমার সে কাকাবাবু আছেন এলাহাবাদে।

মীনু বললে, এলাহাবাদ আমি চিনি।

আরক্তমুখী সুভদ্রা মীনুকে আরও জোরে বুকে চেপে তার ছোট মুখখানিকে চুমায় চুমায় আচ্ছন্ন করে দিলে।

হয় তো অতিশয্যের জন্যই হবে, এবার মীনু বিব্রত হয়ে বললে, আঃ, ছাড়ুন না,—আমি কি বেবি যে খালি কোলে চড়ে থাকব ?

সুবোধ আবার হো হো করে হেসে উঠল; সুভদ্রা মীনুর গাল টিপে দিয়ে বললে, না,—তুমি বেবি কেন হবে !—তুমি যে বুড়ী—আমার ঠাকুরমা'র বয়সী।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাকে কোল থেকে নামিয়েও দিলে সে।

ঘরে গিয়ে সুবোধ বললে, বাড়ীতে সম্মানিত অতিথি এসেছে; তার উপযুক্ত সংকারের জন্য কি ব্যবস্থা হবে, সুভদ্রাদেবী ?

এতক্ষণ কথাটা সুভদ্রার মনে পড়ে নি; সে বিপন্ন মুখে বললে, দেখুন তো, কি কাণ্ড আপনার! আগে যদি সামান্য একটু আভাষও দিয়ে রাখতেন! এখন কি ওকে খেতে দিই ?—

সুবোধ কুণ্ঠিত হয়ে বললে, তবে যাই—বাজার থেকে কিছু কিনে আনি গে।

কিন্তু সুভদ্রা হা হা করে উঠল; বললে, না না,—কিছু আনতে হবে না আপনাকে। একে বাজারের খাবার, তায় আবার মজদুর বস্তির বাজার। ঐ সব বাজে জিনিষ ওকে আমি খেতে দেব নাকি ? বসুন আপনি; আমি যা পারি চট্ করে ঘরেই করে দিচ্ছি। কিন্তু দুঃখ এই,—কথাটা সে মীনুর মুখের দিকে সতৃষ্ণ-চোখে তাকিয়ে শেষ করলে,—এতক্ষণ ওকে চোখের আড়াল করে রাখতে হবে। আমি না পারি এই খাবার করাটা বাদ দিতে, না পারি ওকে ঐ ছোট্ট রান্নাঘরের ভিতরে নিয়ে বসাতে।

সুবোধ একটু চিন্তা করে বললে, তাহলে রান্নার জিনিষগুলিই এই ঘরে নিয়ে আসুন না কেন ? সবাই কাছাকাছি বসা যাবে তাহলে।

সুভদ্রা উৎফুল্ল হয়ে বললে, তাই ভাল।

তার পর সুবোধ আর সুভদ্রা দুইজনে মিলে ষ্টোভ, কড়া প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষ কটি মাঝের হলঘরে বয়ে নিয়ে এল। সুবোধ ষ্টোভ ধরাতে বসল; সুভদ্রা থালায় ময়দা ঢেলে মাখতে আরম্ভ করলে। চাকী-বেলুন-ময়দা দেখে মীনু আগ্রহের স্বরে বললে, আমি লুচি বেলব, কাকীমা!—

সুভদ্রা হেসে বললে, না, মা,—তার চেয়ে তুমি আমার কাছে বসে গল্প কর।

সুবোধ বললে, আপনার হাতদুখানা অচল হয়ে যাবার আশঙ্কা যদি না থাকত তো মীনুকে আমি গান গাইতে বলতাম।

হ্যাঁ?—সুভদ্রা আবার উৎফুল্ল হয়ে বললে,—মীনু গাইতে জানে নাকি?

না, কাকীমা,—মীনু হাসিমুখে প্রতিবাদ করে বললে,—কিছু জানি নে আমি। কাকাবাবু অমনি মিছামিছি—

কিন্তু তার প্রতিবাদটাকে উপেক্ষা করেই সুবোধ বললে, খালি কি গান? মীনু নাচতেও যা জানে!—

হ্যাঁ, জানি বই কি! খালি মিছে কথা বলছেন আপনি!—বলতে বলতে—মীনু দু'জোড়া সহাস্য কটাক্ষের একমাত্র লক্ষ্যস্বরূপ নিজের সলজ্জ হাসিমুখখানা লুকাবার জন্য তেমন ভাল, নিরাপদ আর কোন জায়গা কাছাকাছি খুঁজে না পেয়ে অবশেষে সুভদ্রার কোলের মধ্যেই গুঁজে দিয়ে তখনকার মত আত্মরক্ষা করলে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে গাইতে হল, নাচতেও হল। নির্জ্জন মাঠের মধ্যে সুভদ্রার নিরানন্দ গৃহখানি সেদিন সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত হাসি, গল্প, গান আর নাচের শব্দে মুখরিত হয়ে রইল।

বিদায়ের আগে মীনুকে আর একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সুভদ্রা বললে, আবার কবে আসবে মা? আগে বল, নইলে ছেড়ে দেব না।

মীনু উৎসাহের স্বরে উত্তর দিলে, আবার আসব দশেরার পর।

ওমা—সে কি কথা!—সুভদ্রা দুই চোখ বড় করে বলে উঠল,—দশেরা তো আসবে সেই এক বছর পর। অত দিন তোমায় না দেখলে তোমার কাকীমা যে মরে যাবে, মীনু। না, না,—তা হবে না; আবার কালই আসতে হবে তোমায়। কেমন—আসবে তো?

কাল কেমন করে হবে কাকীমা?—মীনু চিবুক, ঠোঁট এবং চোখ সব

এক সঙ্গে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে নাচিয়ে তুলে উত্তর দিলে,—কাল তো আমরা দেশে যাব। ফিরে আসব সেই দশেরার পর।

সুভদ্রার বিহ্বল চোখদুটি বিদ্যুদ্বেগে সুবোধের মুখের উপর গিয়ে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে মৃদু স্বরে সুবোধ বললে, হ্যাঁ, সুভদ্রাদেবী, কালই ওঁরা সবাই দেশে যাচ্ছেন। সেই জন্যই তো ওর মাকে বলে আজ ওকে এখানে নিয়ে এলাম।

পরদিন সন্ধ্যার আগেই সুবোধ আবার সুভদ্রার বাসায় এসে উপস্থিত হল। জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হল না। তার মুখের দিকে চেয়েই সুভদ্রা বুঝতে পারলে যে মীনুরা চলে গিয়েছে। সুবোধ নিজে মীনুর নামও করলে না। কথা যা হল তার সবই অসংলগ্ন। দুজনেই মনে মনে বুঝলে যে তাদের মনের প্রধান চিন্তার সম্পর্কে তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। আলাপ মোটেই জমল না। আধ ঘণ্টাখানিক পর বিদায় না নিয়েই সুবোধ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

সুভদ্রাও উঠল; মনের কথাটা মনের মধ্যে আর চেপে রাখতে না পেরে এবার সে বলেই ফেললে, মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে আপনার,—না, সুবোধবাবু?

সুবোধের ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত একটু হাসি ফুটে উঠল; কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, কৈ—না তো! খারাপ কেন হবে?

উত্তরটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সুভদ্রা একদৃষ্টে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ স্বরে বললে, অমনি একটি মেয়ে যদি আপনার নিজের থাকত, সুবোধবাবু,—সে বেশ হত, না?

যান—কি যে বলেন!—বলেই সুবোধ মুখ ফিরিয়ে নিলে।

আর এক মুহূর্ত্তও সে ওখানে দাঁড়াল না।

(৪)

গাড়ীর ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে অরুণাংশু তার চাকরটাকে হাঁক দিয়ে বললে, বাড়ীর চাবিটা তোদের দিদিমণিকে দিয়ে দিস, আর তুই নিজে যদি দেশে যেতে চাস তো যেতে পারিস।

তার পরেই নিজে সে কাৎ হয়ে আধশোয়া অবস্থায় আধখানা মুখ গাড়ীর বাইরে বের করে চোখ বুজলে। প্রকাণ্ড গাড়ীটার অপর প্রান্তে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে মহামায়াদেবী গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

একটু আগেই সুভদ্রাকে নিয়ে যে সব কাণ্ড হয়ে গিয়েছে এ তারই প্রতিক্রিয়া। মা ও ছেলের মধ্যে কথা একটাও হল না।

প্রকাণ্ড গাড়ীটা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কলকাতার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। অগণিত বস্তি, গুটিকয়েক পল্লীগ্রাম, ছোটখাটো একটা অরণ্য এবং দুই দুইটি সহর অতিক্রম করে একেবারে হাওড়ার পোলের কাছে এসে তবে সেটা থামল,— তা-ও নিজের গরজে নয়, ভীড় ঠেলে একটানা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না তাই। ব্রেইক কষতে হল বলে ভিতরে একটু ধাক্কা লাগল। অরুণাংশু চমকে উঠল,— এতক্ষণ পর চোখ মেলে তাকিয়ে সোজা হয়ে বসল সে।

কিন্তু সেটা যে হাওড়া, তাদের গন্তব্যস্থান বালিগঞ্জ নয়, শুধু এইটুকু বুঝবার পরেই অরুণাংশু আবার কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। সীট আর হাতের মাঝখানে এমন-ভাবে সে মুখখানাকে লুকিয়ে ফেললে যে, এক মাথার চুল ছাড়া আর কিছুই যেন আর কেউ দেখতে বা ছুঁতে না পারে।

মহামায়াদেবী কথা বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু অরুণাংশুর কাছে আমল না পেয়ে চুপ করে যেতে হল তাঁকে।

এর পর গাড়ী গিয়ে থামল একেবারে প্রতুলবাবুর বাড়ীর গাড়ীবারান্দার নীচে।

অরুণাংশু আবার চমকে চোখ মেলে সোজা হয়ে বসল। মনটা তখনও তার আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে; দুই চোখে রয়েছে তন্দ্রার জড়িমা। অবস্থাটা তৎক্ষণাৎ ঠিক ঠিক সে বুঝতে পারলে না; ভাল করে কিছু দেখতেও পেলে না সে। মুহূর্তের জন্য মোটরের চকিতস্ফুরিত সন্ধানী আলোর দীপ্তিতে দুএকটি থাম, কয়েকটি ফুলের চারা, এবং কাঁকরবিছানো খানিকটা রাস্তা মোটা মোটা কয়েকটি রেখায় ফুটে উঠেই আবার অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তার পর চারিদিকেই সূচিভেদ্য অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষের নীবিড় অন্ধকার রঙকরা বাড়ীর অনালোকিত বারান্দায় দেয়াল, পর্দা আর থামের বেষ্টনীর মধ্যে আরও নীবিড়, আরও কালো হয়ে জমে রয়েছে। শব্দের মধ্যে কেবল মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনটার একটানা মৃদু ধক্ ধক্ শব্দ।

ওরই মধ্যে একটা উদ্বিগ্ন, গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—কে—বৌদি এলেন নাকি? ও সুরপতিবাবু?—

ঐ সঙ্গে আবার চটির চট্‌পট্ আওয়াজ। সাপের জিভের মত টর্চ্চলাইটের লিক্-লিকে আলো হঠাৎ একবার অন্ধকারের বুকে ঝিলিক্ দিয়ে ফুটে উঠল। তার পরেই

আবার সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তাই তো—বৌদিই তো! এত দেরী হল কেন আপনাদের?—অরুণ এসেছে তো?—আমরা যে এদিকে ভেবে মরি!—ঠিকই তো—ও অনু—শীগগির এস তো মা—এরা যে এসেছেন—ও অনু—

দূরে, উপরের দিকে কোথায় যেন উল্লসিত নারীকণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠল, এসেছেন?—এই যাচ্ছি বাবা।

চারিদিক অন্ধকার; চোখে কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে টর্চের আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু তাতে অন্ধকার আরও যেন গভীর মনে হয়। শোনা যাচ্ছে কেবল ধ্বনি,—চটির চট্‌পট্, শাড়ীর খস্‌খস্, চুড়ির টুংটাং এবং গম্ভীর পুরুষকণ্ঠের সমবেত অনৈক্যতানের সঙ্গে পরিপূর্ণ সঙ্গতিতে হাস্যোচ্ছল নারীকণ্ঠের কোমল, মধুর, ছন্দোময় কলঝঙ্কারধ্বনি। ওরই সঙ্গে নাকে এসে ঢুকছে হাল্‌কা রকমের ভারি মিষ্টি একটি গন্ধ।

অন্ধকারের বিরাট, শান্ত, মহাসমুদ্র সহসা যেন শব্দ ও গন্ধের তরঙ্গ তুলে ছুটে এসে সদ্যনিদ্রোত্থিত অরুণাংশুর বুকে, পিঠে, মুখে ও মাথায় অসংযত উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শীগগির এস মা—

কৈ—অরুণদা এসেছেন তো! হ্যাঁ, জেঠিমা, অরুণদাকে আনতে পেরেছেন? কৈ—কিছুই দেখা যাচ্ছে না তো? বারান্দার আলোটা জ্বেলে দাও না, বাবা,—এ যে—ও বাবা—

না, মা, না,—আলো নয় মা, আলো এখানে নয়,—একেবারে ঘরে নিয়ে চল ওঁদের—ও বৌদি—

না, বড্ড ভয় পাও তুমি, বাবা,—জ্বাল না আলোটা;—এক মিনিট আলো জ্বাললেই বোমা এসে আমাদের মাথায় পড়বে নাকি?

বোমা নয় মা, বোমা নয়,—এ আর পি—বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর—তুমি কিছু বোঝ না, মা,—

তুমি আবার বড্ড বেশী বোঝ, বাবা,—কেন, এ আর পি'কে অত ভয় কেন তোমার?—আচ্ছা, আচ্ছা,—জ্বাল তো টর্চটা—এই তো অরুণদা—ঠিকই তো,—কেমন, চিনতে পারছেন আমায়?—

এমনি সব অনর্গল, অসংলগ্ন কথা। অরুণাংশুর মাথায় কিছুই ঢুকল না; তার বিহ্বল মনটা আরও বিহ্বল হয়ে পড়ল। কেমন করে সে যে গাড়ী থেকে নামল,

কে যে হাত ধরে তাকে নীচে থেকে সিঁড়ি দিয়ে উপরের বারান্দায় এবং সেখান থেকে সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমের ভিতরে নিয়ে গেল, সে তা বুঝতেই পারলে না। কিন্তু পরদা ঠেলে আলোকিত ঘরের মধ্যে ঢুকেই সে সচকিত বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ঠিক তার চোখের সামনেই একটি মেয়ে,—বছর কুড়ি বয়সের সুন্দরী তরুণী। যেমন রূপ, তেমনি সাজ। গায়ে গোলাপী সিল্কের আঁটা-সাঁটা হাতকাটা ব্লাউজ, পরণে ঐ রঙেরই সিল্কের শাড়ী,—তেমনি আঁট করে পরা। টক্‌টকে লাল ফুল আর ঝক্‌ঝকে সবুজের পাতাতোলা শাড়ীর পাড়ে জরির বিচিত্র কারুকার্য্য। ততোধিক বিচিত্র কারুকার্যখচিত জড়োয়া অলঙ্কার তার সারা গায়ে। আঙ্গুলের আংটি, হাতের চুড়ি, গলার হার ও কানের দুলের পাকা সোনা আর দামী পাথরগুলি উজ্জ্বল বিজলির আলোকে ঝলমল করে জ্বলছে। দৈহিক সৌন্দর্য্যেরও তুলনা হয় না। পরিণত ও সুগঠিত নারীদেহ যৌবনের বিচিত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ,—দেহের সীমার মধ্যে আর ঠাঁই না পেয়েই লাবণ্য যেন দুকূল ছাপিয়ে উপচে পড়ছে। পরিণত চিবুক, পাতলা, সরস ঠোঁটদুটি, সকলের আগে চোখে পড়ার মত নাক, চঞ্চল কালো তারাবিশিষ্ট উজ্জ্বল দুটি চোখ এবং এক ফালি চাঁদের মত চিকণ, নির্ম্মল ললাটটি নিয়ে অতি চমৎকার গড়নের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখখানিকে ঘিরে তরঙ্গিত ঘন চুলের রাশি একটিমাত্র বেণীর বন্ধনের মধ্যে সংযত হয়ে বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে এসে বুকের উপর লতিয়ে পড়েছে। সোনা আর দামী পাথরের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন প্রতিমুহূর্ত্তেই সহস্র ধারায় ফেটে ফেটে পড়ছে তার চোখ আর ঠোঁটদুটি থেকে সকৌতুক হাস্যের বিচিত্র বিদ্যুদ্দীপ্তি।

বাইরের নীবিড় অন্ধকার থেকে আলোকিত ঘরের মধ্যে ঢুকতেই অরুণাংশু দেখলে জীবন্ত এই বিদ্যুৎশিখা ; চোখদুটি তার ঝলসে গেল।

মেয়েটি কিন্তু খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললে, এ কি অরুণদা—আপনি যে আমায় চিনতেই পারছেন না! আচ্ছা, আচ্ছা, সে বোঝাপড়া পরে হবে'খন—এমন ঝগড়া করব আপনার সাথে!—দাঁড়ান—প্রণামটা সারি আগে।—

বলতে বলতেই সে নত হয়ে অরুণাংশুর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে।

অরুণাংশু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পিছিয়ে গিয়ে বিহ্বল চোখে তার মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু মেয়েটি অসহিষ্ণুর মত বললে, আঃ—দাঁড়ান না, অরুণদা,—পায়ের ধুলো নিই আগে ;—বলতে বলতেই সে এবার সত্য সত্যই অরুণাংশুর পা ছুঁয়ে তাকে প্রণাম করলে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতুলবাবু এগিয়ে এসে অরুণাংশুর হাত ধরে বললেন, এস, বাবা, এস, বোস আগে। ও আমার মেয়ে—অনামিকা,—আমরা ডাকি অনু,—একটা পাগলী আর কি! তুমি যখন ওকে দেখেছিলে তখন ও ছিল অনেক ছোট—এখন বেড়েছে, হয়তো সেই জন্যই চিনতে পারছ না তুমি। কিন্তু আমি?—আমি তো বদলাই নি অরুণ,—আমায় চিনতে পারছ তো?

অরুণাংশুর মুখে উত্তর ফুটবার আগেই মহামায়াদেবী তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোর কাকাবাবুকে প্রণাম কর, রুণু।

অরুণাংশু যুক্তকর ললাটে ঠেকিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল,—মহামায়াদেবী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, ও কি হচ্ছে?—গুরুজনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হয় না?

অরুণাংশু যন্ত্রচালিতের মতই হাঁটু গেড়ে বসে প্রতুলবাবুর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু প্রণাম শেষ হবার আগেই প্রতুলবাবু দুই হাত বাড়িয়ে অরুণাংশুকে প্রায় বুকের কাছে টেনে এনে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, বেঁচে থাক, বাবা,—বেঁচে থাক। এস,—বোস আগে,—এইখানে, আমার কাছে এসে বোস। তার পর?—দেখ তো কি কাণ্ড! এই তুমি আমার এত কাছে রয়েছ—এক দিন দুদিন নয়, শুনছি প্রায় দুবছর। অথচ আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি নে। সেদিন রমেনদার চিঠি পেয়ে আমি তো একেবারে অবাক। তার পর বৌদি যখন এলেন—শুনলাম তাঁর কাছে তোমাদের এই মহাভারতের গল্প। কি যে কাণ্ড—যেমন আমার রমেনদা, তেমনি তুমি। তিলকে তাল বানিয়ে জীবনের সোজা সুতোটাতে অকারণে জটিল গ্রন্থি দিয়ে দিয়ে তোমরা দুজনে কি যে সব করেছ—শুনে আমার তো—

বলতে বলতে কথাটা শেষ না করেই প্রতুলবাবু নিতান্ত ছেলেমানুষের মতই একেবারে হো হো করে হেসে উঠলেন।

কেবল প্রতুলবাবুই নন, অনামিকাও শব্দ করে হেসে উঠল,—তারও সেই প্রাণখোলা খিল্ খিল্ হাসি।

বিহ্বল অরুণাংশুর মনে হতে লাগল যে, চোখের সামনে যা সে দেখছে, তার কিছুই সত্য নয়;—তার মায়ের সঙ্গে হুগলী থেকে সে মোটে চলেই আসে নি,—জেমসন-টমসন কোম্পানীর লোহার কারখানার মজদুর বস্তিতে তারই খোলার ঘরের বাসায় দড়ির চারপাইএর উপর শুয়ে বিকারের ঘোরে সে যেন একটা স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু ওদিকে ঘরের মধ্যে যে হাসির তুফান উঠেছিল, তা গেল থেমে। হাসি থামিয়ে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, তা অরুণ, বাপের উপর রাগ করেই হউক, আর দেশের কাজ করবার একটা প্রবল প্রেরণার বশেই হউক, সংসার ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, শিক্ষাদীক্ষা সব বিসর্জ্জন দিয়ে তুমি মজদুরের বস্তিতে গিয়ে আস্তানা পাতলে কেন? ছিঃ ছিঃ!—দেখ তো, শরীরটার কি অবস্থা করে ফেলছ? দেশের কাজ করতে হলে কি ছোট লোকদের বস্তিতে গিয়ে আত্মহত্যা করতে হবে?

আচ্ছা, অরুণদা,—এবার কথা বললে অনামিকা; অরুণাংশুর দিকে একটু ঝুঁকে ঠিক তার চোখের দিকে চেয়ে বললে,—কি আপনি ওখানে করতেন? বন্দে মাতরম্ আর ইন্‌কালাব্ বলে মজদুর নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়ানো? তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে ধর্ম্মঘট করানো? তাতেই বুঝি স্বরাজ হবে? হ্যাঁ, অরুণদা,—বলুন না আমাকে!—

অরুণাংশুর মনটা তখন আলোর চেয়েও দ্রুততর বেগে হুগলী থেকে কলিকাতা আর কলিকাতা থেকে হুগলীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা ঘর যেন সৌন্দর্য্য আর ঐশ্বর্য্যের প্রদর্শনী; আর একটা নীচু চালের স্যাঁৎসেঁতে খোলার ঘর—আলো নেই, আসবাব নেই; চালে ঝুল, দেয়ালে মাকড়সার জাল, চারিদিকে দুর্গন্ধ। দুটি ঘরে দুটি মেয়ে! একটি আগুনের শিখার মত দীপ্ত, ভুরু আর ঠোঁটের কোণটা সামান্য একটু বেঁকে গিয়েছে, কৌতূহল আর কৌতুকে চোখের তারাদুটি নেচে বেড়াচ্ছে; সমগ্র মুখখানিতে ফুটে উঠেছে একটা অনির্ব্বচনীয় তীক্ষ্ণতা। আর একটি মেয়ে সর্ব্বতোভাবেই বিপরীত,—অতি সাধারণ গঠন, ময়লা রঙ, রাত্রির মত গম্ভীর, পাথরের মত কঠিন, বিস্ফারিত চোখদুটিতে আহত পশুর সকাতর দৃষ্টি। অরুণাংশুর মনে হতে লাগল যে, ঠিক যেন তার চোখের সামনেই দুটি ছবি পাশাপাশি ফুটে রয়েছে!

কিন্তু একটি ছবি কেঁপে উঠল। অনামিকার চোখের তারাদুটির সঙ্গে সঙ্গে তার কানের দুলের লাল পাথর দুখানি আর বেণীর ডগার জরির ফিতাটা হঠাৎ যেন অরুণাংশুর চোখের সামনে রামধনুবর্ণের বিচিত্র একটা বিদ্যুদ্দীপ্তি ফুটিয়ে তুললে।

একটা উদ্দাম ভঙ্গীতে মাথাটাকে পিছনের দিকে হেলিয়ে, ঠোঁটদুখানিকে আরও একটু বেঁকিয়ে অনামিকা আবার বললে, মা গো, মা,—ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয় আমার। শুনে আমি তো আর বাঁচি নে। বস্তির খোলার ঘর, নীচু চাল, স্যাঁতসেঁতে কাঁচা মেঝে, চারিদিকে নোংড়া—আলো নেই, হাওয়া নেই,—সেখানে আপনি দুদুটি বছর কাটিয়েছেন!—

মিষ্টি কণ্ঠস্বর বিদ্রূপে কঠিন হয়ে বাজল। তীক্ষ্ণ ধ্বনি গিয়ে আঘাত করলে অরুণাংশুর আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে। অনুভূতির তন্দ্রা যেন ভেঙে গেল। চমকে নিজের চারিদিকে চেয়ে দেখলে অরুণাংশু,—কঠিন বাস্তব,—অস্বীকার করবার উপায় নেই,—চোখের সামনে অপর ছবিখানি ধীরে ধীরে যেন ফিকে হয়ে আসছে। মানতে হল তাকে যে, সে হুগলী ছেড়ে এসেছে,—কেবল যে আর একটা জায়গায় তাই নয়, একেবারে ভিন্ন একটা জগতে।

হ্যাঁ, অরুণদা,—অনামিকার সকৌতুক কণ্ঠস্বর আবার তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল,—সত্যি, ঐরকম জায়গা? সত্যি অত বিশ্রী?

কেমন একটা তিক্ত বিরক্তি, কি যেন একটা নীবিড় বিতৃষ্ণায় মন বিষিয়ে গেল অরুণাংশুর; মুখ ফিরিয়ে শুষ্ক, নীরস, গম্ভীর স্বরে সে বললে, হ্যাঁ, সত্যি।

কিন্তু তার ভাবান্তরটাকে অনামিকা লক্ষ্যই করলে না; ভারি মিষ্টি একটা ভঙ্গীতে নিতান্ত ছেলেমানুষের মত মাথা দুলিয়ে প্রায় আবদারের স্বরেই অনামিকা বললে, বড্ড দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল আমার। আমি যেতে চেয়েছিলাম। সত্যি,—বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার? আচ্ছা, জেঠিমাকে জিজ্ঞেস করুন তো,—উনিই তো যেতে দিলেন না,—আমাকেও নয়, বাবাকেও নয়। নইলে—

তুই থাম্ তো পাগলী,—প্রতুলবাবু হাসিমুখেই মেয়েকে একটা ধমক দিয়ে বললেন,—কি যে বক্ বক্ সুরু করেছিস!—

অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে তিনি আবার বললেন, কিছু মনে করো না, বাবা,—ও একটা আস্ত পাগলী!—

ফিরে অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এদিকের ব্যবস্থা সব ঠিক আছে তো, অনু? অরুণের শোবার ঘরটা ঠিক করা হয়েছে?

নিশ্চয় হয়েছে,—অনামিকা গর্বিত, ঈষৎ উদ্ধত স্বরেই উত্তর দিলে,—তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, বাবা,—সব আমি ঠিক করে রেখে এসেছি।

তা হলে, অরুণ,—প্রতুলবাবু আবার অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—খাবার সময় তো প্রায় হয়ে এল। একেবারে খেতেই বসবে, না তার আগে একটু চা?—

উত্তর না দিয়ে অরুণাংশু বিপন্ন মুখে তার মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মহামায়াদেবী সেটা লক্ষ্য করে বললেন, চা খাবি তুই?

না, চা নয়,—একটা ঢোক গিলে অরুণাংশু উত্তর দিলে,—একটু জল।

প্রতুলবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—ও,—জল খাবে তুমি?

অনামিকা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি আনছি, বাবা।

অরুণাংশু বিব্রত হয়ে পড়ল; অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে ফেললে সে,—না, না,—আপনাকে উঠতে হবে না। আপনি কেন?—সঙ্গে সঙ্গেই তার নিজের ডান হাতটা উঠে পড়ল অনামিকাকে বাধা দিয়ে নিরস্ত করবার জন্য।

মুহূর্ত্তমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। হঠাৎ যেন একটা আঘাত পেয়ে অনামিকা এক পা পিছনে হটে গেল; দুই চোখ প্রায় কপালে তুলে সে বলে উঠল,—ওমা!—সে আবার কি!—

পরক্ষণেই হাসির একটা ফোয়ারা যেন প্রবল বেগে উর্দ্ধে উঠেই ফেটে গিয়ে সহস্র ধারায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খিল খিল করে হেসে উঠে অনামিকা বললে, ও কি অরুণদা, আমায় 'আপনি' বলছেন কেন? আমি যে আপনার কত ছোট! ছেলেবেলায় কতদিন যে আপনি আমায় 'তুই' বলে গাল দিয়েছেন!—

হাসির ঘটা দেখে অরুণাংশু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, কথা শুনে সে ঘেমে মুখ নামিয়ে নিলে।

কিন্তু একটু থেমেই অনামিকা আবার বললে, শুধু কি তাই! পড়াতে বসিয়ে পড়া পারি নি বলে কতবার আমার কান মলে দিয়েছেন, তা মনে নেই আপনার? মা গো, মা!—কি ভোলা মনও মানুষের হয়। আর আমার কানে এখনও সেই কানমলার জ্বালা রয়েছে! কেন? মিছে কথা বলছি আমি? আচ্ছা, বাবাকে জিজ্ঞেস করুন তো—দেন নি উনি আমার কান মলে?—সেই যে সেবার তোমার কাছে নালিশ করেছিলাম? আচ্ছা, না হয় জেঠিমাকেই জিজ্ঞেস করছি—

আঃ—থাম্ তো তুই!—প্রতুলবাবু আবার মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন,—কি যে ছাইপাঁশ সব বকছিস! যা—জল নিয়ে আয় শীগগির!—

অনামিকা বেরিয়ে যাবার পরেই খপ্ করে অরুণাংশুর একখানা হাত নিজের কোলের উপর টেনে এনে অনুনয়ের স্বরে তিনি আবার বললেন, কিছু মনে করো না, বাবা,—ও একেবারে ছেলেমানুষ,—তায় আবার খ্যাপাটে ধরনের। মা-মরা মেয়ে,—আদব-কায়দা কিছু শেখে নি। সত্যি, এ সব কথা তোমার মনে থাকবার কথাই তো নয়,—সেই ছেলেবেলায় ও একবার আমার সাথে তোমাদের এলাহাবাদের বাড়ীতে গিয়েছিল,—ছিল হয়তো মোটে মাসখানিক। সেই একবারই যা তুমি ওকে দেখেছ। সে সময়কার কোন স্মৃতিই তোমার মনে থাকবার কথা নয়। ওরও কি সত্যি কিছু মনে আছে? এই গত দুতিন দিন বৌদির মুখে দুচারটি কথা শুনে মনে মনে তাকেই ফুলে-পাতায় বাড়িয়ে নিয়েছে হয় তো! ওর কোন কথাই তুমি মনে নিও না, অরুণ!

উত্তরে অরুণাংশু কুণ্ঠিত অস্ফুট স্বরে যা বললে তার কোন কথাই কেউ শুনতে পেলে না।

প্রতুলবাবুই তার হাতের উপর আরও একটু চাপ দিয়ে আবার বললেন, তবে ওকে তুমি 'আপনি' বলে সম্বোধন করো না, অরুণ; ঠিক সম্পর্ক কিছু না থাকলেও বয়সে ও তোমার অনেক ছোট। তোমার মুখের 'আপনি' ডাকটা ওর কানে তো বটেই, আমাদের কানেও বড্ড লাগবে।

কিন্তু 'তুমি' ডাকটা আবার অরুণাংশুর নিজের কানে লাগবার আশঙ্কা। তাছাড়া তার বিহ্বল ভাবটা তখনও একেবারে কেটে যায় নি,—মাথাটা কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। তাই সে রাত্রির মত সকল রকম ডাকাডাকির দায় থেকেই অব্যাহতি পাবার জন্য জলের গ্লাসটা এক নিশ্বাসে শূন্য করেই সে তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললে, আমার শোবার জায়গাটা দেখিয়ে দাও, মা—আমি এখন বিশ্রাম করতে চাই।

প্রতুলবাবু কুণ্ঠিতভাবে একবার মহামায়াদেবীর মুখের উপর চোখ বুলিয়েই অনামিকাকে তাড়া দিয়ে বললেন, শীগগির খাবার আয়োজন কর, অনু। ঠিকই তো,—রাত তো কম হয় নি!—

অরুণাংশু নত মুখে বললে, রাত হবার জন্য নয়, কাকাবাবু,—আমি আজ আর খাব না।

প্রতুলবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, সে কি কথা, অরুণ,—খাবে না কেন?

অরুণাংশু বললে, শরীরটা আমার তেমন ভাল নেই—বোধ হয় গায়ে জ্বর আছে।

জ্বর!—প্রতুলবাবুর মুখ শুখিয়ে গেল ; উত্তরে বলবার মত আর একটি কথাও তিনি ভেবে ঠিক করতে পারলেন না।

কিন্তু মহামায়াদেবীর ব্যবহারে কোন উদ্বেগ, কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না। শান্ত, গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না, ঠাকুরপো,—কিছুদিন থেকেই রাত্রে একটু একটু জ্বর ওর হচ্ছে। যাক্—এই নিয়ে আজ কিছু ওর না খাওয়াই ভাল।

তার পর অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন, চল্ রুণু,—তোর শোবার ঘর দেখিয়ে দিই গে।

অনামিকার মুখের হাসি ইতিমধ্যে নিভে গিয়েছিল ; অরুণাংশু উঠে দাঁড়াতেই সে অপ্রস্তুতের মত বললে, একেবারে কিছু খাবেন না, অরুণদা? আর কিছু না হউক, এক কাপ দুধ?

মহামায়াদেবী আদর করে অনামিকার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, না অনু,—ও আমাশাতে ভুগছে—ওর দুধ খেতে নেই। তুমি দেখ তো—একটু দই যদি থাকে তাই শোবার ঘরে পাঠিয়ে দাও,—আর না থাকলে খালি একটু মিছরির পানা।

উপরে পাশাপাশি দুখানা ঘরে অরুণাংশু আর তার মায়ের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরদিন ভোরে মহামায়াদেবী অরুণাংশুর ঘরে এসেই দেখলেন, অরুণাংশু এরই মধ্যে মুখহাত ধুয়ে তৈরি হয়ে জানালার ধারে একখানা চৌকির উপর চুপ করে বসে রয়েছে। উদ্বিগ্ন স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, শরীর কেমন আছে, রুণু?

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অরুণাংশু বললে, ভাল ; বলেই আবার সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

দোরের কাছেই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর কতকটা অভিযোগ, কতকটা অভিমানের স্বরে মহামায়াদেবী বললেন, কাল ওরকম করলি কেন? ওরা কি মনে করলেন তা খেয়াল হল না একবার?

অরুণাংশু প্রশ্নের উত্তর দিলে না, কিন্তু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজেই সে প্রশ্ন করে বসল, আজ বিকেলেই আমাদের যাওয়া হবে তো, মা?

উত্তর দিতে একটু দেরী হল মহামায়াদেবীর; বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর মৃদু, গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, এই বিপদ-আপদের দিনে কলকাতায় থাকবার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। কিন্তু আজই আমাদের যাওয়া হতে পারবে না। ঠাকুরপো বলেছেন, ডাক্তার দিয়ে তোকে পরীক্ষা করাতে হবে।

অরুণাংশু বললে, কোন দরকার নেই ; দরকার যদি হয় তো এলাহাবাদেও ডাক্তার পাওয়া যাবে।

তাহলেও আজ যাওয়া হতে পারবে না,—গেলে ঠাকুরপোর মনে কষ্ট দেওয়া হবে।

অরুণাংশু এবার বিরক্ত হয়ে বললে, আর আমার মনের কষ্ট বুঝি তোমার কাছে কিছুই নয় ?

মহামায়াদেবী কতকটা বিব্রত, কতকটা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কেন রে রুণু—কি কষ্ট হয়েছে তোর ?

এবারও অরুণাংশু প্রশ্নের উত্তর দিলে না ; মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, যাবার জন্ত তেমন কোন তাড়া যখন তোমার নেই তখন অত তাড়া দিয়ে আমায় ওখান থেকে নিয়ে এলে কেন ?

মহামায়াদেবীর মুখ লাল হয়ে উঠল ; কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েই তিনি বললেন, যাবার তাড়া নেই তা তো বলি নি আমি ! কিন্তু ভদ্রতাও তো একটা আছে !—

অরুণাংশু মুখ না ফিরিয়েই বললে, বেশ, ভদ্রতা রক্ষা কর তুমি,—যতদিন খুশী এখানেই থেকে যাও। কিন্তু আমার কাজের তাড়া আছে। আমি আজই হুগলীতে ফিরে যাব ; তার পর তোমার যাবার দিন ঠিক হলে খবর দিয়ে আমায় আনিয়ে নিও।

মহামায়াদেবী আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, অরুণ—

একটিমাত্র শব্দ। কিন্তু ঐটুকু কানে যেতেই অরুণাংশু চমকে তার মায়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ মুখ নামিয়ে নিলে,—তার সারা শরীরটাই যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

সেদিন হুগলীতেও ঠিক এমনি হয়েছিল,—আগেও অনেক দিন হয়েছে। মহামায়াদেবীর মুখের ঐ অতি সংক্ষিপ্ত 'অরুণ' ডাকটার সঙ্গে অরুণাংশুর দেহের স্নায়ুগুলির ঠিক এই রকমই সম্বন্ধ। এ একেবারে বাঁধাধরা,—ঐ ডাকটা মহামায়াদেবীর

মুখে ফুটলেই অরুণাংশুর দেহের সব কটি শিরাউপশিরাই যেন একসঙ্গে সঙ্কুচিত হয়ে যায়,—কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। মহামায়াদেবী যখনই অরুণাংশুকে 'রুণু' না বলে 'অরুণ' নামে ডাকেন তখনই তার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে অসাধারণ। অভিমান, ক্রোধ, আদেশ, আবেদন, বেদনা, আর্ত্তনাদ,—সব ঐটুকু ধ্বনির মধ্যে একত্র হয়ে বেজে ওঠে,—বজ্রের নির্ঘোষের সঙ্গে এসে যেন মেশে বেহাগের সকরুণ মূর্চ্ছনা। আর ঐ ডাক তার কানে গেলেই অরুণাংশুও কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে; আঘাতের যন্ত্রণা ও বিদ্রোহের উত্তেজনায় পাগলের মত হয়েও ভীতি ও অনুরাগমিশ্রিত একটা প্রবলতর প্রবৃত্তির প্রেরণায় তার বিহ্বল, অস্থির মনটা ঐ মহামায়াদেবীরই পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে চায়।

আজও সেই চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। বাধা পেয়ে হিংস্র পশুর মতই চোখদুটি তার জ্বলে উঠলেও সঙ্গে সঙ্গেই অপরিসীম কুণ্ঠায় মাথাটা তার নত হয়ে পড়ল।

মহামায়াদেবীও কিছুক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অরুণাংশুর আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে বললেন, তুমি যেতে চাইলে তোমায় বেঁধে রাখতে পারি, সে শক্তি আমার নেই। তবে আমার ইচ্ছে যে, যে দুএকদিন দায়ে পড়েই এ বাড়ীতে আমায় থাকতে হয়, সে কটা দিন তুমিও এখানেই থাক।

অরুণাংশু দ্রুতপদে দূরের আর একটা জানালার কাছে চলে গেল; সেখান থেকেই মহামায়াদেবীর মুখের দিকে আর না তাকিয়েই সে উত্তর দিলে, বেশ, তাই থাকব। কিন্তু আগে থেকেই তোমায় আমি বলে রাখছি, মা,—যে একটি মাস তোমাদের কাছে থাকব বলে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি, তার বেশী একটি দিনও তোমরা আমায় ধরে রাখতে পারবে না। কাজেই যে দিনকটির অপব্যয় এখানে হবে, তা কাটা যাবে তোমাদের ভাগ থেকে,—আমার ভাগ থেকে নয়।

মহামায়াদেবী এ মন্তব্যের কোন উত্তর না দিয়েই ধীরপদবিক্ষেপে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন

আকাশের সূর্য্য তখন অনেকটা উঁচুতে উঠে থাকবে। শীতের কুয়াশা ভেদ করে বাড়ীর ছাদে এবং গাছের মাথায় ভীরু মতন খানিকটা রোদ উঁকিঝুঁকি মারছে। ঘরের ভিতরটাও বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। অরুণাংশুর উত্তেজনা ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসতেই তার চোখের দৃষ্টিও যেন স্বচ্ছ হয়ে আসতে লাগল। কাল রাত্রে

যা তার চোখে পড়ে নি আজ সে সবই সে বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলে। সে বুঝলে যে বাড়ীখানা দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় এবং সেটা বেশ একজন বড়লোকেরই সখের বাড়ী।

নিজের ঘরখানাও এতক্ষণ পর ভাল করে দেখতে পেলে সে। বেশ বড় ঘর। গৃহসজ্জায় আড়ম্বর নেই কিন্তু পারিপাট্য আছে। হাল্কা, নীল রঙের দেয়ালে খান কয়েক হাতে আঁকা ছবি—সব কখানাই প্রাকৃতিক দৃশ্য ; যেটা রঙিণ সেটা পশমের সূচিশিল্প। পিছন দিকে দেয়ালের গা ঘেঁষে একটা কাঠের আলনা,—তাতে খানদুই কাচা কোঁচানো ধুতি এবং ধবধবে একখানা তোয়ালে রাখা আছে। পাশেই একটা আলমাড়ি—তাতে সবই বই। ঘরের ঠিক মাঝখানে মেঝেতে দুখানা চৌকি এবং একটি ছোট লিখবার টেবেল,—তার উপর দোয়াত, কলম, পেন্সিল, চিঠির কাগজ, খাম, ব্লটিং, মায় একখানা কলমকাটা ছুরিও যথাস্থানে রাখা রয়েছে। একটি জানালার ধারে একখানা বেতের আরামচৌকি এমনভাবে পাতা আছে যাতে ওর উপর বসলেই দূরের সরকারী বাগান চোখে পড়ে। পাশেই শোবার খাট। তার মাথার দিকে ছোট একটি টিপয়। তাতে পুঁতির ঝালর দেওয়া সরু জালের ঢাকনীঢাকা এক গ্লাস জল, এক টিন সিগারেট, এক বাক্স দেশলাই, একটা ছাইদানী এবং খানকয়েক বই। এই সযত্নরচিত গৃহসজ্জা কাল রাত্রে কেন যে তার চোখে পড়ে নি তাই ভেবে অরুণাংশু অবাক হয়ে গেল। কৌতূহলী হয়ে একখানা বই সে হাতে তুলে নিলে,—দেখলে সেখানা একখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী,—প্রথম পাতাতেই গোটা গোটা মেয়েলী অক্ষরে মালিকের নাম লেখা রয়েছে—শ্রী অনামিকা দাশ গুপ্ত, বি এ। ঐ নামটির দিকে চেয়ে চেয়ে অরুণাংশুর ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্রূপের ক্ষীণ একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে বইখানাকে নামিয়ে রেখে সে আর এক খানা বই হাতে তুলে নিলে,—সেখানা ন্যুট হামসেনের একখানা উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ ; ওতে মালিকের নাম নেই, আছে 'লীলা গ্রন্থাগারের' রবার ষ্ট্যাম্পের ছাপ। তৃতীয় বইখানা খুলতেই অরুণাংশু চমকে উঠল—সেখানা কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল'। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কাটা কেটে যেতেই একা একাই সে শব্দ করে হেসে উঠল ; কিন্তু তখনই হাসি থামিয়ে ঈষৎ লজ্জিত, ঈষৎ সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে দোরের দিকে একবার চেয়ে দেখেই হাতের বইখানাকে নামিয়ে রেখে 'রচনাবলী'খানা আবার তুলে নিয়ে সে গিয়ে আরামচৌকিখানার উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

মিনিট দশেক পর বাইরে থেকে দোরের পর্দ্দাটাকে অল্প একটু ফাঁক করে তারই ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনামিকা মৃদু স্বরে বললে, আসতে পারি, অরুণদা ?

অরুণাংশু চমকে মুখ ফিরিয়েই দেখতে পেলে,—ঠিক কালকের সেই মুখখানি,—তেমনি সুন্দর, তেমনি উজ্জ্বল ; পাতলা ঠোঁটদুখানির কোণে কোণে দুষ্টামির হাসি খেলে বেড়াচ্ছে।

বিব্রতভাবে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, বাঃ—আসুন না ;—তার পর একটা ঢোক গিলে নিজেই নিজেকে সংশোধন করে সে আবার বললে, এস।

ঘরে ঢুকেই বেশ সহজভাবেই অনামিকা জিজ্ঞাসা করলে, কি করছিলেন—পড়াশোনা ?

না,—অনামিকার দৃষ্টি এড়িয়ে অরুণাংশু উত্তর দিলে,—মানে, একটা বই দেখছিলাম।

চঞ্চল চোখের তেরছা দৃষ্টি বইখানার উপর ফেলে অনামিকা বললে, জেঠিমা বারণ করলেন, তাই চা পাঠাই নি।

তাতে কোন ক্ষতি হয় নি,—অরুণাংশু তাড়াতাড়ি বললে।

চলুন তবে,—খাবার তৈরি হয়েছে।

চল,—বলে অরুণাংশু তার অনুসরণ করলে।

একেবারে হুবহু কাল রাতের সেই অনামিকা,—সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অরুণাংশু ভাবলে,—শাড়ী আর জামাটা কেবল ভিন্ন ; তাছাড়া কাল রাত্রে যেখানে যে অলঙ্কার ছিল, আজও সেখানেই সেটি আছে। অরুণাংশুর মনে হতে লাগল যে রূপ আর ঐশ্বর্য্যের এত আড়ম্বর এর আগে আর যেন তার চোখে পড়ে নি।

তার তন্ময় ভাবটাতে ধাক্কা লাগল প্রতুলবাবুর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরের।

এই যে অরুণ,—সে ঘরে ঢুকতেই প্রতুলবাবু দুর্দ্দমনীয় উৎসাহের বশে সশব্দে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—এস বাবা, এস ; এই খানটাতে আমার কাছে এসে বোস তুমি ; শরীরটা কেমন মনে হচ্ছে আজ ? ডাক্তারকে আমি খবর পাঠিয়েছি—তিনি এলেন বলে। তার পর ?—বড় বেশী দেরী হয়ে যায় নি তো ? দোষ কিন্তু সম্পূর্ণ আমার ; অনু ভোর থেকেই উসখুস করছে তোমায় ডেকে আনবার জন্ত ; আমিই বললাম,—থাক্, অরুণাংশুকে একটু নিরিবিলিতে বিশ্রাম করতে দাও।

অনামিকা তার বাপের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললে, কিন্তু সে তো হয়ে গিয়েছে, বাবা। এখন অরুণদাকে একটু পরিশ্রম করে ওঁর পথ্যটুকু খেতে দাও তো,—কাল রাত থেকে ওঁর খাওয়া হয় নি।

ঠিক, ঠিক,—প্রতুলবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন,—তুমি আগে কিছু মুখে দাও, অরুণ। কিন্তু কি-ই বা খাবে—যা অসুখখানা বাগিয়েছ! তাই তোমার জন্য আমি একেবারে রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করেছি,—বার্লির ড্রিঙ্ক, ঘোলের সরবৎ, বেলের পানা আর দুখানা এ্যারারুট বিস্কুট।

অরুণাংশুর পছন্দমত বাটিটা তার সামনে এগিয়ে দিয়ে প্রতুলবাবু একখানা প্লেট নিজের দিকে টেনে নেবার উপক্রম করতেই অনামিকা উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল, ও কি করছ, বাবা,—ও যে অম্‌লেট্‌!—

পরক্ষণেই খিল্‌ খিল করে হেসে উঠে সে আবার বললে, অরুণদাকে অমন গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে পারলে, বাবা, আর নিজের বেলায় লোভ সামলাতে পারছ না? অম্‌লেট্‌ খেলে ঘণ্টাখানিক পরেই তো হাঁসফাঁস করতে সুরু করবে!—

প্রতুলবাবু আবার অপ্রতিভ হয়ে বললেন, তাই তো—এ যে দেখছি অম্‌লেট্‌ই,—আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল মা।

তার পর হাসিমুখে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে আবার বললেন, দেখেছ, অরুণ,—কি কড়া শাসনের মধ্যে আমায় থাকতে হয়! একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। খেতে দেবে একেবারে মেপে, শোয়াবে ঠিক ঘড়ি ধরে, জেলখানার প্রহরীর মত সারাক্ষণ এমন কড়া চোখ রাখবে আমার উপর যে ভুলেও এক ফোঁটা অখাদ্য আমার মুখে দেবার উপায় নেই।

আঃ—থাম না, বাবা;—ঠোটের কোণে হাসি চেপে ছদ্ম কোপের স্বরে অনামিকা বাধা দিয়ে বলে উঠল,—নিজেও খাচ্ছ না তুমি, আর কাউকে খেতেও দিচ্ছ না। দেখুন তো, জেঠিমা,—বাবার কি ছেলেমানুষি কাণ্ড! রোজ বলবে যে অম্‌লেট্‌ ওঁর সহ্য হয় না,—অথচ না দিলেই—

পিতা ও পুত্রীর এই কলহ অরুণাংশু হাসিমুখে উপভোগ করলে। দেখে মুগ্ধই হয়ে গেল সে। বয়স বা সম্বন্ধ তাদের দুজনের মধ্যে একেবারেই কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে নি। ছোট-বড় বা গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ তাদের নয়; উদ্ধত অভিভাবকত্বের নীচে সন্ত্রস্ত আনুগত্য সঙ্কুচিতভাবে লুটিয়ে পড়ে নেই, ফেনিয়ে-ওঠা

ভাবালুতার মধ্যেও তারা দুজন নিরন্তর হাবুডুবু খাচ্ছে না; তবু তাদের দুজনের যে সম্বন্ধ তার মধ্যে মমতাও আছে, শ্রদ্ধারও অভাব নেই। তারা দুজন যেন দুই সমবয়সী শিশু,—পরিণত বয়সের বুদ্ধি ও সহানুভূতি সোনায় সোহাগার মত তাদের দুটি হৃদয়কে জুড়ে এক করে দিয়েছে। অরুণাংশু তার খাদ্যের চেয়েও বাপ ও মেয়ের অভিনব সম্বন্ধের মাধুর্য্যই যেন বেশী উপভোগ করলে।

খাওয়ার মাঝখানেই হঠাৎ একবার মুখ তুলে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে প্রতুলবাবু কতকটা লজ্জিত, কতকটা গর্ব্বিত স্বরে বললেন, বুঝলে অরুণ?—মা বল, মেয়ে বল, সবই আমার ঐ অনু। এ বাড়ীর কর্ত্রী ও,—আমি ওর হুকুম মেনে চলি মাত্র। কিন্তু আমার উপর হুকুম চালিয়ে চালিয়ে এমনি বদ্ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে ওর যে, সকলের উপরেই ও এখন হুকুম চালাতে চায়। তাই কাল রাত থেকে কেবলই আমার ভাবনা হচ্ছে যে, তোমার উপরেও ও হয়তো জোর করে হুকুম চালাতে চাইবে।

অরুণাংশু কথাটার উত্তর দিলে না, কিন্তু স্মিত মুখে অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি বুঝি ইউনিভার্সিটিতে পড়?

কুণ্ঠিত স্বরে অনামিকা উত্তর দিলে, না,—এখন আর পড়ি নে,—পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

কেন?—অরুণাংশু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

ঈষৎ একটু লাল হয়ে উঠে অনামিকা উত্তর দিলে, ভাল লাগল না, তাই। দুতিন মাস ক্লাসে গিয়েছিলাম। কিন্তু মনে হল, মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আর পড়ে লাভই বা কি!—

মিছে কথা!—বাধা দিলেন প্রতুলবাবু,—জান, অরুণ,—আগাগোড়া সব বানানো।

হ্যাঁ—বানানো বই কি!—

আলোর সমুদ্র যেন রামধনুর তরঙ্গ তুলে নেচে উঠল। কানের দুলের পাথর দুখানাতে অকস্মাৎ দোলা লাগল; চোখের কোনে হাসি উঠল চিক্ চিক্ করে; ভুরুদুটি বেঁকিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে, নিতান্ত ছেলেমানুষের মত হাত নেড়ে, মাথা দুলিয়ে অনামিকা বললে, হ্যাঁ—বানানো বই কি! তুমিই তো বানিয়ে বলছ! বলো না বলছি,—বল যদি আমি এক্ষুনি উঠে যাব।—

কিন্তু প্রতুলবাবু অনামিকার প্রতিবাদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই হাসিমুখে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বলে যেতে লাগলেন, জান অরুণ,—বি এ পরীক্ষায় অনু ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিল। ওর শিক্ষকেরা বলেছিলেন, এম্ এ'তে ও ফার্ষ্ট হবে। কিন্তু কি যে ওর ঝোঁক চাপল—হঠাৎ বলে বসল যে ও আর পড়বে না। সবাই মিলে কত বোঝালাম,—কিন্তু ওর ধনুক-ভাঙ্গা পণ,—

বেশ, না হয় তাই ;—অনামিকা এবার রাগের মত করে বললে,—কিন্তু তুমি এখন একটু থাম তো, বাবা,—খাওয়ার পরে যত খুশী মিছে কথা বানিয়ে বলো। এখন অরুণদাকে সুস্থির হয়ে খেতে দাও।

মোরব্বার বাটিটা অরুণাংশুর কাছে এগিয়ে দিয়ে পরে শান্ত কণ্ঠে সে আবার বললে, বিস্কুটে মাখিয়ে নিন, অরুণদা,—এতে আপনার কোন অপকার হবে না। এ আমাদের ঘরে তৈরি।

প্রতুলবাবু তথাপি রণে ভঙ্গ দিলেন না, সহাস্য চোখের একটি অনামিকার এবং অপরটি অরুণাংশুর মুখের উপর রেখে নিজের বক্তব্যটাকে তিনি শেষ করলেন,—আসল কারণটা কি জান, অরুণ ?—ওর ভাবনা যে, ও যদি পড়া নিয়ে থাকে তবে ওর খোকা-বাপকে দেখবে কে ?—

বলতে বলতে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

খেতে খেতে অরুণাংশু অনামিকাকে ভাল করে দেখে নিলে। নিখুঁত সুন্দরী যাকে বলে তা হয় তো সে নয়। পরীক্ষা করলে অনেক খুঁৎ বেরিয়ে পড়ে। রঙটা ঠিক দুধে-আলতা গোছের নয়, নাকটা যেন বড় বেশী উঁচু, মুখখানার দৈর্ঘ্য আরও একটু কম হওয়া উচিত ছিল,—এমনি সব অভাব আর আতিশয্যের প্রকাণ্ড একটা ফর্দ্দ তৈরি করা যায়। তথাপি অরুণাংশুর মনে হতে লাগল যে, সে মুখে যা আছে, বর্ণ, গঠন ও সজ্জানিরপেক্ষ সে এক অতুলনীয় জিনিষ। তার পাতলা ঠোঁটদুটিতে হাসি লেগেই রয়েছে ; কালো চোখ দুটি তো আলোর দুই অফুরন্ত উৎস। তার মুখের যা দীপ্তি, ওর উৎস লোকচক্ষুর আড়ালে তার মনের কোণে লুকিয়ে আছে বলেই তা পলকে পলকে নূতন হয়ে প্রকাশ পায়। কি কোমল উপাদান দিয়েই যে তার মুখখানা তৈরি, একটু হাসলেই কত যে টোল তাতে পড়ে, তার লেখাজোখা নেই। মনে হয় যে ও মুখের গঠন এখনও শেষ হয় নি,—বিশ্বকর্ম্মার অদৃশ্য অঙ্গুলীর অপরূপ সৃষ্টি-কার্য্য তখনও চলছে। শৈশবের কোমল স্নিগ্ধতার সঙ্গে যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তির এমন

পরিমিত সংমিশ্রণ সচরাচর চোখে পড়ে না। আর চোখে পড়ে না অপরিমেয় প্রাণের এমন উচ্ছল অভিব্যক্তি। সে যেন জীবনের একটা বিদ্যুৎলতা—আনন্দোজ্জ্বল প্রাণ তার ঠোঁটের হাসি, চোখের চাহনী ও দেহের প্রত্যেকটি ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন লীলায়িত ছন্দে ফুটে বেরুচ্ছে। তার লাবণ্য, তার কথা, তার হাসি, তার দৃষ্টির এই প্রাণময়তাই তার যৌবনসমৃদ্ধ দেহের চোখঝলসানো রূপকে এমন একটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যাতে করে সেটি হয়ে উঠেছে একেবারেই আলাদা জাতের সম্পূর্ণ অভিনব একটা জিনিষ। সে যে মেয়ে এবং যুবতী, তাকে দেখলে সে কথা মনেই হয় না ;—মনে হয় যে, সে যেন অশরীরী আনন্দের হিল্লোলিত একটি ছন্দ।

ডাক্তার এলেন যথাসময়ে। তিনি প্রতুলবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক, তায় আবার বন্ধু। রোগী দেখে আশ্বাস দিয়ে বললেন,—ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে চিকিৎসা সুরু করবার আগে অনেক গবেষণা করতে হবে।

প্রোগ্রাম হল আপাততঃ এক সপ্তাহের। অরুণাংশু আপত্তি করলে, তার বিরক্তিও গোপন রইল না ; কিন্তু ফল হল না কিছুই। হতাশ হয়ে অবশেষে সে হাল ছেড়ে দিলে।

ডাক্তারকে নিয়ে প্রতুলবাবু যখন বাইরে বেরিয়ে গেলেন তখন অনামিকা অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললে, আমাদের এখানে বুঝি আপনার ভাল লাগছে না,—না অরুণদা ?

অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে বললে, না, তা কেন—তা নয়।

ইস্—না বই কি !—অনামিকা সহাস্য কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললে,—ভালই যদি লাগবে তবে যাবার জন্য এত উতলা হয়েছেন কেন ?

অধিকতর কুণ্ঠিত হয়ে অরুণাংশু বললে, না, উতলা আর কৈ ?—মানে, যেতেই যখন হবে, তাই —

—আর এক মিনিটেরও তর সইছে না আপনার,—না ?—বলতে বলতে অনামিকার হাস্যোজ্জ্বল চোখের কটাক্ষ কুটিল হয়ে উঠল।

সেটা মহামায়াদেবীর চোখ এড়াল না, চকিতে অরুণাংশুর আনত মুখের দিকে

একবার তাকিয়ে নিয়েই তিনি হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা গল্প কর মা,—আমি ওদিকটা একটু ঘুরে আসি।

অরুণাংশু বিব্রতভাবে মুখ তুলতেই অনামিকার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। অনামিকা সশব্দে হেসে উঠে বললে, লুকোতে পারবেন না, অরুণদা,—আমি ঠিক জানি যে এখানে আপনার ভাল লাগছে না। কাল রাত থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি,—এসে অবধি একবারও আপনি হাসেন নি। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি যেন অথই জলে পড়েছেন।

অভিযোগ মিথ্যা নয় বলেই বোধ করি উত্তরে বলবার মত কোন কথা ভেবে না পেয়ে অরুণাংশু কুণ্ঠিতভাবে চুপ করে বসে রইল। তার সেই আনত মুখের দিকে কিছুক্ষণ সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবার পর অনামিকাই আবার বললে, আমি বলব অরুণদা—কি আপনার হয়েছে? হুগলী থেকে জেঠিমা আপনাকে টেনে এনেছেন বলে আপনার মন খারাপ হয়ে গিয়েছে।

অরুণাংশু মুখ না তুলেও বুঝতে পারলে যে অনামিকার সকৌতুক চোখদুটি ঠিক তার মুখের দিকেই চেয়ে রয়েছে। ঘরে আর কোন লোক নেই যে আলোচনার ধারাটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে। তার নিজের পক্ষেও উঠে পালিয়ে যাওয়া এক রকম অসম্ভব,—সেটা নিতান্তই অভদ্রতা হবে। একেবারে চুপ করে থাকা আরও বেশী অভদ্রতা। বুকে ভিতরের কুণ্ঠিত ভাবটাকে সজোরে ঠেলে ফেলে মরিয়ার মত অনামিকার মুখের দিকে চেয়েই সে উত্তর দিলে, খারাপ হওয়াই তো স্বাভাবিক,—কাজকর্ম্ম ছেড়ে ঘরে বসে থাকতে কার ভাল লাগে!—

আপনার কাজ মানে তো,—অনামিকা ঠোঁট উল্‌টিয়ে বলে বসল,—সেই মজদুর খেপিয়ে বেড়ানো,—নয়?

অরুণাংশুর মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল; তথাপি একটু হেসেই সে উত্তর দিলে, হ্যাঁ,—তাই আমার কাজ।

তা আমি জানি,—অনামিকা হাসতে হাসতেই বললে,—কিন্তু কাজ তো অনেক করেছেন,—এখন কিছু দিন বিশ্রাম করলে হয় না?

না,—বলে অরুণাংশু মুখ ফিরিয়ে নিলে।

অনামিকা একটু চুপ করে রইল; তার পর সুর বদলে বললে, আচ্ছা, অরুণদা,—ঐ কাজ খুব ভাল লাগে আপনার?

অরুণাংশু অনামিকার দৃষ্টি এড়িয়ে উত্তর দিলে, লাগে বলেই তো করি।

মা-বাপের জন্য মনে কষ্ট হয় না?

না।

নিজের জন্য?—নিজের জন্যও কষ্ট হয় না?

অরুণাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, তার মানে?

মানে,—অনামিকা একটু ইতস্ততঃ করে বললে,—এই প্র্যাকটিস করবার, কি আর কোন কাজ করবার ইচ্ছে হয় না আপনার?

অরুণাংশু হেসে বললে, না।

কিন্তু খাওয়া-পরার কষ্ট—তা-ও লাগে না আপনার?

সে সব সয়ে গিয়েছে।

অনামিকা কয়েক সেকেণ্ড কাল স্তব্ধ হয়ে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর কতকটা আপন মনেই যেন সে বললে, কি জানি—এ যেন আমি বুঝতেই পারি নে।

পারবার কথাও নয়,—বলে অরুণাংশু অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে টিপে টিপে হাসতে লাগল।

বোধ করি লজ্জা পেল অনামিকা; চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, সত্যি,—যে বস্তিতে আপনি থাকেন শুনেছি—

—সেটা একটা আলাদা জগৎ,—অরুণাংশুই কথাটাকে সম্পূর্ণ করে দিলে।

সত্যি,—বলতে বলতে অনামিকা নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল,—আই এ ক্লাসে যখন পড়ি তখন আমাদের ইকনমিক্সের প্রফেসর আমাদের একবার নিয়ে গিয়েছিলেন বেলুড়ের কাছে একটা কারখানায়। সেই সময়ে দেখেছিলাম বস্তি। মা গো, মা,—কি মানুষ—কি ঘরদোর! মনে হলে এখনও যেন আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

অরুণাংশু হাসিমুখে বললে, আমারও দেয়;—কিন্তু দেয় বলেই আমি সেই বস্তিতে গিয়ে থাকি,—সর্বহারাদের হকের পাওনা তাদের পাইয়ে দেবার জন্য কাজ করি।

অনামিকা এবার আগ্রহের স্বরে বললে, বলবেন, অরুণদা,—আপনার কাজের কথা আমায় বুঝিয়ে বলবেন?

না,—অরুণাংশু আবার গম্ভীর হয়ে বললে,—তা তুমি বুঝতে পারবে না।

অনামিকার মুখ ম্লান হয়ে গেল; তথাপি ঐ মুখখানিই হাসবার মত করে সে বললে, কেন অরুণদা,—আমি কি এতই বোকা?

অরুণাংশু বললে, না, তুমি খুব চালাক। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দিয়ে এ সব কথা বোঝা যায় না। যা দিয়ে এ সব বুঝতে হয় সেই প্রাণ তোমার নেই। তোমায় দেখলে আমার কি মনে হয়, জান?

অনামিকা শুষ্ক কণ্ঠে বললে, কি?

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল অরুণাংশু; হাসতে হাসতে সে বললে, তোমায় দেখলেই রবি ঠাকুরের একটা কবিতা আমার মনে পড়ে,—সেই যে 'স্নানে চলেছেন শত সখী সনে কাশীর মহিষী করুণা';—শেষটা ইচ্ছে হলে তোমার 'রচনাবলী' থেকেই তুমি পড়ে নিও।—

বলেই হাসতে হাসতে সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পনর পর প্রতুলবাবু সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে অনামিকাকে একেলা চুপ করে বসে থাকতে দেখে সবিস্ময়ে বললেন, এ কি অনু?—তুমি একা বসে যে! এরা সব কোথায়?

অনামিকা অপ্রতিভের মত উঠে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, অরুণদা গেলেন এইমাত্র—আমি কাগজখানা এই ফাঁকে দেখে নিচ্ছিলাম।

দূরে খবরের কাগজখানার উপর প্রতুলবাবুর চোখ গিয়ে পড়তেই অনামিকা তার সহজ কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার তুলে আবার বললে, তুমি এত দেরী কেন করছ, বাবা,—স্নান করতে যাবে না? বেলা কত হল তা খেয়াল নেই বুঝি?—

দুপুর বেলায় অরুণাংশু অত সহজে অনামিকাকে এড়াতে পারলে না,—আঘাত দিয়েও নয়।

অরুণাংশু চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারে নি; তারই কৈফিয়ৎ স্বরূপ অনামিকার উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্প জান না তুমি?—সেই যে একবার কোন এক মেছুনী নাকি রাত্রে পথ ভুলে কার এক ফুলবাগানে ঢুকে গিয়েছিল; ফুলের গন্ধে কিছুতেই তার ঘুম হয় না; শেষে মাছের চুপড়িটা নাকের কাছে এনে তাতে খানিকটা জল দিয়ে মাছের গন্ধ বের করে তবে

সে ঘুমোতে পারে। এখানে আমার হয়েছে সেই মেছুনীর অবস্থা,—আঁষ্টে গন্ধ চাই,—তোমাদের এই ফুলবাগানে কিছুতেই চোখে আমার ঘুম আসে না।

অনামিকা মুখ লাল করে বললে, তাই যদি হয়ে থাকে, অরুণদা, তবে আপনিও জল ছিটিয়ে আঁষ্টে গন্ধ সৃষ্টি করুন না! মজদুর আন্দোলনের গল্প করলেও তো কারখানা আর বস্তির আবহাওয়ার একটা আমেজ এখানে আসতে পারে!—

না, তা হয় না,—অরুণাংশু মাথা নেড়ে উত্তর দিলে,—আমরা যে আবহাওয়া চাই, তা কথা দিয়ে সৃষ্টি করা যায় না,—যায় কেবল কাজ দিয়ে।

একটু চুপ করে রইল অনামিকা; তার পর শান্ত, গম্ভীর স্বরে সে বললে, সত্যি, অরুণদা,—আপনার কাজের কথা শুনতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে আমার। বলুন না, শুনি। হুগলীতে কি কাজ করেন আপনি?

সে তো তুমি নিজেই আন্দাজ করে নিয়েছ!—অরুণাংশু হেসে উত্তর দিলে,—ওখানে আমি মজদুর খেপিয়ে বেড়াই।

যান,—বলে অনামিকা চোখ নামিয়ে নিলে। বোঝা গেল যে সে সত্যই অপ্রতিভ হয়েছে। চোখ না তুলেই কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আমি স্বীকার করছি, অরুণদা,—আমার ঘাট হয়েছে।

তথাপি অরুণাংশু বিদ্রূপের স্বরেই বললে, ঘাট কেন মানতে যাবে, অনু? অন্যায় বা ভুল তো তোমার হয় নি—সত্যি তো আমি মজদুর খেপিয়েই বেড়াই!—

এবার অনামিকাও হেসে ফেলে বললে, বেশ তো,—তাহলে সেই গল্পই বলুন।—

অরুণাংশু বুঝলে যে অনামিকা তাকে কথা বলাবার জন্য জিদ করছে; একটু বিব্রত হয়েই সে বললে, আমার গল্প তোমার ভাল লাগবে না, অনু।

না, বেশ ভাল লাগবে আমার,—অনামিকা মাথা দুলিয়ে বললে,—আপনি বলুন তো!—

অরুণাংশু আরও বিব্রত হয়ে পড়ল; একটু চুপ করে থেকে পরে সে বললে, আমি তোমায় কি গল্প বলব, বল তো! আমার যা ধর্ম্ম তা তোমাদের কাছে পাগলামী; আমার যা নীতি, তা তোমাদের কাছে দুর্নীতি; আমার যারা সাথী, তারা সবাই আমারই মত লক্ষ্মীছাড়া! এর কোন গল্প তোমার ভাল লাগবে, অনু?

অনামিকার মুখের চেহারাটা হঠাৎ যেন একেবারে বদলে গেল; একটু চুপ করে থাকবার পর অল্প একটু হেসে সে বললে, জানেন, অরুণদা, আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে একজন দেবতা আছেন যাঁর ধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্মের একেবারে বিপরীত, যিনি অন্নপূর্ণার স্বামী হয়েও নিজে লক্ষীছাড়া ভিখারী, যাঁর আবাস ঘর আর জনপদের বাইরে কদর্য্য শ্মশানক্ষেত্র আর যাঁর সাথী কেবলই ভূত আর প্রেত। তবু সেই দেবতাকে আমরা পুজো করি,—বলি দেবাদিদেব মহাদেব।

অরুণাংশু বিস্মিত হল; কিন্তু হেসেই সে বললে, তিনি তো দেবতা, অনু,—তাঁর পূজো পাবার অধিকারটা, ঐ আমরা যাকে বলি, জন্মগত। কিন্তু আমার মত মানুষের তো সে অধিকার নেই! তোমাদের দেবতাদের গুণগুলিই তো মানুষের মধ্যে প্রকাশ পেলে হয় পাপ;—হয় না?

না,—অনামিকা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে,—সত্যি হয় না, অরুণদা,—অবশ্য গুণের মত গুণ আর মানুষের মত মানুষ যদি হয়, তো।

তার পরেই অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে আগ্রহের স্বরে বললে, আচ্ছা, অরুণদা,—ওখানে এমন আরও কেউ আছেন যিনি আপনারই মত দশের জন্য সব ছেড়ে এসেছেন?

অরুণাংশু এবার শব্দ করে হেসে উঠে বললে, এটা কি হচ্ছে, অনু,—ব্যাজস্তুতি?

না, ছিঃ!—অনামিকা মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে,—আপনি আমার দাদা,—গুরুজন!—

তার পরেই আবার মুখ তুলে ছেলেমানুষের মত মাথা নেড়ে আবদারের স্বরে সে বললে, বলুন না, অরুণদা,—আপনার মত লোক আরও আছে ওখানে?

কি যে বল তুমি!—অরুণাংশু নিজেই এবার কুণ্ঠিত হয়ে বললে,—আমার যারা সাথী, আমার তুলনায় তারা সবাই সত্যিকারের দেবতা।

সত্যি?—

অরুণাংশু উত্তর দিলে না, অন্যমনস্কের মত বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল সে; তার দুই চোখে নেমে এল কেমন যেন একটা স্বপ্নের আবেশ।

উত্তর না পেয়ে একটু পরে অনামিকাই আবার বললে, সত্যি বলছেন, অরুণদা?—কে তাঁরা?

অরুণাংশু মুখ না ফিরিয়েই স্বপ্নাবিষ্টের মতই বললে, হ্যাঁ, সত্যি,—সব রকমেই তারা আমার চেয়ে বড়। সুবোধ, বিমল, শ্যামাচরণ, সুভদ্রা—

সুভদ্রা!—অনামিকা অরুণাংশুর কথায় মাঝখানেই তারই মুখের কথা কেড়ে নিয়েই যেন সবিস্ময়ে বলে উঠল।

অরুণাংশু চমকে উঠেই অপ্রতিভের মত একেবারে চুপ করে গেল।

কাল থেকে সে কেবল সুভদ্রার কথাই ভেবেছে,—কেবল ভাবা নয়,—হুগলী থেকে তার নিজের চলে আসাটা এবং বিশেষ করে আসার আগের অপ্রীতিকর ঘটনাটিকে স্মরণ করে ভিতরে ভিতরে নিরন্তর সে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে। অনুশোচনা ও আকাঙ্ক্ষায় মিলিয়ে সেই দুর্দান্ত ও দুর্দমনীয় ভাবনা ঘুমের মধ্যেও তাকে ছুটি দেয় নি। এই একটু আগেও একা বসে সে ঐ সুভদ্রার কথাই ভাবছিল।

কিন্তু অনামিকার সঙ্গে আলাপ করতে করতে সেই সুভদ্রারই প্রসঙ্গ যে সোজাসুজি উঠে পড়তে পারে, এ সম্ভাবনার কথা একবারও তার মনে হয় নি। কখন যে সুভদ্রার নামটা তার মুখ থেকে বের হয়ে পড়েছে, তা-ও সে বুঝতেও পারে নি,—বুঝলে প্রথম যখন তারই মুখের কথাটার প্রতিধ্বনির মতই ঐ সুভদ্রার নামটাই অনামিকার মুখ থেকে প্রশ্নের আকারে বের হয়ে আবার তার নিজের কানে এসে প্রবেশ করলে। অরুণাংশু চমকে উঠল,—যেন চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে বিস্মিতা অনামিকার কৌতূহলী চোখ দুটি একেবারে তার মুখের উপর এসে পড়েছে,—মুখ ফিরাতেই তার নিজের বিহ্বল চোখদুটি ওতেই যেন ধাক্কা খেয়ে নত হয়ে পড়ল। এক মুহূর্তের ভগ্নাংশ ঐটুকু সময়ের মধ্যেই সে বুঝে নিলে যে অনামিকার দৃষ্টি বা প্রশ্ন কোনটাই এড়াবার উপায় আর নেই। কাজেই বার-দুই ঢোক গিলে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, হ্যাঁ, সুভদ্রাদেবী।

অনামিকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল; সে রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, মেয়ে?—

মুখ লাল করে অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, মেয়ে বই কি।—সুভদ্রাদেবী কি পুরুষের নাম হয়!—

শেষের কথাটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই অনামিকা আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, তিনিও আপনাদের সাথে কাজ করেন?

অরুণাংশু মুখ নামিয়ে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, করেন।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মুখ তুলে অল্প একটু হেসে সে আবার বললে, সব মেয়েই তো আর তোমার মত নয়!—

অনামিকাও হেসে ফেললে; খুব সহজভাবেই বাঁ দিকে মাথাটাকে একটু কাৎ করে সে উত্তর দিলে, তা আমি জানি, অরুণদা।

একটু লজ্জা বোধ করলে অরুণাংশু; কিন্তু তার সঙ্কোচও অনেকটা কেটে গেল। হাসতে হাসতেই সে আবার বললে, সত্যি বলছি, অনু,—খুব ভাল কাজ করেন তিনি,—আমার চেয়েও ভাল।

বিস্মিতের মত কয়েক সেকেণ্ড কাল অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর অনামিকা আবার জিজ্ঞাসা করলে, ওঁর স্বামীও বুঝি ওখানে কাজ করেন?

অরুণাংশু আবার চমকে উঠল; হাওয়ার মুখে মৃৎপ্রদীপের আলোর মতই তার মুখের হাসিও তৎক্ষণাৎ নিভে গেল। ঘাড় নেড়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, না,— মানে,—তার বিয়েই হয় নি এখনও। তিনি নিজেই ওখানে চাকরি করেন।

চাকরি করেন!

হ্যাঁ—তিনি ওখানকার হাসপাতালের নার্স।

কিন্তু তার নিজের মুখের ঐ নার্স' কথাটা তার নিজের কানে যেতেই তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন বিদ্যুতের প্রবল একটা ধারা বয়ে গেল। ঐ একটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে বুঝলে যে ঠিক আগের দিনের ইতিহাসেরই হুবহু পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তার মনে পড়ল যে হুগলীতেও ঠিক অমনি একটা সঙ্কোচ যেন বজ্রমুষ্টিতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল যার জন্য মায়ের কাছে সুভদ্রার সত্য পরিচয় সে মুখ ফুটে প্রকাশ করে বলতে পারে নি; মনে পড়ল যে তার মুখের ঠিক এই 'নার্স' কথাটা সুভদ্রার কানে গিয়ে পৌছতেই তার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি অসহ্য বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই মুখখানিই অরুণাংশু আবার যেন তার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলে,—শ্যামল, স্নিগ্ধ মুখখানিতে যেন মৃত্যুর পাণ্ডুরতা নেমে এসেছে; শুষ্ক, নীলাভ ওষ্ঠদুটি অবরুদ্ধ অভিমানে কেঁপে কেঁপে উঠছে; চোখদুটিতে যেন ফুটে উঠেছে আহত, অশক্ত পশুর ব্যথিত, অসহায় দৃষ্টি আর একটিমাত্র অনুচ্চারিত সকাতর জিজ্ঞাসা—আমি নার্স?—

অরুণাংশুর বুকের ভিতরটা আলোড়িত হয়ে উঠল; বানের মুখে মাটির বাঁধের মতই তার মনের মধ্যে সঙ্কোচের অবরোধটুকু সেই মুহূর্ত্তেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। প্রচণ্ড একটা উত্তেজনার বশে অনামিকার দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ে তৎক্ষণাৎ সে আবার বললে, কিন্তু কেবলই নার্স তিনি নন, অনু ;—তার সত্যিকারের পরিচয় তুমি শুনবে ?

অনামিকা বিস্মিত হয়ে বললে, কি অরুণদা ?

প্রায় উদ্ধতভাবে অনামিকার ঠিক চোখের দিকে তাকিয়ে অরুণাংশু উত্তর দিলে, সুভদ্রা নার্স,—এটা তার বাইরের পরিচয় মাত্র। তার আসল পরিচয় হচ্ছে এই যে, তিনি সেখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই দিদিমণি ; আমরা, যারা তার সঙ্গে কাজ করি, আমাদের সকলের তিনি কম্‌রেড্ ; আর বিশেষ করে আমার নিজের তিনি—বন্ধু।

প্রত্যেকটি কথার উপর বেশ জোর দিয়ে অরুণাংশু ধীরে ধীরে খুব স্পষ্ট করে কথাগুলি উচ্চারণ করলে ; 'বন্ধু' কথাটার উপর জোর দিলে সে আরও বেশী ;— এমনভাবে বললে যেন খুব কঠিন একটা অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্য বহুদিন পর সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করছে,—যেন ঠিক এই কথাগুলিই কাল তার বলা হয়ে ওঠে নি,—যেন তার মায়ের ভ্রূকুটিকে সদর্পে উপেক্ষা করে তারই মুখের উপর কথাগুলি সে তাকেই শুনিয়ে দিচ্ছে।

বলেই অরুণাংশু যেন একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। তার মনে হতে লাগল যে সেই কাল থেকে যে ভারী পাথরখানা তার বুকের উপর চেপে বসে ছিল, সেখানা যেন নেমে গিয়েছে। তার মুখখানাও গর্ব্বে ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

উত্তেজনার এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি অনামিকার চোখ এড়াল না। তার ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম কয়েকটি হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু হাসিটুকু সেখানেই চেপে রেখে সে জিজ্ঞাসা করলে, তার সাথে বুঝি আপনার খুব ভাব ?

কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে অরুণাংশু উত্তর দিলে, খু—ব।

একটু চুপ করে থেকে অনামিকা বললে, সুভদ্রাদেবীকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

অরুণাংশুর চোখ-মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; সে উৎসাহের স্বরে বললে, তিনি দেখবারই মত। সত্যি,—ঐশ্বর্য্য, সংস্কৃতি আর শিক্ষাভিমানিনী দেশবিদেশের কত

মেয়েকেই তো জীবনে দেখেছি ;—কিন্তু ঐ 'নার্স' সুভদ্রার সাথে তাদের কারও তুলনা হয় না।

অনামিকার ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু এবার বাঁধ ভেঙ্গে তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল ; সে আগ্রহের স্বরে বললে, একবার দেখাতে পারেন, অরুণদা ? সত্যি, তাঁকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

অরুণাংশু চমকে উঠল,—অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে সে যেন আয়নার ভিতর দিয়ে তার নিজের প্রতিবিম্বই দেখতে পেলে। বুঝলে যে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে নিজে সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। লজ্জিত মুখ নত করে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, তিনি তো পর্দ্দানশীন মহিলা নন,—মস্ত বড় প্রাসাদেও তিনি থাকেন না। হুগলীর জেমসন-টমসন কোম্পানীর কারখানায় গেলেই তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

অনামিকা তার স্বভাবসুলভ ছেলেমানুষি ধরণে মাথা দুলিয়ে আবদারের স্বরে বললে, আমায় সেখানে নিয়ে চলুন না, অরুণদা,—চলুন না কালই যাই !—

বল কি অনু !—অরুণাংশু চমকে মুখ তুলে তাকাল ; কিন্তু তখনই হেসে ফেলে কৌতুকের স্বরে সে বললে, তুমি যাবে কারখানার কুলিবস্তিতে ? সেখানে গেলেই তোমার মূর্চ্ছা হবে যে !—

অনামিকা হেসেই উত্তর দিলে, হয়ও যদি, তবু আমি যেতে চাই, অরুণদা।

কিন্তু অরুণাংশু হাসি চেপে মাথা নেড়ে বললে, কিন্তু আমি নিতে চাই নে,—অতবড় ঝুঁকি ঘাড়ে নেবার মত দুঃসাহস আমার নেই।

বলেই সে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

অনামিকা সবিস্ময়ে বললে, এ কি—উঠছেন কেন, অরুণদা ? বেশ তো,—না হয় না-ই নিয়ে গেলেন। কিন্তু বসুন—গল্প করুন।

ততক্ষণে অরুণাংশু জানালার কাছে চলে গিয়েছে ; সেখান থেকেই সে উত্তর দিলে, আজ থাক্,—গল্প আজ আর জমবে না !

অনামিকা হাসিমুখে ক্ষণকাল তার দিকে চেয়ে রইল ; তার পর ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, সুভদ্রাদেবীকে ছেড়ে আসতে হয়েছে বলেই বুঝি আপনার মন এত বেশী খারাপ হয়ে গিয়েছে ?

অরুণাংশু মুখ ফিরিয়ে ঘাড় কাৎ করে বললে, ঠিক তাই।

অনামিকাও উঠে দাঁড়াল এবার ; ভুরু বেঁকিয়ে কুটিল কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখের

দিকে চেয়ে কৌতুকের স্বরে সে বললে, আমি আশা ছাড়ছি নে, অরুণদা ; ভাগ্যে যদি থাকে তো এক দিন এই বাড়ীতেই আপনার সুভদ্রাদেবীকে আমি নিশ্চয়ই দেখতে পাব।

সেই রাত্রেই রান্নাঘরে মহামায়াদেবীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে অনামিকা এক সময়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, সুভদ্রাদেবীকে আপনি দেখেছেন, জেঠিমা?

মহামায়াদেবী বিস্ময়ের স্বরে বললেন, সুভদ্রাদেবী—কে সুভদ্রাদেবী?

কিন্তু তখনই সুভদ্রাকে তাঁর মনে পড়ে গেল,—কেবল তার মুখখানিই নয়, সেদিনের গোটা ঘটনাটাই। প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে তিনি বললেন, কেন, অনু? অরুণ তার কথা তোমায় কিছু বলছিল নাকি?

নিজেকে তৎক্ষণাৎ সামলে নিলে অনামিকা। তাচ্ছিল্যের স্বরে সে বললে, না জেঠিমা,—হুগলীর গল্প করছিলেন অরুণদা,—কথায় কথায় একবার তার নাম করছিলেন মাত্র।

কিন্তু মহামায়াদেবীর মুখখানা বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ; প্রায় একটি মিনিট চুপ করে থাকবার পর তিনি তীব্র বিতৃষ্ণার স্বরে বলে উঠলেন, দেখেছিলাম বটে ওর ঘরে একটি মেয়েকে—সে নাকি নার্স।

একটু থেমে অধিকতর তিক্ত কণ্ঠে তিনি আবার বললেন, ছোট ঘরের জ্যাঠা মেয়ে।

পরদিন বৈকালে কাউকে কিছু না বলেই অরুণাংশু বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। ট্রামে চেপে চলল এসপ্ল্যানেডের দিকে।

ইভাক্যুশনের কলিকাতা,—একেবারে জনহীন না হলেও সম্পূর্ণ শ্রীহীন। ট্রামে যেতে যেতে অরুণাংশুর মনে হতে লাগল যে সে যেন পিরামিডের দেশের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

হাঁফ ছেড়ে সে বাঁচল তাদের পার্টির আপিসে উপস্থিত হবার পর। মেয়ে-পুরুষে মিলিয়ে সেখানে অনেক লোকজন। কেউ কেউ এসেছে মফস্বল থেকে। তাদের পার্টির লীডার কমরেড্ ডক্টর প্রবীর চ্যাটার্জ্জি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। মস্ত নামকরা লোক তিনি ; বয়সে প্রবীণ,—ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। মেঝের উপর

মাদুর পাতা ; তারই উপর এক থালা মুড়ি আর চানাচুরকে কেন্দ্র করে তাদের গোলটেবেলের বৈঠক বসেছে। হৈ-হল্লাও চলেছে পুরা দমে। বেশীর ভাগ লোকই অরুণাংশুর চেনা। তারা সবাই খুশী হয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করে তাকে বসালে। যারা অপরিচিত তাদের সঙ্গেও কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জি তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বন্ধুরা মুড়ির থালা তার সামনে এগিয়ে দিলে। চা এল। অরুণাংশু নিজেও একটা টাকা ফেলে দিলে আরও কিছু খাবার আনিয়ে নেবার জন্য। সকলে হৈ হৈ করে উঠল তার ঐ বদান্যতায়,—শুধু জলখাবারের জন্য নগদ একটা টাকা এদের কারও পকেট থেকে প্রায়ই বের হয় না। একজন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসাই করে বসল, অরুণদা গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন নাকি ?

অরুণাংশু হেসে উত্তর দিলে, হ্যাঁ ভাই ;—ভাগ্য ফিরবে, এই রকম একটা আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

জলযোগের পর কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জি অরুণাংশুকে নিয়ে একটা ছোট ঘরের মধ্যে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলেন। বললেন, ভালই হয়েছে তুমি এসে পড়েছ। নইলে কালই লোক যেত তোমার কাছে। আপাততঃ হুগলীতে তোমার আর ফেরা হবে না—একবার আসানশোলের দিকে যেতে হবে।

অরুণাংশু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, কিন্তু, প্রবীরদা, আমি যে বাড়ী যাচ্ছি—এলাহাবাদে।

সে কি কথা !—কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জি চমকে উঠে বললেন।

অরুণাংশু তার নিজের অবস্থাটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললে,—এমনভাবে বললে যেন অনুতপ্ত আসামী বিচারকের কাছে দোষ স্বীকার করছে। ঠিক এক মাস পরেই সে যে ফিরে আসবে এবং হিসাব মত সে এক মাসেরও তিনটি দিন এরই মধ্যে কেটে গিয়েছে, এই কথাটা উপসংহারে সে খুব জোর দিয়েই বললে।

কিন্তু কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জির কথায় বা ব্যবহারে একটুও অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেল না। বরং সকল কথা শুনে খুশী হয়েই তিনি বললেন, এ খুব ভালই হয়েছে, অরুণাংশু। ঠিক এই সময়টাতে মাসখানিকের জন্য তোমায় হারানো অবশ্য আমার দিকে মস্ত একটা লোকসান ; তবু মোটের উপর এতে আমার লাভই হবে আশা করি। বাপ-মায়ের সাথে তোমার যা মতান্তর চলছিল সেটা মিটে গেলে তোমার নিজের সুবিধে তো হবেই, আমাদের পার্টিরও লাভ হতে পারে। কাজেই তুমি ওঁদের আর চটিও

না ; বরং একটু ওদের মন জুগিয়ে চলে কিছু টাকাপয়সা যদি আদায় করে নিতে পার তবে এই দুর্দ্দিনে আমরা বেঁচে যাব।

নিজের অবস্থাকে এভাবে অরুণাংশু আগে দেখে নি ; এখন সে বুঝলে যে এ-ও একটা দিক আছে বটে। কিন্তু নিজে সে কোন মতামত প্রকাশ করবার আগেই কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জি নিজের আসনে সোজা হয়ে বসে আবার বললেন, কিন্তু আসল কথাটা আগে শোন, অরুণাংশু,—এবার হুগলী থেকে তোমায় পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসতে হবে।

এবার অরুণাংশু চমকে উঠে বললে, সে কি কথা, প্রবীরদা ?

শূন্যে বাংলার একটা সাত আঁকার ভঙ্গীতে নিজের মাথাটাকে দুলিয়ে কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আসতেই হবে। হুগলীর ঐটুকু কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে তোমার মত একজন কর্ম্মী বদ্ধ হয়ে থাকলে পার্টির লোকসান হয়। ঐটুকু ক্ষেত্রের জন্য বিমল একাই যথেষ্ট—বিশেষতঃ ইয়ূনিয়ন যখন আমাদের হাতে এসে গিয়েছে আর প্রতিপক্ষীয় সুবোধবাবুও সেখানে আর নেই—

তা তো নয়, প্রবীরদা,—অরুণাংশু বাধা দিয়ে বলে উঠল,—সুবোধ তো ফিরে এসেছে !—

ফিরে এসেছে !—কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

অরুণাংশু সংক্ষেপে সকল কথাই খুলে বললে। সমস্ত শুনে কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জি বিরক্ত হয়ে বললেন, আর তাকে ওখানে রেখে তুমি নিজে ওখান থেকে চলে এলে ? বিমলও তো এখন ওখানে নেই !

অরুণাংশুর মাথাটা কুণ্ঠাভরে নত হয়ে পড়ল। নীরব স্বীকৃতিদ্বারা ভুলটাকে মেনে নিয়ে অস্ফুট স্বরে সে বললে, তবে হুগলীতেই ফিরে যাই আমি ?—বাড়ী যাওয়া না হয় এখন থাক্ !—

কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জি তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিয়ে চৌকি ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যেই পায়চারি করে বেড়ালেন। ফিরে যখন তিনি এসে বসলেন তখন তার মুখের ভাব গম্ভীর হলেও শান্ত হয়ে এসেছে। ছোট একটি নিশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, না, তার দরকার নেই। তুমি যেখানে যাচ্ছ, যাও। আমি দুএক দিনের মধ্যেই বিমলকে ওখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। তবে তোমার সম্বন্ধে আমার আগের সিদ্ধান্তই বহাল রইল,—বাড়ী থেকে ফিরে আসবার পর তোমার হেড্ কোয়ার্টার্স হবে কলকাতা।

অরুণাংশু বিহ্বল স্বরে বললে, সে কি কথা, প্রবীরদা? হুগলীর কাজ তাহলে করবে কে?

কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জি উত্তর দিলেন, এখন থেকে বিমলকেই ওখানকার কাজের ভার নিয়ে থাকতে হবে,—তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে ঠিক করে দেওয়া যাবে। নিতান্ত দরকার যদি হয় তবে তুমি দুএকবার সেখানে গিয়ে একটু তদারক করে এলেই চলবে।

অরুণাংশু আরও বিহ্বল হয়ে বললে, তা যেন হল,—কিন্তু কলকাতায় থেকে আমি করব কি?

শোন কথা,—কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জি হেসে বললেন,—কাজের অভাব আছে নাকি? এত কাজ তোমায় আমরা দেব যে তুমি নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ পাবে না।

কম্‌রেড্ চ্যাটার্জ্জির মুখের কথা অনুরোধ মাত্র নয়,—সেটা পার্টির নির্দ্দেশ। অরুণাংশু অস্বীকার করতে পারলে না, কিন্তু সম্মতিও দিলে না সে। সমস্যাটির শেষ মীমাংসা তখনকার মত স্থগিত রেখেই সে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল।

প্রতুলবাবুর বাড়ীতে যখন সে ফিরে এল তখন সন্ধ্যা হয়েছে। নীচের ড্রয়িং রুমে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সে,—সেখানে ছোটখাটো একটা জমায়েৎ বসেছে। প্রতুলবাবু, মহামায়াদেবী ও অনামিকা তো আছেই, তা ছাড়াও আরও একটি প্রৌঢ়া মহিলা এবং জনতিনেক পুরুষও আছে। একজন ডাক্তার বোস; আর দুজন যুবক তার অপরিচিত। তাদেরই একজনের সঙ্গে অনামিকা গল্প করছিল। অরুণাংশু ঘরে ঢুকতেই তাতে বাধা পড়ল।

প্রতুলবাবু উৎফুল্ল হয়েও উদ্বেগের স্বরে বললেন, এই যে বাবা, অরুণ,—কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

অনামিকা মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, হুগলী গিয়েছিলেন নাকি, অরুণদা?

অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, না,—গিয়েছিলাম এই বৌবাজার।

প্রতুলবাবু বললেন, কেন?

অরুণাংশু বললে, একটু কাজ ছিল।

অনামিকা আবার কি একটা কথা বলবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু তার আগেই প্রতুলবাবু বললেন, যাক্ গে—যাক্; এস, এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই, অরুণ,—এই হল আমাদের অরুণাংশু—যার কথা বলছিলাম তোমাদের

—পলিটিক্‌স্‌কে করেছে কেরিয়ার—ভয়ঙ্কর কম্যুনিষ্ট ; আর এটি—বুঝেছ, অরুণ—আমার জুনিয়র—মিঃ রায় চৌধুরী ; ইনি মিঃ ভট্টাচার্য্য—বিলাত থেকে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এসেছেন—ব্যবসা খুলেছেন খুব বড় ; আর একে ত চেনই—ডাঃ বোস ; উনি মিসেস বোস,—আমার বৌদি।

অরুণাংশু একে একে সব কজনকে নমস্কার করলে। প্রতুলবাবু ওর মধ্যেই আবার বললেন, এরা মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেন,—সন্ধ্যেটা গল্পগুজবে এক রকম কাটে মন্দ নয়। আজ এদের নিমন্ত্রণ করে এনেছি এই বিশেষ করে তোমারই সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য,—রাত্রের খাওয়াটাও একসঙ্গেই হবে।

কারও সঙ্গেই আলাপ করবার ইচ্ছা অবশ্য অরুণাংশুর ছিল না। তথাপি আলাপ করতে হল ; কথা বলতে বলতে সে উৎসাহিতও হয়ে উঠল। যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অরুণাংশু অতিথিদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবেই আলাপ করলে।

কিন্তু আটটা বাজতেই প্রতুলবাবু আলাপে বাধা দিয়ে বললেন, আর না, অরুণ, —এবার খাওয়ার সময় হয়েছে। তুমি চট্ করে কাপড় ছেড়ে মুখ ধুয়ে এস, বাবা ; অনু—তুমি ওদিকটা ঠিক করে ফেল, মা।

কিন্তু সব ঠিক হবার আগেই বাধা পড়ল। অরুণাংশু স্নানের ঘর থেকে বের হবার আগেই বাইরে অকস্মাৎ অন্ধকারের বুক চিরে একটা মর্ম্মান্তিক তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ উর্দ্ধে উঠেই তৎক্ষণাৎ আবার মিলিয়ে গেল।

কোন অসতর্ক অতি-মানবের বুকে হঠাৎ যেন কোন নির্ম্মম, তীক্ষ্ণ, ক্রূর শেল এসে ফুটেছিল ; সেই শত্রুরই ইস্পাতের মত কঠিন অঙ্গুলীগুলির নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে বিদীর্ণ বক্ষের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ পরিস্ফুট হবার আগেই আহতের কণ্ঠনালীর মধ্যেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

কিন্তু তার পর আবার ওরই পুনরাবৃত্তি।

অরুণাংশু বুঝলে যে সাইরেণ বাজছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দূরশ্রুত কলের বাঁশীর তীক্ষ্ণ ধ্বনিকেও পরাস্ত করে নীচে প্রতুল-বাবুর সশঙ্ক কণ্ঠ বেজে উঠল, অনু,—ও মা অনু,—এ যে সাইরেণ! শীগগির এ ঘরে এস মা,—শীগগির। অরুণ কোথায় গেল?—অরুণ—ও বৌদি—ও অনু!—

অদূরে রান্নাঘরের দিকে অনামিকার সহাস্য কলকণ্ঠ শোনা গেল, কি হল বাবা ? সাইরেণ নাকি ? বাঃ রে—কি মজা ! এই আমি যাচ্ছি, বাবা,—এক্ষুনি আসছি।

কি সর্ব্বনাশ !—ওখানে কি করছ তুমি ? আলোটা নিভাও শীগগির—ও অনু !—

আঃ—থাম না, বাবা !—একটু দেখতে দাও।—কৈ—কিছু দেখা যাচ্ছে না তো—একখানা প্লেনও নয় !—

আঃ—কি সর্ব্বনাশ করলে তোমরা—কি পাগলামী করছ তুমি ? এই সময়ে বাইরে ? অরুণই বা কোথায় গেল ?—ও অরুণ !—

কথার পিঠে কথা,—একটির উপর আর একটি যেন ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আবেগ ও আশঙ্কায় প্রতুলবাবুর কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠছে। অনামিকার কণ্ঠস্বরও চঞ্চল ; কিন্তু সে চাঞ্চল্য কৌতূহলের। হঠাৎ সদ্যমুক্ত প্রস্রবনের উচ্ছল জলধারার কলঝঙ্কারের মত অনামিকার সরস কণ্ঠস্বর কলহাস্যের ঝঙ্কার তুলে উছলে উঠল আর ঐ হাসির ফাঁকে ফাঁকেই সে বললে, এ কি ! তুমি আবার এখানে কেন এলে বাবা ? বোমা যদি পড়ে ? আঃ—হাত ছাড় না—যাচ্ছিই তো—এদের নিয়ে যেতে হবে না বুঝি ?

ছাড়া জামাটাই আবার গায়ে দিয়ে অরুণাংশু নীচে নেমে সেণ্টার রুমে ঢুকে গেল। ততক্ষণে অনামিকাকে নিয়ে প্রতুলবাবুও ঘরে এসে ঢুকেছেন। অতিথিরাও সেই ঘরে। চাকরদাসীরাও সেই ঘরেই এসে দেয়াল ঘেঁষে মেঝের উপর বসেছে। মহামায়াদেবী একখানা চৌকির উপর বসে আছেন অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের মত। মিসেস বোসের অবস্থাও প্রায় সেইরকম। মিঃ রায় চৌধুরী এবং মিঃ ভট্টাচার্য্যের মুখও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। প্রতুলবাবুর মুখচোখের অবস্থা অস্বাভাবিক। একা স্বভাব-গম্ভীর ডাক্তার বোসের মুখে কোন ভাবান্তর দেখা দেয় নি। অনামিকার সুন্দর, উজ্জ্বল মুখখানি কিন্তু আরও বেশী সুন্দর, আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অরুণাংশু ঘরে এসে ঢুকতেই অনামিকা বলে উঠল, এই তো অরুণদা। এবার তুমি শান্ত হয়ে বস তো, বাবা,—আমি উপরের জানালাগুলো বন্ধ করে আসি।

না, না,—বলে প্রতুলবাবু অনামিকার একখানা হাত চেপে ধরলেন ; উদ্বিগ্ন, কম্পিত কণ্ঠে যথাসম্ভব ভৎর্সনা ফুটিয়ে তুলে আবার বললেন, কোথাও আর যেতে হবে না তোমায় ; তুমি এখানে বোস,—বড্ড ছেলেমানুষি করছ তুমি।

অপাঙ্গে অরুণাংশুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অনামিকা ঠোঁট ফুলিয়ে উত্তর দিলে, হ্যাঁ—তা বই কি!—ছেলেমানুষি করছ তো তুমি! কেন, কি হয়েছে? অত ভয় কিসের? এর আগেও তো কত বার সাইরেণ বেজেছে। বোমা পড়েছে কখনও?

কি মুশকিল!—মুখচোখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে প্রতুলবাবু বলে উঠলেন,—আগে কখনও পড়ে নি বলেই আজও পড়বে না, এমন কোন কথা আছে নাকি?

পড়ে পড়ুক। তাই বলে বোমা না পড়তেই তোমাদের মত ভয়েই আমি মরে থাকতে পারব না;—বলে অনামিকা এক হ্যাঁচকা টানে নিজের হাতখানি প্রতুল-বাবুর মুঠার ভিতর থেকে ছাড়িয়ে নিলে।

প্রতুলবাবু অসহায়ের মত একে একে উপস্থিত সব কটি লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষে বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না করেই বললেন, দেখ তো,—মেয়ের কি কাণ্ড! এই পাগলীকে নিয়ে আমি কি করি!

অরুণাংশুর ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল; কিন্তু মহামায়াদেবী অনামিকার হাত ধরে তাকে নিজের কাছে বসিয়ে বললেন, ছিঃ, মা! এ সব কথা কি মুখে আনতে আছে! বোস তুমি,—আমার কাছে বোস। রুণু—তুইও বোস্।

তখন সাইরেণ থেমে গিয়েছে। বদ্ধ ঘরের ভিতর থেকে আর কোন শব্দও শোনা যায় না। উদ্বিগ্ন, বিবর্ণ মুখে মিনিট পাঁচেক কাল কান পেতে থাকবার পর প্রতুলবাবু হঠাৎ মিঃ রায় চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা, সুধীর—কি হচ্ছে কিছু অনুমান করতে পার তুমি?

শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর হল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

তখন অরুণাংশুর দিকে ফিরে প্রতুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মনে হয় অরুণ? কোন রকম শব্দও তো শোনা যাচ্ছে না!—

অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে বললে, কিছু হচ্ছে না বলেই কোন শব্দও হচ্ছে না। আর কিছু হবার সম্ভাবনাও হয় তো নেই!

প্রতুলবাবু সংশয়ের স্বরে বললেন, কিন্তু সাইরেণ যখন ওরা বাজিয়েছেন—

বাজিয়েছেন আমাদের খাওয়াটা মাটি করবার জন্য,—অনামিকা ফস্ করে বলে বসল,—ওদিকে সব জিনিষ জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

অরুণাংশু শব্দ করে হেসে উঠল, আর সকলেও তাতে যোগ না দিয়ে পারলে না। এমন কি, স্বয়ং প্রতুলবাবুও সব ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

পরদিন সকালের চায়ের আসরে মহামায়াদেবী মুখ গম্ভীর করে বললেন, যে রকম কাণ্ড হচ্ছে, ঠাকুরপো, তাতে কলকাতায় আমার আর থাকতে সাহস হয় না।

প্রতুলবাবুও গম্ভীর স্বরেই উত্তর দিলেন, থাকতে বলতে আমারও আর সাহস হচ্ছে না, বৌদি। দেখি, ডাক্তারকে আবার আমি তাড়া দিচ্ছি,—দুএক দিনের মধ্যেই আপনাদের যাতে রওনা করে দিতে পারি, তারই চেষ্টা করব।

একটু চুপ করে থেকে তিনি অধিকতর গম্ভীর স্বরে আবার বললেন, আমার নিজেরও এখানে আর থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না, বৌদি; ভাবছি যে অনুকে নিয়ে আমিও কিছু দিনের জন্য অন্য কোথাও যাব।

এরই উত্তরে মহামায়াদেবী মুখ তুলে দৃঢ় স্বরে বললেন, শুধু ভাবা নয়, ঠাকুরপো, আপনাকেও নিশ্চয়ই যেতে হবে আর আমাদেরই সাথে আমাদেরই এলাহাবাদের বাড়ীতে।

প্রতুলবাবু চমকে উঠলেন; কথাটা যে তাঁর মর্ম্মস্থল স্পর্শ করেছে তার প্রমাণ ফুটে উঠল তাঁর চোখেমুখে। ঈষৎ বিব্রত হলেও উৎফুল্ল স্বরেই তিনি বললেন, সে তো খুব ভালই হত, বৌদি। রমেনদা আর আপনার সাথে একত্র থাকাটা তো আমার পক্ষে হবে স্বর্গবাসের তুল্য। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে—

না, মুশকিল কিছুই নেই,—মহামায়াদেবী মাথা নেড়ে আগের চেয়েও দৃঢ় স্বরে, বললেন, আপনাকে যেতেই হবে আমাদের সাথে। না গেলে আমরা এই বোমার বিপদ মাথায় নিয়েও আপনার এই বাড়ীতেই ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকব।

প্রতুলবাবু সলজ্জ স্মিত মুখে নিজের মাথায় বারকয়েক হাত বুলিয়ে নিয়ে পরে অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, শুনলে তো, অনু? তোমার জেঠিমা বলছেন আমাদের এলাহাবাদ যেতে। তুমি কি বল?

মুখ লাল করে কুণ্ঠিত স্বরে অনামিকা বললে, আমি আবার কি বলব,—কলকাতা ছেড়েই যেতে চাই নে আমি!—

প্রতুলবাবু বিব্রত হয়ে তাকালেন মহামায়াদেবীর মুখের দিকে; তিনি হেসে ফেলে বললেন, বেশ তো ঠাকুরপো,—অনুর মত হলেই আপনারও মত হবে তো? তাহলে

ওকে রাজী করাবার ভার আমারই রইল। আপনি আর সব হ্যাঙ্গাম চুকিয়ে ফেলুন শীগগির।

সেই দিনই ঠিক হয়ে গেল যে, অনামিকাকে নিয়ে প্রতুলবাবুও তাদের সঙ্গে এলাহাবাদেই যাবেন। তার পর যাবার আয়োজন করা। সেটা তত সোজা নয়। প্রতুলবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার। তার হাতে অনেক কেস্—সেগুলি সব উপযুক্ত হাতে চালান করে দিতে হবে। অত দিনের অমন একটা পরিপাটি সংসার না ভেঙ্গেও গুটিয়ে তোলা একটা মস্ত ঝঞ্ঝাটের কাজ। এক বসত বাড়ীখানাই একটা মস্ত দায়; তার উপর সোনাদানা আছে, আসবাবপত্র আছে, মোটরগাড়ী আছে, ঝি-চাকর আছে। সব জিনিষের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করে বাড়ী ছাড়া যায় না। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যে কজন প্রাণের চেয়েও প্রিয় চাকরি বা ব্যবসার মায়ায় তখনও কলকাতায় থেকে লক্ষ্মীছাড়া সংসারে বাণপ্রস্থ জীবনের কৃচ্ছসাধনা অভ্যাস করছিলেন, তাদের তোষামোদ করে, ব্যাঙ্ককে মোটা দক্ষিণা উপঢৌকন দিয়ে, বাড়ীর দারোয়ানটির মাইনে দ্বিগুণ বাড়িয়ে তাকে বাড়ীর পাহারা দিতে রাজী করিয়ে, মোটঘাট বেঁধে যাবার জন্য তৈরি হতে সময় নিতান্ত কম লাগল না। ভীড়ের বাজারে রিজার্ভ গাড়ী চাইলেই পাওয়া যায় না,—তার জন্যও দুদিন অপেক্ষা করতে হল। মানসিক উদ্বেগের সঙ্গে শারিরীক অস্বাচ্ছন্দ্য কাউকেই নিতান্ত কম ভোগ করতে হল না। ঘোরাঘুরি করে প্রতুলবাবু হাঁফিয়ে উঠলেন; একবাড়ী ঝি-চাকর নিয়েও এত বড় সংসারের জিনিষপত্র গোছগাছ করতে মহামায়াদেবী ও অনামিকাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হল।

অবশেষে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হল; যাবার দিনও এসে পড়ল।

যাত্রার এই উদ্যোগ-আয়োজনের পরিশ্রম বা উল্লাস কোনটারই কোন অংশ গ্রহণ না করে অরুণাংশু সেদিন সারাটা দিনই কাটাল নিজের ঘরের মধ্যে। সে ষ্টেশনে গেল যন্ত্রচালিতের মত। দ্বিতীয় শ্রেণীর রিজার্ভ গাড়ীতে তার বসবার জায়গাটুকু বেদখল হয়ে যাবার কোন আশঙ্কা না থাকলেও গাড়ী ছাড়বার অনেক আগেই গাড়ীতে উঠে প্লাটফর্মের বিপরীত দিকের জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে চুপ করে বসে রইল সে।

গাড়ী ছাড়বার একটু আগে অন্যান্য সকলের সঙ্গে গাড়ীতে এসে অরুণাংশুকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়ে অনামিকা মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, হুগলী ঐ দিকেই পড়বে, না, অরুণদা ?

অরুণাংশু উত্তর দিলে না, মুখ ফিরিয়েও তাকাল না। প্রশ্নটা সে যে শুনতে পেয়েছে এমন কোন লক্ষণও তার ব্যবহারে প্রকাশ পেল না।

তার মনটাই আসলে বিকল হয়ে গিয়েছিল। গত কয় দিনে তার জীবনে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তার সব কটাই অপ্রত্যাশিত এবং কোনটাই তার বাঞ্ছিত বা বাঞ্ছনীয় নয়। অথচ তার একটা ঘটনাও সে নিবারণ করতে পারে নি। অবাঞ্ছিত, অনিমন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত সে সব ঘটনা তার জীবনের প্রধান সূত্রটির সঙ্গে জড়িয়ে, জট পাকিয়ে কেমন যেন একটা কিম্ভূতকিমাকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। এই দিনকয়েক আগেও হুগলীতে তার জীবনে এই জটিলতা ছিল না। জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে ওর ধারার অসঙ্গতি সেখানে তাকে বিচলিত বা বিভ্রান্ত করে নি। সে জীবন ছিল নিরুপদ্রব এবং সহজ। তাতে গতির অভাব ছিল না; কিন্তু সে গতি ছিল উত্তর ভারতের গ্রীষ্মের গঙ্গার গতির মত শান্ত এবং স্নিগ্ধ। কিন্তু কয়টি দিনের মধ্যেই সেই জীবনই আরও একাধিক স্রোতের সংস্পর্শে পরিপুষ্ট হয়ে বিস্তৃতির প্রসারতায়, গতির দ্রুততায় এবং আবর্ত্ত ও তরঙ্গের ভয়ঙ্কর মুখরতায় যেন বর্ষার পদ্মার মতই অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। এত সব বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তার মনটা কিছুতেই যেন তাল রেখে চলতে পারছিল না।

গাড়ী ছাড়লে তার মনটা আরও বেশী বিকল হয়ে গেল। বোম্বে মেইল হুঙ্কার দিয়ে ষ্টেশন পরিত্যাগ করে ঘণ্টায় যাট মাইল বেগে ছুটে চলল। এ-ও গতি,—ঠিক যেন তার নিজের জীবনের গতিরই বাহ্য প্রতীক। ধাক্কা খেয়ে অরুণাংশু চমকে উঠল —এ কোথায় চলেছে সে ? সেবা দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে এত দিন যা কিছু সে নিজের করে নিয়েছিল, সে সব পিছনে ফেলে এ কোথায় এগিয়ে চলেছে সে !—

শুক্ল পক্ষের রাত্রি। খণ্ড চন্দ্রের নিষ্প্রভ আলোকে পথের ধারের মাঠঘাট, গাছ-পালা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে অরুণাংশু আবার খোলা জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে সাগ্রহ দৃষ্টিতে পিছনের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল। গাড়ী যে কর্ড লাইন ধরে চলেছে সে কথা তার মনেই পড়ল না। তার

মনে হতে লাগল যে, গাড়ী মেইন লাইন ধরেই ছুটে চলেছে,—তার চোখের সামনেই মাঠের শেষে গাছপালার আড়ালে হুগলীর কারখানা অঞ্চল,—তার অতি প্রিয় ও অতি পরিচিত কর্ম্মক্ষেত্র। একটা অনালোকিত ছোট ষ্টেশন জ্যোৎস্নার বুকে পাতলা অন্ধকারের হাল্‌কা একটা পুঞ্জের মত চকিতে দেখা দিয়েই তখনই অদৃশ্য হয়ে গেল। নিদর্শন কিছুই নেই; তবু অরুণাংশুর মনে হল যে জেম্‌সন-টম্‌সন কোম্পানীর কারখানার এলাকায় যাবার জন্য প্রতি বার সে ঠিক এই ষ্টেশনেই ট্রেণ-থেকে নেমেছে। সাগ্রহে আরও খানিকটা বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। লাইন থেকে দূরে মাঠের মধ্যে অনেকখানি জমাট অন্ধকার তার চোখে পড়ল আর ওরই ভিতর দিয়ে অস্ফুট আলোকের কম্পমান একটা বিন্দু। হঠাৎ অরুণাংশুর মনে হল যে ঠিক ঐ জায়গাটিতেই যেন কোম্পানীর কারখানা, মজদুরের বস্তি আর সুভদ্রার একতলা ছোট বাড়ীখানা ঐ অস্পষ্ট আলোকেও সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। দূরে সেই অস্ফুট আলোকের ক্ষুদ্র বিন্দুটি নেচে নেচে বেড়াতে লাগল; তার পর এক সময়ে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু অরুণাংশুর মনে হতে লাগল যে, সে যেন তখনও স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে—আলোকের একটি বিন্দু নয়, সুভদ্রার বাষ্পাচ্ছন্ন চোখের ব্যথিত, সকরুণ দৃষ্টি।——

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী থামলে অরুণাংশু আর একবার চমকে সজাগ হয়ে উঠল। সেখানেই মহামায়াদেবী টিফিনের বাকস খুলে আহারের আয়োজন করলেন। অরুণাংশুর খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু খেতে না চাইলেই কথা বেশী বলতে হবে বুঝে সে বিনা প্রতিবাদেই খেতে বসল। কোনও রকমে খাওয়া শেষ করেই সে বাঙ্কের উপর উঠে শুয়ে পড়ল।

ততক্ষণে গাড়ী আবার নক্ষত্রবেগে ছুটতে আরম্ভ করেছে,—কানে আসছে কেবল গাড়ীর চাকার অবিরাম ঘর্ঘর শব্দ। বাইরের কিছু আর দেখা যায় না—চোখের সামনে কেবল গাড়ীর ছাদ। তথাপি অরুণাংশুর মনে হতে লাগল যে, দূর দিগন্তে ঘন অন্ধকারের বুকে সুভদ্রার করুণ চোখদুটি তখনও যেন সন্ধ্যাতারার মত ফুটে রয়েছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজেও সে নিস্তার পেল না। বরং তাতে তার মনে হতে লাগল যে দূরের দিগন্ত এবার যেন তার অতি নিকটে সরে এসেছে,—সুভদ্রার চোখদুটি ফুটে রয়েছে ঠিক তার নিজের চোখের সামনে,—যেন চোখ চাইলেই এখনই সে সুভদ্রার বিষণ্ণ, গম্ভীর মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পাবে।

কিন্তু হঠাৎ চোখ চেয়েই যে মুখ সে দেখতে পেলে তা সুভদ্রার নয়, অনামিকার।

নীচে ঠিক বিপরীত দিকের বেঞ্চে পাশ ফিরে শুয়ে অনামিকা ঘুমিয়ে পড়েছে। বাঁ হাতখানা কোথায় ঢাকা পড়ে রয়েছে, দেখা যায় না। কিন্তু ডান হাতখানা দেখা যায়,—সুগোল, সুডৌল, অনাবৃত হাতখানা বুকের উপর দিয়ে ত্রিভুজের মত হয়ে বালিশের নীচে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। মুখের নীচের দিকে অনেকখানি দেখা যায় না, কিন্তু যেটুকু চোখে পড়ে তা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট। চোখদুটি বোজা; কয়েকগাছা অবাধ্য চূর্ণ-কুন্তল ললাটের উপর ছড়িয়ে পড়েছে; পাতলা ঠোঁটদুখানি ঈষৎ বিস্ফারিত—ফাঁকের ভিতর দিয়ে মুক্তার মত দন্তপংক্তির সামান্য একটু আভাষ দেখা যায়। কোন অদৃশ্য কোণের বিজলী বাতির পাতলা আলোকে উজ্জ্বল গৌর বর্ণ কোমল হয়ে ফুটে রয়েছে। সেদিনের চোখঝলসানো ঔজ্জ্বল্য আর নেই,—প্রাণচঞ্চলা কিশোরী অনামিকার ঝলমল রূপের সমস্ত উদ্ধত বৈচিত্র্য সুষুপ্তির প্রগাঢ় শান্তির মধ্যে সমাহিত হয়ে আজ একটিমাত্র স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

গাড়ী কি একটা ষ্টেশনে এসে থেমেছিল। অরুণাংশুর কানে এল ক্রুদ্ধ অজগরের ফোঁস ফোঁস ধ্বনির মত অসহিষ্ণু ইঞ্জিনের অবরুদ্ধ কণ্ঠের হুঁস হুঁস গর্জ্জনধ্বনি। কে একটি ফেরিওয়ালা অত রাত্রেও 'চা-গরম' হেঁকে উঠল। জনকয়েক লোকের পায়ের শব্দও শুনতে পেলে অরুণাংশু,—তারা যাত্রী কি রেলের কর্ম্মচারী তা অবশ্য বোঝা গেল না। মাঝে মাঝে দুএকটা কথাও তার কানে এল। কিন্তু চোখে কিছুই সে দেখতে পেলে না। গাড়ীর ভিতরে সব চুপচাপ,—আর কোন লোক যে আছে তা-ও বোঝা যায় না। দেখা যায় কেবল ফুটন্ত ফুলের মত ঘুমন্ত অনামিকার ঐ আধখানা সুন্দর মুখ।

অরুণাংশু মুগ্ধচোখে সেই মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মোগলসড়াই ষ্টেশনে গরম চা আর ছোট হাজরি পাওয়া গেল। কিন্তু ঐ সঙ্গে খবর যা পাওয়া গেল তা তেমন প্রীতিপ্রদ নয়। যুদ্ধের বাজার,—ফৌজ আর লড়াইএর সাজসরঞ্জাম বোঝাই মালগাড়ীকে আগে পথ ছেড়ে দিতে হবে। ডাক-গাড়ীর জন্য কখন যে পথ খোলা পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। গার্ডের

কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, গাড়ী ছাড়তে বেলা বারটাও যদি বেজে যায় সেটাও তেমন বিস্ময়ের বিষয় হবে না। অন্ততঃ ঘণ্টাখানিকের মধ্যে গাড়ী ছাড়বার কোন আশাই যে নেই, তা সে সরকারীভাবেই জানিয়ে দিলে।

প্রতুলবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বেলা নটার মধ্যেই তারা এলাহাবাদের বাড়ীতে পৌছে যাবেন, এই ছিল তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস। অথচ মোগলসড়াইতেই নটা বেজে গেল। গাড়ী কখন যে এলাহাবাদে যাবে তার কিছুই ঠিক নেই। মহামায়াদেবী নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা,—স্নান করা হয় নি বলে তিনি হিন্দু হোটেলের চাটুকু পর্য্যন্ত মুখে দেন নি। পাছে সারাটা দিনই তাঁকে অস্নাত ও অভুক্ত থাকতে হয়, এই আশঙ্কায় প্রতুলবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বিব্রতভাবে কিছুক্ষণ নিজের টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে অবশেষে তিনি মহামায়াদেবীকে সম্বোধন করে বললেন, আমি বলি কি, বৌদি,—গাড়ী ছাড়বার কিছুই যখন ঠিক নেই তখন, আসুন, স্নানটা এই ষ্টেশনেই সেরে নেওয়া যাক্। তার পর আর কিছু না হউক, কিছু ফলমূল আর একটু দুধ মুখে দিয়ে আপনি একটু সুস্থ হতে পারবেন।

ক্ষিদের তাগিদে না হউক, অভ্যাসমত সকালে স্নান করে শুদ্ধ হবার লোভে মহামায়াদেবী তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু অরুণাংশু মুখ ফিরিয়ে বললে যে শীতের দিনে অত সকালে কিছুতেই সে স্নান করতে পারবে না,—এই সময়টাতে গাড়ীতে বসেই সে খবরের কাগজ পড়বে।

প্রতু·বাবু ঈষৎ যেন একটু বিব্রত হয়েই অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তাহলে অনু,—তুমি—

অনামিকা কোন উত্তর দিবার আগেই মহামায়াদেবী তাড়াতাড়ি বললেন, ওকেও আর টেনে কাজ নেই, ঠাকুঃপো,—অরুণের সাথে অনুও গাড়ীতেই থাকুক। ওদের খাওয়া তো আর স্নানের জন্য আটকায় নি!—

ওঁরা দুজনে চলে যাবার পর অরুণাংশু বিব্রতভাবে অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমিও গেলে না কেন, অনু? স্নানটা সেরে নিলেই তো ভাল হত!—

উত্তরে অনামিকা মুখ টিপে হেসে বললে, আমি গেলে আপনার কোন সুবিধে হবে, অরুণদা?

না তো!—অরুণাংশু কুণ্ঠিত হয়ে বললে,—তা তো বলি নি আমি!—সুবিধে আবার কিসের!—

কেন—ভাববার, —বলতে বলতে অনামিকার সহাস্য চোখদুটি কুটিল হয়ে উঠল, —কাল থেকে কেবলই তো ভাবছেন আপনি। কি অত ভাবছেন, বলুন তো?

অরুণাংশু আরও বেশী কুণ্ঠিত হয়ে বললে, কৈ? ভাবছি নে তো কিছুই!—

অনামিকা মাথা দুলিয়ে কৌতুকের স্বরে প্রতিবাদ করলে, না আবার! কাল থেকে একটি কথাও তো বলছেন না আপনি। আমার চোখ এড়িয়ে যাওয়া অত সোজা নয়।

তার পর সোজাসুজি অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি সুভদ্রাদেবীর কথা ভাবছেন,—না, অরুণদা?

প্রথমে বিব্রতভাবে চোখ নামিয়ে নিলে অরুণাংশু; কিন্তু পরক্ষণেই আবার অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে সে বললে, ঠিক তা নয়, অনু। আরও অনেকের কথা আমি ভেবেছি,—সুভদ্রাদেবীর কথাও মাঝে মাঝে মনে পড়েছে বটে।

ঐ দেখুন,—অনামিকা শব্দ করে হেসে উঠল,—আন্দাজ তো ভুল হয় নি আমার,—সুভদ্রাদেবীর কথাও আপনি ভেবেছেন তো!—হয়তো আর সকলের চেয়ে বেশীই ভেবেছেন!—

অরুণাংশু ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে, তা ঠিক।

মুখ তুলতেই তার চোখে পড়ল,—প্রচ্ছন্ন কৌতুকের দীপ্তিতে অনামিকার স্বভাবসুন্দর কচি মুখখানি বিচিত্র হয়ে উঠেছে। এ সেই চঞ্চলা কিশোরী,—ঠোঁটের কোণে দুষ্টামির হাসি, দুটি গালেই টোল পড়েছে, কালো চোখের কোণ থেকে তুবড়ির ফুলকির মত আলো যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে।—

চোখাচোখি হতেই অনামিকা জিজ্ঞাসা করে বসল, আচ্ছা, অরুণদা, সুভদ্রা-দেবীকে আপনি ভালবাসেন?

প্রশ্নটা শুনে প্রথমে অরুণাংশু থতমত খেয়ে গেল; কিন্তু তার পরেই হো হো করে হেসে উঠে সে বললে, তোমার আন্দাজ করবার শক্তি তো নিতান্ত কম নেই, অনু,—এ কথাটা আন্দাজ করে নিতে পার না?

পারি,—ঘাড়টা একটু কাৎ করে অনামিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে,—আন্দাজ করেই তো বলেছি ও কথা। সেটা ঠিক হয়েছে কি না বলুন। ভালবাসেন না আপনি সুভদ্রাদেবীকে?

অনামিকার দৃষ্টি এড়িয়ে কুন্ঠিত স্বরে অরুণাংশু বললে, হ্যাঁ—তাকে আমার খুব ভাল লাগে।

আর তিনি?—তিনিও আপনাকে ভালবাসেন?

হ্যাঁ—বাসেন।

ক্ষণকাল দুজনেই চুপচাপ; তার পর অনামিকার চোখের কোণে চাপা হাসি হঠাৎ আবার ঝিলিক দিয়ে ফুটে উঠল; সকৌতুক কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ অরুণদা,—আপনাদের দুজনের বিয়ে হবে?

অরুণাংশু চমকে উঠল; আবার লাল হয়ে উঠল তার মুখ। কিন্তু এবারও আগের মতই শব্দ করে হেসে উঠে সে বললে, এ কি হচ্ছে, অনু? জেরা নাকি? আমার মত পাশ-করা ব্যারিষ্টারকেও যে তুমি একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছ!—

কিন্তু অনামিকা মাথা তুলে আবদারের স্বরে বললে, বলুন না, অরুণদা—বিয়ে হবে আপনাদের?

পাগল!—বলে অরুণাংশু মুখ ফিরিয়ে নিলে।

অনামিকা তথাপি বললে, কেন? দোষ কি তাতে? বিয়ে হলেই তো ভাল হয়!—

অরুণাংশু হেসে উত্তর দিলে, তা হয়তো হয়,—কিন্তু তা হবে না।

অনামিকা এবার সত্যিকারের বিস্ময়ের স্বরে বললে, কেন অরুণদা? আপনারা দুজনেই যখন দুজনকে ভালবাসেন!—

অরুণাংশু বললে, ভালবাসলেই কি বিয়ে হয়?

অনামিকা বললে, হওয়াই তো উচিত।

অরুণাংশু ফিরে তাকাল; মুচকি হেসে কৌতুকের স্বরে সে বললে, বল কি, অনু? জীবনে মানুষ কত জনকেই তো ভালবাসে। তা বলে সকলের সাথেই তার বিয়ে হবে নাকি?

না, ছিঃ!—অনামিকা অপ্রতিভভাবে উত্তর দিলে,—তা কেন হবে!—

কিন্তু তার পরেই সে কৌতুককুটিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরুণাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্য কণ্ঠে আবার বললে, কিন্তু আপনাদের ভালবাসা তো সে রকমের নয়! আপনারা দুজনেই দুজনকে তো খু—ব ভালবাসেন!—

অরুণাংশু হেসেই উত্তর দিলে, ঠিক সেই জন্যই আমাদের বিয়ে হবে না।

এবার হাসি থামিয়ে বিস্ময়ের স্বরে অনামিকা বললে, কেন, অরুণদা—তা কেন বলছেন?

অরুণাংশু হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, বলছি কারণ ভালবাসা যেদিন শেষ হয়ে যাবে, সেদিনও ভাগ হয়ে যাওয়া চলার পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে অনিচ্ছুক সাথীকে নিয়ে টানাটানি করবার বিড়ম্বনাকে কায়েমী স্বত্ব দিয়ে নিমন্ত্রণ করে আনবার মত দুর্ব্বুদ্ধি বা নির্ব্বুদ্ধিতা আমাদের নেই।

অনামিকা উত্তর দিলে না; তার বিস্ময়বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে অরুণাংশুই আবার বললে, কি অনু,—কি ভাবছ?

অনামিকা চমকে উঠল; মুখ নামিয়ে লজ্জিত স্বরে বললে, যান,—কেবল ঠাট্টা করছেন আপনি।

কিন্তু অরুণাংশু মাথা নেড়ে বললে, না, অনু, ঠাট্টা নয়;—সত্য কথাই বলেছি আমি।

অনামিকা সবিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাল; অরুণাংশুর চোখের সঙ্গে চোখ গিয়ে মিলতেই হেসে ফেলে সে বললে, না, কক্ষনো নয়। আমি ঠিক জানি—বিয়ে করবার ইচ্ছে আপনার রয়েছে ষোল আনা। কিন্তু ভয় পাচ্ছেন পাছে জ্যাঠামশায় আর জেঠিমার মত না হয়।

অরুণাংশু এবার গম্ভীর হয়ে গেল; বললে, না অনু। মা-বাবার মতামতের কথা আমি ভাবিও নি, ভাববও না। আমার নিজের মত আর বিশ্বাসই আমার কাছে সব। সেই দিক থেকে বাধা এসেছে বলেই এতদিন বিয়ে আমাদের হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

অনামিকা থতমত খেয়ে গেল,—অরুণাংশুর কথাগুলিকে পরিহাস বলে সে যেন আর উড়িয়ে দিতে পারছে না। হতবুদ্ধির মত তার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, কেন, অরুণদা—বাধা কেন?

উত্তরে অরুণাংশু বললে, বলেছি তো,—আমাদের ভালবাসাটাই আমাদের বাধা।

দূর,—অনামিকা প্রতিবাদ করে বললে,—তা বুঝি আবার হয়!

খুব হয়,—অরুণাংশু দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে,—অন্ততঃ তাদের কাছে নিশ্চয়ই হয়, যাদের কাছে সত্য আর ভালবাসা দুটো জিনিষেরই দাম খুব বেশী। ভালবাসাকে

তারা শিকল দিয়ে বাঁধতে চায় না ; আর দুদিন পরেই যে ভালবাসা শেষ হয়ে যেতে পারে বলে তারা জানে, তাকেই বিয়ের মন্ত্রের ভাষায় শাশ্বত বলে ঘোষণা করবার দুঃসাহস তাদের নেই।

অনামিকা ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠে বললে,' দুর ! কি যে ছাইপাশ সব বলছেন আপনি ! ভালবাসা সত্য হলে তা বুঝি আবার শেষ হয়ে যায় !—

অরুণাংশু হেসে ফেলে বললে, যায় না ? যে মানুষ ভালবাসে সে নিজে যায় মরে, আর তার ভালবাসা মরতে পারে না ?

অনামিকা কুণ্ঠিত স্বরে বললে, কিন্তু ভালবাসা যদি সত্যিকারের হয় !—

তাহলেও তার শেষ আছে ;--অরুণাংশু মুচকি হেসে ঘাড়টা অল্প একটু কাৎ করে উত্তর দিলে।

অনামিকা হঠাৎ সোজা হয়ে বসল ; প্রায় উদ্ধত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি করে জানলেন ?

অরুণাংশু হেসেই উত্তর দিলে, জেনেছি আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই। ছেলেবেলা থেকে এপর্য্যন্ত দেশবিদেশে কত জনকেই তো ভালবেসেছি। অথচ তাদের অধিকাংশেরই স্মৃতিটুকু পর্য্যন্তও মরে গিয়েছে। অনেকের তো মুখই এখন আর চেষ্টা করেও মনে করতে পারি নে।

অনামিকার উজ্জ্বল চোখদুটি সংশয়ের ছায়াসম্পাতে কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছিল। ঈষৎ বিহ্বল, ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, কিন্তু সে তো হল আপনার বন্ধুদের কথা। কিন্তু ভালবাসা,—মানে, এই ভালবাসা যাকে বলে—এই যেমন সুভদ্রাদেবীকে আপনি ভালবাসেন—এমন কি আর আগে ভালবেসেছেন আপনি ?

অরুণাংশু ঘাড় কাৎ করে স্মিত মুখে উত্তর দিলে, বেসেছি বই কি !—

মেয়েকে ?

হ্যাঁ, মেয়েকেও ভালবেসেছি। কিন্তু কালক্রমে সে ভালবাসারও মৃত্যু হয়েছে।

অনামিকার বিবর্ণ মুখ আরও বেশী বিবর্ণ হয়ে গেল। একবার ঢোক গিলে সে বললে, কিন্তু,—মানে, বিয়ে যদি আপনাদের হত —

—তাহলে সে ক্ষেত্রে হয় তো ভালবাসার মৃত্যু হত আরও অনেক আগে ;— বলে অরুণাংশু অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে টিপে টিপে হাসতে লাগল।

বিস্ময়ে অনামিকা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার মুখে কথা ফুটল না ; হাসি নিশ্চিহ্ন

হয়ে মুছে গেল ; অমন যে চঞ্চল তার চোখের তারাদুটি, তা-ও অকস্মাৎ যেন গতি-শক্তি হারিয়ে একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। এমন করে অরুণাংশুর মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইল যেন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার চোখদুটি গিয়ে মিলেছে ভয়ঙ্কর হিংস্র একটা বাঘের জলজলে চোখদুটির সঙ্গে,—ভয়ে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে তার, কিন্তু মুগ্ধ চোখদুটি কিছুতেই ফিরতে চাচ্ছে না ; অপরিমেয় ভীতি ও বিতৃষ্ণার সঙ্গে দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল মিশে তার বিস্ফারিত চোখদুটির সঙ্গে সঙ্গে তার সারা দেহটাকেই যেন পাথর করে দিয়েছে।

তার মনের অবস্থাটা আন্দাজ করে নিয়েই যেন অরুণাংশু মুচকি হেসে বললে, কি অনু—ভয়ঙ্কর রকমের অমানুষ মনে হচ্ছে আমায় ?

অনামিকা মুখে বললে, ধেৎ!—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে বিব্রতভাবে চোখ নামিয়ে নিলে।

তথাপি অরুণাংশু বললে, ধেৎ কেন ? বলই না, কি মনে হচ্ছে।

অনামিকা মুখ তুললে না ; কিন্তু মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, বলব, কি মনে হচ্ছে ?—আপনি ভালবাসার কিচ্ছু জানেন না।

কিন্তু ঐ উত্তর শুনেই অরুণাংশুর ঠোঁটের কোণের চাপা হাসি তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল ; চোখদুটি তার আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; মাথাটা পিছনের দিকে একটু হেলিয়ে সে সকৌতুক কণ্ঠে বললে, তা হলে, অনু, এবার তোমার কাছেই ভালবাসা শিখব,—কেমন ?—

যাঃ!—

চক্ষের পলকে কি যেন একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। অনামিকার দেহের সমস্ত রক্ত সহসা যেন তার মুখের উপর ছুটে এল ; চোখদুটিতে অর্দ্ধস্ফুট বিদ্যুদ্দীপ্তি পাতা-দুখানির নীচে অকস্মাৎ ঢাকা পড়ে গেল ; তার অমন লতার মত কোমল, নমনীয় দেহখানি সহসা যেন কাঠের মত শক্ত হয়ে গেল ; ললাটের উপরের চুল কগাছা মনে হল যেন খাড়া হয়ে উঠেছে ; বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই চক্ষের নিমেষে সোজা হয়ে বসে সে অস্ফুট কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুধু বললে, যাঃ!—এবং পরমুহূর্ত্তেই জানালা দিয়ে মাথাটাকে বাইরে গলিয়ে দিয়ে ওরই চৌকাঠের উপর ভর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে সে আবার নিশ্চল হয়ে গেল।

অরুণাংশুও চমকে উঠল। নিজের কথাটা নিজের কানে যেতেই তার মনে হয়েছিল যে সে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে। অনামিকার ভাবান্তর দেখে

সে নিঃসংশয়েই বুঝলে যে কাজটা রীতিমত গর্হিত হয়ে গিয়েছে। একটা দুর্নিবার লজ্জায় তার মাথাটা নত হয়ে পড়ল। বলবার বা করবার কিছুই ভেবে না পেয়ে নিজের লজ্জা গোপন করবার উদ্দেশ্যেই তাড়াতাড়ি খবরের কাগজখানি মুখের সামনে তুলে ধরে ওরই আড়ালে মুখ লুকিয়ে নিজেও সে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

আধঘন্টাখানিক পর মহামায়াদেবীকে নিয়ে প্রতুলবাবু যখন ফিরে এলেন তখনও অমনি তাদের অবস্থা,—দুজন দুদিকে মুখ ফিরিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে; কারও মুখেই কোন কথা নেই; একজন আর একজনের উপস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত আছে কি না, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়; এমন কি, মহামায়াদেবীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতুলবাবু যে গাড়ীর ভিতরে এসে প্রবেশ করেছেন, তা-ও দুজনের কেউ লক্ষ্য করলে না।

দেখে বিস্মিত প্রতুলবাবু উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, এ কি অরুণ,—ও অনু—ব্যাপার কি তোমাদের ?

দুজনেই চমকে উঠল; অরুণাংশুর হাতের কাগজখানা সশব্দে মেঝের উপর পড়ে গেল; কিন্তু তার মুখে কোন কথা ফুটবার আগেই অনামিকাই তার স্বভাবসুলভ উচ্ছ্বাসের স্বরে বলে উঠল, অরুণদার সাথে আমি আড়ি করেছি, বাবা। এমন উদ্ভট সব কথা উনি বলছিলেন—আগাগোড়া মিছে কথা—কেবল আমায় বোকা বানাবার মতলব।

প্রতুলবাবুর মুখের উদ্বিগ্ন ভাবটা তৎক্ষণাৎ কেটে গেল; ছেলেমানুষের মত শব্দ করে হেসে উঠে তিনি বললেন, তাই নাকি!—ও অরুণ—তুমি বোকা বানিয়েছে নাকি অনুকে? তাহলে তো বড় ভাল কাজ করেছ, বাবা। তোমার ঠিক শাস্তি হয়েছে, অনু,—যেমন দিনরাত আমায় তুমি বোকা বানিয়ে এসেছ, তেমনি তার ফল। ঠিক হয়েছে—বুঝেছ অরুণ,—খুব ভাল কাজ করেছ তুমি। কিন্তু কি উদ্ভট কথা বলেছিলে তুমি? বলতো,—শিখে রাখি কথাটা।

অরুণাংশুর বুকের উপর থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। কিন্তু সে কোন উত্তর দেবার আগেই মহামায়াদেবী সহাস্য কণ্ঠে বললেন, থাক্, ঠাকুরপো, সে কথা রুণুর আর দ্বিতীয়বার বলে কাজ নেই। শুনে অনু যদি আবার আড়ি করে মুখ বন্ধ করে, তবে কথা বলতে না পেয়ে এলাহাবাদ যেতে যেতে আমরা সবাই হয় তো দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।

শুনে পরিপূর্ণ আনন্দে প্রতুলবাবু আবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

(৫)

সুদীর্ঘ আট বৎসর পর নিঃশব্দে এবং বিনা আড়ম্বরে পিতা ও পুত্রের মিলন হয়ে গেল।

বড়লোকের একমাত্র সন্তান অরুণাংশুর জীবনের ধারাটা কোন দিনই অত বড় বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করে চলে নি। বংশের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে, ব্যঙ্গ করে, ধ্বংশ করে অরুণাংশু ছেলেবেলা থেকেই তার নিজের খেয়ালমত বাঁকা পথে চলাফেরা করেছে। এই নিয়ে বাপের সঙ্গে তার মতান্তর ছিলই। সেটাই তার বিলাত যাওয়ার উপলক্ষে প্রবল হতে হতে অবশেষে মনান্তরে পরিণত হয়। রমেনবাবু অনেকটা সেকেলে লোক। তাছাড়া নিজে তিনি ব্যারিষ্টার না হয়েও অনেক বিলাতফেরৎ ব্যারিষ্টারের উপরে টেক্কা দিয়ে ওকালতি ব্যবসায়ে পসার করতে পেরেছিলেন,—বাড়ী, গাড়ী, নগদ টাকা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি প্রভৃতি যা কিছু তাঁর মত মানুষের কাম্য, তার কোনটারই অভাব তাঁর হয় নি। সকলের চেয়ে বড় কথা এই ছিল যে, একমাত্র সন্তান অরুণাংশুকে তিনি সুদীর্ঘকাল চোখের আড়াল করতে চান নি। এত সব আপত্তি থাকতেও শেষ পর্য্যন্ত ছেলের কাছে হয়তো তিনি হারই মানতেন ; কিন্তু অরুণাংশুর অবিমৃষ্যকারিতায় সব মাটি হয়ে গেল। ভুল অবশ্য দুপক্ষেরই হয়েছিল। অরুণাংশু বিলাত যাবার গোঁ ধরতেই রমেনবাবু ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলেন যে, অরুণাংশু তাঁর অমতে বিলাত গেলে তিনি তাকে এক পয়সা দিয়েও সাহায্য করবেন না ;—ভেবেছিলেন যে, ঐ অস্ত্র একেবারে ব্রহ্মাস্ত্রের মতই সোজা গিয়ে লক্ষ্য ভেদ করবে ;—ভুলে গিয়েছিলেন যে, অরুণাংশু তাঁরই সন্তান; যে জিদ তাঁর নিজের কথায় প্রকাশ পাচ্ছে, ওরই বীজ ছড়ানো রয়েছে অরুণাংশুর রক্তের মধ্যে। কাজেই তিনি যেই বললেন যে অরুণাংশুর বিলাত যাবার খরচ তিনি এক পয়সাও দেবেন না, অমনি অরুণাংশুও গলার স্বর আরও এক পরদা উঁচুতে চড়িয়ে ঘোষণা করে বসল যে বাপের কাছ থেকে এক পয়সাও সাহায্য না নিয়েই সে বিলাত ঘুরে আসবে। সেটা যে মুখের কথা মাত্র নয়, যেন তাই বোঝাবার জন্যই অরুণাংশু সেই রাত্রেই বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। মাসখানিক পর বোম্বাই থেকে 'তার' এল যে, সে সত্য সত্যই বিলাত যাচ্ছে। রমেনবাবু সময়ের হিসাব করে

বুঝলেন যে অরুণাংশুকে নিয়ে জাহাজ ততক্ষণে আরব সাগরের বুকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর মুখে কোন কথা ফুটল না। কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানিক কাল অমনিভাবে বসে থাকবার পর তিনি খালি পায়ে সারা বাড়ী খুঁজে নীচের বাগানে মহামায়াদেবীর সন্ধান পেয়ে সেখানেই ঠিক তাঁর মুখের সামনে ডান হাতের তর্জ্জনীটি হেলিয়ে হেলিয়ে যেমন মৃদু, তেমনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিলেন, শুনে রাখ তুমি,—আজ থেকে বরাবর অরুণকে অকুলেই ভাসতে হবে,—এই বাড়ীতে সে আর ঢুকতে পাবে না,—আমার সম্পত্তির একটি তৃণখণ্ড পর্য্যন্ত তাকে তুমি দিতে পারবে না,—আর কোন দিন যদি তার নাম পর্য্যন্ত তুমি আমার কাছে উচ্চারণ কর, তাহলে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই, তোমার সঙ্গেও আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।

উত্তরে মহামায়াদেবী কি একটা কথা বলবার উপক্রম করতেই ঐ উত্থিত তর্জ্জনী-সঙ্কেতেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রমেনবাবু আগের চেয়েও দৃঢ় স্বরে আবার বলেছিলেন, না, কথা নয়,—ওর সম্বন্ধে একটি কথাও বলতে পারবে না তুমি,—আমার কাছে নয়, আমার কোন আত্মীয় বা কোন বন্ধুর কাছেও নয়। আমার জীবনকালে কেউ যেন আমাদের এই ছাড়াছাড়ির কথা জানতে না পারে।

বলেই প্রসঙ্গটির উপর তৎক্ষণাৎ নিজের হাতে যবনিকা টেনে দিয়ে তিনি আবার বাইরের ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

সেদিন রমেনবাবুর কাছে অরুণাংশুর বিলাত যাওয়াটাই তত গুরুতর অপরাধ মনে হয় নি যত হয়েছিল তাঁর অমতে চলে যাওয়াটা। পিতৃত্বের আহত অভিমান সেদিন কর্তৃত্বের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার মধ্যেই শান্তির সন্ধান করেছিল।

তার পরের আট বৎসরের ইতিহাস মহামায়াদেবীর ঐকান্তিক সাধনার ইতিহাস। তিনি সাধ্বী স্ত্রী,—স্বামীর আদেশ তিনি অমান্য করেন নি। পুত্রের আর্থিক দুরবস্থার কথা জেনেও কখনও তাকে তিনি একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করেন নি; অরুণাংশু দেশে ফিরে আসবার পর তাকে বাড়ীতে আসতে নিষেধ করে নিজের হাতে তিনি তাকে চিঠি লিখেছিলেন; স্বামীর নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য তাঁর কাছে কোন দিন তিনি অরুণাংশুর নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন নি। কিন্তু তিনি নারী এবং জননীও। অরুণাংশুর ব্যবহারে তিনিও মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন। তথাপি তিনি কেবল যে অরুণাংশুকে ক্ষমা করেছিলেন তা-ই নয়, সকল রকম প্রতিকূল

অবস্থা অতিক্রম করেও তার সঙ্গে বাৎসল্যের নীবিড় ও মধুর সম্বন্ধটুকু পর্য্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন। চোখের জল চোখের মধ্যেই চেপে রেখে সুদীর্ঘ কাল ধরে অপরিসীম ধৈর্য্য, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অসাধারণ কৌশলে পিতৃহৃদয়ের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও অভিমান দূর করে পিতা ও পুত্রের মিলন ঘটাবার জন্য অনবরত চেষ্টা করে করে শেষ পর্য্যন্ত তিনিই জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু সে ইতিহাস এখানে অবান্তর। পিতা ও পুত্রের মিলন যখন হল তখন কোন পক্ষ থেকেই অতীত ইতিহাসের উল্লেখ হল না।

অরুণাংশু নিঃশব্দে নত হয়ে বাপের পা ছুঁয়ে তাঁকে প্রণাম করলে; রমেনবাবুও নিঃশব্দেই তার মাথায় ডান হাতখানা রেখে তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন; মুখে শুধু বললেন, যাও, তোমার নিজের ঘরে যাও,—স্নানটান কর গে:—এমনভাবে কথাগুলি তিনি বললেন যেন এই মিলনের পিছনে কোন ইতিহাসই নেই, যেন অরুণাংশুর বাড়ী আসাটা কোন অসাধারণ ঘটনা নয়,—যেন এমন যাওয়া-আসা চিরকালই চলে এসেছে।

কিন্তু প্রতুলবাবু ও অনামিকার সংস্পর্শে আসতেই রমেনবাবুর হৃদয়ের সমস্ত অবরুদ্ধ আবেগ বদ্ধ ফোয়ারার সদ্যমুক্ত জলধারার মতই উছলে উঠল। সাগ্রহে দুই বাহু বাড়িয়ে প্রণতা অনামিকাকে পায়ের কাছ থেকে বুকের কাছে টেনে এনে গাঢ় স্বরে তিনি বললেন, অনু!—তুমি আমার বাড়ীতে এসেছ! এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি, মা!—

প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রতুল,—এ কি সত্য? আমি স্বপ্ন দেখছি নে তো!—

তার পরেই, উত্তরের জন্য আপেক্ষা না করেই আবার দুই হাতে অনামিকার আরক্ত মুখখানি নিজের মুখের কাছে তুলে ধরে কম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন, হ্যাঁ—সেই মুখই তো—একেবারে সেই অনু। বছর পাঁচেক আগে যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তাই,—তেমনি ছেলেমানুষ, তেমনি দুষ্টু,—একেবারে সেই আমার ছোট্ট অনু-মা।—বলতে বলতে একটু নত হয়ে অনামিকার কপালের উপর তিনি আলগোছে একটি চুমো খেলেন।

অনামিকার পর পালা এল প্রতুলবাবুর। দুই হাতে তাঁর ডান হাতখানি নিজের কোলের উপর টেনে এনে রমেনবাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে আবার বললেন, এত সুখ যে আমার অদৃষ্টে ছিল, প্রতুল, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। এখন কেবল ভয়

হচ্ছে, পাছে এ আমার না সয়। দুএক দিনের মধ্যেই তোমরা আবার চলে যাবে না তো, ভাই ?

না, রমেনদা,—কুণ্ঠিত হাসিমুখে প্রতুলবাবু উত্তর দিলেন,—দুএকদিন কি বলছ,—দুএক মাসেও এখান থেকে আমরা নড়ব না,—বৌদিকে আগেই সে নোটিশ দিয়ে তবে আমরা এখানে এসেছি।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি আবার বললেন, কিন্তু তোমার এ কি কাণ্ড, বল তো রমেনদা ? এই অরুণের ব্যাপারটা আগাগোড়া সকলের কাছে তুমি চেপে গিয়েছ ! সে বার দুজনেই আমার বাড়ীতে গিয়ে অত দিন থেকে এলে, অথচ একটিবার আভাষও দিলে না যে অরুণের সাথে তোমাদের এই রকম একটা গোলমাল হয়ে রয়েছে ! বৌদির মুখে পর্য্যন্ত তালা দিয়ে রেখেছিলে তুমি ! তার পর এই বছর দুই অরুণ কলকাতার অত কাছে রয়েছে,—কতবার হয় তো কলকাতায় এসেছে,—অথচ আমি কোন খবরই জানতে পারি নি। জানলে কি আর এ রকম হতে পারত ? কেন—এত বড় কথাটাকে গোপন রাখবার এমন আজগুবি খেয়াল তোমার কেন হয়েছিল ?

আরও অনেক কথাই হয়তো তিনি বলতেন, কিন্তু মহামায়াদেবী বাধা দিয়ে বললেন, থাক্, ঠাকুরপো,—থাক্ ওসব কথা।

রমেনবাবুও যেন ঐ কথাটারই প্রতিধ্বনি করে বললেন, থাক্, প্রতুল, ওসব কথা থাক্। আজকের দিনে আমিও আর পিছনের দিকে তাকাতে চাই নে। যা ভাঙবার তা তো ভেঙেইছে,—এখন দেখি সামনে কিছু গড়া যায় কি না।

বৈকালে আবার যখন অনামিকা এ ঘরে এল তখন তার মুখের দিকে চেয়ে রমেনবাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন ; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, এস মা, এস,—আমার কাছে এসে বোস তুমি।

খাটের উপর আধশোয়া অবস্থায় বসে রমেনবাবু প্রতুলবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। ঘরের জানালাগুলি সবই বন্ধ,—দোরে ভারী পর্দা টানা। ভিতরটা প্রায় অন্ধকার,—স্কাইলাইট আর পর্দার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো আসছে, তা পর্য্যাপ্ত নয়।

ঘরে ঢুকেই অনামিকা বলে উঠল, জানালাগুলো সব বন্ধ করে রেখেছেন কেন, জেঠামশায় ? ভিতরটা যে একেবারে অন্ধকার !

রমেনবাবু তাকে কাছে টেনে নিয়ে সকৌতুক, সহাস্য কণ্ঠে বললেন, অন্ধকার কোথায়, মা? তুমি এ বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই তো এ বাড়ীর অলিগলি পর্য্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে!—

অনামিকা লজ্জিত হয়ে বললে, ছাড়ুন, জেঠামশায়—জানালাগুলো আমি খুলে দিই।

খুলে দেবে?—তা দাও,—বলে রমেনবাবু অনামিকার হাত ছেড়ে দিলেন; কিন্তু তখনই কুণ্ঠিত স্বরে আবার বললেন, কথাটা কি জান, অনু?—এই বুড়ো হাড়ে কিছুই আর সহ্য হয় না। শীতের কনকনে হাওয়াটা গায়ে লাগলেই বাতের ব্যথাটা যায় বেড়ে; আর জোর আলো লাগলে চশমার ভিতরেও চোখদুটো টনটন করতে থাকে।

অনামিকা উঠবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু রমেনবাবুর কথা শুনেই তৎক্ষণাৎ থেমে গিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, তবে থাক্, জেঠামশায়,—আমি জানতাম না।

কিন্তু তোমার যদি অসুবিধে হয়—

না,—কিচ্ছু অসুবিধে হচ্ছে না আমার। এখন আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।

রমেনবাবু কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে অনামিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন; তার পর প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় স্বরে বললেন, মিছে কথা বলি নি, প্রতুল,—অনু আসতে না আসতেই ঘর-বার দুইই আমার আলো হয়ে উঠেছে। আজ যদি আমার মরণ হয়, তবে,—সত্যি বলছি তোমায়—আমি পরম সুখে মরতে পারব।

প্রতুলবাবু হাত ও মুখের বিশেষ একটা ভঙ্গী করে উত্তর দিলেন, কি যে তুমি বল, রমেনদা! কেন—কি হয়েছে তোমার? খামখেয়ালি না করে ওষুধপত্র খাও দেখি—দুদিনেই তুমি ভাল হয়ে আবার কোর্টে যেতে পারবে। তোমাকে ভাল করে দিয়ে তবে আমরা যাব,—কি বল, অনু?

অনামিকা মুখ টিপে একটু হাসলে মাত্র; তার পর রমেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, জেঠিমা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন,—আপনার চা এখানেই পাঠিয়ে দেবেন, না আপনি খাবার ঘরে গিয়ে সকলের সাথে বসবেন?

রমেনবাবু সোজাসুজি উত্তর দিতে পারলেন না; দোটানার মধ্যে বেশ একটু ইতস্ততঃ করে শেষে অনামিকাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, শরীরটা তো আমার দেখছ, মা,—তুমি কি করতে বল?

অনামিকাও দোটানার মধ্যে পড়ে গেল ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হেসে ফেলেই সে বললে, আমার কথা যদি মানেন, জেঠামশায়, তবে আমি আপনাকে ওঘরেই যেতে বলব। একটু চলাফেরা না করলে কি শরীর ভাল থাকে ? চলুন আপনি,—না হয় আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলুন।

উৎসাহ, আনন্দ ও কৌতুকে রমেনবাবুর নিষ্প্রভ চোখদুটি দেখতে দেখতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; বিছানার উপর সোজা হয়ে উঠে বসে তিনি বললেন, বল কি অনু ? এই বুড়োর অপদার্থ বেতো শরীরের ভারী বোঝাটা তোমার উপর চাপিয়ে দিলে তুমি তা বইতে পারবে ?

তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাৎ করে অনামিকা সহাস্য কণ্ঠে উত্তর দিলে, খুব পারব জেঠা-মশায়,—চাপিয়ে দেখুন না আপনি।

—আর তোমার এই বুড়ো ছেলের জীবনের বোঝাটা ?—তা-ও যদি তোমার উপর চাপিয়ে দিই ?

—তা-ও বইতে পারব, জেঠামশায়। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করে সবটা বোঝা আমার উপর ছেড়ে দিতে পারবেন তো ?

রমেনবাবুর দুই চোখ হঠাৎ জলে ভরে উঠল ; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বললেন, খুব পারব, মা,—খু—ব পারব। তোমার মত মায়ের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারলে আমি যে বেঁচে যাব, অনু।

কথার কথা যে সেগুলি নয়, পরদিন থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল। রমেনবাবু সত্যই নিজেকে যেন একান্ত ভাবে অনামিকার হাতে সমর্পণ করে দিলেন। পক্ষান্তরে অনামিকাও নিতান্ত সহজ ভাবেই রমেনবাবুর দৈহিক ও মানসিক পরিচর্য্যার সকল দায় নিজের কাঁধে নিয়ে নিলে। রমেনবাবু যা পেলেন তা কেবল সেবা নয়,—সে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রস। নেশা লেগে গেল তাঁর। ভোর থেকে গভীর রাত পর্য্যন্ত অনামিকাকে ছাড়া তাঁর যেন একদণ্ডও চলে না। রাত্রে পাতা বিছানায় মশারি নামিয়ে দেবার জন্য অনামিকা তাঁর কাছে যেমন অপরিহার্য্য, সকালে বিছানা তুলবার জন্যও তেমনি। তাঁকে ওষুধ খাওয়াবে অনামিকা, মুখ ধোবার গরম জল এনে দেবে অনামিকা, চার বেলা হাত ধরে খাওয়ার টেবেলে নিয়ে যাবেও ঐ অনামিকা। অনামিকার নিজের হাতের অন্ততঃ দুএকটা রান্না না হলে ষোড়শোপচারের

খাওয়াও তাঁর মুখে রোচে না। প্রথম দিন অনামিকা নিজের হাতে তাঁর পায়ের ব্যথার জায়গায় মালিশ করতে চাইলে তিনি সসঙ্কোচে হা হা করে উঠেছিলেন; তার পর এমন হল যে অনামিকা নিজের হাতে মালিশ না করলে তার বেদনার উপসমই হয় না। কোন কাজ যখন না থাকে, তখনও কথা বলবার জন্য অনামিকাকে কাছে না পেলে তাঁর কিছুতেই চলে না। সর্ব্বতোভাবেই রমেনবাবু অনামিকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন।

রমেনবাবুর মুখে কেবল ঐ এক নাম,—অনু; যেন বাড়ীতে তাঁর আপনার লোক আর কেউ নেই। মহামায়াদেবী একদিন ঠাট্টা করে বলেই ফেললেন, অনু তোমায় জাদু করেছে।

সত্যই সমস্ত বাড়ীখানাই যেন 'অনু'ময় হয়ে উঠল। তার উপস্থিতি বাড়ীর সর্ব্বত্র; বর্ণ, গন্ধ ও শব্দের ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে তারই ব্যক্তিত্ব দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ীখানি আগে ছিল যেন পড়ো বাড়ী, জানালাগুলি প্রায় সব সময়েই বন্ধ থাকত; লোকজন একরকম দেখাই যেত না; বাইরের লোক শব্দ শুনতে পেত কদাচিৎ,—প্রকাণ্ড বাড়ীখানা অভিশপ্ত, ঘুমন্ত রাজপুরীর মত খাঁ খাঁ করত। সেই বাড়ীই এখন যেন হেসে উঠল। এখন বাতায়নে বাতায়নে অনামিকারই আগুনের শিখার মত উজ্জ্বল রূপের চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তি, ঘরে ঘরে বসন্তের দমকা হাওয়ার মত তারই নির্ব্বন্ধন গতির ছন্দোময় হিল্লোল, সর্ব্বত্র পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর কল্লোলিত স্রোতের মত তারই অপরিমেয় প্রাণের উচ্ছল প্রবাহ। থেকে থেকে সমস্ত বাড়ীখানি তারই উচ্ছ্বসিত কলহাস্যের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে ওঠে। মনে হয় যে ঐ চঞ্চলা কুমারী মেয়েটি বহুদিনের এই পড়োবাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে ধূলিকণাটিতে পর্য্যন্ত যেন প্রাণসঞ্চার করেছে।

প্রতিবেশীদেরও চোখ এড়াল না,—যা আগে কখনও হয় নি, তাই হয়েছে। অহোরাত্র বাড়ীতে যেন উৎসব চলেছে। কতদিন হয়ে গিয়েছে,—অকালবৃদ্ধ রমনবাবুর মুখে কেউ হাসি দেখে নি। এবার তাঁর মুখেও হাসি ফুটে উঠল। তাঁর বাতের ব্যথাও এত দ্রুত কমে আসতে লাগল যে, ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

অসম্ভবকে সম্ভব করলে অনামিকা। আর সকলকে আড়াল করে একা সে-ই

যেন সামনে এসে দাঁড়াল। এমন কি, যাকে নিয়ে বাড়ীতে ঐ মিলনোৎসব, স্বয়ং সেই অরুণাংশুও যেন অনামিকার ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল।

এলাহাবাদের বাড়ীতে মর্য্যাদা ও জনপ্রিয়তায় অনামিকা তাকে ছাড়িয়ে যাওয়াতে অরুণাংশুর অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই হয়েছিল বেশী। -বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগতদের ভীড় একটু কমে আসতেই সে ছুটি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল; বাপের কাছে আসাটা সে যথাসম্ভব কমিয়ে দিয়েছিল, এলেও দুচারটি অবান্তর কথা বলবার পরেই কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে সে সরে পড়ত। খাওয়ার ঘরেও মাঝে মাঝে তাকে দেখা যেত না; যেদিন সকলের সঙ্গে একত্র সে খেতে বসত, সেদিনও কথাবার্ত্তায় সে বড় একটা যোগ দিত না। তার শোবার ঘর নীচে; উপরে ভাল ঘর থাকতেও নীচের একটী ঘরই সে নিজের জন্য বেছে নিয়েছিল। নীচেই রমেনবাবুর অব্যবহৃত আপিস ঘরটিকে সে করেছিল তার বসবার ঘর। সেখানে এমন সব লোক তার কাছে এসে জড় হত যারা আগে কোন দিন রমেনবাবুর বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে সাহস পায় নি। কিন্তু সেখানেও খুব বেশী সময় সে থাকত না। কোথায় যে সে যেত এবং কি করত সে সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে রমেনবাবু দুএকদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তবে তার কোন সদুত্তর অরুণাংশু দেয় নি।

কিন্তু নিজে চেপে যেতে চেষ্টা করলেও তার নিজস্ব বিশিষ্ট জগতে তার নিজের কীর্ত্তিকাহিনী একদিন রমেনবাবুর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

সেদিন সকালে মুখহাত ধোবার পর রমেনবাবু তাঁর শোবার ঘরেই আরাম চৌকিখানার উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে সেই দিনের 'লীডার' কাগজখানার উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না,—পাশের ঘরে প্রতুলবাবু কাপড় ছেড়ে চায়ের আসরের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন. অনামিকা টেবেল গোছাচ্ছিল খাবার ঘরে। কাগজ পড়তে পড়তে সহসা রমেনবাবুর নিশ্চিন্ত, প্রফুল্ল মুখখানা ছাইএর মত বিবর্ণ হয়ে গেল; কম্পিত হাত থেকে কাগজখানা পড়ে গেল তাঁর কোলের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখ থেকে অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ বেরিয়ে পড়ল—কি সর্ব্বনাশ! —তার পরেই তিনি প্রায় চীৎকার করে ডাকলেন,—অরুণ—অনু—প্রতুল—

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে এক দিক থেকে প্রতুলবাবু ব্যস্তভাবে ঘরে এসে ঢুকলেন, আর এক দিক দিয়ে এল অনামিকা।

রমেনবাবু উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠলেন, দেখ, দেখ,—কাণ্ডখানা দেখ একবার। অরুণ কোথায়? অনু— মা—একবার অরুণকে ডাক তো শীগগির!—

প্রতুলবাবু উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, কি হয়েছে, রমেনদা?

অনামিকাও তুতোধিক উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে, জেঠামশায়?

গোলমাল শুনে মহামায়াদেবীও উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকলেন।

রমেনবাবু কাগজের একটা জায়গায় অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করে কম্পিত স্বরে বললেন, দেখ, প্রতুল,—পড়ে দেখ তুমি,—দেখ, অরুণ কি সর্ব্বনাশের কাণ্ড করে বসেছে!—

প্রতুলবাবুর মুখখানাও বিবর্ণ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাগজখানি হাতে তুলে নিলেন তিনি। অনামিকাও ছুটে এসে বাপের কাঁধের উপর দিয়ে কাগজখানার উপর ঝুঁকে পড়ল; মহামায়াদেবীও চলবার উপক্রম করেও মধ্যপথেই সহসা পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হয়ে গেলেন।

মিনিট দুই কাল কারও মুখেই কোন কথা নেই,—ঘরের মধ্যে অনৈসর্গিক নিস্তব্ধতা।

তার পর প্রতুলবাবুর বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কি হয়েছে, রমেনদা— এতে সর্ব্বনাশের কি দেখলে তুমি? এ তো একটা মীটিংএর রিপোর্ট!—

রমেনবাবু ইতিমধ্যে শুয়ে পড়েছিলেন, সোজা হয়ে বসে বললেন, কিন্তু আমাদের অরুণের কথা আছে না ওতে? সে ছিল না ওখানে?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দূর থেকে মহামায়াদেবী শুষ্ক, অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে, ঠাকুরপো—কি করেছে রুণু?

প্রতুলবাবু চমকে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই হেসে ফেললেন তিনি; বললেন, না বৌদি, তেমন কিছু হয় নি। কাল বৈকালে অরুণ একটা সভায় বক্তৃতা করেছিল,—তাই নিয়ে সেখানে সামান্য একটু গোলমাল হয়। সেই খবরটাই কাগজে বের হয়েছে।

অনামিকার দিকে ফিরে তিনি আবার বললেন, তাহলেও অরুণকে একবার এখানে ডেকে নিয়ে এস তো, মা,—শুনি কি হয়েছিল।

রমেনবাবু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, তবে দেখতে ভুল হয় নি আমার ?—অরুণকে নিয়েই তাহলে ঐ কাণ্ড হয়েছে ?—

প্রতুলবাবু আবার হেসে ফেলে উত্তর দিলেন, 'কাণ্ড' কি বলছ, রমেনদা ? রাজনৈতিক সভায় আজকাল এরকম গোলমাল তো হয়েই থাকে ! এর জন্য অত উতলা কেন হচ্ছ তুমি ?

সত্যই উতলা হবার মত গুরুতর কিছু ঘটে নি। আগের দিন একটা জনসভায় বক্তৃতা করতে উঠে অরুণাংশু চলতি যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে ব্যাখ্যা করেছিল। তার সেই উক্তি শ্রোতাদের অনেকের মনঃপূত হয় নি। কেউ কেউ তার ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিল। তাই নিয়ে দুই দলের মধ্যে একটু বচসা, হয়তো সামান্য একটু হাতাহাতিও হয়ে থাকবে। অভিজ্ঞ রিপোর্টার সেই ছবিটিকেই বেশ একটু রঙ ফলিয়ে এঁকেছে। বোধ হয় তার নিজের সহানুভূতি ছিল অরুণাংশুর দিকে। তাই তার রিপোর্টে প্রতি-বাদটা ফুটেছে আক্রমণের রূপে আর অরুণাংশু ফুটেছে যেন আক্রান্ত বীর। তার সাহস, তার দৃঢ়তা, তার বুদ্ধির প্রশংসা করে অপর সকলের সঙ্গে তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহরূপে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে রিপোর্টার তার বংশমর্য্যাদার কথাটাও উল্লেখ করতে বাকি রাখে নি ;—রমেনবাবুর নামটাও কাজেই অপরিহার্য্যরূপে ঐ রিপোর্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ছোট রিপোর্টটির উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রতুলবাবু আবার সকৌতুক কণ্ঠে বললেন, এতে সর্ব্বনাশের কি দেখলে তুমি, রমেনদা ? অরুণকে দেখছি কাগজওয়ালারা বাহবাই দিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও।

আ হা হা !—বলতে বলতে রমেনবাবু উত্তেজনার আতিশয্যে প্রতুলবাবুর হাত থেকে খবরের কাগজখানা প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন ; তার পর আঙুল দিয়ে ওরই একটা জায়গা নির্দ্দেশ করে আবার বললেন, পড় নি এ জায়গাটা ? গোলমাল, মারামারি,—এই সব হয়েছে যে ! লোকে নাকি ঢিল ছুঁড়েছে,—কে একজন ওর গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে একটা পচা ডিম—

ততক্ষণে অরুণাংশু ঘরে এসে ঢুকেছে ; সে নিজেই রমেনবাবুকে আশ্বাস দিয়ে বললে যে তার গায়ে আঘাত একটুও লাগে নি ; কেবল জামায় সামান্য বা একটু ময়লা লেগেছে তা কাচলেই উঠে যাবে।

কিন্তু কেবল মুখের কথা বিশ্বাস করবার মত লোক রমেনবাবু নন। তিনি

তৎক্ষণাৎ অরুণাংশুর জামা খুলিয়ে তার বুক, পিঠ, বাহু প্রভৃতি প্রত্যেকটি অঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখলেন। আঘাতের কোন চিহ্ন তাঁর চোখে পড়ল না। তথাপি কম্পিত কণ্ঠেই তিনি বললেন, তুমি, অরুণ, ওর মধ্যে গেলে কেন? মারাত্মক রকমের একটা আঘাতও তো লাগতে পারত তোমার গায়ে! দাঙ্গা হতে পারত—ধরপাকড় হতে পারত—

অরুণাংশু হেসে ফেলে বললে, তা সবই হতে পারত, বাবা। কিন্তু তাই বলে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে তো আর থাকতে পারি নে!—দেশের এই দুর্দিনে দেশের লোককে তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিতে হবে তো!—

রমেনবাবু বললেন, সে কাজের জন্য দেশের নেতারা রয়েছেন।

অরুণাংশু বললে, নেতারা আজ দেশের লোককে ভুল বোঝাচ্ছেন, বাবা,—যে যুদ্ধ আমাদের নিজের, তারই বিরুদ্ধাচরণ করতে বলছেন। কিন্তু ভুল না করে তাঁরা যদি দেশের লোককে ঠিক নির্দেশও দিতেন, তাহলেও আমার কর্তব্যটুকু আমাকেই করতে হত।

রমেনবাবু বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; তার পর ক্ষুব্ধ অভিমানের স্বরে বললেন, তুমি এসব ছাড়বে না, অরুণ?

অরুণাংশুর চোখদুটি ঈষৎ নত হয়ে পড়ল; একবার ঢোক গিলে অস্ফুট স্বরে সে বললে, অন্যায় তো আমি কিছু করছি নে?—

রমেনবাবু অসহিষ্ণুর মত উত্তর দিলেন, ন্যায়-অন্যায়ের কোন কথাই হচ্ছে না, বাপু; আমি বলছি যে, এই রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তোমায় সরে আসতে হবে।

পলেকের জন্য অরুণাংশুর মাথাটা আরও যেন নত হয়ে পড়ল; কিন্তু পরমুহূর্তেই মুখ তুলে দৃপ্ত কণ্ঠে সে বললে, বাড়ী আসবার সময় মাকে আমি সে রকম কোন প্রতিশ্রুতি দিই নি, বাবা,—বাড়ীতে থাকবার জন্যও সে প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারব না। আমার কর্তব্য আমার পালন করতেই হবে।

কথাগুলির বিনিময় হয়ে গেল শাণিত তরবারির আঘাত আর প্রত্যাঘাতের মত। অবস্থাটা প্রতুলবাবু যখন উপলব্ধি করলেন তখন দুপক্ষের কথাই বলা হয়ে গিয়েছে। তথাপি সুপ্তোত্থিতের মতই চমকে উঠে দুদিকে দুহাত বাড়িয়ে অবস্থাটা যথাসম্ভব সহজ করে দেবার উদ্দেশ্যে উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে পরিহাসের খানিকটা খাদ মিশিয়ে তিনি

বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা,—সে সব পরে বোঝা যাবে'খন—কি যে তিলকে তাল কর তোমরা! এখন চা'টা তো আগে খাওয়া যাক্। যাও, অরুণ, তুমি খাবার ঘরে যাও; চল, রমেনদা,—চায়ের সময় পার হয়ে গিয়েছে প্রায় দশ মিনিট। সকাল বেলায় এ সব কথা কেন? এই জন্যই খবরের কাগজগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে।—চল,—চল,—·

কিন্তু ফল তেমন হল না। অনুভূতির রাজ্যে কথার ক্রিয়া তখন সুরু হয়ে গিয়েছে। চায়ের টেবেলে সকলেই সেদিন উপস্থিত থাকলেও আর আর দিনের মত আসর জমল না। অরুণাংশু একটি কথাও না বলে এক টুকরা মাত্র রুটি আর এক কাপ চা খেয়েই নীচে চলে গেল। রমেনবাবু দুএকটি কথা যা বললেন তা অন্যমনস্কের মত। খেলেন নাম মাত্র। তার প্রসন্ন মুখের উপর একখানা কালো মেঘ সারা দিন ঘন হয়ে চেপে রইল। প্রতুলবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও অন্য দিনের মত আলাপ জমাতে পারলেন না। তার চটুল পরিহাস আর সান্ত্বনার আবেদন দুইই সেদিন রমেনবাবুর ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্যে প্রতিহত হয়ে ফিরে ফিরে আসতে লাগল।

অবশেষে বৈকালের দিকে বেশ একটু বিরক্ত হয়েই প্রতুলবাবু বললেন, এ তো তোমার উচিত হচ্ছে না, রমেনদা! ছোট্ট একটি ঘটনাকে অকারণে বাড়িয়ে, ফাঁপিয়ে নিজেকে নিজেই তুমি কেন এত দুঃখ দিচ্ছ?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রমেনবাবু বললেন, তা তুমি বুঝবে না, প্রতুল। আমি বড় আশা করেছিলাম যে ছেলে আমার ঘরে ফিরে এল। অথচ সে সব আশাই আজ আমার ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল।

প্রতুলবাবু সবিস্ময়ে বললেন, তা কেন হবে, রমেনদা? অরুণ যে ঘরে ফিরে এসেছে তা তো আর মিথ্যে নয়!—

রমেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললেন, একে তুমি ঘরে ফিরে আসা বল? এই কালই সে যা কাণ্ড করেছে তার পরেও?

প্রতুলবাবু একটু চুপ করে থেকে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন, তা হলে আমিও বলি রমেনদা, রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অরুণ একেবারে সরে দাঁড়াবে, এ আশা যদি তুমি করে থাক, তবে তা-ও তো তোমার উচিত হয় নি!—

উচিত হয় নি!—রমেনবাবু চমকে উঠে বললেন,—বল কি, প্রতুল!

না, উচিত হয় নি,—প্রতুলবাবু মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন,—কিছুতেই

উচিত হয় নি। অরুণ তো চোদ্দ-পনর বছরের ভাবপ্রবণ তরুণের মত সাময়িক একটা হুজুগে পড়ে হল্লা করতে বেরোয় নি যে ধমক দিয়েই তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে? ছেলেবেলা থেকে এই সবের দিকেই তার ঝোঁক। তার উপর এখন সে বড় হয়েছে,—লেখাপড়া শিখেছে। তার জ্ঞান আছে,—তাই দিয়ে নিজের চলার পথ সে বেছে নিয়েছে। তার জীবনের ধারা চলেছে বিশেষ একটা লক্ষ্যের দিকে। সুদীর্ঘকালের অনুশীলনে তার জীবনযাত্রার পদ্ধতি বিশিষ্ট একটা পরিণতি লাভ করেছে। এই সব কাজের মধ্যেই হয়তো তার স্বার্থ, তার প্রবৃত্তি, তার আবেগ পেয়েছে চরিতার্থতা। আজ কি সে তোমার বা আমার একটা কথায় বা একটা হুকুমে তার সমগ্র অতীতটাকে মুছে ফেলে একেবারে নূতন করে আবার জীবনযাত্রা সুরু করতে পারে? যে নদী একবার পর্ব্বত থেকে সমতল ক্ষেত্রে নেমে এসেছে তাকে কি হুকুম করে আবার পর্ব্বতের গুহায় ফিরিয়ে দেওয়া যায়?—

যুক্তিগুলি বেশ জোরালো,—রমেনবাবু কোনটাকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারলেন না! অথচ তাঁর মন ওতে পুরোপুরি সায়ও দিলে না। বিহ্বল হয়ে অস্ফুট, কম্পিত স্বরে তিনি বললেন, বল কি, প্রতুল,—অরুণকে ফিরানো যাবে না? সারা জীবন এমনি ছন্নছাড়ার মত সে কেবল হাঙ্গাম-হল্লোড় করে বেড়াবে?

প্রতুলবাবু এমন অবস্থাতেও হাসি চাপতে পারলেন না; হেসে ফেলেই বললেন, রাজনীতিকেই তুমি যদি হাঙ্গাম-হুল্লোড় বলতে চাও, রমেনদা, তবে উত্তরে আমাকেও 'হ্যাঁ' বলতে হবে। কিন্তু আসলে রাজনীতি তো তা নয়! জেলে যাবার রাস্তা না হয়ে রাজনীতি মানুষের জীবিকাও তো হতে পারে!—

রমেনবাবুর মুখে এবার আর কথাই ফুটল না। একটু পরে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, হ্যাঁ, রমেনদা, পারে; এই গণতন্ত্রের যুগে ওকালতি-ডাক্তারীর মত রাজনীতিও তো একটা উপজীবিকা। তাতে বরং অতিরিক্ত সুবিধে আছে এই যে, অন্য একটা উপজীবিকার সঙ্গে ওটাকে একটা অতিরিক্ত পেশা হিসাবে চালানো যায়। আমাদের জানাশোনার মধ্যেই এমন কত লোক তো রয়েছে, রমেনদা, যারা এই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গলাবাজি করেই তোমার আর আমার চেয়ে ঢের বেশী যশ অর্জ্জন করেছেন—আর ঐ সঙ্গে অর্থও নিতান্ত কম উপার্জ্জন করেন নি।—

ঐ যুক্তিও অকাট্য। রমেনবাবু অস্থির চোখে একবার সীলিং ও একবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে ফিরে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে

বললেন, কিন্তু আমাদের অরুণ তো তাঁদের পথে যাচ্ছে না, প্রতুল,—সে যে ঝুঁকে পড়েছে ঐ হ্যাঙ্গাম-হুল্লোড়েরই দিকে।—

এবার প্রতুলবাবু কুণ্ঠিত হয়েই বললেন, সেটা আমিও পছন্দ করি নে, রমেনদা। ঐ দিক থেকে ওকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে,—বলতে বলতে কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন।

কিন্তু রমেনবাবু আগ্রহের স্বরে বললেন, 'তবে' কি বলছিলে, প্রতুল? বলতে বলতে হঠাৎ থামলে কেন?

একটু ইতস্ততঃ করে প্রতুলবাবু আবার দৃঢ় স্বরেই উত্তর দিলেন, তবে সে কাজটা জোরজবরদস্তি করে একদিনেই করা যাবে না, রমেনদা। বুঝিয়ে সুঝিয়ে, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে অত্যন্ত কৌশলে সে কাজ করতে হবে! ওর জীবনের স্রোত যেমন চলেছে তেমনি চলতে দিতেই হবে; বদলাতে হবে কেবল সে চলার ছন্দটাকে।

রমেনবাবু রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তুমি কি মনে কর যে তা সম্ভব হবে?

আবার একটু ইতস্ততঃ করে প্রতুলবাবু গম্ভীর স্বরেই উত্তর দিলেন, অসম্ভব হবে বলে মনে হয় না, রমেনদা। আর হয়ও যদি, তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে তো!—

রমেনবাবু উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন; বোঝা গেল যে কথাটা তাঁর মনে লেগেছে।

একটু পরে প্রতুলবাবুই ফিক্ করে হেসে ফেলে আবার বললেন, তবে কি জান, রমেনদা,—রাজনীতিক্ষেত্রে থাকতে গেলে ঐ হ্যাঙ্গাম-হুল্লোড় একেবারে কেউ এড়াতে পারবে না। জনসভায় বক্তৃতা তাকে করতেই হবে, ধূলোবালি তার গায়ে লাগবেই,—আর—ঐ কাল যেমন হয়েছে,—পচা ডিমও মাঝে মাঝে দুএকটা গায়ে এসে পড়বেই।

কিন্তু রমেনবাবু ঐ রসিকতায় যোগ দিলেন না। তাঁর ললাটের উপর চিন্তার ছায়া ক্রমশঃই ঘন হয়ে উঠতে লাগল।

সেই দিনই দুপুর বেলায় অনামিকা নীচে অরুণাংশুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। জনবিরল ওর্জ টাউনের ছায়া-ঢাকা পথে গাড়ী

ঘোড়া একেবারেই নেই। এ বাড়ীর চাকর-বাকরেরা পর্য্যন্ত নিজেদের মহলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করলে অনামিকা ; কিন্তু তার পর সঙ্কোচ কাটিয়ে বন্ধ দ্বারে আলগোছে করাঘাত করে সে ডাকলে, অরুণদা ঘরে আছেন ?

অরুণাংশু টেবেলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছিল ; তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সে দোর খুলে দিলে ; অনামিকাকে দেখে সবিস্ময়ে বললে, এ কি—অনু !—

অনামিকা কুণ্ঠিত স্বরে বললে, এই এলাম একবার।

এস, এস,—বলে পথ ছেড়ে দিয়ে অরুণাংশু আবার নিজের আসনে গিয়ে বসল ; তার পর কৌতুকের স্বরে বললে, হঠাৎ এ ঘরে যে ! পথ ভুলে নাকি ?

অনামিকা হেসে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, পথ ভুলে বই কি ! রোজই তো এ ঘরে আমি আসি।

অরুণাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, রোজই !—

তা নয় তো কি ! নইলে এ ঘরে আপনি থাকতে পারতেন কখনও ? ঘর-দোর যা নোংড়া করে রাখেন আপনি ! রোজ রোজ সে সব সাফ করে ঘরের জিনিষপত্র সব গুছিয়ে রাখে কে ?

অরুণাংশু চকিত দৃষ্টিতে ঘরের অবস্থাটা একবার দেখে নিয়ে অধিকতর বিস্মিত স্বরে বললে, বল কি অনু !—এ সব কাজ তুমি কর নাকি ? কেন ?—ঝি-চাকরেরা সব কোথায় গেল ?

অনামিকা সহাস্য কণ্ঠে উত্তর দিলে, যাবে আবার কোথায় ? আছে সবাই, আর কাজও তারাই করছে। কিন্তু তাদের দিয়ে কাজ করাতে হয় না বুঝি ?

অরুণাংশু কয়েক সেকেণ্ড কাল অবাক হয়ে অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে রইল ; তার পর সশব্দে হেসে উঠে বললে, আমি তো জানতাম যে ঐ কাজগুলো পড়ে আমার মায়ের বিশেষ দায়িত্বগুলোর মধ্যে। সেগুলো তোমার হাতে এল কেমন করে ? মাকে সরিয়ে তুমিই এ বাড়ীর কর্ত্রী হয়ে বসেছ—এত বড় রাষ্ট্রবিপ্লবের খবরটা আমার জানা ছিল না তো !—

অনামিকা মুখ লাল করে বললে, বাড়ীর কোন খবরটা আপনি রাখেন যে এটা আপনার জানা থাকবে ?

অরুণাংশু অপ্রতিভ হয়ে বললে, তা বটে !—কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেলে

সে আবার বললে, কিন্তু কর্ত্রীমহারাণী নিজেই তার অভিষেকের খবরটা আমায় জানিয়ে দিলেন না কেন?

আরক্ত মুখ আরও লাল করে অনামিকা উত্তর দিলে, বাজে খরচ করবার মত সময় মহারাণীর নেই।

উত্তরে অরুণাংশু শব্দ করে হেসে উঠেই বললে, কিন্তু আর একজনের কাজের সময়টা নষ্ট করবার সময় আজ তিনি কেমন করে পেলেন?

অনামিকা উত্তরে বললে, মহারাণীর রাজ্যে আর একজন এমনি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে যে তিনি তার শোধ না নিয়ে পারছেন না।

কথাকটি অনামিকা হাসতে হাসতেই বললে; কিন্তু তার কণ্ঠের স্বরে মুখের হাসির কোন ঝঙ্কার বেজে উঠল না। অরুণাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, ব্যাপার কি অনু? তোমার রাজ্যে কে আবার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলে?

সেই কথাই তো আপনাকে বলতে এলাম,—বলে অনামিকা বসবার চৌকি-খানাকে অরুণাংশুর আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে এল। তার পর তার মুখের দিকে চেয়ে রীতিমত গম্ভীর স্বরেই সে বললে, জ্যেঠামশায় আজ মনে বড় ব্যথা পেয়েছেন, অরুণদা; জেঠিমাও তাই। কেউ আজ ভাল করে খেতে পর্য্যন্ত পারেন নি।

কথাটা খুব স্পষ্ট না হলেও অর্থের কোন অস্পষ্টতা ছিল না। অরুণাংশু বুঝলে যে ওটা অবস্থার সাদাসিধে একটা বর্ণনা মাত্র নয়,—তার নিজের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম একটা অভিযোগও ঐ বর্ণনাটুকুর মধ্যে নিহিত রয়েছে। তার মুখের হাসি দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে সে বললে, তা হবে।

উত্তরে অনামিকা স্পষ্ট করেই বললে, জ্যেঠামশায়ের বা জেঠিমার কথাগুলোকে আপনি গোড়াতেই আদেশ বলে ধরে নেন কেন? ওগুলোকে ওঁদের ইচ্ছে বলেও তো মনে করে নেওয়া যায়!

অরুণাংশু উত্তরে বললে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে ওদুটো জিনিষের তফাৎ কিছুই নেই। আমার সম্বন্ধে আমার বাবা-মা'র যা ইচ্ছে তা আমি কোনদিনই পূর্ণ করতে পারব না। সেই কথাটাই তখন বাবাকে আমি বলেছি।

অনামিকা বললে, তাহলেও অমন কড়া করে কথাটা আপনি না বললেও পারতেন। ঐ কথাটাই আর এক সময়ে মোলায়েম করে বলা চলত।

প্রায় মিনিটখানিক কাল চুপ করে রইল অরুণাংশু; তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে সে বললে, না, অনু; যে সময়ে, যে ভাবেই কথাটা বলা হউক না কেন, বাবা অমনিই অসন্তুষ্ট হতেন তাতে,—অমনি আঘাতও পেতেন। এ বরং ভালই হয়েছে। আর দিনদশেক পরেই তো চলে যেতে হবে আমায়,—কেমন করে কথাটা তুলব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। আজকের ঘটনায় পরোক্ষভাবে পথটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

অনামিকা সংশয়ের স্বরে বললে, সত্যি চলে যাবেন আপনি?

অরুণাংশু অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে, সত্যি কি না, তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে ১০ই ফেব্রুয়ারি,—তার বেশী দেরী তো আর নেই!—

অনামিকা ও হাসিতে যোগ দিলে না; কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর সে ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, না গেলে চলে না, অরুণদা? এখানেও তো দেখছি কাজই করছেন আপনি। এমনি ভবিষ্যতেও এখানেই থেকে কাজ হতে পারে না আপনার?

অরুণাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, কেন, অনু?—এ কথা কেন বলছ?

অধিকতর কুণ্ঠিত স্বরে অনামিকা বললে, কথাটা মনে এল তাই বললাম। আমার মনে হয় যে আপনি বাড়ীতে থাকলে আপনার কাজও চলতে পারে, জেঠিমা-জ্যেঠা-মশায়ের মনেও কষ্ট হয় না।

অরুণাংশু ক্ষণকাল অবাক হয়ে অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর শুকনো রকমের একটু হাসি হেসে মাথা নেড়ে সে বললে, তুমি জান না, অনু—ফল তাতে ঠিক উল্টো হবে। আমার কাজও হবে না, বাবা-মা'র কষ্টও বাড়বে। আজকের যে ঘটনা এত তোমায় বিচলিত করেছে, তখন রোজই সে রকমের ঘটনা ঘটতে থাকবে।

অনামিকার মুখ ম্লান হয়ে গেল; ক্ষুন্ন কণ্ঠে সে বললে, কি জানি—আপনাদের এ সব ব্যাপার আমি বুঝতেই পারি নে। তবে আমার মনে হয় যে নিজের কথাই কেবল না ভেবে ওঁদের মনের ভাবটাও আপনি যদি একটু বুঝতে চেষ্টা করেন, তবে মাঝামাঝি একটা জায়গায় আপনাদের মিল হয়তো হতে পারে,—বলতে বলতে সে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

অরুণাংশু কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ অনামিকাকে উঠতে দেখে

সে এক সঙ্গেই অপ্রতিভ ও উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, এ কি, অনু,—উঠছ কেন? বোস।

না,—যাই এখন,—অনামিকা মুখ ফিরিয়ে বললে,—এই কথাটাই আপনাকে বলতে এসেছিলাম আমি। প্রগল্‌ভতা যদি হয়ে থাকে, সেটা মাপ করবেন।

দোরের কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে সে আবার বললে, চায়ের আর বেশী দেরী নেই, অরুণদা,—না খেয়ে বাইরে যাবেন না যেন,—তাতে জ্যেঠামশায়ের মনে আরও কষ্ট হবে।

অরুণাংশুর বিস্ময়ের অবধি রইল না। অনামিকার এই গম্ভীর রূপ আগে সে কখনও দেখে নি, এমন কথাও তার মুখে কোন দিন শোনে নি। অনামিকা চলে যাবার পরেও তার চুলের মৃদু, মিষ্টি গন্ধটার সঙ্গে তার কণ্ঠের অশ্রুতপূর্ব্ব সুরের রেশটুকু ঘরের মধ্যে যেন ভেসে বেড়াতে লাগল। কথাগুলি মনে হল যেন তার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। বাইরে দরকারী কাজ ছিল অরুণাংশুর; তথাপি চা না খেয়ে সে বেরুতে পারলে না। রাত্রে সে ফিরেও এল খাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই বারান্দায় অনামিকার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। অনামিকা খুশী হয়ে বললে, আসুন, অরুণদা,—জ্যেঠামশায়ের কাছে একটু বসবেন,—জেঠিমাও ওঘরেই আছেন।

কিন্তু অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমি তোমাকে খুঁজছিলাম, অনু।

কেন অরুণদা?—অনামিকা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তরে অরুণাংশু বললে, তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে,—আমার কৈফিয়ৎটা তোমায় শুনতে হবে।

কয়েক সেকেণ্ড কাল বিহ্বলের মত অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠে অনামিকা বললে, ওমা—কৈফিয়ৎ আবার কি! আমি কি বলেছি যে আপনি কোন অন্যায় করেছেন? খালি জ্যেঠামশায়ের—

বাধা দিয়ে অরুণাংশু বললে, বেশ,—কৈফিয়ৎ না হয়, আমার উত্তরটাই তোমায় শুনতে হবে! তা-ও তো তখন দেওয়া হয় নি!—

আচ্ছা, আচ্ছা,—অনামিকা কুণ্ঠিত হয়ে বললে,—সে না হয় শুনব'খন,—কাল দুপুরে যাব আবার আপনার ঘরে। এখন ও ঘরে চলুন তো আপনি।—

সত্যই পরদিন দুপুরে আবার সে অরুণাংশুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু প্রথমেই সে বললে, আমি কিন্তু গল্প শুনতে এসেছি, অরুণদা। ছোট বোনের মুখের একটা অনুরোধকে অভিযোগ মনে করে যদি লম্বা-চওড়া কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করেন, তাহলে কিন্তু তক্ষুনি উঠে যাব আমি,—তা আগেই আপনাকে বলে রাখছি।

এ আবার সেই অপরিণতবুদ্ধি, হাস্যমুখী, কৌতুকমুখরা, বালিকা অনামিকা,—কাল দুপুরে যে অনামিকাকে সে দেখেছিল তার সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্যই নেই। অরুণাংশু বিব্রত হয়ে পড়ল,—জোঁকের মুখে নুন পড়লে তার যে অবস্থা হয়, কতকটা সেই রকমেরই অবস্থা হল তার। আত্মপক্ষ সমর্থনে অনেক ভাল ভাল যুক্তি সে মনে মনে মহড়া দিয়ে ঠিক করে রেখেছিল; কিন্তু অনামিকার ভাব দেখে এবং কথা শুনে সে সবই যেন তার মাথার মধ্যে তাল পাকিয়ে গেল! বিহ্বলের মত অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, কিন্তু কি গল্প বলব আমি? গল্প তো আমি জানি নে?—

না,—জানেন না বৈ কি!—অনামিকা আবদারের স্বরে উত্তর দিলে,—কত দেশ আপনি ঘুরেছেন—সেই সব দেশের গল্প বলুন না, শুনি।

অনামিকা নাছোরবান্দা। অরুণাংশু যত বলে যে হাল্‌কা রকমের গল্প করবার মত না আছে তার সময়, না ইচ্ছে, ততই অনামিকা আরও জিদ করতে থাকে। কোন রকমেই এড়াতে না পেরে অবশেষে অরুণাংশু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, আমি কিন্তু আমার কাজের কথাই তোমায় বলতে চাচ্ছিলাম, অনু।

বেশ, তবে তাই বলুন,—বলে অনামিকা সোজা হয়ে বসল। কিন্তু পরক্ষণেই কুটিল কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, আচ্ছা, অরুণদা,—কাল সত্যি পচা ডিম ছুঁড়ে মেরেছিল আপনার গায়ে? কারা মারলে?

ইতিমধ্যে অরুণাংশু কতকটা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অনামিকার ভাব দেখে আবার হেসে ফেললে সে; বললে, ডিম ছুঁড়ে মেরেছিল সত্য আর অহিংসার পূজারীরা।

তার মানে?—অনামিকা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

অরুণাংশু টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললে, তার মানে বুঝতে পারছ না, অনু? —কংগ্রেসের লোকেরা।

কংগ্রেসের লোকেরা!—অনামিকা আরও বিস্মিত হয়ে বললে,—কেন, অরুণদা, তারা আপনাকে অপদস্থ কেন করলে? আপনিও তো কংগ্রেসের লোক—নন?—

অরুণাংশুর মুখের হাসি কান পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল ; ডান হাতের তালু দিয়ে নিজের কপালেই আলগোছে একটা আঘাত করে সে উত্তর দিলে, হায় হায়, অনু ! তুমি ছাড়া আর কেউ কি এ কথা মানবে ? আমি যে আজ দেশের শত্রু—আমি যে কম্যুনিষ্ট !—

সত্যই বিহ্বল হয়ে পড়ল অনামিকা ; কিছুক্ষণ অবাক হয়ে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সংশয়ের স্বরে সে বললে, কেন, অরুণদা,—মানে না কেন ?

—কারণ এই চলার জগতের অধিবাসী হয়েও জগতের গতিকে একেবারে অস্বীকার করে এক দিনের একটা মুখের কথার নোঙড় আঁকড়ে ধরে অচল হয়ে আমি বসে থাকতে পারি নে,—বলে অরুণাংশু অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে আবার টিপে টিপে হাসতে লাগল।

অনামিকা হয় তো কথাটা বুঝতে পারলে না ; হয় তো বুঝলেও অরুণাংশুর মুখের ঐ হাসি দেখে বিব্রত হয়ে পড়ল সে। ঈষৎ লাল হয়ে উঠে মুখ নামিয়ে সে বললে, যান—কেবল হেয়ালী করছেন আপনি ! কি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম আর আপনি কি সব বলতে সুরু করলেন !—না মাথা, না মুণ্ড !—

অরুণাংশু শব্দ করে হেসে উঠে বললে, তা কেন হবে, অনু ? তোমার প্রশ্নেরই তো জবাব দিয়েছি আমি। আচ্ছা,—না হয় আরও সোজা করে বলছি।—

একটু থেমে, হাসি থামিয়ে বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই সে আবার বললে, আগেও তো তোমায় বলেছি, অনু, এই যুদ্ধের ব্যাখ্যা নিয়ে গান্ধী-পন্থীদের সাথে আমাদের মতান্তর হয়েছে। এক দিন সবাই যে আমরা এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলেছিলাম তাই ওঁদের কাছে রয়েছে শাশ্বত সত্য। জার্ম্মানী যে জগতের একমাত্র জনগনের রাষ্ট্র সোভিয়েট রুষিয়াকে আক্রমণ করেছে এবং তার চেয়েও বড় এবং ভয়ঙ্কর সত্য,—জাপান আমাদেরই দেশটাকে দখল করবার উদ্দেশ্যে আমাদেরই পূব দরজায় এসে ওৎ পেতে বসে আছে,—এ সব কথা ওরা মানতেই চাচ্ছে না। আজও দেশের লোককে ওরা বুঝিয়ে যাচ্ছে যে, এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই রয়েছে,—যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দেবার জন্য দেশের লোককে উসকে দিচ্ছে। আত্মঘাতী এই নীতিতে আমরা সায় দিতে পাচ্ছি নে বলেই, দেশের লোককে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা করবার জন্য আমরা উৎসাহিত করছি বলেই আমরা আজ হয়েছি দেশের শত্রু।

এমনি আরও অনেক কথা বললে অরুণাংশু,—কতক অনামিকার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কতক বা নিজে থেকেই। বলতে বলতে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল সে; তার পর জনযুদ্ধের ব্যাখ্যা করতে করতে এক সময় সোজা অনামিকার চোখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসাই করে বসল, ইংরাজকে তাড়াবার জন্য সাক্ষাৎ ভাবে হউক, পরোক্ষ ভাবে হউক, জাপানকে নিমন্ত্রণ করে আনার নীতিটাকে আমরা বলি আত্মঘাতী নীতি। তুমি এ কথা মান না, অনু?

মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘাড় নেড়ে অনামিকা উত্তর দিলে, খুব মানি।

অরুণাংশুর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; উৎফুল্ল স্বরে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি বলছ, অনু? আমার মতকে তুমি তাহলে সমর্থন কর?

নিজেও দৃপ্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলে অনামিকা, জয়চাঁদ-মীরজাফরের দেশের মেয়ে আমি,—এ কথা আমি কি সমর্থন না করে পারি!—

কিন্তু নিজের কথা তার নিজের কানে যেতেই লজ্জায় অনামিকার কান পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠল; তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত, মৃদু স্বরে সে আবার বললে, কিন্তু আমার সমর্থন মানে তো মুখের দুটি কথা মাত্র,—কোন কাজ তো করি নে আমি! আমার সমর্থন পেয়ে কি লাভ হবে আপনার!—

এরও উত্তরে অরুণাংশু দৃপ্ত কণ্ঠেই বললে, ঐ সমর্থনই যে একটা মস্ত লাভ অনু। নূতন পথে পা বাড়াবার পর সেটুকুই বা আমার জুটছে কোথায়? স্রোত ঠেলে উজিয়ে চলেছি; ভাটার পথে এত দিন যারা ছিল সাথী, তারাও একে একে আমায় ছেড়ে যাচ্ছে। জনসভায় করতালির পরিবর্ত্তে সম্বর্দ্ধনা পাচ্ছি পচা ডিমের,—সে তো তুমি দেখেইছ। এই নিঃসঙ্গ যাত্রার দুস্তর পথে এক জনের সমর্থনের মূল্য কি কম!—

অনামিকা আরও লাল হয়ে উঠে বললে, তাহলেও আমার সমর্থন একেবারেই ভুয়া জিনিষ। আমি তো আর কোন কাজ করি নে!—

অরুণাংশু মাথা নেড়ে বললে, মানুষের কাছে মানুষের সমর্থন ভুয়া কখনও হয় না,—আর সে সমর্থন যদি চিন্তাশীল মানুষের আন্তরিক সমর্থন হয় তবে তো সে এক অমূল্য প্রেরণা!—

অনামিকা উত্তর দিলে না; একটু চুপ করে থেকে অরুণাংশুই গম্ভীর স্বরে আবার বললে, মনুষ্যের চলার পথে আর একজনের সমর্থনই তো মরুভূমিতে মরুদ্যান; ওর

মধ্যেই তো তার বিশ্বাস পায় আশ্রয় ; ঐ সমর্থন থেকেই তো মানুষ নিজে পায় তার পথ চলার শক্তি। অন্ততঃ আজকের দিনে যে কোন লোকের সমর্থনই আমার নিজের কাছে এক অমূল্য সম্পদ।

এবারও কোন উত্তর দিলে না অনামিকা ; অরুণাংশু নিজেও আর কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তার পর সহসা মুখ ফিরিয়ে অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে সে আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, অনু,—তুমি এক-আধটুকু কাজ কর না কেন ?

অনামিকা চমকে একবার চোখ তুলে তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নিলে ; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, কি কাজ আবার করব ?—ওসব আমি বুঝতেই পারি নে !—

বাজে কথা !—অরুণাংশু প্রতিবাদ করে বললে,—বুঝতে যে সবই তুমি পার তা এ কদিনেই আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তাতেই তো তোমার জীবনের এই শোচনীয় অপচয় দেখে আমার এত দুঃখ হয় !—

অপচয় !—বলে চমকে মুখ তুলে তাকাল অনামিকা ; ঈষৎ বিস্মিত, ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে সে বললে, অপচয় কি বলছেন, অরুণদা ? আমার জীবনের তো অপচয় হচ্ছে না !—

হচ্ছে না ? —অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে অরুণাংশু,—তোমাদের কলকাতার প্রাসাদের মত বাড়ীতে থাকা, মাঝে মাঝে গাড়ী চড়ে ময়দানে বা লেইকের ধারে বেড়িয়ে আসা, জড়োয়া গয়না আর দামী শাড়ী পরে হেসেখেলে, নেচেগেয়ে, কদাচিৎ রবি ঠাকুরের দুএকটা কবিতা আবৃত্তি করে আর মাঝে মাঝে ড্রয়িংরুমে বসে দেশ-বিদেশের কোটি কোটি লোকের জীবনপন সাধনার হাল্‌কা আলোচনা করে জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়া জীবনের অপচয় নয় ?

ও, সেই কথা !—বলে অনামিকা লজ্জিত ভাবে মুখ নামিয়ে নিলে।

অরুণাংশু ঘাড় কাৎ করে বললে, হ্যাঁ, ঠিক সেই কথাই আমি বলছি। নিশ্চিন্ত আরাম আর বিলাসে জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়াকেই কি তুমি জীবনের সার্থকতা বলবে ?

অনামিকা কোন উত্তর দিলে না।

একটু পরে অরুণাংশুই আবার জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, অনু, লেখাপড়া তো তুমি কম শেখ নি ! তাছাড়া দেশটাও তো তোমার চোখের সামনেই রয়েছে,—

সেখানে কত বৈষম্য, কত দারিদ্র্য, কত অবিচার-অত্যাচার, কত দুঃখ! কোন দিন, কোন সময় দেশের জন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় নি তোমার?

অনামিকা আবার মন্ত্রমুগ্ধের মতই ঘাড় কাৎ করে অস্ফুট স্বরে বললে, হ্যাঁ—হয়েছে।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই গোটা শরীরটাকে বেশ জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসল; কপালের উপরের অবাধ্য চুল কগাছাকে দুই হাতে দুদিকে সরিয়ে দিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে অরুণাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললে, কিন্তু অরুণদা, ও পথ আমার জন্য নয়। আমার যেটুকু কাজ, তা আমার ঘরে—আমার বাবাকে নিয়ে। দেশ বলুন, ধর্ম্ম বলুন,—আমার কাছে সব আমার ঐ বাবা। নাচ-গান, হাসি-ঠাট্টা, গাড়ী-গয়না প্রভৃতি আমার যা কিছু আপনার চোখে পড়েছে, তার কোনটাই আমার নিজের জন্য নয়,—সব আমার ঐ বাবার জন্য। তাঁকে খুশী করতে পারাই আমার জীবনের চরম সার্থকতা।

অনামিকার চোখের দৃষ্টি বা কথার স্বরে একটুও উত্তেজনা প্রকাশ পেল না। বরং তার স্বভাব-চঞ্চল চোখের তারাদুটি যেন পাখা থামিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; কণ্ঠে সুর নেমে পড়ল একেবারে সকলের নীচের পর্দ্দায়,—কথাগুলো যেন ভাল করে শোনাই গেল না। তথাপি অরুণাংশুর মনে হল যে হঠাৎ যেন এক অপ্রতিরোধ্য বন্যার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস দুর্ব্বার বেগে ছুটে এসে এক নিমেষেই তাকে তার নিরাপদ আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে গভীর অতলে ডুবিয়ে দিয়েছে। উত্তর দেওয়া দূরে থাক্, সহজ ভাবে নিশ্বাসও যেন সে গ্রহণ করতে পারলে না। অভিভূতের মত অনামিকার মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

একটু চুপ করে থাকবার পর আগের মতই ধীর, শান্ত কণ্ঠে অনামিকাই আবার বললে, শুধু দেশ কেন, অরুণদা, স্বয়ং ভগবানের জন্যও আমার বাবাকে আমি ছাড়তে পারব না। দেশ যদি মা হন, তাঁর ছেলে-মেয়ে আমি ছাড়াও আরও অনেক আছে। কিন্তু সংসারে আমি ছাড়া আমার বাবার তো আর কেউ নেই!—

তার পর আবার সব চুপচাপ। বহুক্ষণ দুজনের কারও মুখেই কোন কথা ফুটল না। তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ছেড়ে অরুণাংশুই বললে, বুঝেছি, অনু; এই জন্যই আমার বাপ-মায়ের সাথে আমার যে সম্বন্ধ হয়েছে, তা তুমি বুঝতে পার না।

তা হবে,—বলে অনামিকা মুখ নামিয়ে নিলে।

কিন্তু তার পরেই সে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললে, আমি এখন যাই অরুণদা,—জ্যেঠামশায় হয় তো ঘুম থেকে উঠে আমায় খুঁজছেন।

বলে অরুণাংশুর সম্মতির জন্ম অপেক্ষা না করেই সে দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে গেল।

প্রতুলবাবুর কথাগুলি রমেনবাবু উড়িয়ে দিতে না পারলেও মেনেও নিতে পারছিলেন না।

প্রতুলবাবুর সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য খুব বেশী না থাকলেও সংস্কৃতিগত পার্থক্য ছিল। আসলে তিনি ছিলেন সেকেলে লোক। তাঁর মনের গড়নটাই যেন আলাদা; তারও আবার তেমন প্রসার হয় নি। তিনি সরস্বতীর সেবা করেছিলেন লক্ষ্মীকে লাভ করবার একমাত্র উপায় হিসাবে। বিদেশেও এসেছিলেন ঐ মা-লক্ষ্মীর কৃপা পাবার জন্তই। তার পর বাংলার বাইরের বাঙ্গালী সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে চিরটা কাল কূপমণ্ডুকের জীবনই তিনি যাপন করে এসেছেন। বৃহত্তর জাতীয় জীবনের খরধার স্রোত কোনদিন তাকে স্পর্শও করতে পারে নি। নিজের ছোট সংসারের বাইরে আর যে জগৎটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেটা হাইকোর্টের চতুঃসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ কৃতবিদ্য ব্যবহারজীবির বিশিষ্ট জগৎমাত্র। জনসেবা বলতে যা তিনি জেনেছিলেন তা বারোয়ারি পূজা আর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। সীমাবদ্ধ এই কটিমাত্র বিশিষ্ট ক্ষেত্রের বাইরের জগৎটাকে বরাবরই তিনি হয় অবজ্ঞা, নয় তো ভয়ের চক্ষে দেখে এসেছেন।

তাই বিলাৎ-ফেরৎ প্রতুলবাবুর চোখে যে জগৎটা লোভনীয় না হলেও সকৌতুক কৌতূহলের বস্তু বলে মনে হচ্ছিল, রমেনবাবু তার মধ্যে এক বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। স্বীয় ঔরসজাত অরুণাংশুকে তিনি জন্ম থেকেই নিজের দ্বিতীয় সংস্করণ বলে ভেবে এসেছেন। সে যে তাঁরই মত ওকালতি করে, অর্থ উপার্জ্জন করে, শান্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সংসারধর্ম্ম পালন করে সমতল, সরু পথে তাঁর নিজের জীবনেরই নিস্তরঙ্গ ধারাটিকে বজায় রেখে চলবে না, এ চিন্তা আগেও যেমন তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি, তেমনি এত দিন এবং এত ঘটনার পরেও

আজও সহ্য করতে পারছিলেন না। বরং অরুণাংশুর প্রত্যাবর্ত্তনের স্বল্প উপাদান-টুকুকে নিয়ে প্রথমেই তাঁর উত্তেজিত কল্পনা আকাশে যে প্রাসাদ গড়ে বসেছিল, সে যে কল্পিত রচনা ছাড়া আর কিছু নয়, সে কথাটা সেদিন বুঝতে পেরেই তিনি উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অরুণাংশুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল মনে মনে তিনি কম যন্ত্রণা সহ্য করেন নি; কিন্তু নূতন এই আশাভঙ্গের বেদনা তীব্রতায় আগের সে যন্ত্রণাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতুলবাবুর যুক্তি তাঁর ঐ যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও সান্ত্বনা দিতে পারে নি। যুক্তি দিয়ে ওকে তিনি খণ্ডন করতে না পারলেও অন্তর দিয়ে ওকে তিনি কিছুতেই মেনেও নিতে পারছিলেন না।

তাই দিন দুই পরেও প্রতুলবাবুর সমস্ত সান্ত্বনার প্রত্যুত্তরে রমেনবাবু সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে অশ্রুসজল বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, কিছুই হল না, প্রতুল,—আমার কোন আশাই মিটল না,—সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। অরুণ যা ই হউক, আমার মনের মত তো আর হল না!—

বন্ধুর বুকের ব্যথা প্রতুলবাবু নিজের বুকের মধ্যেও অনুভব করলেন। তথাপি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর তিনি বললেন, সে তো ঠিকই, রমেনদা। তবে তার জন্য দুঃখ করেই বা লাভ কি! কোন সন্তানই তার মা-বাপের মনের মত হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে তারতম্য হয়তো হয়, কিন্তু আসল জিনিষটি সব ক্ষেত্রেই এক,—ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সব মা-বাপকে দুঃখ পেতে হয়।

রমেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না, ভাই,—আমার মত এত দুঃখ কোন বাপকেই সইতে হয় না।

প্রতুলবাবু নাছোরবান্দা হয়ে বললেন, কিন্তু দুঃখ সকলকেই পেতে হয়, রমেনদা,—কোন সন্তানই সর্ব্বতোভাবে তার বাপ-মায়ের মনের মত হয় না। এই আমার কথাটাই ভাব না তুমি,—আমারই কি কম দুঃখ! ঐ আমার অনু—

রমেনবাবু চমকে উঠলেন; উত্তেজিতভাবে হাত উঠিয়ে সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, না, না, প্রতুল,—কোন মতেই না। আমার ঐ লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটার সঙ্গে অনু-মায়ের তুলনা কিছুতেই তুমি করতে পারবে না।

প্রতুলবাবু হেসে ফেলে বললেন, না, রমেনদা, তা আমি করতে চাই নি—যদিও অরুণকে তোমার মত লক্ষ্মীছাড়া বলতে আমি মোটেই রাজী নই। আমি কেবল বাপ-মায়ের মনের মত হওয়ার কথাটাতেই বলছিলাম—

কি বলছিলে তুমি?—রমেনবাবু আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে বললেন,—অনু তোমার মনের মত হয় নি? তা যদি হয় তবে আমি বলব যে, তোমার মনটা মনই নয়। অনুর মত মেয়েকে কোলে পেয়েও সুখী যদি তুমি না হয়ে থাক তবে তুমি নিতান্তই হতভাগ্য।

প্রতুলবাবু প্রসন্ন মুখে হাসতে লাগলেন—যেন তিরস্কারটাকে তিনি উপভোগ করছেন। তার পর হাসতে হাসতেই বললেন, না, রমেনদা, তা-ও আমি বলছি নে। অনুকে পেয়ে সুখী হই নি, এ কথা কি বলতে পারি আমি? কিন্তু আমি বলছিলাম যে ঐ অনুকে নিয়েও আমার দুর্ভাবনা কি কম! ও যে একেবারে পাগলী, রমেনদা,—কুড়ি বছর বয়স হতে চলল তবু সংসারটাকে ও চিনলে না। তবু—

না, না, প্রতুল,—রমেনবাবু আবার বাধা দিয়ে বললেন,—বলো না এ সব কথা। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ও যা বোঝে, তুমি-আমি তার অর্দ্ধেকও বুঝি নে।

প্রতুলবাবু স্মিতমুখে বললেন, তবে থাক্ রমেনদা, অনুর কথা না হয় না-ই তুললাম। তবে আমি বলছিলাম কি যে—

বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেলেন তিনি; একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন; তার পর হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে আবার বললেন, আমি খুব ভেবে দেখেছি রমেনদা,—ছেলে-মেয়েকে নিজের মনের মত করতে চাওয়াটাই বাপ-মায়ের একটা মস্ত ভুল।

ভুল!—রমেনবাবু চমকে উঠে বললেন,—তা কেন বলছ, প্রতুল?

হ্যাঁ, রমেনদা, ভুল,—প্রতুলবাবু গম্ভীর স্বরেই উত্তর দিলেন,—ওরা তো মোম বা কাদার মত নরম, জড় পদার্থ নয় যে নিজেদের ছাপটা ওদের উপর মেরে দিলেই কাজ হয়ে যাবে! ওরা তো মানুষ,—একেবারে স্বতন্ত্র জীব। একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যুগে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিবেশের মধ্যে পরিবর্ত্তিত ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে ওরা সব মানুষ হয়ে ওঠে। আমাদের নিজেদের ফটোগ্রাফ বা গ্রামোফোণ ওরা যদি না হয়, সেজন্য দুঃখ করলে এক দুঃখ ছাড়া আর কি আমাদের লাভ হবে!

রমেনবাবু মন দিয়েই শুনলেন; কিন্তু উত্তরে সেই আগের মতই হতাশার নিশ্বাস ফেলে বললেন, বুঝি তো, ভাই, সবই,—কিন্তু মন যে কিছুতেই মানতে চায় না!—

কিন্তু রমেনবাবুর নিজের মনের চেয়েও বেশী অবাধ্য অরুণাংশু। সব জেনে এবং বুঝেও যাবার দিন কয়েক আগেই সে তার নিজের সঙ্কল্পের কথাটা মহামায়া-

দেবীকে শুনিয়ে দিলে এবং মহামায়াদেবীর মারফৎ সে চরমপত্র যথাসময়ে রমেনবাবুর কাছেও পৌঁছে গেল।

ঘরে আর কেউ ছিল না; মহামায়াদেবী বেছে বেছেই সময়টাকে নির্ব্বাচন করেছিলেন। কিন্তু খবর শুনেই রমেনবাবুই উতলা হয়ে বললেন, ডাক প্রতুলকে—আমার মাথা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

সংবাদটি প্রতুলবাবুর কাছে নূতন নয়। তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে রমেনবাবুর হাতখানাকে নিজের কোলের উপর টেনে এনে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, আমি বলি কি, রমেনদা,—তুমি এ রকম উতলা না হয়ে অরুণকে কাছে ডেকে তার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে একবার কথা বল। তাতে দুজনেই তোমরা দুজনকে অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝতে পারবে।

নিজের হাতখানাকে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে রমেনবাবু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, বোঝবার আর কিছুই বাকি নেই। সে দিন সে তো আমার মুখের উপরেই স্পষ্ট করে বলে গিয়েছে যে ও সব কাজ সে ছাড়বে না। এবার উনি নিজেই নিঃসংশয়ে বুঝে এসেছেন যে কলকাতায় সে যাবেই যাবে।

প্রতুলবাবু ঘাড় কাৎ করে বললেন, সে কেবল বৌদি কেন, আমিও বুঝেছি। কিন্তু তাতেই তো সব শেষ হয়ে যায় না, রমেনদা! অবশ্য অরুণ এই এলাহাবাদে তোমার কাছে থাকলেই সব চেয়ে ভাল হত। কিন্তু সে যখন কলকাতাতেই থাকবে বলে ঠিক করেছে তখন ওটাকে মেনে নিয়েও তো চলনসই রকমের রফা একটা হতে পারে! এলাহাবাদের লোক কি আর কাজকর্ম্মের জন্য কলকাতায় থাকে না? সেখানেও তো একটা হাইকোর্ট আছে,—অরুণ তো সেখানেও প্র্যাকটিস করতে পারে!—যা সে করছে তা বজায় রেখেও সে তো আরও দশ জন রাজনৈতিক কর্ম্মীর মত সংসারীও হতে পারে!—

এ ভাবে রমেনবাবু আগে কখনও ভাবেন নি,—কথাটা তাঁর মনে গিয়ে লাগল। তিনি সোজা হয়ে বসে আগ্রহের স্বরে বললেন, তোমার সাথে অরুণের কি কোন কথা হয়েছে, প্রতুল? সে কি এরকম কোন উদ্দেশ্যের আভাষ দিয়েছে তোমায়?

প্রতুলবাবু কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলেন, না, রমেনদা, তার সাথে এই বিশেষ বিষয়ে আমার কোন কথা হয় নি; তবে তার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্ম্মধারা সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা কখনও কখনও হয়েছে। সেই জন্যই আমি বলতে পারি যে, আগের বারের

মত তুমি নিজে তার সাথে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলে সে যে কেন তোমায় ছেড়ে যাবে তা আমি বুঝতে পারি নে। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী যারা হয়, অরুণ তো তাদের একজন নয়!—

ঠিক জান তুমি?—রমেনবাবু রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলেন,—ঠিক বুঝেছ তুমি যে সংসারে তার বিতৃষ্ণা নেই?

প্রতুলবাবু বিব্রত হয়ে পড়লেন; টাকে হাত দিয়ে বললেন, অত ঠিক করে কিছু বলা যায় না, রমেনদা,—বিশেষ করে আমাদের এই দেশের কোন লোকের সম্বন্ধে। এ দেশের ঐতিহ্যটাই খারাপ কি না,—এখানে সকলের রক্তের মধ্যেই বৈরাগ্যের বীজ কিছু না কিছু ছড়িয়ে আছে। তবে অরুণের আদর্শকে আমি তো উল্টো বলেই বুঝেছি!—

রমেনবাবু চিন্তিত, গম্ভীর মুখে চুপ করে বসে রইলেন। একটু পরে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, সেই জন্যই আমি বলি, রমেনদা, যে তুমি যদি শিকড়সহ তুলে আনতে চেষ্টা না কর, তবে অরুণকে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করতে রাজী করানো একেবারে অসম্ভব না-ও হতে পারে।

রমেনবাবু কুণ্ঠিত অনুনয়ের স্বরে বললেন, কিন্তু, প্রতুল, অরুণ যদি কলকাতায় থাকে, তুমি নিজে তার উপর একটু চোখ রাখতে পারবে? একটু দেখাশোনা— একটু—

প্রতুলবাবু বাধা দিয়ে উৎসাহের স্বরে বললেন, আহাহা—তা আর পারব না কেন! অরুণ কি আমার পর? আমি তো তাকে দেখবই। সে আমাদের কোর্টে প্র্যাকটিস্ করতে সুরু করলে আমি সব রকমেই তাকে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করব।

রমেনবাবু খপ্ করে বন্ধুর ডান হাতখানা চেপে ধরে সনির্ব্বন্ধ স্বরে বললেন, তবে, —ভাই প্রতুল,—তুমিই ওর ভার নাও, ভাই। তুমিই বুঝিয়ে বল ওকে। তুমি যা করবে তাই মেনে নেব আমি।

মহামায়াদেবী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এবার তিনিও স্বামীর সুরে সুর মিলিয়ে বললেন, নাও না, ঠাকুরপো,—ছেলেটাকে আমাদের মানুষ করে দাও তুমি। আমার মন বলছে যে তুমি পারবে। তুমি নিজে একবার ওকে বল।

কিন্তু প্রতুলবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, তা হয় না, বৌদি,—আমি বললে কোন কাজ হবে না। বলতে হবে রমেনদাকেই।

তার পর রমেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন, আমার কথা রাখ, রমেনদা,—অরুণকে কাছে ডেকে তুমি নিজে খোলাখুলিভাবে ওর সাথে কথা বল। চাও যদি, আমি নিজে না হয় তখন কাছে উপস্থিত থাকব,—কিন্তু কথা বলতে হবে তোমাকে। গোড়া থেকেই তুমি এই একটা মস্ত ভুল করে এসেছ যে, ছেলেকে নিজের বন্ধু করতে পার নি,—স্নেহকে গোপন করে কেবল শাসন দিয়ে তাকে বশ করতে চেয়েছ। সেই গোড়ার ভুলটাই আজ তোমায় সকলের আগে সংশোধন করতে হবে,—ওর মনটাকে তোমায় জয় করতে হবে বিশ্বাস আর সহানুভূতি দিয়ে। নিজের ছেলেকে আপন করার কাজটা কি উকিল দিয়ে করানো যায়, রমেনদা?—

রমেনবাবু লজ্জিতভাবে চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, কিন্তু কি আমি তাকে বলব? সে কি আমার কথা শুনবে?

প্রতুলবাবু হেসে ফেলে বললেন, এটাই তোমার মস্ত দোষ, রমেনদা,—গোড়াতেই শেষের কথাটা এমন নিশ্চয় করে তুমি ঠিক করে রাখ যে শেষ ফলটা অন্য রকম হতেই পারে না। আর শোনাতে না পারলে কি কথা কেউ শোনে?—আমি বলি কি যে, অরুণকে ডেকে এনে তার নিজের কথাটা তুমি আগে শোন। তার পর শুধু বল তাকে প্র্যাকটিস সুরু করতে। গোড়াতে এইটুকু তাকে দিয়ে করাতে পারলে ভবিষ্যতে অনেক কিছুই হতে পারবে।

শুধু পরামর্শই দেওয়া নয়,—প্রতুলবাবু নিজেই উদ্যোগী হয়ে আর সব ব্যবস্থাও ঠিক করে দিলেন। ঠিক হল যে, পরের দিনই বাপ-বেটায় কথা হবে। মহামায়া-দেবীকে তিনি বললেন, বৌদি, আমাদের এই কন্‌ফারেন্সে আপনাদের উপস্থিতিটা বাঞ্ছনীয় হবে না,—আপনি বরং অনুকে নিয়ে কাল বাইরে কোথাও ঘুরে আসুন গে।—

অরুণাংশুকেও যথাসময়ে প্রতুলবাবুই রমেনবাবুর ঘরে ডেকে নিয়ে এলেন। অবস্থাটাকে সহজ করে দেবার উদ্দেশ্যে নিজেই তিনি আলোচনার উদ্বোধন করে বললেন, তোমার নিজের কথাটা নিজেই তুমি রমেনদাকে খুলে বল, অরুণ,—কোন সঙ্কোচ করো না তুমি। কি তুমি করতে চাও, সব বুঝিয়ে বল ওঁকে। উনিও অবুঝ নন, আর তুমিও অন্যায় কিছু করতে চাচ্ছ না। তবু এত যে সব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে সে কেবল তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে দিচ্ছ না বলে। এর

কোনটাই অবশ্যম্ভাবী ছিল না বলেই সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে একটা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। আমার বিশ্বাস ওঁকে তুমি সব কথা বুঝিয়ে বললে ওঁর কাছ থেকে বাধা না পেয়ে উৎসাহ আর সাহায্যই তুমি পাবে।

রমেনবাবুও চেষ্টা করে গলাটা সাফ করে নিয়ে তার পর বললেন, হ্যাঁ, অরুণ,—বল তোমার সব কথা,—তোমার নিজের মুখ থেকে তোমার কথা শুনব বলেই তোমায় আজ আমি এখানে ডেকে পাঠিয়েছি।

অরুণাংশু বিস্মিত হল, একটু সন্দেহও হল তার মনে। কিন্তু কথাটা বলতে আরম্ভ করেই তার মুখ খুলে গেল। মানুষের নৈতিক কর্তব্যের কথা, সাম্যবাদের কথা, সোভিয়েট রুষিয়ার কথা, নূতন সমাজব্যবস্থার কথা, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার কথা, যুদ্ধের কথা, কংগ্রেস আর কম্যুনিষ্ট পার্টির মতবৈষম্যের কথা,—সকল কথাই সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললে সে। বলতে বলতে শেষের দিকে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তার প্রাণের আবেগ মুখের ভাষাকে যেন সঞ্জীবিত করে তুললে; এমনভাবে সে বললে যেন সে জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছে। জনসভার মুগ্ধ শ্রোতার মতই রমেনবাবু ও প্রতুলবাবু নির্ব্বাক হয়ে তার কথাগুলি শুনলেন।

প্রায় আধঘণ্টাখানিক পর অরুণাংশু যখন চুপ করলে তখন প্রতুলবাবু রমেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে উৎফুল্ল স্বরে বললেন, ঠিকই তো,—অরুণ তো অন্যায় কিছু বলছে না!—

অরুণাংশু উৎসাহিত হয়ে বললে, তা যদি হয়, কাকাবাবু, তবে আমায় কাজ করতে নিষেধ করবেন কেন? জীবনের আচরণের মধ্যে রূপ দিয়ে ফুটিয়েই যদি তোলা না হয়, তবে সত্যকে সত্য বলে মানবার কোন অর্থই তো থাকে না!—

তা তো ঠিকই,—তা তো ঠিকই,—বলে প্রতুলবাবু বিব্রতভাবে রমেনবাবুর মুখের দিকে তাকালেন।

একটু নড়ে বসলেন রমেনবাবু; যেন অরুণাংশুর বক্তৃতা তাঁর চারিদিকে যে ইন্দ্রজাল রচনা করেছিল, তাকেই ছিঁড়ে ফেলে মুক্ত হয়ে বসলেন। তার পর সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, কি জানি, অরুণ,—এ সব কথা আমার মাথায় তেমন ঢোকে না। দেওয়ানী আইনের যত সূক্ষ্ম তর্কই তুমি তোল না কেন, সব আমি বুঝি। কিন্তু এই রাজনীতি?—যাক্ সে কথা। ও সব আমি বুঝতেও চাই নে।

মোটা কথা যা আমি বুঝি কেবল সেই সম্বন্ধেই দুচারটি প্রশ্ন তোমায় আমি করতে চাই। মন খুলে তার জবাব দেবে তুমি?

অরুণাংশু বিব্রত হয়ে বললে, তা দেব না কেন? বলুন, কি আপনার প্রশ্ন।

রমেনবাবু একটু চুপ করে থেকে তার পর সনির্ব্বন্ধকণ্ঠে বললেন, অরুণ,—বাবা,—আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না। সত্যি বল তো—তুমি কি করবে? বোমা-পিস্তল নিয়ে কিছু করতে যাবে না তো?

অরুণাংশু হেসে ফেললে; মুখ তুলে বললে, না বাবা,—এ কথা আপনার পায়ে হাত দিয়েই বলতে পারি আমি। ও পথ আমার কাছে পথই নয়। ও সব জিনিষ কোনদিন আমি ছুঁই নি, ছোঁবও না।

কিন্তু সত্যাগ্রহ?—সত্যাগ্রহ করবে না তো তুমি?

না, তা-ও করব না,—সে পথও আমার পথ নয়।

জেলে যাবে না তুমি?

না।

রাজশক্তির সাথে তোমার সংঘর্ষ হবে না?

হবার তো কথা নয়, বাবা! আমি তো যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে আমার সকল শক্তি দিয়ে সাহায্যই করতে চাই।

হ্যাঁ,—ঐ আর এক কথা,—রমেনবাবু আবার নড়ে বসে আরও বেশী উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন,—ঐ যে যুদ্ধে সাহায্য করার কথা বলছ,—তুমি যুদ্ধে যাবে না তো, অরুণ?

অরুণাংশু মাথা নেড়ে অস্ফুট স্বরে বললে, না।

তবে কি করবে তুমি?—রমেনবাবু এবার বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলেন।

একটু চুপ করে রইল অরুণাংশু; তার পর মুখ তুলে বললে, এ যুগের যুদ্ধ কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই হয় না, বাবা,—সারা দেশ জুড়েই এ যুগের যুদ্ধক্ষেত্র ছড়িয়ে থাকে। এ যুগের যুদ্ধে জয়পরাজয় বন্দুকধারী সৈনিকের উপর যতটা নির্ভর করে, ক্ষেতের চাষী আর কারখানার মজদুরদের উপর নির্ভর করে বোধ করি তার চেয়েও বেশী। সামরিক যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে সেই বিরাট অসামরিক যুদ্ধক্ষেত্রই হবে আমার কর্ম্মক্ষেত্র। ভ্রান্ত দেশপ্রীতি দেশের লোককে যে সত্যটা ভুলিয়ে তাদের দিয়ে শত্রুর পঞ্চমবাহিনী রচনা করছে, সেই সত্যটাই দেশের লোককে আমি শেখাব,—তাদের মোহগ্রস্ত রাজনৈতিক চেতনাকে আমি উদ্বুদ্ধ করব,—আমি তাদের বোঝাব যে, এ যুদ্ধ আমাদের।

প্রতুলবাবু উৎফুল্ল মুখে রমেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সোৎসাহ কণ্ঠে বললেন, শোন, রমেনদা,—শুনলে তো? এতে তো আপত্তি করবার কিছু নেই,—আমরাও তো এই কথাই বলি!—

কিন্তু রমেনবাবুর কথা বা ব্যবহারে কোন উৎসাহই প্রকাশ পেল না। বরং তাকিয়ার উপর নিজের দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে অবসন্ন কণ্ঠে তিনি বললেন, কি জানি ভাই,—আমার মাথায় সবই কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। তবে তোমার কাছে যদি ভাল মনে হয়,—বেশ, করুক তাহলে,—ওর ইচ্ছেমত কাজই করুক। ওর নিজের মঙ্গল, নিজের সুখ ছাড়া আর তো কিছু আমি চাই নে!—

রমেনবাবুর বাকি কথাগুলো প্রকাশ পেল তার চোখের দৃষ্টিতে। সেই নীরব ভাবাটা বুঝতে পেরে প্রতুলবাবু একটু নড়ে বসলেন। তার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরুণাংশুর মুখখানা একবার দেখে নিয়ে, একটু কেসে, কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দ্দা নীচে নামিয়ে অনুনয়ের মত করে বললেন, কিন্তু, বাবা অরুণ,—আমাদের দুএকটি কথা তোমায় রাখতে হবে। তোমার নিজের শরীরটার অবস্থাই দেখ,—এই বয়সেই যেন ভেঙ্গে পড়েছে। যে কাজ তুমি করতে চাচ্ছ, সেই কাজ করবার জন্যই শরীরটাকে তো তোমার সুস্থ রাখতে হবে। কাজেই তোমার ঐ যে হুগলীর বস্তিতে গিয়ে থাকা,—ওটা আমাদের তেমন ভাল লাগে না, বাবা। ঐ জায়গাটা তুমি ছাড়তে পার না?

ইতিমধ্যে অরুণাংশু বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শুনবার পর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে বললে, এখন থেকে হুগলীতে আর আমি থাকব না, কাকাবাবু,—কলকাতাতেই থাকব ঠিক করেছি।

প্রতুলবাবুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; উৎফুল্ল স্বরে তিনি বললেন, কলকাতায় থাকবে তুমি? তবে তো কোন কথাই নেই! রমেনদার অর্দ্ধেক ভাবনা তাহলে তো চুকেই গিয়েছে। কি বল, রমেনদা?

রমেনবাবু কোন উত্তর দিলেন না, প্রতুলবাবু উত্তর দাবীও করলেন না। আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরুণাংশুর মুখের অবস্থাটা দেখে নিয়ে আবার তিনি অনুনয়ের স্বরে বললেন, তাহলে,—বাবা অরুণ,—আমাদের আরও একটি কথা তোমায় রাখতে হবে,—মাত্র আর একটি। খাস্ কলকাতার উপরেই যখন তুমি থাকবে, তখন—বুঝলে না?—পরীক্ষাটা যখন দেওয়াই আছে,—সময়-সুবিধেমত হাইকোর্টেও মাঝে মাঝে যেতে হবে তোমার।

অরুণাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, হাইকোর্টে গিয়ে কি করব, কাকাবাবু ?

এই যা আমরা করে ।কি, তাই,—প্রতুলবাবু সহাস্য কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—অর্থাৎ ওকালতি। এই একটু আগেই তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে এ রকম করে যদি তুমি বলতে পার তবে যত বড় মিথ্যা মামলাই হউক, আর যত বড় ঝুনা জজই হউক, মামলায় জিত তোমার নির্ঘাত হয়ে যাবে। ছয় মাসের মধ্যেই তোমার পসার জমে উঠবে।

এতক্ষণে কথাটা বুঝতে পারলে অরুণাংশু; হেসে ফেলে সে বললে, না, কাকাবাবু, ওকালতিতে কোন দিনই আমার পসার হবে না। আইন আমি পড়েছিলাম নিছক সময় কাটাবার জন্য। অসলে ওকালতিতে আমার একটুও রুচি নেই।

না থাকলেও এসে যাবে, বাবা;—আপত্তিটাকে উড়িয়ে দেবার মত করেই প্রতুলবাবু উত্তর দিলেন,—ওকালতি কি রকম, জান? ও একটা নেশার মত,—একবার পেয়ে বসলে ক্রমেই বাড়তে থাকে। তাছাড়া, যা তোমার বিদ্যাবুদ্ধি—পসার তোমার নিশ্চয় হবে।

অরুণাংশু বললে, তা হলেও হাইকোর্টে আমার যাওয়া হবে না, কাকাবাবু,—মোটে সময়ই হবে না আমার।

কিন্তু প্রতুলবাবু ছাড়বার পাত্র নন,—অরুণাংশুকে তিনে চেপে ধরলেন। হাইকোর্টে যাওয়া যে চাকরি নয়, ইচ্ছা করলেই যে সেখানে অনুপস্থিত থাকা চলে অথচ অন্য কোন কাজ না থাকলে সেখানে গিয়ে কি আরাম আর আমোদেই যে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যায়; কত মানী আর নামী লোকের সঙ্গেই যে সেখানে অনায়াসে পরিচয় হয়ে যায়, আর সকলের উপরে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে কত সহজেই যে ঐ জীবনটাকে মিলিয়ে নেওয়া যায়,—সে সব কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে অরুণাংশুকে তিনি বোঝাতে লাগলেন। অরুণাংশুর সব যুক্তি তিনি থান্ থান্ করে কেটে দিলেন, আপত্তির প্রত্যুত্তরে করলেন আবেদন। শেষের দিকে রমেনবাবুও তাতে যোগ দিয়ে বললেন, আমাদের অনুরোধ শুধু এই একটি,—হাইকোর্টে নামটা লিখিয়ে নাও। এই একটি অনুরোধও তুমি রাখতে পারবে না ?

অরুণাংশু বিব্রত হয়ে বললে, কেবল নাম লিখালেই আপনারা খুশী হবেন ?

প্রতুলবাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ বাবা, হব,—তোমার বাবার কথাও আমিই বলছি।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল অরুণাংশু; অনেক কথাই তার মনে পড়ল। প্রায় মিনিট পাঁচেক পর কুণ্ঠিত চোখ তুলে অস্ফুট স্বরে সে বললে, কিন্তু, বাবা,—হাইকোর্টে যাতায়াত করতে গেলেই তো তার আনুসঙ্গিক কতকগুলি ব্যাপার আছে। আমার এই স্যাণ্ডাল আর ছেঁড়া পাঞ্জাবী পরে তো আর আমি হাইকোর্টে যাতায়াত করতে পারব না—আর আমার পার্টির আপিসে চাটাই বা মাদুরের উপর বসেও মক্কেলের সঙ্গে দেখা করা চলবে না। ওকালতি করতে যে সব দামী সাজসরঞ্জাম লাগবে, তা আমি জোটাব কোথা থেকে?

শুনে প্রথমে রমেনবাবুর মুখে কথাই ফুটল না; তার পর যা তিনি কোন দিন করেন নি, তাই করে ফেললেন। সশব্দে হেসে উঠে তিনি বললেন, এ তুই কি বলছিস রুণু? ছেঁড়া জামা পরে তোর পার্টির আপিস থেকে তোকে আমরা হাইকোর্টে যাতায়াত করতে বলছি নাকি? ব্যাঙ্কে, বাড়ীতে,—যা কিছু আমার আছে, সে সব কার? ওকালতিই যদি তুই করতে রাজী হোস তবে তুই যত টাকা চাইবি তার চেয়ে ঢের বেশী টাকাই তোকে আমি দিতে পারব।

প্রতুলবাবু বললেন, শুনলে তো, অরুণ? অথচ—

তার পর কথা আর তাঁর বলা হল না; তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা হো হো হাসির শব্দে সমস্ত বাড়ীখানা মুখরিত হয়ে উঠল।

অরুণাংশু অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়েছিল, প্রতুলবাবুর হাসি থামলে সে মৃদু স্বরে বললে, বেশ, তাহ'লে হাইকোর্টে যোগ দেব আমি। তবে এবার গিয়েই সেটা হবে না,—আমার একবার সফরে বেরুতে হবে।

প্রতুলবাবু আড়চোখে একবার রমেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন; তার পর অরুণাংশুর দিকে বেশ একটু ঝুঁকে, গলার সুর আগের চেয়েও মোলায়েম করে বললেন, তাহলে, বাবা অরুণ,—এই গোলমালের সময়টাতে কলকাতার দিকে কেন যেতে চাও তুমি? অবস্থাটা একটু ফিরলেই অনুকে নিয়ে আমিও তো কলকাতায় ফিরে যাব,—তখন এক সঙ্গেই গেলে হয় না?

অরুণাংশুর মুখের ভাব এবার কঠিন হয়ে উঠল; সে সোজা হয়ে বসে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, না, কাকাবাবু,—আমার দেরী করা চলবে না—প্রোগ্রাম আমার আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে!

প্রতুলবাবু বুঝলেন যে অরুণাংশুকে আর বেশী ঘাটাতে গেলে লাভের চেয়ে

লোকসানের আশঙ্কা বেশী। শুধু চোখের ভাষার সাহায্যেই রমেনবাবুকে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে প্রকাশ্যে বেশ উৎসাহের স্বরেই তিনি বললেন, বেশ, তাহলে ঘুরেই এস তুমি। আমিও দেখি,—যত তাড়াতাড়ি পারি কলকাতাতেই ফিরে যাব। তোমার সাথেই হয় তো আমিও যেতাম; কিন্তু মেয়েটা গোঁ ধরেছে, পশ্চিমে দ্বারকা পর্য্যন্ত না দেখে সে কলকাতায় ফিরবে না। তা যাও তুমি—মাসখানিক পরেই যা হয় করা যাবে। কি বল, রমেনদা?

রমেনবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, বেশ,—তাই হবে।

প্রতুলবাবু বিজয়ী বীরের মত এক বার রমেনবাবু ও এক বার অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন,—ভাবখানা এই যে, ষোল আনা লাভ না হলেও অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি। শেষ পর্য্যন্ত মুখেও তিনি বলে ফেললেন, যাক্—বাপ-বেটার বোঝাপড়া যে হয়ে গেল, এ আমার মস্ত বড় এক আনন্দের কথা। গত একটি মাস কি উদ্বেগেই যে আমার কেটেছে। আজ মনে হচ্ছে যে, জীবনে এই একটি মাত্র কাজের মত কাজ আমা দ্বারা হল।

কেউ উত্তর দিলে না। তথাপি নিজের মনের খুশীতেই প্রতুলবাবু সকৌতুক কণ্ঠে আবার বললেন, দেখ, বাবা অরুণ,— তোমার সবই আমার ভাল লেগেছে। কেবল একটা বিষয়ে মনের খুঁৎ খুঁৎ ভাবটা কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না।

অরুণাংশু সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি হেসে ফেলে আবার বললেন, খুব ভাল হত, বাবা, যদি তুমি কম্যুনিষ্ট না হতে।

অরুণাংশু বিরক্তির চেয়ে কৌতুকই বেশী অনুভব করে সহাস্য কণ্ঠে বললে, কেন কাকাবাবু,—কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে আপনার এই বিতৃষ্ণা কেন?

কি জানি!—প্রতুলবাবু অপ্রতিভের মত উত্তর দিলেন,—কথাটা ভাল করে বুঝিয়েও হয়তো বলতে পারব না। কিন্তু ঐ যে তোমাদের জড়বাদ, তোমাদের হিংসানীতি, ঈশ্বরে অবিশ্বাস, ধর্ম্ম, নীতি, চরিত্র প্রভৃতি সকল সনাতন আদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধা, তোমাদের বড়লোকবিদ্বেষ,—এ সব—কি জানি—মনে হলেই মনটা কেমন যেন বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

অরুণাংশু এবার সশব্দে হেসে উঠে বললে, এ সব আপনাকে কে বলেছে কাকাবাবু? অত পাষণ্ড আমরা নই। শুনবেন আমার কাছে কম্যুনিজমের ব্যাখ্যা?

না, বাবা,—প্রতুলবাবু অপ্রতিভভাবে বললেন,—না; ওসব নিয়ে মাথা

ঘামাতেও ইচ্ছে হয় না আমার। বেশ আছি। হেসে-খেলে সুখে-দুঃখে কিন্তু এক রকম বেশ কেটে যাচ্ছে—আর কটা দিনই বা আছে জীবনের? এখন আর ওসব নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। তুমি ঘরের লোক—তাই তোমায় বললাম। তুমি নিজেই ভেবে দেখো। ভাবলে নিজেই তুমি বুঝতে পারবে যে, যা কিছু প্রাচীন, তাই মন্দ নয়।

অরুণাংশু হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, আমরাও ও কথা মানি কাকাবাবু,—অনেকের চেয়ে হয়তো বেশীই মানি।

অরুণাংশু হাসিমুখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রথমে উপরের বসবার ঘরে ও পরে একাদিক্রমে সব কখানা ঘরের মধ্যেই সে উঁকি মেরে দেখলে। তার পর অন্দরের দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে দুতিনবার অনামিকার নাম ধরে ডাকলে। কোনও সাড়া না পেয়ে সে আবার রমেনবাবুর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, অনু কোথায়, কাকাবাবু?

সত্য কথা টাই প্রতুলবাবু একটু ঘুরিয়ে বললেন, তাহলে বৌদি বোধ করি ওকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন,—যাবেন শুনেছিলাম সেই দুপুর বেলায়।

অরুণাংশু ঘরে গিয়ে জামাটা বদলেই বেরিয়ে পড়ল। সহরের দিকে সে গেল না। পায়ে হেঁটেই সে সোজা চলে গেল একেবারে দারাগঞ্জ। সেখানে গঙ্গার ধারে বালির উপর একা একাই অনেকক্ষণ সে পায়চারি করে বেড়াল। অন্ধকারে কিছুই আর যখন দেখা গেল না তখন একখানা এক্কা করে সে বাড়ী ফিরে এল।

উপরের বসবার ঘরে অনামিকা তখন একা বসে কি একখানা বই পড়ছিল। দেখে অরুণাংশু সবিস্ময়ে বললে, এ কি, অনু,—তুমি একা বসে যে! মা কোথায়?

অনামিকা হাসিমুখে উত্তর দিলে, জেঠিমা ও ঘরে আছেন; কিন্তু সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। আধ ঘন্টার কাছাকাছি হল নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করছি।

অধিকতর বিস্মিত হয়ে অরুণাংশু বললে, ব্যাপার কি, অনু?

অভিমানের ভঙ্গীতে নীচের ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে অনামিকা উত্তর দিলে, কি জানি! আমায় জানাবার হলে কি আর আমায় তাড়িয়ে দিয়ে দোর বন্ধ করতেন ওঁরা? আপনি যান না,—জেনে আসুন গে কি ব্যাপার।

অরুণাংশু হেসে বললে, না, কিছু দরকার নেই; আমার দরকার ছিল তোমাকে।

আমাকে!

হ্যাঁ, অনু,—সেই বিকেল থেকেই তোমায় আমি খুঁজছি।

কেন, অরুণদা?

একটা সুখবর দেব বলে।

অনামিকা বিহ্বলের মত বললে, কি অরুণদা?

অরুণাংশু সহাস্য কণ্ঠে উত্তর দিলে, তুমি যা চেয়েছিলে তাই হয়েছে—বাবার সাথে আমার বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে।

হয়ে গিয়েছে!—বলতে বলতে উৎসাহ ও উত্তেজনায় অনামিকার চোখদুটি চিক্‌ চিক্‌ করে জ্বলে উঠল,—কি বোঝাপড়া হয়েছে, অরুণদা?

অরুণাংশু বললে, বাবার ঠিক অনুমতি না হলেও সম্মতি আমি পেয়েছি। এখন থেকে বাবার খরচেই আমি কলকাতায় থাকব।

অনামিকার চোখেমুখে যে আলোটা নেচে বেড়াচ্ছিল তা হঠাৎ যেন স্থির হয়ে দাঁড়াল; ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে সে বললে, কলকাতায় থাকবেন আপনি? হুগলী যাবেন না?

অরুণাংশু অপ্রতিভের মত হেসে বললে, কলকাতা আর হুগলী তো খুব বেশী দূর নয়—কলকাতায় থাকলেই হুগলীতেও থাকা হবে।

ভুলটা যেন মেনে নিয়েই অনামিকা কুণ্ঠিত স্বরে বললে, তা বটে!

অরুণাংশু কথাটাকে আরও বুঝিয়ে বললে, সেটাই হয়েছে আমাদের আপোষ। আমি এখন যা করছি তার সবই করতে থাকব; বাবার কথামত বেশী যেটুকু করব তা অবসর সময়ে ওকালতি।

অনামিকা আবার বিস্মিত হয়ে বললে, ওকালতি করবেন আপনি?

অরুণাংশু হেসে উত্তর দিলে, করি আর না করি, হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের তালিকায় নিজের নামটা দর্জ্জ করিয়ে নেব। তার বদলে বাবা আমার কলকাতায় থাকবার সব খরচ যোগাবেন।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল অনামিকা; তার পর মাথাটা দুলিয়ে আবদারের স্বরে বললে, বলুন না, অরুণদা,—সব কথা আমায় খুলে বলুন। কখন কথা হল আপনাদের—আজ বিকেলে? কি কি কথা হল?

অরুণাংশু সংক্ষেপে খুলে বললে সব কথা। অনামিকা মন দিয়ে শুনলে। শুনতে শুনতে তার মনের খুশী চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ল। অরুণাংশু থামতে না থামতেই সে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, খুব ভাল হয়েছে, অরুণদা,—আমাদের বাড়ীর কাছেই আপনার বাসা যদি হয়,—সে খুব ভাল হবে। সত্যি, খুব খুশী হয়েছি আমি।

পরদিন সকালে অনামিকা নিজেই আবার অরুণাংশুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। দুএকটি অবান্তর কথা বলবার পর কুণ্ঠিত ভাবে একটু হেসে সে আবার বললে, জ্যাঠামশায়ের সাথে আপনার যা বোঝাপড়া হয়েছে সে খুব ভালই হয়েছে, অরুণদা। কিন্তু আপনি যদি এই এলহাবাদেই থাকতে রাজী হতেন তো সে হত একেবারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

বিস্মিত চোখে কিছুক্ষণ অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর অরুণাংশু অল্প একটু হেসে বললে, বাবা বুঝি তোমায় ওকালতনামা দিয়ে পাঠিয়েছেন,—না, না?

না, ছিঃ!—অনামিকা লজ্জিত স্বরে উত্তর দিলে,—তা কেন? জ্যাঠামশায় কিছু বলেন নি আমায়,—জেঠিমাও নন। আমার নিজেরই কথাটা মনে হল,—তাই বলছিলাম। কেন?—আপনি নিজে বুঝতে পারেন না যে আপনি এখানে থাকলে জ্যাঠামশায় ও জেঠিমা দুজনেই আরও বেশী খুশী হবেন!

অরুণাংশু স্বীকার করে বললে, তা বুঝতে পারি।

তবে থাকেন না কেন?

তা পারি নে।

একটু চুপ করে রইল অনামিকা; একবার বাইরের দিকে চেয়ে সে দেখলে, তার পর সকৌতুক, সহাস্য চোখে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা, অরুণদা, এমন যদি হয়,—সুভদ্রাদেবীও এই এলাহাবাদেই যদি থাকেন—তাহলে এখানে থাকবেন আপনি?

প্রায় আধ মিনিট কাল অরুণাংশুর মুখে কোন কথাই ফুটল না। তার পর সহসা সে হেসে ফেটে পড়বার মত হয়ে বললে, এ কি হল, অনু? যাকে কোন দিন তুমি চোখেও দেখ নি, সেই সুভদ্রাদেবী অত দূর থেকে তোমায় সম্মোহিত করলেন কেমন করে!

মুখ নামিয়ে লজ্জিত স্বরে অনামিকা উত্তর দিলে, হাঁ,—তা বই কি।

নিজের ভাবটা আর এক জনের উপর আপনি আরোপ করছেন কেন? আমি আবার সম্মোহিত হলাম কিসে!—সম্মোহিত হয়ে রয়েছেন তো আপনি।

অরুণাংশু উত্তর দিলে না; সহাস্য চোখে কিছুক্ষণ অনামিকার ঐ আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সে সকৌতুক কণ্ঠে বললে, আচ্ছা, অনু,—সত্যি বল তো,—মা তোমায় ব্রীফ দিয়ে পাঠিয়েছেন?

অনামিকা সবেগে মাথা নেড়ে দৃঢ় স্বরে প্রতিবাদ করলে, না,—কক্ষনো নয়। জেঠিমা কিছু বলেন নি আমায়? সুভদ্রাদেবীর কথা!—না, ছিঃ।—

অরুণাংশু গাম্ভীর্য্যের ভান করে বললে, তবে তো লক্ষণ আরও খারাপ। সুভদ্রাদেবী দেখছি তোমার স্নায়ুগুলো সব অধিকার করে রেখেছেন। বড্ড ভাবিয়ে তুলেছেন তোমায়,—না?

অনামিকা আরক্ত হয়ে বললে, আর আপনাকে?—ভ্রূভঙ্গী করে বেশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই সে আবার বললে, আপনাকে তো তিনি জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

চমকে উঠল অরুণাংশু; ঈষৎ বিব্রত, ঈষৎ বিস্মিত স্বরে সে বললে, বল কি অনু?—এ কথা আবার তোমায় কে বললে?

বলবে আবার কে?—অনামিকা মুখ ফিরিয়েও আগের চেয়েও বরং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলে,—সব কথাই সবাইকে বলে দিতে হয় নাকি? তিনি না টানলে আপনি যাচ্ছেন কেন?

যাচ্ছি আমার নিজের গরজে।

ও একই কথা। সুভদ্রাদেবীর টানেই তো ও গরজের সৃষ্টি হয়েছে!—বলতে বলতে ঘাড়টা একটু কাৎ করে ফিক্ করে হেসে ফেললে অনামিকা।

কিন্তু অরুণাংশু গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর গম্ভীর স্বরেই সে বললে, না, অনু,—সুভদ্রাদেবীর টানে যাচ্ছি নে আমি,—বাইরের কোন টানেই নয়। আমি যাচ্ছি ঐ যাকে বলে, ভিতরের ঠেলায়,—মানে, গতিধর্ম্মী জীবনের দুর্ব্বার স্রোতের টানে যা মানুষকে কেবলই চালিয়ে, এগিয়ে নিয়ে যায়।

তথাপি অনামিকা পরিহাসের স্বরেই বললে,—কিন্তু যাচ্ছেন তো সুভদ্রাদেবীরই দিকে!—

তা ঠিক,—অরুণাংশু উত্তরে বললে,—তবে তাকে ছাড়িয়েও তো যেতে পারি আমি!—

অনামিকা বিস্মিত হল—কেমন যেন একটা বিহ্বলতার ভাবও তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মুচকি হেসেই সে বললে, পারলেই বা তার দরকার কি, অরুণদা? ছেড়ে বা ছাড়িয়ে যাতে না যেতে হয় সেই ব্যবস্থাই করুন না কেন,—সুভদ্রাদিকে বিয়ে করে সাথেই নিয়ে নিন না কেন?

আবার চমকে উঠল অরুণাংশু; বিব্রতভাবে সে বললে,—এই, আবার দুষ্টুমি সুরু হল তোমার!

ও মা!—দুষ্টুমি আবার কোথায় করলাম!—হাসি চেপে গাম্ভীর্য্যের ভান করে অনামিকা বললে,—আমি তো ভাল পরামর্শই দিচ্ছি আপনাকে। সত্যি, এতে সব দিক বজায় থাকবে, অরুণদা। সুভদ্রাদিকে বিয়ে করলে আপনি এই এলাহাবাদেই থাকতে পারবেন, আর সেই কারণেই জেঠিমা-জ্যাঠামশায়ও মত না দিয়ে থাকতে পারবেন না।

একটু থেমে মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে আবার বললে, বলতে আপনার যদি লজ্জা করে, অরুণদা, তবে আমার উপর ভার ছেড়ে দিন,—ওঁদের বলে আমিই সব ব্যবস্থা ঠিক করে দেব।

অরুণাংশুর মুখ লাল হয়ে উঠল; সে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, থাক্—অত কষ্ট তোমার না করলেও চলবে। বিয়ে করার চেয়েও ঢের বেশী গুরুতর অনেক কাজ এখন আমার হাতে আছে।

সকৌতুক, সহাস্য মুখে ক্ষণকাল অরুণাংশুর দিকে চেয়ে থাকবার পর অনামিকা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, আচ্ছা, অরুণদা, বিয়ে আপনি করতে চান না কেন?

অরুণাংশু মুখ তুলে তাকাল; একটু যেন ইতস্ততঃ করলে সে; তার পর অল্প একটু হেসে বললে, তার আগে তুমি বল তো, অনু,—আমার বিয়ের সম্বন্ধে তোমারই বা এত কৌতূহল কেন?

চক্ষের পলকে অনামিকার কান পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠল; অপরিসীম কুণ্ঠায় চোখদুটি পড়ল নত হয়ে; ঐ শীতের সকালেও তার কপালে যেন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। কিন্তু পরক্ষণেই শরীরটাকে বেশ জোরে একবার নাড়া দিয়ে অকুণ্ঠিত স্পর্দ্ধায় চোখ তুলে অরুণাংশুর চোখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে সে বললে, কৌতূহল আবার কি! আর হলেও বা দোষ কি তাতে? দাদার বিয়ের সম্বন্ধে বোনমাত্রেরই তো কৌতূহল হয়েই থাকে, অরুণদা!—

না, তোমার সঙ্গে পারবার উপায় নেই,—বলে অরুণাংশুও আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কথার যুদ্ধে তারই যে জয় হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেই যেন অনামিকার চোখমুখ উজ্জল হয়ে উঠল; সে সহাস্য কণ্ঠে বললে, তা হবে না, অরুণদা,—আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি,—এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে। বিয়ে করতে চান না কেন আপনি?

অরুণাংশু হেসে ফেলে বললে, সাহস হয় না।

বাজে কথা!—বলে অনামিকা মুখ ফিরিয়ে নিলে; কিন্তু একটু পরেই আবার অরুণাংশুর মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে কতকটা কৌতূহল, কতকটা অনুনয়ের স্বরে সে আবার বললে, আচ্ছা, অরুণদা, চিরটা কালই কি এই ছন্নছাড়ার জীবন কাটাবেন আপনি? বে-থা করবেন না কোনদিন?

মিটি মিটি হাসতে হাসতে অরুণাংশু উত্তর দিলে, চিরদিনকে মুখের কথা দিয়ে আমি বাঁধব কেমন করে, অনু? লোকে যাদের বলে অতি-মানুষ, সেই অমানুষদের একজন তো আমি নই!—

যান!—অনামিকা ঠোঁট ফুলিয়ে বললে,—আমি জিজ্ঞেস করলাম কি, আর আপনি বিশ্বশুদ্ধ লোককে খোঁচা দিতে আরম্ভ করলেন। তার চেয়ে সোজাসুজি বলুন না কেন যে আমার কথার জবাব দেবার ইচ্ছে আপনার নেই।

অরুণাংশু প্রতিবাদ করে বললে, তা কেন হবে, অনু! তোমার প্রশ্নের জবাবই তো আমি দিয়েছি। বিয়ে কোন দিনই করব না, ভীষ্মদেবের মত তেমন প্রতিজ্ঞা তো আমি করি নি!—

অনামিকা খুশী হয়ে বললে, সত্যি বলছেন? বিয়ে তাহলে আপনি করবেন?

অরুণাংশু হাসিমুখে উত্তর দিলে, করতেও পারি।

কবে করবেন?—অনামিকা আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

কবে?—বলে অরুণাংশু আবার ভাববার ভান করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; তার পর অনামিকার দৃষ্টি এড়িয়ে ধীরে ধীরে বললে,—এই ধর—নিজের উপর বিশ্বাস যেদিন অনেকটা হারিয়ে ফেলব, সুখের চেয়ে স্বস্তিটাই দুর্বল মনের বেশী কাম্য হয়ে উঠবে, দুষ্প্রাপ্য ভালবাসার উন্মাদনার চেয়ে সুলভ আর নিশ্চিত ভোগের পান্‌সে পরিতৃপ্তিটাই বেশী দামের জিনিষ বলে মনে হবে, মুক্ত আকাশের আলোকোজ্জ্বল

বিপুলতার চেয়ে পাতাঢাকা সঙ্কীর্ণ নীড়ের ভাপ্‌সা অন্ধকারেই অসীমের বিরাটতর প্রকাশ উপলব্ধি করব, আমার সৃষ্টিধর্ম্মী শিল্পী-সত্ত্বা মৌলিক প্রেরণা ও শক্তি হারিয়ে প্রজননের অতি-সোজা পুতুল গড়ার মধ্যেই চরম চরিতার্থতা লাভ করতে পারবে, সেদিন শাঁখা-সিঁদুরপরা একটি গৃহিণীকে নিয়ে আমিও হয়তো অন্য দশটি ভাল ছেলের মত মর্ত্ত্যের কোন একটি কুটিরে ছোট্ট একটি স্বর্গ রচনা করে তোমাদের সকলের পরিতৃপ্তিবিধান করতে পারব।

কুণ্ঠায়, লজ্জায় মুখ লাল করে চোখ নামিয়ে অনামিকা বললে, থাক্‌,—আমাদের পরিতৃপ্তির কথা না হয় না-ই ভাবলেন,—নিজের পরিতৃপ্তির জন্যই সুভদ্রাদেবীকেই শাঁখা-সিঁদূর পরিয়ে ঘরে নিয়ে আসুন না কেন!—

অরুণাংশু হেসে উত্তর দিলে, না, আমার জীবনে আজও গৃহ বা গৃহিণীর প্রয়োজন উপস্থিত হয় নি,—সে দুর্দ্দিনের এখনও অনেক বাকি আছে আশা করি।

ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে অনামিকা বললে, কিন্তু এখন না এনে রাখলেও ভবিষ্যতের দুর্দ্দিনে সুভদ্রাদিকে পাওয়া যাবে তো?

না পেলেও কোন ক্ষতি হবে না,—অরুণাংশু উত্তরে বললে,—এ দেশে মেয়ের তো অভাব নেই! কোন একটিকে ধরে এনে দিতে পারবে না তোমরা?

অনামিকা এবার প্রকাশ্যেই হেসে ফেলে বললে, তা পারব। কিন্তু আমরা যাকে ধরে এনে দেব, তাকেই আপনি ভালবাসতে পারবেন?

অরুণাংশু বললে, না-ই বা পারলাম—বিয়ে করবার জন্য ভালবাসবার কোন দরকারও তো নেই!—

অনামিকার মুখের হাসি বিবর্ণ হয়ে গেল; এমন একটা উদ্ভট কথার উত্তরে বলবার মত একটি কথাও ভেবে ঠিক করতে না পেরেই যেন সে অবাক বিস্ময়ে অরুণাংশুর মুখে দিকে চেয়ে রইল।

সেই মুখের দিকে স্মিত মুখে তাকিয়ে অরুণাংশু বললে, কি দেখছ, অনু,—ভূত?

অনামিকা অন্যান্যবারের মত এবার আর মাথা নেড়ে একটা কাণ্ড করে বসল না; কুণ্ঠিতভাবে একটু হেসে শুষ্ক কণ্ঠে সে বললে, না, তা নয়। কিন্তু—ভারি উদ্ভট মনে হচ্ছে আপনাকে। উল্টো চলা আর উল্টো বলার মোহ আপনাকে যেন ভূতের মত পেয়ে বসেছে।

সশব্দে হেসে উঠে অরুণাংশু বললে, আমি তোমাদের এই গোটা সমাজ আর

সংস্কৃতিটাকেই তো উলটাতে চাচ্ছি, অনু,—আমার চলন-বলন সোজা হবে কেমন করে?

কিন্তু তার পরেই সে হাসি থামিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল; বললে, আর না, অনু,—উদ্দেশ্যহীন বাজে গল্পে আজ আমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আমার কাজ আছে,—এক্ষুনি আমায় বাইরে যেতে হবে।—

(৬)

পর পর দুদিন বাদলা গিয়েছে। এ দুদিন আকাশ ছিল কালো, মাটি ছিল ভিজে। ঘরের মধ্যে সুভদ্রার মনটাও যেন সেঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছিল।

তাই সেদিন সকালে চোখ মেলেই খোলা জানালা দিয়ে দূরের অশ্বত্থ গাছের মাথায় মাথায় উজ্জ্বল সোনালী রৌদ্রের চঞ্চল নৃত্যলীলা দেখতে পেয়েই তার মনটা খুশীতে ভরে উঠল। চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে সে দেখলে যে, অদূরে হাসপাতালের সাদা দালানটার গায়ে কে যেন মুঠা মুঠা আবির ছড়িয়ে দিয়েছে; আকাশ নির্মেঘ, নীল; পৃথিবীর বৃষ্টিধোয়া শ্যামলিমা প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে ঝল মল করে জ্বলছে। তার নিজের মুখখানাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কাজে যাবার আগে ঝিকে সে বললে, নিরামিষ খেয়ে খেয়ে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে, ঝি; কিছু মাছ যদি আজ এনে দিয়ে যাও, তোমায় খুশী করে বখশীষ দেব।

ঝি এক গাল হেসে উত্তর দিলে, বখশীষ আবার কি দেবে, দিদিমণি! অমনিতেই মাছ শুধু এনে দেওয়া কেন, বল তো রেঁধেও রাখতে পারি।

সুভদ্রা খুশী হয়ে বললে, না, রাঁধতে হবে না—তুমি খালি কেটে রেখে যেয়ো—আমিই রেঁধে নেব'খন। আর তোমার জন্যও একটু ঝোল বাটিতে রেখে দেব আমি। ওবেলায় এসে নিয়ে যেয়ো।

ফিরে এসে মাছ দেখে আরও খুশী হল সে। বড় রুইয়ের কোলের দিকের বেশ বড় একটা খণ্ড,—ঝি পরিপাটি করে কেটে ধুয়ে রেখে দিয়েছে। পরিমানে এত বেশী যে, একা দুবেলাতেও সে খেয়ে শেষ করতে পারবে না। ডাল আর তরকারি

সুভদ্রা সবই সরিয়ে রাখলে; কেবল আস্ত একটি বেগুন আর দুটি আলু চালের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে হাঁড়িটি উনোনের উপর চাপিয়ে সে স্নান করতে চলে গেল। ভাবলে যে ফিরে এসে কেবল মাছের ঝোলটুকু রেঁধে নিলেই আজকের মত তার রাজভোগের আয়োজন হয়ে যাবে।

কিন্তু ভাতের হাঁড়ি নামাবার আগেই বাইরে থেকে শিকল নেড়ে কে যেন তাকে ডাকলে, দিদিমণি!—

কারখানারই একজন মজদুরের ছোট ছেলে—ইয়ুনিয়নের কাজে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই ফাই-ফরমাস খাটে। সুভদ্রাকে দেখেই এক গাল হেসে সে বললে, আপনাকে ডাকছেন, দিদিমণি,—এক্ষুনি যেতে হবে।

যতখানি বিস্মিত তার চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে, মদন,—কে ডাকছে?

মদন উত্তরে বললে, সভা বসেছে যে, দিদিমণি,—অরুণবাবু আপনাকে এক্ষুনি যেতে বললেন।

কে?

অরুণবাবু গো—তিনি যে এসেছেন!—

সুভদ্রার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত হঠাৎ যেন বিদ্যুতের প্রবল একটা ধারা বয়ে গেল। কিন্তু তার পরেই তার সারা শরীরটা হয়ে গেল যেন পাথর,—হৃদ্‌পিণ্ডের গতি যেন আর নেই; চোখে পলক পড়ে না; হাত-পা অসাড়, নিথর। উত্তরে মুখে তার একটিও কথা ফুটল না।

মদনই অসহিষ্ণুর মত আবার বললে, যাবেন না, দিদিমণি,—এক্ষুনি যেতে বললেন যে!—

সুভদ্রার গায়ে আবার যেন একটা ধাক্কা লাগল,—তার স্তব্ধ হৃদপিণ্ড হঠাৎ যেন দ্বিগুণ বেগে চলতে সুরু করে দিলে। শুষ্ক, অস্ফুট, জড়িত স্বরে সে বললে, কখন এলেন তিনি?

এই তো একটু আগে,—মদন উৎসাহের স্বরে উত্তর দিলে,—কেউ কিছু জানত না, দিদিমণি,—তিনি এসেই সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

কবাটের একটা কোণ শক্ত করে চেপে ধরে সুভদ্রা বললে, আচ্ছা, তুমি যাও, মদন,—আমি একটু পরে যাচ্ছি।

অপ্রত্যাশিত নয়, তথাপি অবিশ্বাস্য। অরুণাংশু সত্য সত্যই ফিরে এসেছে, এই সংবাদটা সুভদ্রার উত্তেজিত চিত্ত কিছুতেই যেন সত্য বলে মেনে নিতে পারছিল না। বলা নেই, কওয়া নেই, একটা আভাষ পর্য্যন্ত দেওয়া নেই,—অথচ অরুণাংশু সশরীরে এখানে উপস্থিত হয়ে নিজেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছে! প্রথমে সুভদ্রার মনে হল যে এমন কোন ঘটনা আসলে মোটেই ঘটে নি; অতীতের মতই আজও সে জেগে জেগে একটা স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু তার পরেই আবার তার মনে হল যে অসাধারণ কিছুই ঘটে নি। এমনই তো অরুণাংশুর স্বভাব,—কিছু না বলে হঠাৎ চলে যাওয়া, কোন খবর না দিয়েই হঠাৎ ফিরে আসা, সকলকে চমক লাগিয়ে দেওয়া,—তার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম থেকেই এমনি ভাবে সকল নিয়মের ব্যতিক্রমের ভিতর দিয়েই অরুণাংশু তার অসাধারণ নিয়মানুবর্ত্তিতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। একটা পুলকিত বিস্ময়, মধুর লজ্জার ঈষৎ যেন একটু রোমাঞ্চের ভিতর দিয়ে সুভদ্রা অনুভব করলে, যে, এত দিন তার সকল বেদনা, সকল উদ্বেগের মধ্যেও রাত্রির নীবিড় অন্ধকারের এমনি আকস্মিক অবসানই নিজেও যেন সে প্রত্যাশা করে এসেছে।

বিস্ময়ের আঘাতটা কেটে যেতেই উল্লাস এল জোয়ারের প্রবল একটা উচ্ছ্বাসের মত। সংশয় আর আশঙ্কার কাঁটা আর কাঁকর যত ছিল, সবই চক্ষের নিমেষে অতল তলে তলিয়ে গেল। যেন তার একটি মিনিটও তর সয় না, এমনি ভাবে সুভদ্রা ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। তার অত সাধের মাছ সে বাটিসহ ঘরের কোণে সরিয়ে রাখলে,—ওতে যে অন্ততঃ একটু নুন আর মশলা মাখিয়ে রাখা উচিত, এ কথাটাও তখন তার মনে পড়ল না। ভাত ভাল করে ফুটতে না ফুটতেই হাঁড়িটি সে উনোনের উপর থেকে নামিয়ে নিলে। কোন মতে ঐ ভাতে-ভাতই দুমুঠো মুখে দিয়ে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে পেটের আগুন তখনকার মত নিভিয়ে দিয়েই সে দোরে তালা লাগিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল।

ভিতরে তখন তুমুল তর্ক চলছে। বারান্দায় উঠতেই সুভদ্রার কানে এল,—সুবোধ বিষণ্ণ, গম্ভীর স্বরে বলছে, জার্ম্মানী সোভিয়েট রুষিয়াকে আক্রমন করতেই যুদ্ধের স্বরূপটা একেবারে বদলে গেল, পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটা স্বাধীন-পরাধীন নির্ব্বিশেষে সকল জাতির কাছেই পুরোপুরি 'জনযুদ্ধ' হয়ে উঠল,—এ যুক্তিটাকে

দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুনিষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্রের নামে চালাতে চেষ্টা করে গোটা শাস্ত্রটাকেই তোমরা হাস্যাস্পদ করে তুলছ।

কিন্তু সুবোধের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সুভদ্রা ঝড়ের মত ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। ভিতরের সব কজন লোকই চমকে উঠল; সব কজোড়া চোখই এক সঙ্গে তার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু তার নিজের চোখদুটি আর সকলকে অতিক্রম করে একেবারে অরুণাংশুর মুখের উপর গিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের উচ্ছ্বাসে, আনন্দের আভায় ও হাসির আলোকে তার কালো মুখখানিও ঝলমল করে জ্বলে উঠল।

অকস্মাৎ বাধা পেয়ে আলোচনাটা তখনকার মত থেমে গেল। অরুণাংশু হাসি-মুখে বললে, এস, সুভদ্রা,—এত দেরী হল যে তোমার?

প্রশ্নটা যেন সে শুনতেই পায় নি, এমনি ভাবে সুভদ্রা বললে, বাঃ—বেশ লোক তো তুমি! আসার আগে খবরটাও দিতে পার নি?

অরুণাংশু হাসি মুখেই উত্তর দিলে, খবর দিয়ে আসতে না পারার চেয়ে খবর না দিয়ে আসাই তো ভাল!

সে না হয় আমাদের পক্ষে,—সুভদ্রাও হেসে ফেলে বললে,—কিন্তু তোমার নিজের পক্ষেও তা ভাল হয়েছে তো? এসে কিছু খেতে পেয়েছ?

অরুণাংশু বললে, তার দরকারও হয় নি। কাউকে বিব্রত করব না ঠিক করেই এ বেলার খাওয়াটা সেরে নিয়ে তবে এখানে এসেছি।

পলেকের জন্য সুভদ্রার ঝকঝকে চোখদুটিতে একটু যেন বিস্ময়, ঈষৎ সংশয়ের পাতলা একখানা ছায়া দেখা দিল; কিন্তু পরমুহূর্তেই সে মাথা নেড়ে বললে, না, তাহলেও ভাল কর নি তুমি,—বরং সকলকেই বিব্রত করেছ আরও বেশী। বল তো, হঠাৎ এখন সব গোছগাছ কেমন করে হবে! যাবার আগে চাকরটাকে পর্য্যন্ত ছুটি দিয়ে গিয়েছিলে,—তা মনে নেই তোমার? আজ এক বেলাতেই ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগবে কেমন করে?—মন্ত্রবলে?

উত্তর দিতে একটু দেরী হল অরুণাংশুর; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে হেসেই বললে, বিকেলে তোমার বাসায় বসে চা খেতে খেতে সে সমস্যাটা সমাধান করব বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু আমার সংসারের চেয়েও ঢের বেশী দরকারী আমাদের এই সংঘটাতে যে ফাটল দেখা দিয়েছে, আপাততঃ সুবোধকে নিয়ে

সেটাই জুড়বার চেষ্টায় বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ওদের সকলের সাথে তোমাকেও ডেকেছি কিছু ইট-কাঠ-চূণ-সুরকির যোগান দিতে। কাছে বসে দেখ না একবার চেষ্টা করে—যদি একটু সাহায্য করতে পার!—

সুভদ্রা অপ্রতিভভাবে মুখ নামিয়ে কোণের দিকে বসে পড়ল। মুখে তার উত্তর ফুটল না; মনে মনে সে বুঝতে পারলে যে অত্যন্ত গম্ভীর একটা আলোচনার মধ্যে নিজে সে অত্যন্ত অশোভন চপলতা প্রকাশ করে ফেলেছে। এতক্ষণ আর কোন দিকে তার চোখ পড়ে নি; এবার আড় চোখে সে চেয়ে দেখলে। বুঝলে যে ইয়ুনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির কেতাদুরস্ত সভা সেটা নয়,—অনেক সদস্যই অনুপস্থিত। অরুণাংশু আর সুবোধ ছাড়া আছে কেবল বিমল, শ্যামাচরণ আর কেশবলাল। কিন্তু সকলের মুখই অসাধারণ রকমের গম্ভীর; সুবোধ নিজে মেঝের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে।

সেই সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে অরুণাংশুই আবার বললে, তাহলে, সুবোধ, সোভিয়েট রুষিয়া সক্রিয় ভাবে এ যুদ্ধের অংশীদার হওয়ার ফলেও জগতে গুরুতর পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নি?

সুবোধ উত্তরে যা বললে তা যেন সুভদ্রার কানেই গেল না, তার চোখদুটি ফিরে আবার অরুণাংশুর মুখের উপর গিয়ে পড়ল।

প্রথমে যা চোখে পড়ে নি, এবার তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই এক মাসে অরুণাংশুর অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। আলোচনার বিষয়টি গুরুগম্ভীর—অরুণাংশুর মুখের উপরেও তারই ভারী ছায়া পড়েছে। ললাটে চিন্তার সুস্পষ্ট রেখা, চোখের দৃষ্টি মনোযোগে তীক্ষ্ণ; সমগ্র মুখখানিতেই কেমন একটা বিব্রত, বিপন্ন ভাব। তথাপি অত্যন্ত সুন্দর সেই মুখখানি,—স্বভাবসুন্দর মুখখানি আগের চেয়েও যেন বেশী সুন্দর হয়েছে। এখানে থাকতে তার রোগশীর্ণ মুখের উপর যে পাণ্ডুরতা দেখা দিয়েছিল, তা এখন আর নেই। শরীরে যে অনেকটা চর্ব্বি জমেছে তা বেশ বোঝা যায়; স্বাভাবিক গৌর বর্ণ স্বাস্থ্যের লাবণ্যে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা মুগ্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু তর্ক ক্রমেই তুমুল হয়ে উঠছিল। কত শত মাইল দূরে যুদ্ধ হচ্ছে—এখানে তারই প্রতিধ্বনি। গোলার চালের ছোট ঘরখানিই যেন হয়ে উঠছে দ্বিতীয় এক রণক্ষেত্র! এখানেও তেমনি আওয়াজ, তেমনি উত্তাপ, তেমনি

কঠিন আঘাতের প্রত্যুত্তরে কঠিনতর প্রত্যাঘাত। সুভদ্রার ধ্যান ভেঙে গেল।

এ যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ' হয়েছে কি না, তাই নিয়ে তর্ক। সুবোধ কিছুতেই মানবে না, অরুণাংশুও কিছুতেই ছাড়বে না। দুজনেই সমান একগুঁয়ে, পাণ্ডিত্যও কারও কম নয়। অরুণাংশু সুবোধকে যেন জেরা করে চলেছে; সুবোধের মুখেও উত্তর আটকাচ্ছে না। কথার পিঠে কথা বেড়েই চলল।

হঠাৎ সুভদ্রার দেহের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুতের একটা প্রবাহ বয়ে গেল। সুবোধ স্বভাবতঃই শান্ত; গোড়া থেকেই সে যথাসম্ভব নম্রভাবে কথা বলছিল। কিন্তু হঠাৎ তারও কণ্ঠে যেন মহাকালের প্রলয় বিষাণ গম্ভীর নির্ঘোষে বেজে উঠল। একটা যুক্তির উপসংহারে তার নিজের সিদ্ধান্তটি সে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলে, সোভিয়েটের কাছে এ যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ' নিশ্চয়ই; কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন-ফ্রান্সের বিশাল সাম্রাজ্যের অগনিত পরাধীন নরনারীর কাছে এ যুদ্ধ আজও পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই রয়েছে।

সুবোধ থামতে না থামতেই কি যেন একটা দুর্নিবার প্রেরণার বশে সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে অরুণাংশুর মুখের দিকে তাকাল; দুজনের চোখাচোখি হল; অরুণাংশু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, তুমি কি বল, সুভদ্রা?

সুভদ্রা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, আমিও ঐ কথাই বলি।

অরুণাংশু হেসে ফেলে বললে, Et tu Brute—সুভদ্রা, তুমিও?

সুভদ্রার মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল; চোখদুটি আপনা থেকেই নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তথাপি ঘাড়টা একটু কাৎ করে মৃদু হলেও দৃঢ় স্বরেই সে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, আমিও; আমিও বলি যে আমাদের কাছে এ যুদ্ধ আজও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই রয়েছে।

চুপ করে গেল অরুণাংশু,—চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াবার মত। কিন্তু একটু পরেই সুবোধের দিকে মুখ ফিরিয়ে এমন ভাবে সে আবার কথা সুরু করলে যেন এই মাত্র সুভদ্রার সঙ্গে কোন কথাই তার হয় নি,—যেন সুভদ্রা সে ঘরের মধ্যে মোটে উপস্থিতই নেই।

আবার তর্ক চলল। মাঝে বাধা পড়েছিল বলেই যেন বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত তার গতি আগের চেয়েও দ্রুত, আগের চেয়েও উদ্দাম হয়ে উঠল।

উত্তাপ বেড়ে উঠতে লাগল, কখন যে খেই হারিয়ে গেল, কখন যে যুক্তি ও যুক্তির পরিচ্ছন্ন দ্বন্দ শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে ব্যক্তি ও ব্যক্তির হীন কলহের পর্য্যায়ে নেমে এল, আত্মবিস্মৃত দুটি বন্ধু তা যেন বুঝতেও পারলে না। অবশেষে সুবোধের কি একটা মন্তব্য অর্দ্ধেকটা মাত্র শুনেই বিরক্ত ভাবে মুখ ফিরিয়ে অরুণাংশু তিক্ত কণ্ঠে বললে, দেশের ভিতরে থেকে যারা শত্রুর পঞ্চম বাহিনীর সৃষ্টি করছে, তারা এ রকম কথাই বলবে।

সুভদ্রা আর চুপ করে থাকতে পারলে না; একটু এগিয়ে এসে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে কুন্ঠিত স্বরে সে বললে, তুমি না বলেছিলে যে, আমাদের সংঘের মধ্যে যে ফাটল দেখা দিয়েছে তা-ই তোমরা জুড়তে চেষ্টা করছ? সে কি এই?

অরুণাংশু ও সুবোধ দুজনেই চমকে উঠে এক সঙ্গে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল। লাল হয়ে উঠল তার মুখ। তথাপি অরুণাংশুকেই উদ্দেশ করে সে আবার বললে,—এই ভাবে তুমি ফাটল জুড়তে পারবে?

অরুণাংশু অপ্রতিভের মত একটু হেসে উত্তর দিলে, না, এ ফাটল জুড়বার মত নয়। দেখলাম যে, এ একেবারে ভিত পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে।

সুভদ্রা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, ঠিক ফাটলের উপরেই বার বার হাতুড়ির ঘা মেরে ফাটল জোড়া যায় না। তুমি আমায় কিছু চুণ-সুরকির যোগান দিতে বলেছিলে,—তাই বলি যে, এ বিষয়ের আলোচনাটা তোমরা ছাড়।

অরুণাংশু বিব্রত ভাবে বললে, তা কেমন করে হবে? এই তো আমাদের আসল সমস্যা।

না,—সুভদ্রা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে,—আমি তা একেবারেই মনে করি নে। যাদের নিয়ে আমাদের কাজ সেই কুলি-মজদুরদের তুমিও নিধিরাম সর্দ্দার হয়ে লড়াই করতে যেতে বলবে না, আর সুবোধবাবুও বলবেন না কারখানার চাকরি ছেড়ে ঘরে গিয়ে বসে থাকতে। আমাদের আসল যে কাজ, সেই ছুটি-ছাটার জন্য, মাইনে বাড়াবার জন্য, মাগ্‌গী ভাতার জন্য, কেউ জখম-টখম হলে ক্ষতিপূরণের জন্য আন্দোলন করার কথা নিয়ে মতান্তর তো আর হয় নি! কাজেই কি দরকার যুদ্ধের কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবার?

সুবোধ আর অরুণাংশু এক সঙ্গেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল,—দুজনেরই ঠোঁটের কোণে এক সঙ্গেই একই রকমের একটু হাসি ফুটে উঠল।

কিন্তু তারা কেউ কথা বলবার আগেই কেশবলাল সুভদ্রাকে সমর্থন করে বললে, আমিও বলি,—দিদিমণির কথাই ঠিক। আমরা আদার ব্যাপারী,—জাহাজের খবরে আমাদের কি দরকার?

সুভদ্রা উৎসাহিত হয়ে বললে, কিছু দরকার নেই। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা সবাই যখন একে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলেছি, তখনও তো ইয়ুনিয়নের সভায় প্রস্তাব করে সে কথা আমরা ঘোষণা করি নি। তবে আজ কেন আমরা গায়ে পড়ে একে জনযুদ্ধ বলতে যাব? বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে আমাদের সকলের মত যখন এক নয়!—

চাপা হাসির আলোকে অরুণাংশুর মুখখানা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল; সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে সকৌতুক কণ্ঠে বললে, কি হল, সুবোধ? সোজাসুজি একটা প্রস্তাব না করলে খুশী হবে তুমি?

কিন্তু সুবোধ কোন উত্তর দেবার আগেই বিমল প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে বলে উঠল, না, অরুণদা, তা হতেই পারে না। আজকের এই সঙ্কটের সময়ে আদর্শের স্পষ্টতা খুব বেশী দরকার।

সুভদ্রার মুখখানা দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে উঠল; বিমলের মুখের উপর একবার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই ফিরে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, তাহলে সুবোধবাবুর ইয়ুনিয়ন সুবোধ বাবুর হাতেই ছেড়ে দাও তোমরা,—এর মধ্যে রেষারেষি, দলাদলি করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করো না।

সুবোধ বিব্রতভাবে বললে, আঃ!—এ কি বলছেন, সুভদ্রাদেবী?

কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে সুভদ্রা বললে, আপনি চুপ করুন, সুবোধ বাবু,—যা করবার আমিই করছি।

তার পর আবার অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, আমি জানি, সুবোধবাবুর কত কষ্ট, কত সাধনার সৃষ্টি এখানকার এই ইয়ুনিয়ন। এ জিনিষ তাকেই তোমায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

অরুণাংশুর মুখখানা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সহাস্য চোখদুটি সুভদ্রার মুখের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতেই সে বললে, কি সুবোধ,—এখানকার এই হাজার কয়েক মজদুরের মন আর তাদের এই ইয়ুনিয়নটি বুঝি তোমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একখানা জমিদারী এষ্টেট?

স্বত্বাধিকারের জোরেই বুঝি তোমার নিজের সেই সম্পত্তি তুমি ফিরে পেতে চাও?

সুবোধের মুখ লাল হয়ে উঠল; কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে অল্প একটু হেসেই সে উত্তর দিলে, জমিদারি এষ্টেট একে যে আমি মনে করি নে, তা নিজেই তুমি জান, অরুণাংশু। ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়ে যাবার ছলাবিদ্যেটা তোমরা কলাবিদ্যে হিসাবে অভ্যাস করেছ জেনেও বামপন্থীদের সংহতির খাতিরে আমিই যে তোমায় নিমন্ত্রণ করে এনে আমারও মাথার উপরের আসনে বসিয়েছিলাম, তা আশা করি আজও মনে আছে তোমার।

অরুণাংশুর মুখের হাসি নিভে গেল; একটু চুপ করে থেকে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, বেশ মনে আছে আমার। কিন্তু আমি যে চিরকাল তোমার গ্রামোফোণ হয়ে থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমার জমিদারীতে প্রজা হয়ে বাস করতে আসি নি, আশা করি যে, তুমিও সে কথা ভোল নি।

সুবোধ কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সুভদ্রা প্রায় আর্ত্ত কণ্ঠে বলে উঠল, এ আবার কি সুরু হল তোমাদের?

অরুণাংশু চমকে তার মুখের দিকে তাকিয়েই হেসে ফেলে বললে, এ একটা খেলা,—এতে এ রকম দ্বন্দযুদ্ধ হয়েই থাকে,—খেলার মাঠে ছাড়াছাড়ি হয় পায়ে পায়ে। কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না,—অন্ততঃ আমি হতে দিই নে।

সুভদ্রা একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, তবে এই আলোচনা বন্ধ কর। তোমার অভাবে অনেক জরুরি কাজ জমে গিয়েছে এখানে। শুনেছ বোধ হয় যে ইয়ূনিয়নের কর্ম্মী হবার অপরাধে শ্যামাচরণদার চাকরিটি গিয়েছে। তার কেস্‌টা নিয়ে কি করা যাবে তাই আগে ঠিক কর।

অরুণাংশুর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল; সুভদ্রার দৃষ্টি এড়িয়ে সে উত্তর দিলে, ও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে,—লড়তেও হবে হয় তো। তবে যে আলোচনাটা তুমি বন্ধ করতে বলছ তার বিষয়বস্তুটা ধামাচাপা দেবার মত নয়। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে মজদুর ইয়ূনিয়ন চালানো যায় না;—এ বিষয়ে আমার যা মত, সুবোধেরও তাই। নইলে এ আলোচনাটা আজ উঠতই না।

তার পরেই সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, কিন্তু, সুবোধ,—তোমার অবর্ত্তমানেই এ ইয়ুনিয়নের কর্ত্তৃত্ব যখন আমার হাতে এসে গিয়েছে

তখন একে দিয়ে যা খুশী তা-ই আমি করাতে পারলেও এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে তা আমি করাব না। সুভদ্রার কথামতই জনযুদ্ধের প্রস্তাব আপাততঃ চাপাই থাকবে। তিন মাস পর আমাদের ইয়ুনিয়নের সাধারণ নির্ব্বাচন। তারই ফলাফল দিয়ে আজকের এই দ্বন্দের নিষ্পত্তি হবে। বুঝলে, সুবোধ,—তুমি পার যদি, ইতিমধ্যে আমার সব অনুচরকে তোমার নিজের অনুচর করে নিও।

এইটুকুতেই সুভদ্রার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বললে, এ তো খুব ভাল কথা, সুবোধবাবু!

সুভদ্রার ভাব দেখে সুবোধ হেসে ফেললে, কিন্তু অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়েই সে বললে, খুব ভাল কথা,—একেবারে সেকালের ধর্ম্মযুদ্ধের ব্যবস্থা এ। ইয়ুনিয়নের কর্তৃত্ব তোমার হাতে, আইনের ধারাগুলো সব তোমার স্বপক্ষে। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' কথাটা মুখেও উচ্চারণ করবার উপায় নেই আমার; অথচ 'জনযুদ্ধের' বাণী প্রচারের পথটা একেবারে নিষ্কণ্টক। তোমার কণ্ঠে ফুটবে পাকা চাকরি, মোটা মাইনে আর নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের কোমল আবেদন; আর আমি সবাইকে বলব সব ছেড়েছুড়ে প্রাণটাকে হাতে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিতে। কোম্পানীর সর্দ্দারেরা সব হবে তোমার বডি-গার্ড; আর আমার পিছনে লাগবে সব গুণ্ডার দল। নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে একেবারে সমানে সমানে। তথাপি,—বলে একবার চুপ করলে সুবোধ; তার পর ঠোঁটের হাসিটুকুকে সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে কথাটাকে সে শেষ করলে,—তথাপি তোমার এই উদারতার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি, অরুণাংশু।

অরুণাংশুও হেসেই উত্তর দিলে, লেজের কাঁটাটি বাদ দিয়ে ধন্যবাদ দাও সুভদ্রাদেবীকে;—ওঁরই কথামত আমাদের প্রস্তাব আমরা মুলতুবি রাখলাম।

লজ্জা ও আনন্দের আভায় সুভদ্রার মুখখানা বিচিত্র হয়ে উঠল; কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফিরে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে-ও হাসতে হাসতেই বললে, নির্ব্বাচনে আপনাকেই আমরা জিতিয়ে দেব, সুবোধবাবু;—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।

যে তর্ক প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্পের মত ঘরখানাকে পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিল,

এমনিভাবে লঘু পরিহাসের ভিতর দিয়েই তখনকার মত তার অবসান হল। তার পর উঠল চায়ের প্রসঙ্গ। ভাব থেকে এল বস্তু,—চা এবং খাবার দুইই। সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল,—এক বিমল ছাড়া। কিন্তু সে-ও তখনই ওটাকে টেনে বাড়াবার সুবিধা করতে পারলে না।

চা খাবার পর অরুণাংশু নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজ আর নয়,—একটু খোলা হাওয়ার জন্য মন আমার হাঁফিয়ে উঠেছে।

বাইরে এসে সুবোধ অরুণাংশুকে উদ্দেশ করে বললে, আজই কি তোমার না গেলেই নয়।

অরুণাংশু উত্তর দিলে, আজ এখান থেকে না গেলে কাল সকালে চিটাগাং মেইল ধরাই যাবে না,—অথচ কাল আমার যাওয়া চাইই।

আগের কথা সুভদ্রা কিছুই শোনে নি,—সে বিস্মিত, বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়েই অরুণাংশুর মুখের দিকে তাকাল।

তার মুখের ভাবটা সুবোধের চোখ এড়াল না। ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসিটুকু চেপে রেখে সে এক চোখ সুভদ্রার ও এক চোখ অরুণাংশুর মুখের উপর স্থাপন করে বললে, তবে আর দেরী করছ কেন? ওখানে একবার যাও। তোমার সাথে সুভদ্রাদেবীর অনেক বোঝাপড়া এখনও বাকি আছে যে!—

অরুণাংশু চমকে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাতেই সুভদ্রা বিব্রত ভাবে মুখ ফিরিয়ে বললে, আছেই তো! কিন্তু আমার বোঝাপড়া আপনার সামনেও হতে পারবে। চলুন,—আপনিও চলুন আমার বাসায়।

সুবোধ হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, না, আমার কাজ আছে,—আমি চললাম। —বলেই মুখ ফিরিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে সে বস্তির দিকে চলে গেল।

অরুণাংশুর নিজের মুখখানাও লাল হয়ে উঠেছিল; অপ্রতিভভাবে একটু চুপ করে থাকবার পর সে বিমলকে ডেকে বললে, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর,—আমি ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই ফিরে আসব।

তার পর সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, চল, সুভদ্রা,—তোমার সাথে আমারও একটু কথা আছে।

পথ নিতান্ত কম নয়; তবু দুজনের কারও মুখেই আর কোন কথা ফুটল না। এতকাল অনেক লোক আর অন্য একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনার আড়ালে তারা

নিজেরা যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তৃতীয় আর কোন লোক সামনে উপস্থিত নেই; বিশেষতঃ সুবোধের সকৌতুক, সহাস্য কণ্ঠের ঐ ছোট্ট কথাটিই অবশিষ্ট আবরণটুকুকেও সরিয়ে দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাটিকেই একেবারে তাদের চোখের সামনে এনে হাজির করে দিয়েছে;—আজ তার সমাধান। সেই দুপুরের মতই সুভদ্রার বুকের মধ্যে আবার যেন ঝড় উঠল; বুকের ভিতর থেকে এত কথা এক সঙ্গে ফেনিয়ে উঠতে লাগল যে সাময়িকভাবে কণ্ঠই যেন তার রুদ্ধ হয়ে গেল।

ঘরে এসে একখানা চৌকি অরুণাংশুকে এগিয়ে দিয়ে কোন একটা কথা বলবার জন্যই সে বললে, আর একটু চা খাবে?

অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে বললে, না—চা'র দরকার নেই। তুমি বোস।

মিনিটখানিক পর সোজাসুজি সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, তুমি বোধ হয় ভেবেছ যে, সুবোধকে তাড়িয়ে এখানকার ইয়ুনিয়নের উপর একচেটিয়া অধিকার আমি প্রতিষ্ঠা করতে চাই?

সুভদ্রা কুণ্ঠিতভাবে চোখ নামিয়ে উত্তর দিলে, না,—তা ভাবি নি আমি।

কিন্তু আসলে তা নয়,—সুভদ্রার উত্তরটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই অরুণাংশু বললে,—এ হচ্ছে আদর্শের সঙ্গে আদর্শের সংঘর্ষ,—কর্ম্মপন্থার সঙ্গে কর্ম্মপন্থার। ব্যক্তিগত স্বার্থ এতে আমার একটুও নেই। নিজে তো এখান থেকে চলেই যাচ্ছি আমি। আজ এসেছি কেবল তোমাদের সকলের কাছে বিদায় নিতে।

সুভদ্রা বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইল,—যে কথাটা তার কানে গেল ওর অর্থ যেন সে বুঝতে পারছে না। তার পর বুঝবার চেষ্টাই ছেড়ে দিয়ে সে মাথা নেড়ে বললে, তা কি আর জানি নে আমি,—বিমলের মত ছোট তুমি কিছুতেই হতে পার না। কিন্তু ওঁকে তো আর সে কথাটা মুখের উপর বলতে পারি নে,—তাই তোমাকেই বলতে হল।

একটি নিশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিলে অরুণাংশু; তার পর বললে, যাক্—এবারের মত কথাটা চাপাই রইল। বিমলকে আমি ভাল করে বলে যাব,—যাতে প্রতিযোগিতা করবার সকল রকম সুযোগ সুবোধ পায়। তার পর নির্ব্বাচনে বিমলকে হারিয়ে তোমরা যদি ইয়ুনিয়ন দখল করতে পার,—করো।

সুভদ্রা আবার যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল,—কিছুক্ষণ তার মুখে কথাই ফুটল না।

তার পর আবার সবেগে মাথা নেড়ে কণ্ঠস্বরে একটু অতিরিক্ত রকমের জোর দিয়েই সে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা,—সে তখন দেখা যাবে। এখন এ সব কথা থাক্। তোমার নিজের কথা আগে বল। এত দেরী হল যে তোমার?

অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, বেশী দেরী তো হয় নি—এই মাসখানিক মাত্র।

সুভদ্রা হেসে বললে, মাসখানিকও তো বড় কম সময় নয়। এত দিনের মধ্যে একখানা চিঠিও কি দিতে পারতে না?

সুভদ্রার সহাস্য চোখদুটি একেবারে অরুণাংশুর চোখের উপর গিয়ে পড়ল। প্রথমে সে কুণ্ঠিত ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু তখনই আবার সে ফিরে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসেই উত্তর দিলে, চিঠি কি আর দেব! প্রথমে তোমায় বলবার মত কোন কথা আমার মনেই আসে নি যা আগে থেকেই তোমার জানা নেই। কিন্তু কথা যখন মনে এল তখনই মনে হল যে আমার মনের প্রথম কথাটার মত এ কথাটাও নিজের মুখেই তোমায় বলতে হবে।

অকস্মাৎ সুভদ্রার দেহের অনেকখানি রক্ত এক সঙ্গে যেন তার মুখের উপর ছুটে এল। মুখ নামিয়ে অস্ফুট স্বরে সে বললে, যাও!—

পলেকের জন্য অরুণাংশুও কেমন যেন হয়ে গেল; কিন্তু তখনই নিজের শরীরটাকে বেশ জোরে একবার নাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে সে বললে, আমার কথাটা তোমায় আজ বেশ একটু শক্ত হয়েই শুনতে হবে। আমার সময়ও খুব বেশী নেই।

সুভদ্রা মুখ না তুলেই উত্তর দিলে, কি বলবে তুমি? কাল ভোরেই তুমি চিটাগাং যাবে,—এই তো? আর আজ রাত্রেই এখান থেকে? তা তো আমি শুনেইছি।

অরুণাংশু বিব্রতভাবে বললে, কেবল ঐটুকুই তো সব নয়!—

তা-ও বুঝেছি আমি,—অরুণাংশুর কথার মাঝখানেই সুভদ্রা বলে উঠল,—আবার মাসখানিকের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চাও তো? কিন্তু তার জন্য এত বড় ভূমিকার কি দরকার? বেশ, যেয়ো। কাজ থাকলে দূরে যাবে বই কি! আমি কি আর তোমার পথ আগলে দাঁড়াব?

অরুণাংশু বিব্রত ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; তার পর বসবার চৌকিখানিকে সুভদ্রার আরও একটু কাছে নিয়ে গিয়ে বললে, না, সুভদ্রা,—চিটাগাং অঞ্চলে অতদিন থাকতে হবে না আমায়। হয় তো হপ্তাখানিক পরেই আবার আমি এখানে

আসব। তার পরেও হয় তো প্রায়ই আমায় এখানে আসতে হবে। এই আসা-যাওয়ার কথাটা তেমন বড় কথা নয়। আসল কথা এই যে, এখানকার সকলের সাথে,—মানে, তোমার সাথে এবার আমার ছাড়াছাড়ি হবে।

সুভদ্রা চমকে মুখ তুলে তাকাল; তার বিব্রত মুখের উপর সলজ্জ আনন্দের যে বিচিত্র হাসিটুকু চটুল ছন্দে নেচে বেড়াচ্ছিল তা হঠাৎ যেন একেবারে নিষ্প্রাণ ও নিশ্চল হয়ে গেল। বিহ্বল চোখে অরুণাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কতকটা প্রতিধ্বনির মতই বললে, ছাড়াছাড়ি হবে!—

মানে,—চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে অরুণাংশু উত্তর দিলে,—দেখা আর হবে না তা নয়; সাময়িক ভাবে ভিন্ন পথেও যদি তুমি চল, তবু আমরা সাথীই থাকব; আমাদের সৌহার্দ্যও আশা করি অটুট থাকবে। সব চেয়ে বড় কথা, আমাদের হৃদয়ের সঞ্চয়ের পাত্র দুটো স্মৃতির মধুতে কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হয়েই থাকবে। তবু ছাড়াছাড়ি আমাদের হবেই। সেই কথাটাই নিজের মুখে তোমায় বলে তোমার কাছে আমি বিদায় নিতে এসেছি।

নিশ্চল ও বিবর্ণ হয়েও তখনও যে হাসিটুকু সুভদ্রার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল, এবার তা-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার মুখে কোন কথাই ফুটল না; তার পর দুর্ব্বল, ক্ষীণ কণ্ঠে টেনে টেনে সে বললে, বাবা-মা'র মত হল না বুঝি?

অরুণাংশু আবার নড়ে বসল; তার পর কণ্ঠস্বরে একটু অতিরিক্ত জোর দিয়েই সে বললে, না, সুভদ্রা, সে কথা নয়। তাদের মতামত মোটে জিজ্ঞেসই করি নি আমি,—করবার দরকারই হয় নি। তার আগেই নিজের মনেই আমি বুঝেছি যে, আমরা দুজনে পরস্পরের কাছ থেকে যা পেয়েছি, মনের মধ্যে সেই অমূল্য সম্পদটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই এবার পরস্পরকে আমাদের ছাড়তে হবে।

তার মানে?—সুভদ্রা বিহ্বল স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

সুভদ্রার চোখের দিকে চেয়েই অরুণাংশু উত্তর দিলে, তার মানে আজ স্পষ্ট করেই তোমায় বলব। তোমার কাছ থেকে আর কিছুই নিতে পারব না আমি, কারণ তোমায় দেবার মত আর কিছুই আমার নেই!

একটু চুপ করে থেকে সে দৃঢ়তর স্বরে আবার বললে, আমি আর তোমায় ভালবাসি নে।

সুভদ্রা এমন ভাবে চমকে উঠল যেন হঠাৎ কে তার মুখের উপর সপাং করে এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিয়েছে। মাথাটা পিছনে সরিয়ে সে প্রায় আর্ত্ত কণ্ঠে বলে, উঠল, কি বললে? তুমি আমায় ভালবাস না?

অরুণাংশু চোখ ফিরিয়ে নিলে; কিন্তু অকম্পিত, গম্ভীর স্বরেই সে উত্তর দিলে, না, বাসি নে। তোমায় আমি প্রতারণা করতে পারব না,—তাই সত্য কথা নিষ্ঠুর হলেও স্পষ্ট করেই আমি বলেছি।

কিন্তু কি বলছ তুমি?—সুভদ্রা উদ্‌ভ্রান্তের মত বললে,—তুমি আমায় ভালবাস না? ভালবাস নি কোন দিন? এতদিন কি হচ্ছিল তবে? অভিনয়?—সাময়িক মোহের ক্ষণিক একটা বিকার? লালসার উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা? আগাগোড়া তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে এসেছ?

কথা তো নয়, যেন আগ্নেয়গিরির গর্ভ থেকে গলিত ধাতুস্রোত ছুটে বের হচ্ছে। তরঙ্গিত, গাঢ়, তপ্ত, তরল ধারার মত প্রশ্নের পর প্রশ্নের আঘাতে অরুণাংশু যেন অভিভূত হয়ে পড়ল। সুভদ্রা নীরব হবার পরেও দুতিন সেকেণ্ড কাল তার মুখে কোন কথাই ফুটল না। তার পর ভিখারীর মত কাতর, মিনতিভরা চোখে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে সে করুণ স্বরে বললে, না, সুভদ্রা, ফাঁকি আমি তোমায় দিই নি। বরং আগে তোমায় ফাঁকি দিই নি বলেই আজও ফাঁকি দিতে পারছি নে। মোহ বল, উন্মত্ততা বল, লালসা বল,— হয় তো এ সবই আমার ভালবাসায় ছিল। এ সব ছাড়াও মেয়ে-পুরুষের আপনহারা ভালবাসার স্বতন্ত্র, খাঁটি একটা সত্তা যে আছে, তা আমার মোটে জানাই নেই। কিন্তু আমার ভালবাসা ভালবাসার অভিনয় নিশ্চয়ই ছিল না,—সেদিন ভাল আমি তোমায় সত্যি বেসেছিলাম।

আর আজ?—সুভদ্রা অস্ফুট, কম্পিত স্বরে বললে,—আজ আর আমায় তুমি ভালবাস না?

অরুণাংশু মাথা নেড়ে উত্তর দিলে,—না। সেদিন তোমায় আমি ভালবেসেছিলাম এ কথা যত সত্য, আজ যে তোমায় ভালবাসি নে, এ কথাও তাই। অতীতের সত্য বর্ত্তমানে মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। সেদিনের ভালবাসা আজ আর নেই।

কেন?

অদ্ভুত এক রকমের হাসি হেসে অরুণাংশু বললে, তা তো জানি নে! যেদিন ভালবেসেছিলাম সেদিনও তার কারণটা বুঝতে পারি নি; আর আজ সেই

ভালবাসাই কেন যে শেষ হয়ে গেল সে তত্ত্বও বুঝতে পারলাম না। তবে সেদিন কারণটা না জেনেও যে মন নিয়ে ভালবাসার আবির্ভাবকে উপলব্ধি করেছিলাম, আজ সেই মন দিয়েই তেমনি নিঃসংশয়েই তার তিরোধানের সত্যটাও উপলব্ধি করছি।

সুভদ্রা সহসা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দুই হাত দিয়ে অরুণাংশুর ডান হাতখানা চেপে ধরে সনির্ব্বন্ধ স্বরে বললে, বল তুমি,—রাগ করেছ? ইয়ূনিয়নের ব্যাপারে তোমার মতে আমি মত দিতে পারি নি বলে আমার উপর রাগ করেছ তুমি?

অরুণাংশু বিব্রত ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে; খোলা জানালা দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড কাল সে বাইরের দিকে চেয়ে রইল; তার পর আবার মুখ ফিরিয়ে নিজের মুক্ত হাতখানা আলগোছে সুভদ্রার হাতের উপর রেখে বিষণ্ণ, মৃদু স্বরে সে বল্লে, না, সুভদ্রা তা নয়। রাগ বা অভিমানের ব্যাপার এ নয়,—বাইরের ব্যাপারই নয় এটা। হউক না মতের অমিল,—তবু তো সুবোধ আমার বন্ধুই রয়েছে! প্রতিদ্বন্দিতা যত তীব্রই হউক না কেন, তবু আশা করি যে, সে আমার বন্ধুই থাকবে। তোমায়ও তো বলছি যে, ঝড়-ঝাপ্‌টা যতই লাগুক না কেন, বাইরের সম্বন্ধে যা তুমি আমার ছিলে তাই রয়েছ,—তেমনি সহকর্ম্মী, তেমনি সুহৃদ, হয় তো সাথীও। ভবিষ্যতেও তুমি তাই থাকবে।

তবে কেন ভয় দেখাচ্ছ আমায়?—কম্পিত দেহটির সকল ভারই যেন অরুণাংশুর হাতের উপর ছেড়ে দিয়ে কম্পিত কণ্ঠেই সুভদ্রা বললে,—তবে কেন বলছ যে ছাড়াছাড়ি হবে?

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরলে অরুণাংশু; কিন্তু তখনই ছেড়ে দিয়ে সে আগের চেয়েও মৃদু স্বরে বললে, সুভদ্রা,—কেবল মানুষই তো তুমি নও—তুমি যে মেয়ে!—

তাতে কি হয়েছে?—সুভদ্রা বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলে।

একবার ঢোক গিলে অরুণাংশু উত্তর দিলে, মানে,—তোমার আর আমার মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠছিল সে তো কেবল শ্রদ্ধা আর সৌহার্দ্দ্যের সম্বন্ধই নয়,—সে যে ভালবাসা,—সে তো ছিল ঢের বেশী মধুর,—গভীরতর স্তরের জিনিষ।

সুভদ্রা বললে, 'ছিল' কেন বলছ তুমি?

অরুণাংশু উত্তর দিলে, তা যে আর নেই!—

নেই !—

না।

তবে যে বললে—

আমি বলছি যে হৃদয়ের বহিপ্র্াঙ্গণে মানুষের সাথে মানুষের যে বিরাট মিলন-ক্ষেত্র আছে সেখানে আগেও যা তুমি ছিলে এখনও তা-ই আছ। কিন্তু ভিতরে মেয়েপুরুষের গভীর, নীবিড় মিলন যেখানে হয় সেই প্রাঙ্গণে আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি,—সেখানে তুমি আর নেই।

কেন ?

অরুণাংশু নড়ে বসল ; কিন্তু তার পর ধীর, গম্ভীর স্বরেই সে বললে, তা আমি জানি নে। তবে এটুকু আমি নিঃসংশয়েই বুঝেছি যে, আজ যদি শ্রদ্ধা আর সৌহার্দ্দ্যের সীমারেখা ডিঙিয়ে আগের মত নীবিড়ভাবে তোমায় আমি লাভ করতে চাই, তবে তা-ই হবে—ঐ যা তুমি বলছিলে—ভালবাসার অভিনয়,—হয় তো তার চেয়েও কুৎসিৎ,—অমার্জ্জনীয় ব্যভিচার।

শুনতে শুনতে সুভদ্রার মুখখানা একেবারে মরার মুখের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। অরুণাংশু সবিস্ময়ে দেখলে যে একটু আগেই সুভদ্রার যে ঠোঁট দুখানি অবরুদ্ধ আবেগে থর থর করে কাঁপছিল, তা একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়েছে ; চোখে পলক নেই ; নিশ্বাস পড়ছে কি না, বোঝা যায় না ; একটু আগেই সুভদ্রার যে হাত দুখানা ব্যাকুল আগ্রহে তার নিজের হাতখানিকে চেপে ধরেছিল, তারই শিথিল মুঠার মধ্যে সেই হাত দুখানিই একেবারে যেন কাঠের মত শক্ত ও স্থির হয়ে গিয়েছে।

সুভদ্রার হাতের উপর জোরে একটা চাপ দিয়ে অরুণাংশু শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলে, সুভদ্রা, শুভা, কি হল তোমার ?

দুতিনবার ডাকবার পর সুভদ্রা চমকে উঠল,—ঠিক যেন মূর্চ্ছা ভেঙ্গে জেগে উঠেছে সে। তার বিহ্বল চোখদুটি ঘুরতে ঘুরতে অরুণাংশুর চোখের সঙ্গে গিয়ে মিলতেই হঠাৎ যেন তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ; এক ঝটকা টানে নিজের হাতখানাকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে অস্ফুট স্বরে সে বললে, না, কিছু হয় নি।

অরুণাংশু আশ্বাস পেলে না ; অপরাধীর মন কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, রাগ করলে, সুভদ্রা ?

রাগ!—সুভদ্রা হঠাৎ যেন উদ্ভ্রান্তের মত হেসে উঠল,—রাগ কেন করতে যাব? আর রাগ করবই বা কার উপর,—তোমার?

একটু চুপ করে রইল অরুণাংশু; তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, রাগ তুমি নিশ্চয়ই করেছ। তবু একটু শান্ত হয়ে যদি ভেবে দেখ তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে যে, জীবনে ঠিক এই রকমই হয়ে থাকে। মানুষের স্থূল দেহটা এক বারের বেশী মরে না নিশ্চয়ই, কিন্তু তার আসল যে সত্ত্বা, জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে অনেকবার তার মৃত্যু হয়, প্রতি বার মৃত্যুর পরেই তার আবার পুনর্জ্জন্মও হয়। একটা জীবনের মধ্যেই এক জন মানুষ একাদিক্রমে হয়তো দশটা জীবন যাপন করে।

অন্ধকারে শাণিত ছুরির ফলার মতই অল্প একটু হাসি সুভদ্রার চোখের কোণে ঝক্ ঝক্ করে জ্বলে উঠল; মুখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, তা কি আর জানি নে আমি! চোখের সামনেই সে সত্যের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রয়েছে যে!

উত্তরে অরুণাংশু কুণ্ঠিত ভাবে কি একটা কথা বলবার উপক্রম করতেই সুভদ্রা হাসি থামিয়ে গর্ব্বিত, গম্ভীর স্বরে বললে, কিন্তু এত বিনিয়ে বিনিয়ে কৈফিয়ৎ কেন দিচ্ছ তুমি? কে চেয়েছে তোমার কৈফিয়ৎ? যা বলেছ তা-ই যথেষ্ট। তোমার কাজ রয়েছে,—তুমি এখন যাও। কোন ভয় নেই তোমার। আমি রাগও করব না, দুঃখও করব না। তোমার সম্পত্তির উপর আমার কোন লোভ নেই,—তোমার ঐ দেহটার উপরেও নয়! চোখের জলে তোমার পা দুখানিকে ভিজিয়ে দিয়ে আমি তোমায় সাধতে যাব না; পাগল হয়ে নাটুকে ধরণের কিছু একটা কাজ করে বসে তোমায় আমি কোন বিপদেও ফেলব না। মা-বাপ-ভাই-বোন সবাইকে বাদ দিয়েও যে সুভদ্রা খালি নিজের পায়ের জোরে মাথা খাড়া করে জীবনের পঁচিশটি বছর পার হয়ে আসতে পেরেছে, সে আজ তোমায় হারিয়েই আশ্রয়চ্যুতা লতার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না।

অরুণাংশু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল; হাসবার চেষ্টায় মুখখানাকে বিকৃত করে নীরস, জড়িত স্বরে সে বললে, আজ আর নয়, শুভা,—তুমি বড় বেশী উত্তেজিত হয়েছ। আজ আমি তোমায় কিছুই বোঝাতে পারব না। কিন্তু দিনসাতেক পরেই তো আবার আমি এখানে ফিরে আসছি,—সেই দিন আবার কথা হবে।

কথাগুলি বোধ করি সুভদ্রার কানেও গেল না। কখন যে অরুণাংশু বের হয়ে গেল তা-ও বোধ করি সে জানতে পারলে না। সে যেমন ছিল তেমনি বসে রইল,—ঠিক যেন পাথরের মূর্ত্তি,— হাতপাগুলি নিস্পন্দ, অসাড়; চোখ ছুটি খোলা, কিন্তু তাতে দৃষ্টি নেই। সামনেই মাঠ। অদূরে গঙ্গা। অপরাহ্নের আলো জলের বুকে সোনা দিয়ে আলপনা এঁকে দিয়েছে। ওপারে প্রকাণ্ড একটা কারখানাবাড়ীর পিছনে উঁচু একটা গাছের কচি পাতাগুলি উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে ঝলমল করে জ্বলছে। কারখানার অমন যে কুৎসিৎ, কালো চিমনিটি, তারও গায়ে যেন আবিরের ছোপ। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর থেকেই সবই দেখা যায়। অথচ এ সবের কিছুই আর সুভদ্রার চোখে পড়ল না। পিছনে ওদের নিজেদের কারখানার কলের বাঁশীতে ভোঁ-ওঁ-ওঁ করে ছুটির ঘণ্টা বাজল। পিপীলিকার সারির মত মজুরেরা ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। দূর সমুদ্রের কলকল্লোলের মত তাদের আনন্দোচ্ছল কণ্ঠের কোলাহল ধ্বনিতে আকাশ ও বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। কিন্তু সে সব শব্দও সুভদ্রার কানে গেল না। সংসারটা তখন তার চৈতন্য থেকে একেবারে যেন অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের যে বিচিত্র জগৎটা সেদিন সকালেই তার মনটাকে অত জোরে দোলা দিয়ে সজীব করে তুলেছিল, সেই জগৎটাকে ছেড়ে, তার নিজের দেহটাকেও ছেড়ে সে যেন কোন সুদূরের আর একটা জগতে চলে গিয়েছে।

আধ ঘণ্টাখানিক পর ঝি এসে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে দোরের কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের স্বরে বললে, এ কি, দিদিমণি—এমন ভাবে বসে রয়েছ যে! কি হয়েছে?

চমকে উঠল সুভদ্রা; শরীরটাকে খুব জোরে নাড়া দিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, না, কিছু হয় নি;—বলেই মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে সে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বিস্মিতা ঝি রান্নাঘরে গিয়ে একেবারে থ হয়ে গেল,—ভাতের হাঁড়িতে আধ-সেদ্ধ ভাত, মেঝের উপর উচ্ছিষ্ট থালায় অর্দ্ধেকেরও বেশী ভাত ছোঁয়াও হয় নি; একটা গোটা সেদ্ধ আলু থালা থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়েছে; আর একখানা থালায় অব্যবহৃত কোটা তরকারিগুলি শুখিয়ে বিবর্ণ হয়ে রয়েছে;

ঘরের কোণে খোলা মাছের বাটিটার উপর কালো হয়ে মাছি জমে আছে। ঘরময় পচা মাছের দুর্গন্ধ,—নাকে কাপড় না দিয়ে দাঁড়ানোই প্রায় অসম্ভব। ঝি দাঁড়ালও না।

সুভদ্রার ঘরের বাইরে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে সে রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, এ কি, দিদিমণি,—দুপুরে রাঁধ নি তুমি?

সুভদ্রা বিব্রত স্বরে উত্তর দিলে, না, ঝি; সময় পেলাম কোথায় যে রাঁধব? হঠাৎ এমন কাজ পড়ে গেল!—

কাজ না হাতী!—ঝি ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল,—কাজের জন্য জানটা খোয়াবে নাকি তুমি? অত সখ করে মাছ আনতে বললে,—তা-ও তো পড়ে রয়েছে।

সুভদ্রা উত্তরে বললে, হ্যাঁ,—সময় পাই নি রাঁধবার। ধুয়ে দিয়ে যাও,—এ বেলায় রাঁধব'খন।

ঝি নিজের কপালে করাঘাত করে বললে, ওমা—রাঁধবে কি আমার মাথা! কাটা মাছ,—পচে ভর ভর করছে যে!—

তবে ফেলে দাও গে,—বলে সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

ধোয়ামোছার কাজ শেষ করে ঘণ্টাখানিক পর আবার যখন ঝি সুভদ্রার ঘরে এসে উপস্থিত হল তখনও সে জানালার ধারে চুপ করে বসে রয়েছে। কিছুই বুঝতে না পেরে ঝি উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, শরীরটা কি তোমার ভাল নেই, দিদিমণি?

সুভদ্রা আবার যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল; তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বরে একটু অতিরিক্ত জোর দিয়েই সে বললে, না, না,—বেশ ভাল আছি আমি।

একটু ইতস্ততঃ করে ঝি বললে, এবেলার রান্নাটা করে দিয়ে যাব আমি?

সবেগে মাথা নেড়ে সুভদ্রা উত্তর দিলে, না, দরকার নেই,—আমি নিজেই রাঁধব'খন। তুমি এখন যাও।

সেটা রাঁধবার আগ্রহে নয়,—ঝিকে বিদায় করে নিজে একা হবার জন্য। রাঁধা দূরে থাক্,—রান্নাঘরের ধার দিয়েও সে গেল না। ঝি চলে যেতেই সে সদর দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে; জানালাও একটিও সে খোলা রাখলে না। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। কিন্তু আলোর সুইচটা একবার টিপে

দিয়েই তাড়াতাড়ি নিজের চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে সে আলোটা আবার নিভিয়ে দিলে। তার পর হাতরে হাতরে চৌকিখানার সন্ধান করে তারই উপর নির্জ্জীবের মত সে বসে পড়ল।

একেবারে অসাধারণ অবস্থা তার,—এমন আর আগে কোন দিনই হয় নি। দেহ অবসন্ন,—বুকের ভিতরটা একেবারে খালি। সেই যে পায়ের কাছে অন্ধকার গর্ত্তটা এতদিন বার বার হাঁ করে তাকে কেবল ভয় দেখিয়েছে, তারই ভিতরে তার নির্জ্জীব, অনুভূতিসর্ব্বস্ব দেহটা কেবলই যেন নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। পড়ার পথে ক্ষণেকের জন্ম আঙ্গুলের ডগাটুকু দিয়েও ছোঁবার মত সামান্য অবলম্বন টুকুও নেই,—তলও নেই। পড়া যেন আর শেষ হয় না।—

দুঃখ তার আগেও ছিল। সেই অরুণাংশুর চলে যাবার দিনটি থেকেই সুরু করে সম্পূর্ণ একটি মাস এক দিনও সে শান্তিতে কাটাতে পারে নি,—ভাত মুখে রোচে নি, বিছানায় শুয়ে তার গায়ে কাঁটা ফুটেছে, বুকের ভিতরে অনবরত ঢিব ঢিব করেছে, নিদ্রা ও জাগরণনির্ব্বিশেষে প্রায় সব সময়েই চোখের সামনে সে শত রকমের বিভীষিকা দেখেছে। এত দিন তার দুঃখ ও আশঙ্কার অন্ত ছিল না। তবু এত দিন ঐ সঙ্গে তার আশাও ছিল; বুকভাঙ্গা দুঃখের মধ্যেও ছিল পথ চাওয়ার আনন্দ। নির্জ্জনে ঘরের মধ্যে তার বুকের ভিতর থেকে কান্না যখন উথলে উঠেছে, তখনও মনে মনে অভিমান করে সে এক অনির্ব্বচনীয় পুলকের শিহরণ উপভোগ করেছে।

কিন্তু জীবনের সেই পরম ও চরম অবলম্বনটুকুও আজ আর তার নেই।

অরুণাংশু নিজের মুখেই তাকে বলে গিয়েছে যে, সে আর তাকে ভালবাসে না। একেবারে স্পষ্ট উক্তি,—নিরেট, কঠিন সত্য কথা;—ওর মধ্যে কোথাও ছুঁচের ছিদ্রের মত অতি সূক্ষ্ম এমন একটা ফাঁকও কোথাও নেই যার ভিতর দিয়ে আশার আলোকের ক্ষীণ একটি রেখা এসেও তার মনের কোন একটি কোণকেও রাজিয়ে, তাতিয়ে তুলতে পারে। আজ আর প্রতীক্ষা নেই, অভিমান নেই, অভিযোগ করবারও উপায় নেই,—কোন সম্বলই আজ আর তার নেই। অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক আঘাতের বেদনা, ব্যর্থতার গ্লানি, প্রত্যাখ্যানের অপমান আর সকলের উপরে অননুমোদিত মাতৃত্বের নিদারুণ লজ্জা নিয়ে এবার তাকে বিশ্বজনের কৌতূহল আর ধিক্কারভরা দৃষ্টির সামনে একেবারে নিঃস্ব ও নগ্ন হয়েই দাঁড়াতে হবে।

অন্ধকার—চারিদিকে ঘনীভূত অন্ধকার। নিশ্বাসে নেবার জন্য একটু হাওয়াও যেন জগতে নেই।

অন্ধকারে সুভদ্রা পাথরের মূর্ত্তির মত অচল হয়ে বসে রইল। আজ তার চোখ দিয়ে এক ফোটা জলও পড়ল না।

একা ঝি-ই নয়,—সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। পরদিন সুভদ্রা কাজ কামাই করলে; খবর পাঠিয়ে দিলে যে, তার শরীর ভাল নেই। তার পরদিন অবশ্য সে সময়মতই হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হল, কিন্তু সে যেন একেবারে আর এক মানুষ। মুখে হাসি নেই, কাজে আগের সেই তৎপরতা নেই। মুখের ভাবে কেমন যেন একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য; নিষ্প্রভ চোখ দুটিতে কেমন যেন একটা উদাসীন ভাব,—সে মুখের দিকে চাইলেই যেন ডর লাগে। কাজ করে যাচ্ছে, যেন একটা যন্ত্র। কাজে যে মন নেই তা সহজেই চোখে পড়ে। কথা বলতে বলতে তার কথার খেই হারিয়ে যায়; কাজ করতে করতেও এক এক সময়ে তার হাত দুখানা একেবারে নিশ্চল হয়ে যায়। বাইরে যাওয়া সে একেবারে ছেড়ে দিলে,—হাসপাতালের কাজ হয়ে গেলেই সে বাসায় ফিরে যায়। সে বাসাতেও বাইরে যখন তালা খোলে না তখন ভিতর থেকে দোর বন্ধ থাকে,—অধিকাংশ সময়েই সব কটি জানালাও।

হাসপাতালের বড় ডাক্তার চৌধুরীসাহেব কড়া লোক, কিন্তু অবুঝ নন। অন্যান্য অনেকের মত তিনিও সুভদ্রাকে স্নেহের চোখে দেখেছিলেন। সুভদ্রার পরিবর্ত্তনটা তাঁরও চোখ এড়াল না। তিন-চার দিন পর তাকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বেশ একটু উদ্বিগ্ন স্বরেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শরীরটা কি খুব বেশী খারাপ হয়েছে, নার্স ?

সুভদ্রার বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে অস্ফুট স্বরে সে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, স্যার।

ডাক্তার চৌধুরী কোমল স্বরে বললেন, আশ্চর্য্য নয়,—অনেক দিন যাবৎই তোমার মধ্যে আমি একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছি। বড্ড বেশী খাটছ তুমি,—যেমন এখানে তেমনি বাইরে। আমার মতে কিছু দিন তোমার বিশ্রাম করা দরকার।

সুভদ্রা আগের চেয়েও মৃদু স্বরে বললে, হ্যাঁ, স্যার।

একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার চৌধুরী বললেন, তোমার তো অনেক ছুটি পাওনা

হয়েছে। চাও যদি, দুএক মাসের ছুটি তোমায় দেওয়াতে পারি। এই সময়ে আমার হাতে দুএকটি নার্স আছে,—এখানকার কাজ আমি এক রকমে চালিয়ে নিতে পারব।

সুভদ্রা উত্তরে বললে, আমি ভেবে দেখব, স্যার।—বলেই নমস্কারটুকু পর্য্যন্ত না করে সে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গেল।

তার পরিবর্ত্তনটা সব চেয়ে বেশী যার চোখে পড়ল, সে সুবোধ। সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল,—ঠিক সুভদ্রার জন্য ততটা নয়, যতটা এই ব্যাপারে তার নিজের একটা দায়িত্ব কল্পনা করে। সে অনুমান করলে যে, সুভদ্রার পরিবর্ত্তনের কারণ অরুণাংশু; আর আন্দাজ করলে যে, সুভদ্রা অরুণাংশুকে সমর্থন না করে তার মতে মত দিয়েছে বলেই অরুণাংশুর সঙ্গে তার একটা গুরুতর মনোমালিন্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার মুশকিল হল এই যে, কথাটা সুভদ্রাকে সে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করতে পারলে না। এ নিয়ে আগের মত পরিহাস করতে তার মোটে সাহসই হল না। সুভদ্রার বিষণ্ণ, গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে তার মনে হতে লাগল যে, তার ঐ গাম্ভীর্য্য দিয়েই সুভদ্রা তার নিজের চারিদিকে এমন একটা দেয়াল তুলে রেখেছে যাকে অতিক্রম করে তার কাছে ঘেঁষবারও উপায় নেই। দুতিনবার ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর সে মনে মনে ঠিক করলে যে অরুণাংশু ফিরে এলে এবার সে তারই সঙ্গে সুভদ্রার কথা নিয়ে সোজাসুজি আলাপ করবে।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে অরুণাংশু ফিরে এল না, তার পরদিনও নয়। উদ্বিগ্ন হয়ে সুবোধ বিমলকে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি, বিমল?

বিমল কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলে না,—সে নিজেও কোন সংবাদ পায় নি। বললে, সুভদ্রাদিকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না,—তিনি যদি কোন খবর পেয়ে থাকেন।

কিন্তু বিশেষ করে অরুণাংশুরই সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার জন্য সুভদ্রার কাছে যেতে সুবোধের মোটে সাহসই হল না। অনেক ভেবেচিন্তে পরদিন বৈকালে নিজেই সে কলিকাতায় চলে গেল। সুভদ্রা দূরে থাক্, বিমলকেও সে কিছু জানালে না।

সে ফিরে যখন এল তখন বেশ রাত হয়েছে। ময়দান খালি। বড় রাস্তাতেও যান-বাহন-লোক-জনের যাতায়াত কমে এসেছে। দোকানগুলির বন্ধ হয় হয় অবস্থা। পরদিন কারখানায় কাজ আছে; কাজেই বস্তি বা ব্যারাকে হৈ চৈ একেবারেই নেই। অনেকেই এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুবোধ ময়দানের মাঝখানেই একা একাই অনেকক্ষণ পায়চারি করে বেড়াল। সেদিন শুক্লপক্ষের ষষ্ঠি কি সপ্তমী তিথি। বাঁকা চাঁদ তখন পূবের দিকে গাছপালার নীচে অনেকখানি হেলে পড়েছে। তবু ওরই ফিকে আলোকেই চারিদিকের সবই দেখা যায়। অদূরে হাসপাতাল,—ভিতরে আলো নেই; তবে সাদা বাড়ীখানা জ্যোৎস্নার আলোকে ধব ধব করছে। পাশেই সুভদ্রার বাসাবাড়ী। ভিতরে কোথায় বুঝি একটা আলো জ্বলছে,—ময়দান থেকে তার আভাষ পাওয়া যায় মাত্র। সেই দিকে চেয়ে সুবোধ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল; তার পর বেশ জোরে জোরেই পা ফেলে সে সেই দিকে চলে গেল।

দোরে করাঘাতের শব্দ পেয়ে ভিতর থেকে সুভদ্রা ঈষৎ বিস্মিত, ঈষৎ সন্ত্রস্ত স্বরে বললে, কে?

আমি সুবোধ।

সশব্দে দোর খুলে গেল; ভিতর থেকে অনেকখানি আলোক গিয়ে পড়ল সুবোধের মুখের উপর। দুই হাতে দুই চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা বিস্মিত স্বরে বললে, ব্যাপার কি, সুবোধবাবু?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আপনার সাথে আমার একটু কথা আছে।

এত রাত্রে?

সুভদ্রার আরও একটু কাছে এগিয়ে এসে সুবোধ বললে, আমি আপনার বন্ধু, সুভদ্রাদেবী।

চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সুভদ্রা বললে, তা জানি,—আসুন আপনি।—বলতে বলতেই সে হাত সরিয়ে পথ ছেড়ে দিলে।

সুবোধ ঘরে ঢুকবার পর সুভদ্রা নিজের হাতেই দোর বন্ধ করে দিয়ে আবার বললে, চলুন,—ও ঘরে গিয়ে বসি।

সুভদ্রার শোবার ঘরেই দুখানি চৌকিতে দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসল।

দুএকটি কৈফিয়তের ও কয়েকটা অবান্তর কথা বলে, খানিকটা ইতস্ততঃ করে অবশেষে সুবোধ কথাটা বলেই ফেললে, এই মাত্র কলকাতা থেকে আসছি,—অরুণাংশু শুনলাম 'তার' পেয়ে আবার এলাহাবাদ চলে গিয়েছে।

সুভদ্রা চমকে উঠেছিল, কিন্তু মুখ নামিয়ে বললে, তা হবে।

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, আপনাকে বলে যায় নি কিছু ?

অধিকতর কুণ্ঠিত স্বরে সুভদ্রা উত্তর দিলে, না।

কিন্তু পরক্ষণেই মুখখানাকে হাসবার মত করে সে আবার বললে, বলে যাবার কথাও তো নয়,—আপনাদেরও তো কিছু বলে যান নি তিনি।

বিব্রতের মত একটু হেসে সুবোধ বললে, আমরা আর আপনি কি এক পর্য্যায়ের ?

তা নয় তো কি !

কি যে বলেন !—

কিন্তু সেটা সুবোধের মনের কথা নয়। যে শুকনো হাসিটুকু তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছিল তা কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল। তার মনের মধ্যে জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্কোচের যে দ্বন্দ চলছিল, তার ছায়া ফুটে উঠল তার মুখের উপর। শেষ পর্য্যন্ত একটা ঢোক গিলে সঙ্কোচটাকে চাপা দিয়ে মনের কথাটা সে বলেই ফেললে, কদিন থেকেই আমার মনে কেমন সন্দেহ হচ্ছে। আজ সেটা এত বেড়ে গিয়েছে যে প্রকাশ না করে আর থাকতে পারছি নে। আপনাদের দুজনের মধ্যে কি কোন গোলমাল হয়েছে ?

সুভদ্রার সারা শরীরটাই থর থর করে কেঁপে উঠল। ওটা ঢাকবার জন্যই যেন সে নড়ে বসল ; আর ঐ গতির মধ্যেই বললে, কৈ—না তো !—

তার মুখের দিকে চেয়েই সুবোধ বললে, আপনার কথাটা বিশ্বাস করতে পারলেই আমি খুশী হতাম, সুভদ্রাদেবী। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, ইতিমধ্যে কিছু একটা ঘটনা আপনাদের মধ্যে ঘটেছে যা সহজও নয়, সুন্দরও নয়।

সুভদ্রা মুখ তুললে না, কিন্তু উত্তরে বললে, না,—ঘটবে আর কি !—

একটু চুপ করে রইল সুবোধ ; তার পর বিষণ্ণ, গম্ভীর স্বরে বললে, আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপারে বাইরের কোন লোকের কোন কথা বলতে যাওয়াই ধৃষ্টতা। কিন্তু আমি তো ঠিক বাইরের লোক নই ! আর—তাছাড়া—আমার কেমন মনে হচ্ছে যে, গোলমালের কারণ হয়েছি হয় তো আমি নিজে। তাই—

না, সুবোধবাবু,—সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললে,—তা মোটেই নয়। আপনার কোন কথাই এতে নেই। মিছামিছি মন খারাপ করবেন না আপনি। যা ঘটেছে

তা পুরোপুরিই আমাদের দুজনের ব্যাপার। আর কারও কোন কথাই এতে নেই।

সুবোধ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ; তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, আমার বুঝতে তাহলে ভুল হয় নি, সুভদ্রাদেবী,—গোলমাল কিছু একটা হয়েছে-ই। সেটা কি, জানতে পারি নে আমি? আমি তো আপনাদের পর নই—যদি কিছু করতে পারি!—

সুবোধের কথা, বিশেষ করে তার কণ্ঠের স্বর—একেবারে যেন সোজা গিয়ে সুভদ্রার হৃদয় স্পর্শ করলে। বুকের ভিতরটা তার সহসা আলোড়িত হয়ে উঠল। এত দিন নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যেন ঠিক এই জিনিষটিই কামনা করেছে। শুষ্ককণ্ঠ চাতক বৃষ্টিধারাকে যেমন করে চায়, তেমনিভাবে এই সমবেদনাই সে চেয়ে এসেছে,—এমনি একজন সমব্যথী যার কাছে মনের কথা মুখ ফুটে প্রকাশ করে চোখের জলের ভিতর দিয়ে বুকের ব্যথা খানিকটা অন্ততঃ সে বের করে দিতে পারে।

কিন্তু মুখে তার কথা ফুটল না। কেবল একটা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন যেন তার বুকের ভিতর থেকে কণ্ঠের কাছে ঠেলে উঠতে লাগল।

উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুবোধ আবার বললে, বিশ্বাস করতে পারবেন না আমায়? আমি তো আপনার বন্ধু!—

সুভদ্রা নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। এবার তার দুই চোখ ফেটে বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু তার দুই গালের উপর গড়িয়ে পড়ল। গাঢ় স্বরে সে বললে, কি বলব, সুবোধবাবু? সবই তো আপনি দেখেছেন,—আপনি নিজেই তো জানেন যে, তিনি চলে গিয়েছেন।—

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমি গোলমালের কথাটা জিজ্ঞেস করছিলাম, সুভদ্রাদেবী।

সুভদ্রা বললে, গোলমাল আর কি!—চলে গিয়েছেন, এই তো আসল কথা। এর চেয়ে বড় গোলমাল কি আর হবে!—

অন্ধকারে বিজলির ঝলকের মত সুবোধের মনের পটে একটা সন্দেহ খেলে গেল। চমকে উঠল সে। নিতান্ত অকারণেই মাথার চুলের ভিতর দিয়ে ডান হাতের অস্থির আঙুলকটিকে এক বার চালিয়ে দিয়ে সুভদ্রার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে সে বললে, চলে গিয়েছে!—এ কি বলছেন আপনি?—

আঁচলের একটি কোণ দিয়ে সুভদ্রা চোখের কোণ ছুটি মুছে ফেললে; তার পর মুখ তুলে বললে, হ্যাঁ,—চলেই তিনি গিয়েছেন। লুকিয়ে যান নি, কিছু গোপন করেও যান নি। সে দিন খুব স্পষ্ট করেই তিনি আমায় বলে গিয়েছেন যে, তাঁর এবারের যাওয়াটা বরাবরের আসা-যাওয়ার মত যাওয়াই কেবল নয়,—এবারের এটা সত্যিকারের যাওয়া।

তার মানে?

তার মানে, নিজের মুখেই তিনি আমায় বলে গিয়েছেন যে, এবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হল।

সুবোধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, বাড়ীতে ওঁর বাপ-মায়ের মত হয় নি বুঝি?

সুভদ্রা সহসা উদ্ভ্রান্তের মত শব্দ করে হেসে উঠল; বললে, ঠিক ঐ কথাই আমারও মনে উঠেছিল, সুবোধবাবু; তাকে মুখ ফুটে জিজ্ঞেসও করেছিলাম,—পোড়া মনের আশা কি কখনও যায়! কিন্তু তাতে কেবল নূতন করে ঘা'ই খেতে হল।

একটু চুপ করে থেকে সে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে আবার বললে, না, আর কারও মতামতের কথা এতে নেই। অমত হয়েছে তার নিজের। খুব স্পষ্ট করেই তিনি বলে গিয়েছেন যে, আমায় তিনি আর ভালবাসেন না।

ভালবাসেন না!—সুবোধ প্রতিধ্বনির মত বলে উঠল।

মুখ ফিরিয়ে সুভদ্রা বললে, না,—তাঁর ভালবাসার শেষ হয়ে গিয়েছে।

প্রায় এক মিনিট কাল সুবোধের মুখে কোন কথা ফুটল না; কিন্তু তার পর হঠাৎ সে সোজা হয়ে বসে বললে, স্কাউণ্ড্রেল!—

কথা তো নয়, যেন একটা বোমা ফাটল। সুভদ্রা চমকে ফিরে তাকাল তার মুখের দিকে।

ভুরু কুঁচকে অপরিসীম উত্তেজনার সঙ্গে সুবোধ বললে, স্কাউণ্ড্রেল ঐ কথাটা বলে গেল আপনাকে? আর আপনি তাই মেনে নিলেন?

না মেনে কি করব, বলুন তো!—বলতে বলতে ভারি অদ্ভুত একটু হাসি সুভদ্রার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল,—কি করব, বলুন না?—কেঁদে ভাসিয়ে দেব? চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করব? পাগলের মত নালিশ করতে ছুটব?

সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে সুবোধ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। হাসি তো

নয়, যেন শাণিত খড়্গের হিংস্র দীপ্তি; চোখ দুটি জল জল করে জ্বলছে; মুখে পাথরের কঠিনতা,—মানুষের মুখই যেন তা নয়। সে উত্তর দেবে কি,—কোন উত্তর তার মনেও এল না।

কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে সুভদ্রা। একটু পরে শান্ত কণ্ঠেই সে আবার বললে, না, সুবোধবাবু, মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় আমার নেই। অন্তরে যে সম্বন্ধটা মিথ্যে হয়ে গিয়েছে, বাইরে তাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচরা করতে গেলে বিড়ম্বনাই কেবল বাড়বে।

সুবোধ বিহ্বলের মত বললে, এ আপনি কি বলছেন, সুভদ্রাদেবী?

সুভদ্রা আবার হাসলে। কিন্তু এবারের হাসি খড়্গের মত তীক্ষ্ণ নয়, বরং অশ্রুর চেয়েও যেন করুণ। মুখ নামিয়ে অস্ফুট স্বরে সে আবার বললে, হ্যাঁ, সুবোধবাবু,—যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে।

সুবোধ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল; বললে, কি হয়ে গিয়েছে? ও বললে যে তার ভালবাসা শেষ হয়ে গিয়েছে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল! একটা মুখের কথাতেই সব শেষ হয় নাকি?

মুখের কথাই তো শুধু নয়!—সুভদ্রা মুখ না তুলেই উত্তর দিলে,—তিনি তার মনের কথাই আমায় বলে গিয়েছেন।

কিন্তু এ তো মগের মুল্লুক নয়!—সুবোধ আরও উত্তেজিত হয়ে বললে,—এক জনের মনে একটা কথা উঠলেই দুজনের এমন একটা সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায় নাকি? আইন, আদালত,—এ সব কি এ দেশ থেকে উঠে গিয়েছে?

সুভদ্রা আবার হাসলে; মুখ তুলে বললে, আইন-আদালত দিয়ে আমার কি হবে, সুবোধবাবু? হাকিমের কাছে গিয়ে আমি কি বলব? বলব যে, উনি আমায় ভালবাসেন না,—তোমরা ওঁকে দিয়ে আমায় ভালবাসিয়ে দাও?—মরণ নেই আমার!—বলতে বলতে আবার সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

একটা যেন ঘা খেলে সুবোধ। তৎক্ষণাৎ তার মুখে কথা ফুটল না। উত্তেজনার যে সব চিহ্ন তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সুভদ্রার দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ে সে অনুনয়ের স্বরে বললে, কতখানি যে আপনার লেগেছে তা আমি বেশ বুঝতে পারি, সুভদ্রাদেবী। কিন্তু এ অবস্থায় অভিমানে জ্ঞান হারালে তো চলবে না। ভুলচুক মানুষমাত্রেরই হয়।

ও হয়তো ভুল করে কি একটা কথা বলেছে,—আপনিও হয়তো ভুল করে তার একটা মানে ধরে নিয়েছেন। সেই ভুলের জন্য এত বড় একটা সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে!—

না, সুবোধবাবু,—সুভদ্রা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে,—ভুল আমাদের কারও হয় নি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, আমিও স্পষ্টই শুনেছি,—ভালবাসা তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছে।

সুবোধের ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল। সে বললে, শেষ হয়েছে বললেই আপনি তা মেনে নেবেন নাকি? আপনার এত বড় একটা অধিকার মুখের কথায় ছেড়ে দেবেন আপনি?

অধিকার কি বলছেন!—তাড়াতাড়ি মুখ তুলে সুভদ্রা যেন বিস্ময়ের স্বরে বললে, এক জনের ভালবাসার উপর আর এক জনের অধিকার কখনও থাকতে পারে নাকি?

পারে না?—সুবোধ নিজেও বিস্মিত হয়ে বললে।

সুভদ্রা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, না, পারে না।—তার পর সোজাসুজি সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে,--আপনি নিজেই কি তা জানেন না, সুবোধবাবু?

আমি!—এমন ভাবে সুবোধ কথাটা বললে যেন সে আকাশ থেকে পড়েছে।

চোখ নামিয়ে মৃদু, গম্ভীর স্বরে সুভদ্রা উত্তর দিলে, হ্যাঁ, আপনিই জানেন। দাবী করলেই আর এক জনের ভালবাসা যে পাওয়া যায় না, এক জনের দাবী মেটাবার জন্যই আর এক জন যে তাকে ভালবাসতে পারে না, এ কথা আপনার চেয়ে বেশী আর কে জানবে, সুবোধবাবু?

চক্ষের পলকে সুবোধের মুখখানা একবার লাল হয়ে উঠেই পরক্ষণেই একেবারে ছাইএর মত বিবর্ণ হয়ে গেল। তার বুকের যে জায়গাটাতে ব্যথা সব চেয়ে বেশী, কথাটা গিয়ে লাগল যেন ঠিক সেই জায়গায়। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সে; তার পর উদ্গত একটি দীর্ঘনিশ্বাস সযত্নে চেপে রেখে শুষ্ক, প্রায় অস্ফুট স্বরে সে বললে, আমার কথা এখন থাক্, সুভদ্রাদেবী।

বেশ, থাক্,—সুভদ্রা মুখ না তুলেই উত্তর দিলে,—কিন্তু নিজে আমি ভালবাসার জন্য হ্যাংলামি করে আর এক জনের উপর জুলুম করতে যাব না।

সুবোধ বিব্রত ভাবে বললে, কিন্তু ভালবাসা ছাড়াও তো আপনার আরও অনেক অধিকার রয়েছে!

সুভদ্রা অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলে, না, আর কোন অধিকার আমার নেই।

কি যে বলেন!—সুবোধ কতকটা কৌতুকের স্বরেই বললে,—বিবাহিতা স্ত্রীর অধিকার নেই আপনার?

সুভদ্রা ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে, না।

সুবোধ আবার যেন আকাশ থেকে পড়ল। কিছুক্ষণ তার মুখে কোন কথাই ফুটল না, তার পর হঠাৎ রুদ্ধনিশ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করলে, নেই!—বিবাহিতা স্ত্রীর অধিকার নেই আপনার?

তার পর সব চুপচাপ,—দুজনের কারও নিশ্বাসও যেন পড়ছে না। ঘরটা এত নিস্তব্ধ যে ঘরের মধ্যে একটা ছুঁচ পড়লেও সে শব্দ যেন শোনা যায়।

কিন্তু সুভদ্রাই ঐ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলে। একটু কেসে, গলাটাকে সাফ করে নিয়ে সে স্পষ্ট করেই বললে, না, সুবোধবাবু, নেই,—লোকে যাকে বিয়ে বলে তা আমাদের হয় নি।

হয় নি!—সুবোধ চমকে উঠে বললে,—বিয়ে হয় নি আপনাদের?

না, হয় নি,—সুভদ্রা মুখ নামিয়ে উত্তর দিলে,—সেদিন আপনাকে আমি মিথ্যে করে বলেছিলাম, সুবোধবাবু। কিন্তু এক অসতর্ক মুহূর্ত্তের মিথ্যাচারের সাজা আমি নিতান্ত কম পাই নি।

সুবোধের মুখে উত্তর ফুটল না। কিন্তু তার চোখের সম্মুখ থেকে হঠাৎ যেন একখানা কালো পর্দ্দা তর তর করে উপরে উঠে গেল। এত দিন যা ছিল রহস্য তার সম্পূর্ণ মর্ম্ম এখন এক নিমেষেই দিনের আলোকের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুভদ্রার চোখের উপরকার সশঙ্ক সঙ্কোচের ছায়া, তার অকারণ লজ্জা, তার অনাবশ্যক উল্লাস, সকলের উপর অরুণাংশুর প্রসঙ্গটিকে নিয়ে ক্রমাগতই হেঁয়ালি বুনবার তার যে প্রবৃত্তি এত দিন সুবোধের মনে কৌতুকের চেয়েও বেশী বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে, ওর কোনটাই এখন আর তার কাছে প্রহেলিকা রইল না। অরুণাংশুর ব্যবহারের যে দিকটা এত দিন তাকে বিস্মিত, এমন কি, বিরক্ত পর্য্যন্ত করেছে, তা-ও এখন তার কাছে আর দুর্ব্বোধ্য মনে হল না। এমন কি, তার নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে অরুণাংশুর সর্ব্বশেষ কীর্ত্তিটিও যেন কালিমামুক্ত হয়ে সহজ ও স্বাভাবিক রূপেই প্রতিভাত হল। সব চেয়ে বড় কথা, তার নিজের মনটাই কি যেন একটা ভারী বোঝা ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ হাল্‌কা এবং সুস্থ হয়ে উঠল।

একটি নিশ্বাস ফেলে সে শুধু বললে, আশ্চর্য্য !—

সুভদ্রা নড়ে বসল ; তার পর বললে, না, আশ্চর্য্য আর কি !—বিয়ে হবার কথাও ছিল না আমাদের। তবু সে দিন কি যে হল,—পাছে আপনার কাছে খেলো হতে হয়, এই আশঙ্কায় ও কথাটা সেদিন ঝোঁকের মাথায় আপনাকে বলে ফেলেছিলাম। বুঝতে পারি নি যে, একটা কাল্পনিক লজ্জা গোপন করবার জন্য আরও মারাত্মক একটা লজ্জা সৃষ্টি করছি। কিন্তু আজ তো ভবিষ্যতের আশা আর নেই,—তাই আশঙ্কাও কেটে গিয়েছে। গত এক মাসের মধ্যে অনেক বারই যে কথা আপনাকে বলবার জন্য মন আমার উন্মুখ হয়ে উঠেছে, আজ সেটা বলে ফেলে আমি বেঁচে গেলাম, সুবোধবাবু।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুবোধ জিজ্ঞাসা করলে, অরুণাংশু তার মত বদলাবে, এ আশা কি আপনার একেবারেই নেই !—

অত্যন্ত ম্লান হাসির সূক্ষ্ম কয়েকটি রেখা সুভদ্রার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল। চোখ নামিয়ে সে বললে, মতের কথা এ তো নয়,—বদলাবে কি ?

তবে কি সবই শেষ হয়ে গিয়েছে ?

সুভদ্রা সম্মতির ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়লে মাত্র,—কথা বললে না।

আবার একটু চুপ করে থেকে সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে আবার বললে, সুভদ্রাদেবী, আপনি এখন তাহলে মুক্ত ?

সুভদ্রা চমকে উঠল ; হঠাৎ তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল ; বিহ্বল স্বরে সে বললে, কি বলছেন, সুবোধবাবু ?

মানে,—সুবোধ ঢোক গিলে উত্তর দিলে,—অরুণাংশু যখন চলে গিয়েছে,—বলেই যখন গিয়েছে আপনাকে,—মানে, অনুষ্ঠানের বা চুক্তির আর কোন দায়ই যখন তার কাছে আপনার নেই !—

সুভদ্রা কুণ্ঠিত হয়ে বললে, অনুষ্ঠান বা চুক্তির না হউক, দায় আমার আছে বই কি !—খুবই আছে।

মুখখানাকে হাসবার মত করে সুবোধ বললে, কিন্তু সে তো আপনাকে মুক্তি দিয়ে গিয়েছে !—

সুভদ্রার ঠোঁটের কোণে আবার একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠল ; চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে সে বললে, মুক্তি কি কেউ কাউকে দিতে পারে, সুবোধবাবু ?—

না বাঁধতেই পারে এক জন আর এক জনকে? মানুষ বাঁধা যদি পড়ে তো সে তার নিজের জালে। আমিও আমার নিজের জালেই বাঁধা পড়ে আছি।

সুবোধ রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, কি বলছেন, সুভদ্রাদেবী? কিসের বন্ধন? তবে যে বললেন যে, অরুণাংশু তার শেষ কথা আপনাকে বলে গিয়েছে,—তার ভালবাসা গিয়েছে শেষ হয়ে? সে কি সত্যি নয়?

সুভদ্রা মুখ তুলে সুবোধের মুখের দিকে তাকাল; তার পর শান্ত কণ্ঠেই বললে, সত্যি বই কি! কিন্তু যা শেষ হয়ে গিয়েছে সে তো তার ভালবাসা—আমার ভালবাসা তো নয়! আমি এখনও তাকেই ভালবাসি।

সুবোধের বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন করে উঠল, মাথার মধ্যে সব যেন গেল গুলিয়ে। দুই হাতে মাথার চুলগুলিকে পিছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে সে উদ্ভ্রান্তের মত বললে, এ কি সম্ভব! এখনও তাকেই ভালবাসেন আপনি?—

সুভদ্রা উত্তরে বললে, সম্ভব কি বলছেন, সুবোধবাবু,—এ যে সত্যি।

সুবোধ রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, যা হয়ে গিয়েছে তার পরেও তারই প্রতীক্ষায় থাকবেন আপনি?—

ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে সুভদ্রা উত্তর দিলে, না, প্রতীক্ষা আর কি! তবে থাকতে হবে তো!—

কিন্তু সে কি তারই জন্য? কিসের আশায়? কি নিয়ে থাকবেন আপনি?

সুভদ্রার বিবর্ণ মুখখানা হঠাৎ নত হতে পড়ল। উত্তরে সে যা বললে, তার কেবল শব্দটুকু ছাড়া আর কিছুই সুবোধের কানে গেল না।

কিন্তু শুনবার জন্য বা বোঝবার জন্য সুবোধ কোন চেষ্টাই করলে না। হঠাৎ সুভদ্রার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে সে সনির্ব্বন্ধ স্বরে বললে, সুভদ্রাদেবী, জীবনটা তো দুএক দিনের ব্যাপার নয়! যে সুদীর্ঘ কাল এখনও আপনার সামনে রয়েছে, তা কি আপনি এমনি করেই কাটাতে চান? ভেবে দেখুন একবার,—আকাশের দিকে মুখ বাড়িয়ে যে লতা সবে মাত্র মাটি ফুঁড়ে বের হয়েছে, তাতে ফুল ফুটবে না, ফল ফলবে না,—মরুভূমির তপ্ত হাওয়া লেগে তা তিল তিল করে শুখিয়ে যাবে। যে জীবনের সুরুই এখনও হয় নি, তার সকল সম্ভাবনার হবে শোচনীয় অপমৃত্যু। তাই হতে দেবেন আপনি?—

সুভদ্রা মুখ তুললে না, কিন্তু গাঢ় স্বরে বললে, কি করব, বলুন,—দুর্ভাগ্য আমার যত ভয়ঙ্করই হউক না কেন, তাকে আমি ঠেকাব কেমন করে ?

সুবোধ উত্তেজিত হয়ে বললে, ঠেকাতে আপনি পারেন,—ইচ্ছে করলেই।

না, পারি নে,—সুভদ্রা কথার মাঝখানেই মাথা নেড়ে বলে উঠল,—সংসারে আরও দশটি ছেলেমেয়ের মত চেয়েও না পাওয়ার যে দুর্ভাগ্য তা আমাকেও নিজের মাথায়ই বইতে হবে।

উত্তরে সুবোধও মাথা নেড়েই বললে, না, না, সুভদ্রাদেবী,—সংসারের আর কোন মেয়ের সাথেই আপনার তুলনা হতে পারে না। পায়ে যাদের শিকল আঁটা থাকে, চলতে পারে না তারাই। কিন্তু আপনি থমকে দাঁড়াবেন কেন ?—আপনার পায়ে তো বন্ধন নেই। প্রতীক্ষা যারা করে তারা করে কিছু একটা পাবার আশায়; সম্বল সকলেরই থাকে,—কিছু না কিছু। কিন্তু আপনি প্রতীক্ষা করবেন কেন ? কি সম্বল নিয়ে ?

সুভদ্রা মৃদু স্বরে বললে, সম্বল আমার আছে।

সুবোধের চোখ দুটি হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল; উত্তেজিত স্বরে সে বললে, কি সম্বল আছে আপনার ? ভবিষ্যতের আশা ?—অরুণাংশু নিজেই তো তা ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে। অতীতের স্মৃতি ?—সে তো কেবল মোহ আর সম্ভোগের। প্রত্যাখ্যানের অপমানের বিষে বিষিয়ে ওঠে নি তা ? তাই সম্বল নিয়ে আপনি মিথ্যাবৈধব্যের কৃচ্ছসাধনা করবেন ?

ধীরে ধীরে মুখ তুলে সুভদ্রা অসাধারণ রকমের শান্ত, গম্ভীর স্বরে বললে, আমার সম্বল আমার নিজের মধ্যেই আছে, সুবোধবাবু,—বাইরে তাকে আমার খুঁজতে হবে না। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক্,—রাত অনেক হয়েছে।

কিন্তু সুভদ্রার মৃদু, শান্ত কণ্ঠের ঐ সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটিই যেন চাবুকের একটি আঘাতের মত সুবোধের মুখের উপর এসে পড়ল। ব্যথায় কালো হয়ে উঠল তার মুখ; কয়েক সেকেণ্ড কাল স্তম্ভিতের মত সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে গাঢ় স্বরে বললে, আমি আপনাকে ভালবাসি, সুভদ্রাদেবী।

সুভদ্রা চমকে উঠে বললে, কি !—কিন্তু পরক্ষণেই মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত, মৃদু স্বরে সে আবার বললে, তা আমি জানি।

সুবোধ বিদ্যুদ্বেগে ফিরে তাকাল; রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, জানেন আপনি? বিশ্বাস করেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি?

সুভদ্রা কোন উত্তর দিলে না, কিন্তু তার সারা শরীরটাই থর থর করে কেঁপে উঠল।

ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা অনৈসর্গিক স্তব্ধতা। জানালা বন্ধ,—বাইরে থেকেও কোন আওয়াজ আসছে না,—হাওয়াও নয়। ভিতরটা গরম হয়ে উঠেছে। মাথার উপরে টুপিঢাকা বিজলীর আলো। সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে সুবোধ স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে,—তার সামনে একটু দূরে আনতমুখী সুভদ্রা।

—বিশৃঙ্খল চুল,—গায়ের কাপড় এলোমেলো,—কখন যে কাঁধের উপর থেকে শাড়ীর আঁচলখানি কোলের উপর খসে পড়েছে, সে তা জানতেও পারে নি। বাঁ হাতটা একেবারে খোলা; ঢিলা, বুক-খোলা ব্লাউজের ভিতর দিয়ে সে দিকের কণ্ঠের হাড় এবং তার নীচে পরিণত বুকের খানিকটা অস্ফুট রকমে চোখে পড়ে; পিছনে অযত্নরচিত এলো খোপার বিশৃঙ্খল একটু আভাষ। নত মুখ। রুক্ষ চুলের কয়েকটি গোছা কপালের উপর এসে পড়েছে। সম্পূর্ণ মুখখানা দেখা যায় না,—অনেকটা ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। দেখা যায় শুধু আনত দুটি চোখ, নাকটি আর শুকনো, বিবর্ণ ঠোঁট দুটির খানিকটা অংশ,—অবরুদ্ধ আবেগে থর থর করে কাঁপছে। আর দেখা যায়, বাঁ পাশের গাল,—তার উপরে অস্পষ্ট আলোকে চিক চিক করে জ্বলছে চোখের জলের অতি সূক্ষ্ম একটি রেখা।

এক একটি মুহূর্ত্ত যেন এক একটি যুগ। সুভদ্রার সেই অশ্রুকলঙ্কিত আনত মুখের দিকে তাকাতেই তার আর সুভদ্রার সম্বন্ধের গোটা ইতিহাসটাই এক সঙ্গে সুবোধের মনে পড়ে গেল,—তার নিজের প্রাণঢালা ভালবাসা আর ওরই শোচনীয় ব্যর্থতার মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস। মনে পড়তেই সুবোধের মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলে উঠল,—মুখখানা হল যেন ক্ষুধার্ত্ত বাঘের মত হিংস্র,—চোখ দুটি থেকে আগুনের ফুলকি যেন ঠিকরে বের হতে লাগল,—দেহের পেশীগুলি হয়ে উঠল ইস্পাতের মত শক্ত। সুভদ্রার দিকে আরও একটু ঝুঁকে দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, সুভদ্রা, আমি তোমায় ভালবাসি,—আজ তুমি মুক্ত,—তোমায় আমি চাই।

সুভদ্রা চমকে মুখ তুলে তাকিয়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল ; সশব্দে বসবার চৌকিখানাকে সরিয়ে দিয়ে, দুপা পিছনে হটে গিয়ে সে সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললে, আপনি এখন যান, সুবোধবাবু।

কিন্তু সুবোধ তখন ক্ষেপে গিয়েছে ; সে-ও তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, না, না, সুভদ্রা,—আমি তোমায় ভালবাসি,—চোখের সামনে তোমার নিজের জীবনটাকে এমন করে তোমায় আমি নষ্ট করতে দেব না। তুমি অরুণাংশুর নও, তুমি অরুণাংশুর কখনও হও নি,—কখনও চাওনি তাকে তুমি। ভুল করে, ক্ষণিকের একটা মোহের বশে তুমি একটা জালের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলে। কিন্তু আজ তুমি মুক্ত,—এবার আমারই হতে হবে তোমায়।

সুভদ্রা অসহায়ের মত চারিদিকে এক বার চেয়ে দেখলে,—না, পথ খোলা নেই,—ঘরের একটি মাত্র দোর সুবোধ নিজেই আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে সে অবরুদ্ধ স্বরে বললে, না, সুবোধবাবু, না,—আমি মুক্ত নই।

সুবোধের চোখ দুটি আরও বেশী জ্বলে উঠল ; সুভদ্রার দিকে আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, না, তুমি মুক্ত,—তুমি আমার। মিথ্যাবৈধব্যের জালের মধ্যে তোমায় আমি জড়িয়ে পড়তে দেব না। সেবার নিজের অধিকার আমি পুরুষের মত প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি বলেই তোমায় আমি হারিয়েছিলাম। কিন্তু এবার আর নয়,—পাহাড়ের গুহার আদিম অধিবাসীর মতই এবার তোমায় আমি জোর করে নিজের করে নেব।

মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে সুভদ্রা আর্ত্ত কণ্ঠে বলে উঠল, সুবোধবাবু—

কিন্তু বাকি কথাগুলি সুবোধের ঠোঁটের নীচে চাপা পড়ে গেল। ক্ষিপ্তের মত ছুটে গিয়ে সুবোধ সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরলে ; লোহার মত শক্ত দুটি বাহু দিয়ে টেনে তুললে তাকে নিজের বুকের উপর ; উন্মত্ত আগ্রহে সুভদ্রার মুখের উপর মুখ দিয়ে সে থেমে থেমে, কেটে কেটে বললে, না, তুমি আমার—আমারই হতে হবে তোমায়।

কিন্তু ঐ একটি মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই—তার নিজের মুখের কথাটা শেষ হতে না হতেই—নিজের ঐ উন্মত্ততার মধ্যেও সুবোধ বুঝতে পারলে যে, সুভদ্রার ঐ কোমল, তপ্ত দেহখানি তার বাহুবন্ধনের মধ্যে হঠাৎ যেন পাথরের মত কঠিন, বরফের

মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে,—গালের উপর সুভদ্রার তপ্ত নিশ্বাস আর দ্রুত তালে এসে পড়ছে না,—স্পন্দিত বুকের উপর সুভদ্রার বুকের স্পন্দন আর অনুভূত হয় না। সুবোধের নিজের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়েও হঠাৎ যেন একটা তুষারশীতল শিহরণ খেলে গেল; সঙ্গে সঙ্গেই তার বাহুর বন্ধনও আলগা হয়ে পড়ল।

রুদ্ধনিশ্বাসে সুবোধ ডাকলে, সুভদ্রা—

সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠল সুভদ্রা; এক ঝটকায় নিজের মুখখানাকে সরিয়ে নিয়ে সে আবার আর্ত্ত কণ্ঠে বললে, সুবোধবাবু, আমায় ছাড়ুন,—আপনার দুটি পায়ে পড়ি,—ছেড়ে দিন শীগগির—

সুবোধের তপ্ত নিশ্বাস আবার সুভদ্রার গালের উপর গিয়ে পড়ল; গাঢ় স্বরে সুবোধ বললে, আজও আমায় ফিরিয়ে দেবে, শুভা?—আজ তো তুমি মুক্ত,—

না, সুবোধবাবু, না,—বলতে বলতে সুভদ্রা তার অবসন্ন, মুর্চ্ছিতপ্রায় দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করে আর একবার নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কোনই ফল হল না। তখন হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে সুবোধেরই বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বললে, আমি মুক্ত নই, সুবোধবাবু,—বন্ধন রয়েছে আমার নাড়ীতে নাড়ীতে,—

মিছে কথা,—সুবোধ আবার তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে,—ভুল, করছ তুমি।

না, না, সুবোধবাবু,—সুভদ্রা সবেগে মাথা নেড়ে বললে,—মিথ্যে নয়, ভুল নয়, —আমারই মধ্যে তাঁর সন্তান রয়েছে,—আমার সন্তান,—

সুবোধ চমকে উঠল,—এমন, যেন বাজ পড়েছে তার নিজের মাথার উপর। চক্ষের পলকে তার মুখ কালো হয়ে গেল, হাত দুটি অসাড় হয়ে ঝুলে পড়ল কাঠের পুতুলের আলগা হাত দুখানির মত। হঠাৎ অবলম্বন হারিয়ে সুভদ্রার দেহটা ছিটকে গিয়ে পড়ল মেঝের উপর।

কিছুক্ষণ কারও মুখেই কোন কথা নেই,—শব্দের মধ্যে কেবল ভুলুণ্ঠিতা সুভদ্রার চাপা কান্নার অস্ফুট শব্দ।

অনেকক্ষণ পর—সুবোধের নিজেরই মনে হল যেন এক যুগ,—সুবোধ সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, উঠুন, সুভদ্রাদেবী,—আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখও আমার নেই,—কিন্তু এ কথা আমায় আগে বলেন নি কেন?—

সুভদ্রা উঠল না, মুখও তুললে না ; শুধু বললে, এ কি বলবার কথা, সুবোধবাবু!—

সুবোধ আবার চমকে উঠল ; রুদ্ধনিশ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করলে, অরুণাংশু জানে না এ কথা ?

এবারও মুখ না তুলেই সুভদ্রা উত্তর দিলে, না।

সুবোধ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; তার পর ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, যাক্,—বাঁচা গেল। আপনি উঠুন, সুভদ্রাদেবী। কোন ভাবনা নেই আপনার,—আমিই সব ঠিক করে দেব।

সুভদ্রা হঠাৎ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই উঠে বসল ; ঊর্দ্ধমুখে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে সে বললে, কি বলছেন, সুবোধবাবু,—কি করবেন আপনি ?

সুবোধ সান্ত্বনার স্বরে বললে, আপনি কিছু ভাববেন না, সুভদ্রাদেবী। অরুণাংশু এ খবর জানে না বলেই এ রকমটি হতে পেরেছে।

কিন্তু,—দুই চোখ বিস্ফারিত করে সুভদ্রা বললে,—কিন্তু আপনি কি আমার এই অবস্থার কথা বলতে চান তাকে ?

সুবোধ ঘাড় নেড়ে বললে, নিশ্চয়ই বলব।

না, না, না,—সুভদ্রা যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল,—কিছু বলবেন না তাকে। কোন কথা বলতে পারবেন না আপনি,—আমার সম্বন্ধে একটি কথাও নয়। আপনার পায়ে পড়ি সুবোধবাবু,—একটি কথাও নয়।—বলতে বলতে সুভদ্রা সত্যই সুবোধের দুটি পা-ই জড়িয়ে ধরে একেবারে তার দুই পায়ের পাতার ফাঁকে মুখ গুঁজে দিলে।

সুবোধ চমকে উঠল। নিজের পা দুটিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে সে। কিন্তু সুভদ্রা এত শক্ত করে তাকে চেপে ধরেছে যে, সহজে সে পা নাড়তেই পারলে না,—পাছে সুভদ্রার মুখে আঘাত লাগে, এই ভয়ে সে জোরও করতে পারলে না। কিন্তু বেদনা ও সমবেদনায় তার বুকের ভিতরটা কাণায় কাণায় ভরে উঠল। তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে আলগোছে সুভদ্রার মাথার উপর ডান হাতখানা রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বললে, কেন, সুভদ্রাদেবী—বারণ কেন করছেন ?

সুভদ্রা এবার সুবোধের পায়ের উপরেই মুখ ঘষতে ঘষতে বললে, না,—বলতে পাবেন না আপনি। বলুন,—কথা দিন আমায়,—আমার সম্বন্ধে একটি কথাও তাকে আপমি বলবেন না। নইলে এখনই আপনার পায়ের উপরেই মাথা খুঁড়ে মরব আমি।

সুবোধ বিহ্বল হয়ে পড়ল। হাঁটুর নীচে দুটি পায়েই সুভদ্রার দুই হাতের সুদৃঢ় বন্ধন,—পা'দুটিকে শিকলের মত বেঁধে রেখেছে দুইখানি হাত; সুভদ্রারই চোখের জলে তার পায়ের পাতাদুটি ভেসে যাচ্ছে। জ্বলন্ত কয়লার মত তপ্ত, আবার বরফের মত ঠাণ্ডা সেই স্পর্শ। সুবোধের মাথার মধ্যে আবার কেমন যেন করে উঠল; পরনের জামা-কাপড় ঘামে ভিজে গেল; হাত-পাগুলি অবশ হয়ে আসতে লাগল; মুখের মধ্যে জিভ শুখিয়ে যেন কাঠের মত জড় ও শক্ত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলে না। তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে শুষ্ক, জড়িতস্বরে সে বললে, বেশ, আমি কথা দিচ্ছি,—আপনার সম্বন্ধে কোন কথাই আমি অরুণাংশুকে বলব না। আপনি উঠুন।

সুভদ্রা তার পা ছেড়ে দিলে, কিন্তু উঠে দাঁড়াল না, বসলও না; সামান্য একটু দূরে সরে গিয়ে মেঝের উপরেই উপুর হয়ে পড়ে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

সুবোধ উঠে দাঁড়াল। তার অবস্থা তখনও অস্বাভাবিক। মাথার চুলগুলি খাড়া খাড়া; কপাল বেয়ে দর দর করে ঘাম ঝড়ছে; চোখে কেমন যেন একটা বিহ্বল ভাব, পাদুটি যেন টলছে। পাশের চৌকির পিঠটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরলে সে। তার পর সামনে তাকিয়ে দেখলে,—সুভদ্রা তেমনি মেঝের উপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। সে কান্নার ধ্বনি নেই, আছে শুধু কম্পন। সুবোধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইল,—যেন সে ভূত দেখেছে। তার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে একটি কথাও না বলে দোর খুলে মাতালের মত টলতে টলতে বের হয়ে গেল।

পরিচিত সোজা পথ গঙ্গার ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। একেবারে জলের ধারে গিয়ে বাধা পেয়েই সুবোধ যেন থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারকে কেটে দুফাঁক করে রূপার চিক্কণ, শুভ্র একটি রেখা ঝক ঝক করে জ্বলছে; তাছাড়া আর সবই অন্ধকার। গাছপালা, বাড়ীঘর যেন নীবিড়তর অন্ধকারের এক একটা স্তুপ। মানুষের সাড়াশব্দ কোথাও নেই; কুলিব্যারাকগুলি নিস্তব্ধ, নিঝুম; দৈত্যের মত অতিকায়, শ্রান্তিক্লান্তিহীন অমন যে সব কারখানা,—রাতের মরণ কাঠির স্পর্শে তারাও যেন মরে পড়ে রয়েছে। আলোর মধ্যে কেবল আকাশের ঝকঝকে নক্ষত্র আর নীচে জলের বুকে তাদেরই চঞ্চল, কম্পমান প্রতিচ্ছবি

আচ্ছন্ন, বিহ্বল চোখে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সুবোধ জলের ধারে মাটির উপরেই ধপ করে বসে পড়ল।

তখনও তার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে,—দেহ ক্লান্ত,—মন অবসন্ন। মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগেই তার দেহে ঐরাবতের শক্তি ছিল, চোখে ছিল স্বপ্ন, প্রাণে উৎসাহের অন্ত ছিল না,—অরুণাংশুকে হারিয়ে এখানকার ইয়ুনিয়ন আবার সে জয় করে নেবে। অথচ এখন তার মনে হল যে জরা এসে তার দেহ ও মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে বসেছে,—যযাতির মত পুনর্যৌবন লাভ করবার সম্ভাবনাও আর নেই।

কোথা দিয়ে, কেমন করে, কি অঘটনই না ঘটে গেল! স্মৃতির পটে ঝাপসা হয়ে এক একটা ছবি ফুটে ওঠে; টুকরা টুকরা স্বপ্নের মত মনে পড়ে—যা সে শুনেছে, যা সে দেখেছে, যা সে নিজে করে ফেলেছে। বিশেষ করে তার নিজের কৃতকর্ম্মের কথা স্মরণ করেই তার মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও যেন শিউরে উঠতে লাগল। সত্য এত দিন মনের গহনে চাপা পড়ে ছিল,—সে ভালই ছিল। তার ও সুভদ্রার মাঝখানে এত দিন ছিল রহস্যের অতল ও অপার মহাসমুদ্র,—কল্পনা আলো ফেলে ওর বুকে কত রামধনুর সৃষ্টি করতে পারত, জাল ফেলে ওর অন্তস্তল থেকে কত অমূল্য মণিমুক্তা আহরণ করে আনতে পারত। পাগল হয়ে কেন যে সেই সমুদ্রটাকে সে মন্থন করতে গেল,--লাভ হল কেবল তীব্র হলাহল। কি কুক্ষণেই সুভদ্রাকে সে জেরা করতে গিয়েছিল,—যা সে জানতে পেরেছে তার কোনটাই সে জানতে চায় নি। হউক না তা সত্য; কিন্তু তার প্রত্যেকটি সত্যই নির্ম্মম, কুৎসিৎ, ভয়ঙ্কর;—বিশেষ করে তার নিজের সম্বন্ধে যে সত্যটা সে জানতে পেরেছে। সুভদ্রাকে সে প্রায় প্রথম দেখার দিন থেকেই ভালবেসেছে,—এ কথাটা তার অজানা ছিল না। কিন্তু এত দিন সে জানত যে, তার ঐ ভালবাসা তার নিজের গোপন হৃদয়েরই অমূল্য এক সম্পদ,—গভীর সরোবরের নিরাবিল জলের মত স্নিগ্ধ, নির্ম্মল প্রভাতের প্রস্ফুটিত জুঁই ফুলটির মত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, ঘৃতপ্রদীপের অকম্পিত আলোকশিখাটির মতই আসক্তিহীন, প্রতিদানের আকাঙ্খাহীন শান্ত ও অনাড়ম্বর আত্মদানপ্রবৃত্তি; ভক্ত পূজারীর মুগ্ধ হৃদয়ের আত্মনিবেদনের মতই অনাবিল তার অনুরাগ। কিন্তু আজ সে জানতে পেরেছে যে, এত দিন বুকের মধ্যে অতি যত্নে যাকে সে লালন করে এসেছে, তা কলুষিত লালসা ছাড়া আর কিছুই নয়; সে এক দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্ব্বার আত্মসাৎপ্রবৃত্তি,—বন্য পশুর মত হিংস্র, কৃমিকীটের মত ক্লেদাক্ত, উন্মত্ত নারীমাংস-

লোলুপতা। সুবোধের মনে হতে লাগল যে, একটা কুৎসিৎ, হ্যাংলা কুকুর তার নিজের বুকের ভিতর থেকেই বাইরে এসে নোংড়া দুপাটি দাঁত বের করে অমার্জ্জনীয় লোলুপতার সঙ্গে দেবতার ভোগে মুখ দিতে গিয়েছিল,—উপযুক্ত প্রাপ্য হিসাবেই লাথি খেয়ে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের মত আবার তার বুকের মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে। তার নিজের হাতে-পায়ে সেই পরাজিত, পদাহত কুকুরটারই অবসন্ন দেহের বেদনা জড়িয়ে রয়েছে, আর বুকের মধ্যে রয়েছে তারই উপস্থিতির দুরপনেয় ক্লেদাক্ত উপলব্ধি।

সময় কেটে যেতে লাগল, কিন্তু সুবোধের খেয়াল নেই।

জ্ঞান হল একটা এ্যারোপ্লেনের শব্দে। কদাকার, কালো, অতিকায় একটা পাখীর মত প্রকাণ্ড একটি এ্যারোপ্লেন কোথা থেকে যেন উড়ে এসে তারই মাথার উপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে কলিকাতার দিকে ছুটে গেল। সুবোধ চমকে উঠল। দেখলে যে পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে; এখানে এসেই যে তারাটাকে সে জল্ জল্ করে জলতে দেখেছিল, তার সে ঔজ্জল্য আর নেই। সে পিছনে তাকিয়ে দেখলে যে তাদের কারখানার উঁচু, কালো চিমনিটা আরও যেন উঁচু, আরও যেন কালো হয়ে উঠেছে। ওর মাথার উপরে এক ঝাঁক জোনাকি,—ভাল করে তাকাতেই বোঝা গেল যে, জোনাকি নয়, আগুনের ফুলকি,—কারখানার ইঞ্জিন ঘরে এরই মধ্যে কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে। সুবোধ আবার চমকে উঠল,—রাত আর বেশী নেই,—পূবের পাণ্ডুর আকাশ শীগগিরই রাঙ্গা হয়ে উঠবে, পাখী ডাকবে, লোকজন সব বের হয়ে আসবে আর পরিচিত মজদুরের কেউ কেউ হয় তো ঘাটেই এসে উপস্থিত হবে মুখহাত ধোবার জন্য,—হয়তো সুভদ্রাও—

আবার সুভদ্রার সঙ্গে দেখা হবার কল্পনামাত্রেই সুবোধের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা কেমন যেন একটা শিহরণ খেলে গেল। ঘণ্টা কয়েক আগের দেখা সুভদ্রার মুখখানা হঠাৎ যেন স্পষ্ট হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠল,—একেবারে মরার মুখের মত বিবর্ণ সেই মুখ,—বিস্ফারিত চোখ দুটিতে কি সন্ত্রস্ত, সকাতর দৃষ্টি! মনে পড়ে গেল যে তার নিজের ভিতরের কদর্য্য, ক্লেদাক্ত, লুব্ধ পশুটাকে বের হয়ে আসতে দেখেই সুভদ্রার সরলবিশ্বাসী মুখখানির স্বাভাবিক মাধুর্য্য অত দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। সুভদ্রার ক্রন্দনবিকৃত কাতর কণ্ঠের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ সেই মুহূর্ত্তেই আবার যেন সে স্পষ্ট শুনতে পেলে,—সুবোধবাবু—

সুবোধ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সেই মুহূর্ত্তেই মর্ম্মে মর্ম্মে সে অনুভব করলে যে, একটা রাত্রির মধ্যেই তার জীবনে একটা বিপর্য্যয় ঘটে গিয়েছে। সুভদ্রাকে সে জন্মের মতই হারিয়েছে,—তার দেহটা তো বটেই, তার শ্রদ্ধাও। অপরিমেয় সে ক্ষতি,—দুঃসহ তার বেদনা। কিন্তু ঐটুকুই সব নয়। সুভদ্রার চেয়েও মূল্যবান যা তার ছিল, সেই তার পরম সম্পদ,—তার আত্মমর্য্যাদা, তার আত্মবিশ্বাস,—একটি রাত্রির মধ্যেই তারও সবটুকু হারিয়ে সে একেবারে নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হয়ে পড়েছে; গত রাত্রে সুভদ্রার চোখের সন্ত্রস্ত দৃষ্টির মধ্যেই সে তার নিজের কুৎসিৎ, বিকৃত, ক্ষতদুষ্ট, জঘন্য পশুসত্তাটাকে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে সুদীর্ঘ দর্পনে প্রতিফলিত জীবনাবয়ব প্রতিকৃতির মত। দিনের আলোকে আবার সেই সুভদ্রার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার কল্পনামাত্রেই তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। সে স্পষ্টই বুঝলে যে, নিজের অন্তঃসারশূন্য পঙ্কিল অস্তিত্বটাকে নিয়ে সুভদ্রা দূরে থাক্, পরিচিত একটি লোকেরও মুখের দিকে আর সে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না।

সুবোধ আর দাঁড়াল না,—ছুটে চলল যেন ভূতের ভয়ে সে পালিয়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে ধারেই অনেকটা এগিয়ে গিয়ে ঘুরপথে সে তাদের আস্তানায় গিয়ে উঠল। দোর ভিতর থেকে বন্ধ,—বিমল দোর বন্ধ করে ঘুমিয়েছে বোঝা গেল। কিন্তু ভিতরের লোককে না জাগিয়েও কৌশল করে বাইরে থেকেই দোর খোলা যায়। নিশাচরদের সুবিধার জন্য আগে থেকেই এ ব্যবস্থাটা করা আছে। সুবোধকে বিব্রত হতে হল না, বাইরে থেকে ডাকাডাকিও করতে হল না। নিঃশব্দে দোর খুলে সে ভিতরে ঢুকল। বিমল অঘোরে ঘুমোচ্ছে,—সে কিছুই টের পেল না। সুবোধ তাকে আর জাগালে না; নিজের টিনের হাতবাক্স আর বিছানাটাকে হাতে নিয়ে সে আবার পা টিপে টিপে বের হয়ে গেল।

তার পর বড় রাস্তা ধরে সে এগিয়ে চলল ষ্টেশনের দিকে।

কিন্তু কারখানার ফটকের কাছে গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। অদূরে সুভদ্রার বাসাবাড়ী,—ভোরের আবছায়া আলোকেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সুবোধের মনে হল যে, ঐ বাড়ীটার চেয়েও যেন বেশী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বিদায়ের দৃশ্যটি,—তারই চোখের সামনে মাটিতে লুটিয়ে সুভদ্রা অবরুদ্ধ আবেগে ফুলে ফুলে কাঁদছে। দুর্ভাগিনী সুভদ্রা,—একেবারেই হতভাগিনী। অরুণাংশুর স্ত্রী সে

নয়; অরুণাংশুর ভালবাসাও সে হারিয়েছে। অথচ সে হতে যাচ্ছে ঐ অরুণাংশুরই সন্তানের জননী। মাথার উপরে নিদারুণ দুর্ভাগ্যের দুর্ব্বহ বোঝা আর বুকের মধ্যে বঞ্চনার বিষাক্ত স্মৃতি,—সুদীর্ঘ জীবনপথে এই হল সুভদ্রার একমাত্র পাথেয়। ঝঞ্ঝাবিদ্ধস্ত উপবনের মত, বজ্রদগ্ধ পুষ্পিত লতাটির মত, মরুভূমির বালির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনীর মত মূর্ত্তিমতী ব্যর্থতা এই সুভদ্রা,—লীলাচঞ্চল জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশের মধ্যে একা-সে জীবনের এক জীবন্ত সমাধি। মনে হতেই সুবোধের বুকের ভিতরটা দুলে উঠল, চোখ দুটি জ্বালা করে জলে ভরে গেল;—দুপা সে এগিয়েও গেল সুভদ্রার ঐ বাসার দিকে।

কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে সে আগের চেয়েও দ্রুতপদে ষ্টেশনের দিকে ছুটে চলল,—পিছনের দিকে আর একবারও সে ফিরে তাকাল না।

সুবোধ চলে যাবার পরেও সুভদ্রা আগের মতই মাটিতে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। সে কান্নার আর বিরাম নেই, উপশমও নেই। দুই চোখে যেন অশ্রুর বন্যা এসেছে। কিন্তু ঐটুকুই সব নয়। বুকের মধ্যে যেন অনবরত ঢেঁকির পাড় পড়ছে,—রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন হৃদয়েরই যেন এক একটা টুকরা ছিটকে উঠে আসছে হিক্কার সঙ্গে। অথচ ভারও নামছে না, ব্যথাও কমছে না,—গলার সরু নালীটার মধ্যেই সব আটকে যাচ্ছে। সহজ ভাবে নিশ্বাস নেবারও উপায় নেই। জলভরা চোখ দুটির মধ্যেও যেন আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে,—অসহ্য তার জ্বালা।

এত দিন যে যন্ত্রনা ছিল, তাই ছিল অসহ্য। আজ তা শতগুনে বেড়ে গিয়েছে। এত দিন সে তার প্রকাণ্ড ক্ষতিটার আভাষ মাত্রই পেয়ে এসেছিল; আজ সে বুঝেছে যে, তার যা লোকসান হয়েছে তা অপরিমেয় ও অপূরণীয়। কেবল অরুণাংশুকেই সে হারায় নি, দয়িতের সঙ্গে সঙ্গেই সে তার নিজের সম্ভ্রমও হারিয়েছে। অরুণাংশুর যে ভালবাসা সে হারিয়েছে সে তো তার মনের খোরাক মাত্রই ছিল না, সে ছিল তার দেহের বর্ম্মও। সে রক্ষাকবচ আজ আর নেই। সর্ব্বশেষ আবরণটুকুও হারিয়ে প্রত্যাখ্যাতা নারী আজ নগ্ন দেহে ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। আজ যে তাকে পরিহাস করবে না, সে করবে কৃপা। বে-ওয়ারিস

সম্পত্তির মতই তার যৌবনসমৃদ্ধ নারীদেহটা এখন থেকে পুরুষমাত্রেরই চোখে লালসার আগুন জ্বালিয়ে তুলবে,—যেমন জ্বালিয়ে তুলেছিল সুবোধের চোখে। মানুষের কৃপাভরা চোখের দৃষ্টি যদি তীক্ষ্ণধার ছুঁচের মত তার গায়ে এসে ফুটতে থাকে, পুরুষের লালসা যদি আগুনের হল্‌কার মত এসে নির্ম্মম দহনে তার দেহটাকে ঝল্‌সেও দেয়, তবু অতি সুক্ষ্ম কোন আবরণের আড়াল তুলেও সে আর আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

আর কি লজ্জা! এত দুঃখের মধ্যেও গোপনতার যে আবরণটুকুর নীচে অননুমোদিত মাতৃত্বের লজ্জা এত দিন সে গোপন করে আসছিল, সে আবরণটুকুও এবার খসে পড়েছে। সুবোধ সব কথাই জেনে গিয়েছে,—তার নিজের মুখ থেকেই শুনে গিয়েছে তার দেহের মধ্যে অরুণাংশুর অজাত সন্তানের অস্তিত্বের কথা। কে জানে সংবাদটা এতক্ষণ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে কি না! না-ও যদি পড়ে থাকে, আর কেউ এখনও কথাটা যদি না-ও জেনে থাকে তবু সুবোধের নিজের জানাটা তো আছেই। এর পর সেই জানাটাই শত রকমে প্রকাশ পেতে থাকবে,—মুখের কথায় না হউক, আলো হয়ে, অনুচ্চারিত প্রশ্ন হয়ে ফুটে উঠবে সুবোধের চোখের প্রত্যেকটি দৃষ্টির মধ্যে। সেই সুবোধের কাছে কেমন করে সে আবার মুখ দেখাবে, তাই ভেবে সুভদ্রা আকুল হয়ে পড়ছিল।

ঊষার আভাষ মাত্র পেয়েই সে চমকে শিউরে উঠল,—আলো ফুটছে; একটু পরেই দিন হবে; অন্ধকারের যে আবরণটুকু এখনও তাকে আড়াল করে রয়েছে তা-ও আর থাকবে না। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পূবের আকাশের দিকে চেয়ে তার মনে হল যে, সুবোধের প্রশ্নভরা, কৌতূহলভরা, কৌতুকভরা, লালসাভরা চোখ দুটিই যেন সেখানেও ফুটে রয়েছে,—কেবল সুবোধের চোখই নয়, তার পরিচিত শত শত নরনারীর জোড়া জোড়া চোখ। সব তাকিয়ে রয়েছে প্রত্যাখ্যানের অপমান আর অননুমোদিত মাতৃত্বের কালিমাখা নিরাবরণ তার দেহটার দিকে। শত শত বৃশ্চিকদংশনের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার ভিতর দিয়েই সে উপলব্ধি করলে যে, তার যে আবরণ এক বার খুলে পড়েছে, তাকেই আবার তুলে নিজেকে ঢাকা দেবার সাধ্য তার আর নেই;—সুবোধ তার প্রতি দয়া করে চুপ করেও যদি থাকে, নিজের মুখে নিজে সত্য কথাটা আর কারও কাছে না-ও যদি সে প্রকাশ করে, তবু এখানে সে থাকলে এখানকার প্রত্যেকটি নরনারীই তার কলঙ্কের কথা জানতে

পারবে,—স্বয়ং প্রকৃতিই আর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাকে সকলের কাছে ধরিয়ে দেবে।

ভাবতেই ভয়ে এবং লজ্জায় সুভদ্রার সারা শরীরটাই যেন অসাড় হয়ে গেল,—দিদিমণি, বলে যারা তাকে ডাকে, বোনের মতন স্নেহ করে, শ্রদ্ধা করে দেবীর মত, সেই পরিচিত দশজনের কাছে কোন অন্যায় না করেও কলঙ্কিনী বলে ধরা পড়বার নিদারুণ দুর্ভাগ্যকে এখানে থেকে কিছুতেই সে ঠেকাতে পারবে না।

পূবের আকাশ ক্রমশঃই ফর্সা হয়ে আসছিল; কিন্তু আকাশ বা আলো কিছুই আর যেন তার চোখে পড়ল না। তার নিজের মনটাই তখন আবার গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছে,—অসাড় একটা জড়পিণ্ডের মত সেই অতলস্পর্শ গহ্বরটার নিকষ-কালো অন্ধকারের মধ্যে আবার যেন তলিয়ে যাচ্ছে সে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার মনের কালো পটখানির উপর আলোর একটি রেখা ঝিলিক্ দিয়ে ফুটে উঠল,—মনের ঐ অবস্থাতেও তার আদিম আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তি জেগে উঠল মাথা নাড়া দিয়ে; বন্যার মত দুর্ব্বার হয়ে সঙ্কল্প এল,—না, তার এত বড় সর্ব্বনাশ সে কিছুতেই ঘটতে দেবে না,—মহারাণীর মতই সগৌরবে মাথা উঁচু করে সুদীর্ঘকাল যেখানে সে রাজত্ব করে এসেছে, ঠিক সেই রাজ্যেই শত শত নরনারীর টিটকারিভরা দৃষ্টির সামনে দুদশজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর কৃপার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকবার নিদারুণ দুর্ভাগ্যকে কেবল নিজের শক্তিতেই অবশ্যই সে প্রতিরোধ করবে।

খুব জোরে শরীরটাকে নাড়া দিয়ে সুভদ্রা সোজা হয়ে দাঁড়াল; মনে মনে তখনই সে ঠিক করলে যে, ধরা সে কিছুতেই পড়বে না,—যা ঘটে গিয়েছে তাকে নাকচ করবার সাধ্য যদি তার না-ও থাকে তবে অন্ততঃ ভবিষ্যতে ও রকম ভুল সে আর কিছুতেই করবে না,—তার দুর্ব্বলতা, তার লজ্জা, তার জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতা আর কারও কাছেই আভাষেও সে প্রকাশ হতে দেবে না।

ঝি আসবার আগেই খুব বেশী করে সাবান মেখে সে তার স্নান সেরে নিলে। চায়ের জল চাপিয়ে দিলে নিজের হাতে ষ্টোভ ধরিয়ে। বেশ একটু ঘটা করেই সে সাজগোজ করলে। মুখে সে ঘষে ঘষে পাউডার মাখলে বিবর্ণতা ঢাকবার জন্য। চোখে মোটা করে সুর্ম্মা লাগালে চোখের নীচের কালিমাটুকু যাতে কারও চোখে না পড়ে। ঝি যখন এল, তখন তার চা খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এত সকাল সকাল যে, দিদিমণি?—ঝি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

সুভদ্রা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, ঝি,—কাজ আছে।

হাসপাতালে ডাঃ চৌধুরী আসতে না আসতেই সুভদ্রা হাতের কাজ ফেলে তার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল ; তিনি কোন প্রশ্ন করবার আগেই সে প্রায় মুখস্থের মত বলে ফেললে, আপনি, স্যার, আমায় ছুটি দেবেন বলেছিলেন ; ছুটি যদি এখনই আমি নিই, আপনি এদিকের কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন তো ?

ডাঃ চৌধুরী বিস্মিত হলেও তার চেয়ে বেশী খুশী হয়েই বললেন, হ্যাঁ, বেশ চালিয়ে নিতে পারব,—কালও চাকরির খোঁজে এক জন নার্স আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু ছুটি কি তুমি সত্যি নেবে ? কদিনের ছুটি ?

যত দিনের ছুটি আপনি দিতে পারেন, স্যার—সুভদ্রা উত্তর দিলে,—আর ছুটি না দিতে পারলেও আমায় ছেড়ে দিতে হবে, স্যার। আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি,—দরখাস্তও আমি লিখেই এনেছি।—বলেই মুঠার ভিতর থেকে কাগজখানি বের করে সে দাখিল করে দিলে।

ডাক্তার চৌধুরী বিস্মিত হয়ে বললেন, ব্যাপার কি, সুভদ্রা ?

একবার ঢোক গিললে সুভদ্রা ; কিন্তু তার পর বেশ স্পষ্ট করেই সে বললে, শরীরটা আমার খুবই খারাপ হয়েছে, স্যার—লম্বা বিশ্রাম দরকার। আর—তাছাড়া—চাকরি আর মোটে ভালই লাগছে না।

ডাক্তার চৌধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন ; তার পর শান্ত কণ্ঠে বললেন, যে চাকরি এখানকার,—ভাল লাগবার কথাও নয়। কিন্তু চাকরি ছেড়ে কি করবে তুমি ?

প্র্যাকটিস্ করব, স্যার,—চোখ নামিয়ে সুভদ্রা উত্তর দিলে ; কিন্তু তার পরেই আবার মুখ তুলে সে জিজ্ঞাসা করলে, চাকরি করার চেয়ে প্র্যাকটিস্ করা ভাল নয় ? আপনিই তো অনেক দিন বলেছেন, স্যার, যে আজকাল প্র্যাকটিস্ করলে বেশ দুপয়সা পাওয়া যায় !—

তা যায়,—ডাক্তার চৌধুরী সায় দিয়ে বললেন,—নিশ্চয়ই যায়। আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলি যে, চাকরি করার চেয়ে, অন্ততঃ এ রকম প্রাইভেট আধা-হাসপাতালে চাকরি করার চেয়ে নিজে প্র্যাকটিস্ করা ঢের ভাল। কিন্তু,—বলতে বলতে তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন ; তার পর সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললেন,—কিন্তু আমার মতে তোমাদের মেয়েদের জন্য প্র্যাকটিস্ করার চেয়েও ঢের বেশী ভাল আরও একটা কাজ আছে।

কথাটা বুঝতে না পেরে সুভদ্রা বিহ্বলের মত ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেখে অল্প একটু হেসে ডাক্তার চৌধুরী আবার বললেন, চাকরি এবং প্র্যাকটিস্ দুইই ছেড়ে বে-থা করে ছোট একটি সংসারের কর্ত্রী হয়ে বসতে পার না, সুভদ্রা ?

চক্ষের পলকে সুভদ্রার মুখখানি আরক্ত হয়ে উঠেই তখনই আবার বিবর্ণ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিলে সে।

কিন্তু ডাক্তার চৌধুরী যেন পরম কৌতুক অনুভব করে শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, বুড়োমানুষের কথাটা বাসায় গিয়ে ভেবে দেখো, দিদি। কিন্তু যাক্ সে কথা। আপাততঃ তোমার পদত্যাগ-পত্র চাপা থাকবে,—এ যেন আমি পাইই নি—এমন। তোমার তিন মাসের ছুটি পাওনা আছে,—তা আমি পুরোপুরিই মঞ্জুর করিয়ে দেব। কবে যেতে চাও তুমি ?

সুভদ্রা মুখ না তুলেই কুণ্ঠিত স্বরে বললে, কালই।

ডাক্তার চৌধুরী চমকে উঠে বললেন, কালই কি বলছ তুমি ? এত তাড়াতাড়ি কেমন করে হবে ?

সুভদ্রা উঠে দাঁড়াল ; ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে কাতর স্বরে সে বললে, আমি আর কিছুতেই কাজ করতে পারছি নে, স্যার। কাল যদি না-ই হয়, পরশু আমায় ছেড়ে দিন দয়া করে। পরশু সকালেই এখান থেকে আমি যেতে চাই,—আর যাবই।

প্রস্তাবটাকে মঞ্জুর করিয়ে তবে সে বাসায় ফিরল।

বৈকালে শ্যামাচরণ তার বাসায় এসে উপস্থিত। সুভদ্রা কিছু বলবার আগেই নিজেই সে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, সুবোধবাবু কোথায়, দিদিমণি ?

সুভদ্রার বুকটা কেঁপে উঠল। শ্যামাচরণের কথার প্রতিধ্বনির মত করেই শুষ্ক, জড়িত স্বরে সে বললে, সুবোধবাবু !—

হ্যাঁ, দিদিমণি,—শ্যামাচরণ উত্তর দিলে,—তাকে খুঁজে পাচ্ছি নে। বাসায় তিনি নেই। বিমলবাবু বললেন যে, রাত্রেও তিনি বাসায় ফেরেন নি। তুমি জান না কিছু ?

না তো,—বলে ঘাড় নাড়লে সুভদ্রা।

মনটা তার কেমন যেন করে উঠল,—উদ্বেগ আর স্বস্তিতে মিলিয়ে সে এক ভারি

অদ্ভুত মিশ্রিত অনুভূতি। অনেক সম্ভাবনার কথাই তার মনে উঠল, কিন্তু নিশ্চয় করে কিছুই সে ঠিক করতে পারলে না। শ্যামাচরণ আর যা বললে তা সে মন দিয়ে শুনলেও না। অন্যমনস্কের মত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর সোজা হয়ে বসে সে বললে, কি জানি,—কিছুই জানি নে তো আমি। কোথাও হয় তো গিয়েছেন। সময় হলেই নিজেই ফিরে আসবেন।

শ্যামাচরণ কিন্তু আশ্বস্ত হতে না পেরে উদ্বেগের স্বরেই বললে, ভারি অদ্ভুত তো! এমন তো কখনও হয় না!—

সুভদ্রা আবার নড়ে বসল; তার পর বললে, থাক্ সে কথা;—সময় হলে তিনি নিজেই ফিরে আসবেন। আমি এখানে কিন্তু তোমারই কথা ভাবছিলাম, শ্যামাচরণদা!—

শ্যামাচরণ বিস্মিত হল,—সুবোধের কথাটা সাময়িক ভাবে সে যেন ভুলেই গেল; বললে, কেন, দিদিমণি?

উত্তরে সুভদ্রা বললে, আগে কথা দাও,—কাউকে কিছু বলতে পারবে না,—সুবোধবাবুকে না, বিমলবাবুকে না, এমন কি বৌদিকে পর্য্যন্ত না।

মন খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকলেও নিছক কৌতূহলের জন্যই শ্যামাচরণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললে।

সুভদ্রা তখন বললে, তোমায় একটু খাটিয়ে নেব, শ্যামাচরণদা। আমার হাতে হাতে আমার বাসার জিনিষগুলো কাল দুপুরে এসে গুছিয়ে দিতে হবে; আর পরশু ভোরে লোকজন জাগবার আগেই একখানা গাড়ী এনে আমার দোরগোড়ায় হাজির করে দিতে হবে।

শ্যামাচরণ সবিস্ময়ে বললে, কেন, দিদিমণি?

একবার ঢোক গিলে তবে সুভদ্রা উত্তর দিলে, মাসতিনেকের ছুটি নিয়েছি আমি,—একবার হাওয়া বদলাতে যাব।

কোথায় যাবে, দিদিমণি?

তা ঠিক করি নি এখনও। আপাততঃ কলকাতায় গিয়েই দুদশ দিন থাকব ভেবে রেখেছি।

কলকাতার কোন জায়গায়?

তা বলব না তোমাকে,—বলতে বলতে সুভদ্রা একটু হাসলে।

শ্যামাচরণ থ হয়ে গেল। ব্যাপারটা অসাধারণ। বৎসরের পর বৎসর সে এই সুভদ্রাকে দেখে এসেছে,—কোন দিনই সে বাইরে যায় নি,—কদাচিৎ দুএক দিনের জন্য ছাড়া সে ছুটিও নেয় নি। সেই সুভদ্রাই এবার দীর্ঘ কালের ছুটি নিয়েছে, হাওয়া বদলাবার জন্য বাইরে যাবার আয়োজন করছে, অথচ কথাটা সকলের কাছ থেকেই গোপন রাখতে চাচ্ছে,—এর প্রত্যেকটা ব্যাপারই এমনি অভিনব যে, কোনটাই শ্যামাচরণ তার সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলে না।

কিন্তু তার বিহ্বল কণ্ঠের এলোমেলো প্রশ্নের উত্তরে সুভদ্রা তাকে বুঝিয়ে বললে যে, তার শরীরটা ভিতরে ভিতরে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে,—সময় থাকতে সাবধান যদি সে না হয় তবে হয় তো বা শীগগিরই সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়বে; ডাক্তার সুদীর্ঘ দিনের বিশ্রামের ব্যবস্থা দিয়েছেন বলেই সে অত দিনের ছুটি নিয়েছে; এই সময়ে কোম্পানীর বাড়ীতে নূতন লোক এসে বাস করবে,—তাই তার নিজের জিনিষগুলি গোছগাছ করে রাখা দরকার; আর কথাটা আপাততঃ সে গোপন রাখতে চায় এই জন্য যে, জানাজানি হয়ে গেলেই চারিদিক থেকে এত বেশী অনুরোধ-উপরোধ আসতে থাকবে যে, শেষ পর্য্যন্ত হয়তো তার যাওয়াই হবে না।

যুক্তিগুলি অকাট্য,—শ্যামাচরণ উত্তর খুঁজে পেলে না। তাছাড়া সুভদ্রার প্রতি তার নিজের মমতা এত বেশী যে, সুভদ্রার কথা সে ঠেলতেও পারলে না। যেমন সুভদ্রা বললে কতকটা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতই সে তেমনি কাজ করে গেল।

কাজ অবশ্য খুব বেশী নয়। বাসায় সুভদ্রার নিজের জিনিষ খুব বেশী ছিল না। আসবাব সবই কোম্পানীর, ঘটিবাটি প্রভৃতি তৈজসপত্রেরও অধিকাংশই। তিন বছরের সংসারে তার নিজস্ব যে সব খুটিনাটি জিনিষ জমে উঠেছিল, তাদের ব্যবহারিক মূল্য যথেষ্ট থাকলেও বিনিময় মূল্য একেবারেই নেই; অধিকাংশই অন্যত্র নিয়ে যাবারও যোগ্য নয়। তার মধ্যে কেবল ষ্টোভের মত দুচারটি মূল্যবান জিনিষ সঙ্গে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে সে ছোট একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে গুছিয়ে তুললে। বাকি জিনিষের কতক সে ঝিকে দিয়ে দিলে, কতক দিলে শ্যামাচরণকে। শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত হয়ে বললে, আমায় কেন দিচ্ছ, দিদিমণি? কি হবে এ সব দিয়ে?

সুভদ্রা মুচকি হেসে উত্তর দিলে, বৌদিকে জিজ্ঞেস করো, শ্যামাচরণদা,—সে বলে দেবে।

অধিকতর কুণ্ঠিত হয়ে শ্যামাচরণ বললে, কিন্তু তুমি ফিরে এলে আবার এ সবই তো দরকার হবে তোমার!—

হলে তখন কিনে নিতে পারব,—বলে একটা জরুরি কাজের অছিলায় সুভদ্রা অন্য ঘরে চলে গেল।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই সব গোছগাছ হয়ে গেল। অথচ হাসপাতালের বাইরে সুভদ্রার ঝি আর শ্যামাচরণ ছাড়া একটি জনপ্রাণীও জানতে পারলে না যে, তাদের দিদিমণি সুদীর্ঘ কালের জন্য অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

. রাতের জন্য ঝিকেই দুমুঠো চাল ফুটিয়ে রাখতে বলে সুভদ্রা নিজে বস্তির দিকে চলে গেল। এ তার না বলে বিদায় নেওয়া। সারাটা বস্তিই ঘুরে এল সে; সব কটি ব্যারাকও। চেনাজানা যার সঙ্গে তার দেখা হল, তারই সঙ্গে সে হেসে দুটি কথা বলে নিলে। পরিচিত যাদের সঙ্গে ইদানীং অনেক দিন তার দেখা হয় নি, তাদেরও অনেকের বাসায় গিয়েই তাদের সঙ্গে দেখা করে এল সে। কেবল বিমলের সঙ্গে সে দেখা করলে না; ইয়ুনিয়নের আপিসের ধার দিয়েও সে গেল না,—পাছে সুবোধের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

কত লোকের সঙ্গেই তার দেখা হল। সকলেই তার মুখে দেখলে হাসি। কেউ বুঝতে পারলে না যে, তার মুখের ঐ হাসির নীচে তার বুকফাটা অশ্রু বরফ হয়ে জমে রয়েছে।

কিন্তু গভীর রাত্রে নির্জ্জন বাসাবাড়ীর শোবার ঘরে তার চোখের জল আর বাধা মানল না। এ তার চাকরির জায়গাই কেবল নয়,—এ তার কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে প্রত্যেকটি নরনারীর সঙ্গেই তার আত্মীয়তার সম্বন্ধ,—এ জায়গার প্রত্যেকটি গাছের প্রত্যেকটি পাতাও যেন তার পরিচিত। কত যে কঠিন এই কর্ম্মক্ষেত্রের আকর্ষণ, এত দিন সে তা এমন নীবিড় ভাবে অনুভব করে নি। আজ সে বুঝলে যে মাটির বুকে বনস্পতির মতই এই জায়গাটা যেন তার বুকের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছে; তাকে উপড়ে ফেলতে গেলে তার নিজের বুকের ভিতরটাই যেন ভেঙ্গে, ছিঁড়ে, খান্ খান্ হয়ে যায়।

কিন্তু উপায় নেই। চোখের জল আবার চোখের মধ্যেই চেপে রেখে অমন যে তার অনুরক্ত ভক্ত শ্যামাচরণ, তাকেও শীগগিরই ফিরে আসবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরদিন সুভদ্রাকে 'আসি' বলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে হল।

ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফোটে নি,—সুভদ্রা তার গয়নার বাক্সটা হাতে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

শ্যামাচরণ গাড়ীর দরজার কাছে এসে গাঢ় স্বরে বললে, কোথায় যাচ্ছ, সে কথাটাও যদি ঠিক করে বলে যেতে দিদিমণি!—

সুভদ্রা হাতের বাক্সটা খুলতে খুলতে অস্ফুট স্বরে বললে, ঠিক তো এখনও হয় নি,—হলেই তোমাকে জানাব।

কাল থেকে শ্যামাচরণ এই একটি প্রশ্নই নানা রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু সন্তোষজনক কোন উত্তর পায় নি। এবারও সুভদ্রা প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল বুঝে নিরুপায় হয়ে সে হারই মেনে নিলে। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে সে বললে, বেশ, তোমার ইচ্ছে হলেই খবর দিও। কিন্তু আজ ষ্টেশন পর্য্যন্ত যেতেও আমায় বারণ করছ কেন?

সুভদ্রা মুখ না তুলেই উত্তর দিলে, দরকার নেই, তাই।—কিন্তু তার পর শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, কিন্তু তুমি আর একটু কাছে এস তো, শ্যামাচরণদা,—দিদিমণির দেওয়া আর একটা জিনিষ তোমায় নিতে হবে। পাত তো হাত,—এই—

শ্যামাচরণের প্রসারিত ডান হাতের মধ্যে একটি জিনিষ গুঁজে দিয়ে নিজেই সে তার হাতখানা মুড়ে বন্ধ করে দিলে।

জিনিষটা এক ছড়া সরু সোনার হার। শ্যামাচরণ ওর স্পর্শ থেকেই সেটা অনুমান করে নিয়েছিল, চোখের কাছে নিতেই সেটা সত্য বলে বুঝতে পেরে সে চমকে উঠে বললে, এ কি, দিদিমণি!

সুভদ্রা হেসে উত্তর দিলে, তারার গলায় পরিয়ে দিও,—বলো যে তার পীসিমা তাকে দিয়েছে।

হৈ চৈ করে শ্যামাচরণ অনেক প্রতিবাদ করলে, কিন্তু সুভদ্রা হারছড়াকে ফিরিয়ে নিলে না। হাল ছেড়ে দিয়ে শ্যামাচরণ কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল; তার পর হঠাৎ চমকে উঠে প্রায় আর্ত্তনাদের মত করে সে বললে, তুমি একেবারে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ না তো, দিদিমণি?

পাগল!—বলে সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং পরক্ষণেই বিপরীত দিক দিয়ে মুখ বের করে গাড়োয়ানকে উদ্দেশ করে সে বললে, গাড়ী চালাও,—জলদি।

কিন্তু গাড়ী চলতে সুরু করতেই আবার শ্যামাচরণের দিকে ফিরে তাকিয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে সুভদ্রা বললে, কিছু মনে করো না, শ্যামাচরণদা ;—ভুলচুক যা কিছু আমার হয়ে থাকে, সব মাফ করো তোমরা ; যেমন কাজকর্ম্ম করছিলে তেমনি করো, কিন্তু বউদির মনে কষ্ট দিয়ো না ; আর,—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সে।

ছুটে এল শ্যামাচরণ ; চলন্ত গাড়ীর সঙ্গেই নিজেও সে ছুটতে ছুটতেই রুদ্ধ-নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে,—আর কি, দিদিমণি ?

আর,—সুভদ্রা চোখ নামিয়ে বললে,—আর সুবোধবাবুকে একটু যত্ন করো তোমরা,—তার শরীর তো খুব ভাল নয় !—

বলেই আবার সে মুখ ফিরিয়ে নিলে ; তার পর তাকে আর মোটে দেখাই গেল না।

বিবেকানন্দ রোডের উপর বেশ বড় তেতলা একটি বাড়ীতে সিষ্টার চারুশীলার "নার্সেস হোম"। নীচের তলায় দোকান ; দ্বিতলে এবং ত্রিতলে মেয়েরা থাকে। কুড়ি-পঁচিশটি মেয়ে। বয়স, ধর্ম্ম বা জাতির মিল নেই,—কেউ কেউ প্রৌঢ়ত্বও পার হয়ে বার্দ্ধক্যের কোঠায় পা দিয়েছে, কেউ আবার নিতান্তই তরুণী ; ধর্ম্মে কেউ খৃষ্টান, কেউ হিন্দু ; কেউ হিন্দুস্থানী, কেউ বাঙ্গালী, কেউ মাদ্রাজী। কিন্তু দুটি বিষয়ে তাদের চমৎকার মিল রয়েছে,—রূপ কারও নেই, আর নেই সৌভাগ্য। এ বাড়ীতে যারা বাস করে তাদের অনেকেরই বিয়ে হয় নি ; যাদের হয়েছিল তাদের স্বামীরা বেঁচে নেই। অধিকাংশই পিতৃমাতৃহীনা। যে দুএকজনের বাপ-মা এখনও বেঁচে আছে তারাও কোন না কোন কারণে বাপমায়ের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে তবে এখানে এসেছে। ভাগ্যবিড়ম্বিতা নিরাশ্রয়া এই মেয়েগুলি মায়ামমতাহীন সংসারের অতল তলে ডুবে যেতে যেতে শুশ্রূষাবিদ্যারূপ ক্ষীণ তৃণখণ্ডের সন্ধান পেয়ে তাকেই আশ্রয় করে কোনও রকমে ভেসে চলেছে। ঘর এদের ভেঙ্গে গিয়েছে, সংসার এদের নেই, সমাজে থেকেও এরা যেন সমাজের বাইরের জীব। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বা প্রকাশ্য সভায় এদের স্তুতিগান যখন হয় তখন সমাজ ওর প্রতিবাদ করে না ; প্রয়োজন হলে সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও অনুনয় করে এদের

বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যায় ;—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। প্রয়োজনের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রটির বাইরে সমাজ এদের কোন মর্য্যাদাই দেয় না। সমাজের আওতার মধ্যেই অমন যে জাজ্বল্যমান এদের অস্তিত্বটা, তা-ও যেন অস্বীকৃতই থেকে যায়।

কিন্তু সুভদ্রা এদেরই এক জন। হুগলীর আশ্রয় হারিয়ে আজ সে আশ্রয়ের জন্য এদেরই দোরে এসে উপস্থিত হল।

দোরগোড়ায় তার গাড়ী থামতেই কমলা উপর থেকে ছুটে নীচে নেমে এল ; আনন্দের আতিশয্যে সুভদ্রাকে একেবারে জড়িয়ে ধরে উৎফুল্ল স্বরে সে বললে, এই যে,—এসেছ তুমি !—সত্যি !—আমি কিন্তু—

বিশ্বাসই করতে পার নি,—না ?—সুভদ্রা হাসিমুখে বললে ; কমলার উচ্ছ্বসিত বন্ধুবাৎসল্য সোজা গিয়ে তার অন্তর স্পর্শ করলে ; তার পাথরের মত মনটাতেও হঠাৎ যেন দোলা লাগল। আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার যে কালো মেঘখানি তার মুখের উপর চেপে বসে ছিল, দমকা হাওয়ার ঘা খেয়ে তা যেন টুকরা টুকরা হয়ে উড়ে গেল,—যাক্, একেবারে অকুলে তাহলে সে ঝাঁপ দেয় নি,—আশ্রয় এখনও তার আছে !—

কেন, বল তো ?—সে স্মিতমুখে বললে,—বিশ্বাস হয় নি কেন ? চিঠিতে—

স্পষ্টই লিখেছিলে, তা জানি,—কমলা উত্তর দিলে,—আচ্ছা, সে সব কথা পরে হবে'খন। এখন চল,—তোমার থাকবার ঘর তেতলায় ; কিন্তু আগে এস,—সিষ্টারের সাথে পরিচয়টা আগে হয়ে যাক।

সিষ্টার চারুশীলা তার নিজের মেদবহুল বিপুল দেহখানি প্রকাণ্ড একখানি আরামচৌকির মধ্যে ঢেলে দিয়ে বাংলা খবরের কাগজ পড়ছিল ; কমলার সঙ্গে সুভদ্রাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বহু কষ্টে সোজা হয়ে বসে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের স্বরে বললে, ও, তুমিই সুভদ্রা ?—তোমার কথা অনেক শুনেছি কমলার মুখে। কলকাতায় এত জায়গা থাকতে তুমি যে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে এসে উঠেছ, এ আমাদের বড় গৌরব, বড় আনন্দের কথা। কমলা তো তোমার বন্ধুই,—আমরাও তোমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করব না। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানকে তোমার মনের মত করবার জন্য তোমাকেও খাটতে হবে, মা। নিজের সংসারের মতই মনে করো একে,—মেস হলেও আসলে এই তো আমাদের মত মেয়েদের বাড়ী !—বলতে বলতে তার ঠোঁটের কোণে ভারি অদ্ভুত একটু হাসি ফুটে উঠল।

বাইরে এসে কমলা কৈফিয়তের মত করে বললে, কিছু মনে করো না, ভাই,—ওর ধরণই এই ; বড্ড রাশভারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উনি,—নমস্কারের প্রতিদানে প্রতি-নমস্কার করবেন না, কাছে গেলে বসতে বলবেন না, সব সময়েই মুখখানাকে করে রাখবেন যেন কালো একটি হাঁড়ি। তবে, জান, সুভদ্রা,—আসলে উনি লোক খারাপ নন,—আমাদের সকলকেই উনি পেটের মেয়ের মত স্নেহ করেন, কেস্ জোগার করে দেবার জন্য যা খাটেন—

উনি বুঝি বিধবা ?—সুভদ্রা কথার মাঝখানেই জিজ্ঞাসা করে বসল।

বিধবা কি বলছ,—বিয়েই তো হয় নি ওঁর! আর হবেই বা কি করে ? ঐ তো দেখলে রূপ !—বলতে বলতে কমলা হাসি চাপবার চেষ্টায় মুখের মধ্যে কাপড়ের আঁচল গুঁজে দিলে।

কিন্তু ঘরে গিয়েই হাসি থামিয়ে কতকটা মাফ্ চাইবার মত করে সে বললে, তোমার একটা অনুরোধ আমি রাখতে পারি নি, ভাই। এক সীটের ঘর এ বাড়ীতে একটিও নেই ; টাকা বেশী দিয়েও আপাততঃ পুরো একটি ঘর কারও পাবার উপায় নেই,—কারণ সব ঘরই ভর্ত্তি রয়েছে। তবে একটা ঘর শীগগিরই খালি হবে। মিসেস মুদালিয়র যুদ্ধের চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছেন,—হয়তো মাসখানিকের মধ্যেই চলে যাবেন তিনি। খালি হলেই সেই ঘরটা তুমি পাবে। তত দিন তোমায় থাকতে হবে আমার ঘরেই,—পারবে না, ভাই ?

সুভদ্রা ক্ষুণ্ণ হল,—একটু যেন চিন্তিতও হয়ে উঠল। কিন্তু মনের ভাবটা গোপন করেই সে বললে, তা আর কি হয়েছে! তোমার সাথে একত্র এক ঘরে থাকব,—সে তো ভালই হবে !

খানিক পরে চা খেতে খেতে কমলা জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি, সুভদ্রা ? ওখান থেকে চলে এলে কেন ?

চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করে তবে সুভদ্রা উত্তর দিলে ; অল্প একটু হেসে বললে, এলাম, কারণ জীবনটাকে একেবারে ঢেলে সাজতে চাই।

ঠোটের কোণে হাসি চেপে কমলা বললে, তা আমি বুঝেছি।

সুভদ্রা কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল ; অপ্রতিভের মত সে বললে, কি আবার বুঝলে তুমি ? আমি এসেছি স্বাধীনভাবে রোজগার করে বড়লোক হবার জন্য। সেবার গিয়ে যে লোভ তুমি দেখিয়ে এসেছ,—চাকরি আর ভাল লাগল না।

আহা হা !—কমলার কণ্ঠে পরিহাস বেজে উঠল,—খুব ছলনা শিখেছ তো ! কিন্তু আমার কাছে ও চালাকি চলবে না। আমি জানি কেন তুমি এসেছ,—বলব ?

সুভদ্রার সম্মতির জন্য সে অপেক্ষা করলে না। একটু থেমেই আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে আবার বললে, পাশাপাশি দুখানা ঘরের একখানা থেকে আর একখানায় গিয়ে ওঠাটা নিতান্তই গদ্য হয়ে যেত,—না ? তাই বিয়েটাকে রীতিমত পদ্য করবার জন্য বিয়ের আগের কটা দিন তুমি বাইরে কাটাতে এসেছ। ভাবটা চমৎকার বটে ! কিন্তু কার মাথা থেকে এটা বের হল,—বল তো ? তোমার ? —না তোমার 'উনির' ?

বিবর্ণ মুখে কোন রকমে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে সুভদ্রা বললে, বাজে কথা ! কি যে ছাইপাশ ভাবতে পার তুমি !

কমলা শব্দ করে হেসে উঠে বললে, ছাইপাশ বই কি,—ঠিক তোমার মনের কথাটি ধরে ফেলেছি কি না ! আচ্ছা, আচ্ছা,—লজ্জাবতী লতাটির মত আর চোখ বুজে এলিয়ে পড়তে হবে না। এখন চল তুমি। স্নান সেরে খাওয়া-দাওয়া আগে কর। তার পর—

বৈকালে কথায় কথায় সুভদ্রা কমলাকে বললে, চাকরি তো এক রকম ছেড়েই দিয়ে এলাম। এখন বল তো,—প্র্যাকটিস্ করে মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের সংস্থান করতে পারব ?

প্রথমে কথাটাকে পরিহাস ভেবেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলে কমলা ; কিন্তু সুভদ্রার গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করে শেষ পর্য্যন্ত তার প্রশ্নটাকে সে আর উপেক্ষা করতে পারলে না। ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, খুব জোর করে বলতে পারি নে, ভাই,—কলকাতা দেখছ না, কেমন খালি হয়ে গিয়েছে ! পরে হয় তো অবস্থার উন্নতি হতে পারে। কিন্তু আপাততঃ—মানে; কিছু দিন অন্ততঃ খুব চেষ্টা করতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে কমলা সহসা বলে উঠল, যুদ্ধের চাকরি নিলে কিন্তু খুব পয়সা হতে পারে। নেবে যুদ্ধের চাকরি ? আমাদের নার্সরা কিন্তু দলে দলে ঐ দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

তাই নাকি!—সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে;—আমাদের মেয়েরাও এ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' মনে করছে নাকি?

'জনযুদ্ধ' না হাতী!—কমলা ব্যঙ্গ করে উঠল,—তোমার মত পাগল নাকি সবাই যে এই সব কথা নিয়ে মাতামাতি করবে! এরা যুদ্ধে যাচ্ছে মোটা মাইনে পাবে বলে।

একটু থেমে মুচকি হেসে সে আবার বললে, আর নূতনের আকর্ষণও আছে তো! তার উপর কি অসীম সম্ভাবনা ঐ জীবনের,—কত নূতন দেশ দেখা, কত দেশের, কত লোকের সাথে মেলামেশা, কত থ্রীল্, কত রোমান্স! মন টানে না এতে! বিশেষতঃ কচি মেয়েদের!—

সুভদ্রাও হেসে ফেলে বললে, টানেই যদি তবে তুমিও গেলে না কেন? তুমি ঠিক কচি হয় তো নও,—কিন্তু বুড়ীও তো হও নি তুমি!—

কমলাও হেসেই উত্তর দিলে, হই-ই নি তো। আর লোভও কি আমার হয় নি ভেবেছ? কচি কচি রাঙা মুখ চোখে আমার কম পড়ে নি! তবে মুশকিল কি হল, জান? কারও হুকুম মেনে আমি চলতে পারি নে,—ডিসিপ্লিনের নাম শুনলেই গায়ে আমার জ্বর আসে। তাই সুযোগ পেয়েও এই ভাঙ্গা বাড়ীতেই পড়ে রইলাম। কর্ম্মভোগ আর কি!—

কিন্তু তখনই হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে আবার বললে, না ভাই, আমার মনে হয় যে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় প্র্যাকটিস্ করতে এসে তুমি ভাল কাজ কর নি!

সুভদ্রা উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, কেন, ভাই?

এ কি একটা ব্যবসা?—কমলা তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে,—না আছে এতে অর্থ, না মর্য্যাদা। লোকে মুখেই বলে, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল,—দায়ে পড়লে হাতে পায়ে ধরে সেধেও নিয়ে যায়! কিন্তু মর্য্যাদা দেয় না একটুও। বাড়ীর চাকরাণী লোকের কাছে যে মর্য্যাদাটুকু পায়, আমরা তা-ও পাই নে। উল্টো পাই বরং অপমান।

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, এ রকম মত তো তোমার আগে ছিল না, কমলা,—নার্সের ব্যবসাকে তুমি তো ব্রত বলেই গ্রহণ করেছিলে। এবার মত বদলাল কেন?

বদলাল কি সাধে!—কমলা বেশ একটু উষ্মার সঙ্গেই উত্তর দিলে,—পশ্চিমে হাসপাতালের কাজ আমার বেশ ছিল। হাউস্-সার্জ্জন আর ছাত্রবাবুরা কেউ কেউ সেখানেও এক আধটুকু ফষ্টি-নষ্টি করত বটে, কিন্তু চাষা-ভুষো গেঁয়ো রোগীরা সেখানে সবাই আমাদের মা বলেই ডাকত। কিন্তু এই কলকাতায় প্র্যাকটিস্ করতে

এসে এই দুমাসেই আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে। আমাদের মধ্যে যাদের গায়ের রঙ একটু ফর্সা আর বয়স একটু কম, তাদের তো কথাই নেই। আমার এই এত বয়স আর দাঁড়কাকের মত রঙ নিয়েও আমিই কি রেহাই পাই! এই ধর সেদিন,—বলতে বলতে কমলা হঠাৎ থেমে গেল।

কিন্তু সুভদ্রা আগ্রহের স্বরে বললে, থামলে কেন, কমলা? কি হয়েছিল সেদিন?

শুনবে তুমি?—বলে কমলা সুভদ্রার খাটের উপর এসে বসল; তার পর বললে, শোন তবে। সেদিন সন্ধ্যার পর ভবানীপুর থেকে ফোণ এল,—এক ভদ্রলোকের কলিক্-পেইন উঠেছে,—সারা রাত জাগতে পারে এই রকম শক্ত একটি নার্স চাই। সিষ্টার আমায় সেখানে পাঠালেন। গেলাম। ছোট ফ্ল্যাট। লোকের মধ্যে রোগী আর তার স্ত্রী। আহা,—মেয়েটির কথা মনে হলে এখনও চোখে আমার জল আসে। রোগা ফ্যাকাসে চেহারা—টি বি হয়তো ধরেছেই,—না ধরে থাকলেও ধরবে নিশ্চয়ই। আমি যেতেই রোগী তাকে শুতে যেতে বললে। আমার তো চোখে জল আসে আর কি! ভাবলাম যে অমন বিবেচক স্বামী সংসারে আর দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু শীগগিরই ভুল ভেঙ্গে গেল। রোগীর শিয়রে বসে ঘুম পারাবার জন্য তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমার চোখেই ঘুমের আমেজ এসে গিয়েছে,—হঠাৎ হাতখানাতে জোরে একটা টান পড়ল, আর কানে এল গাঢ় স্বরের দুটি কথা,—বুকে এস। চমকে চোখ চেয়ে দেখি, কলিক্-পেইনের রোগী ড্যাবডেবে দুটি চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে।

সুভদ্রা রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, তার পর?

কমলার ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল; সে বললে, তার পরের ব্যাপারটা খুবই সোজা আর সংক্ষিপ্ত। রোগীর ভাগ্য ভাল, আমার পায়ে স্যাণ্ডাল ছিল না,—হীল্‌তোলা জুতো পরে গিয়েছিলাম সেদিন। তাই বাঁ-হাতে তার গালের উপর চট্ চট্ কটা চড় মেরে ডান হাত টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম,—আর তার পরেই গট্ গট্ করে নীচে নেমে এলাম।

ওর বৌকে তুলে দিয়ে এলে না?

না,—সাহস হল না। মনে পড়ে গেল মেয়েটির ফ্যাকাসে, করুণ মুখখানি। ভাবলাম যে ও বাড়ীতে এরূপ ঘটনা নিশ্চয়ই সেদিন প্রথম ঘটে নি,—বৌটি নিশ্চয়ই জানে কেন রাত্রে তার স্বামীর কলিক্-পেইন ওঠে, কেন শক্ত নার্সের দরকার হয়

তার, আর নার্স এসে কেমন করে সারা রাত তার স্বামীর শুশ্রূষা করে। আমিও তো নার্স,—বৌটিকে মুখ দেখাতে লজ্জা করতে লাগল আমার। তাই পালিয়ে এলাম।

এর পর আলাপ আর তেমন জমল না। কমলারও বাইরে কাজ ছিল। একটু পরেই সে-ও উঠে দাঁড়াল। যাবার আগে সুভদ্রাকে সে বলে গেল, সন্ধ্যের পরেই ফিরে আসব আমি। ততক্ষণ আর আর মেয়েদের সাথে গল্প কর,—পরিচয় তো হয়েছেই!—

যাদের সঙ্গে সকালে পরিচয় হয় নি তাদের সঙ্গেও পরিচয় হয়ে গেল। নবাগতাকে খুশী করবার জন্য মেসের মেয়েরা চেষ্টা বা যত্নের ত্রুটি করলে না। সুভদ্রাকে তারাই ডেকে ছাদে নিয়ে গেল। কিন্তু সুভদ্রার ভাল লাগল না কিছুই। প্রতিবেশটা নূতন। এমন ছোট বাড়ীতে এত বেশী লোকের সঙ্গে সুভদ্রা যে কখনও বাস করে নি, তা নয়। কিন্তু সে অনেক দিন আগের কথা। একাদিক্রমে বছর তিনেক হুগলীতে থেকে তার বাল্য ও ছাত্রজীবনের সে অভ্যাসটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। হুগলীতে যে বাড়ীতে সে থাকত সেটা অবশ্য রাজপ্রাসাদ ছিল না, নানা রকমের লোকও সেখানে আসত। তথাপি সেটা ছিল তার নিজের বাসা,—তার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতাটুকু সেখানে এমন ক্ষুণ্ণ হত না। সেখানে যারা তার কাছে আসত, তারা পর হলেও যেন ছিল তার নিতান্ত আপনার জন। কিন্তু কলিকাতা সহরের বুকের উপর ঐ মেসবাড়ীটাকে তার মনে হতে লাগল যেন একটা বাজার। যাদের সঙ্গে তার আলাপ হল তারা সবাই শিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি, সমবয়সী এবং সমব্যবসায়ী হলেও ভাব সে তাদের কারও সঙ্গেই জমাতে পারলে না। কেবল নূতন পরিচয়ের সঙ্কোচই নয়,—এই সব জীবিকাসর্ব্বস্ব, আত্মকেন্দ্রিক, অস্বাভাবিক ও অসাধারণ মেয়েদের বিরুদ্ধে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণাও সে বোধ করতে লাগল।

মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যান কেবল ঐ কমলা। সে ফিরে এলে সুভদ্রা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

রাতের খাওয়াটা সকাল সকাল সেরে নিয়ে ঘরে গিয়ে কমলা দোর বন্ধ করে দিলে। তার পর সুভদ্রার খাটের উপর বসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, এবার বল তো, ভাই,—বিয়ে তোমাদের কবে হবে?

লজ্জায়, কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হয়ে সুভদ্রা তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে বসল, মুখে বললে, কি যে বল তুমি!—

কমলা ভ্রূভঙ্গী করে বললে, কেন,—অন্যায়টা কি বলেছি? বিয়ের আয়োজন করবার জন্য ছুটি নাও নি তুমি?

পাগল!—

তবে এলে কেন এখানে?

বলেছি তো,—ব্যবসা করতে।

কমলা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর সন্দিগ্ধ স্বরে বললে, সত্যি বল তো, সুভদ্রা,—ঝগড়া হয়েছে তোমাদের? রাগ করে পালিয়ে এসেছ তুমি?

সুভদ্রা মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, কি বাজে বকছ তুমি? রাগ করব কার উপর? ঝগড়া কার সঙ্গে হবে?

কেন—তোমার 'উনি'র সঙ্গে!—

আমার কেউ 'উনি' নেই।

তবে এত দিন কার কথা বলছিলে তুমি?

অল্প একটু হেসে সুভদ্রা উত্তর দিলে, কোন সত্যিকারের মানুষের কথাই নয়; উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা আর কাঁচা হাত দিয়ে ছোটখাটো একটু সাহিত্য রচনা করবার চেষ্টা করছিলাম।

আহা হা!—কমলা বিদ্রূপের স্বরে বললে,—আমি কচি খুকীটি কি না যে তোমার এই কথায় ভুলব!

কিন্তু তার পর সুভদ্রার আরও একটু কাছে সরে গিয়ে অনুনয়ের স্বরে সে আবার বললে, না, সুভদ্রা,—বল,—কি হয়েছে তোমাদের?

সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলে, কিছু না।

তবে ওখান থেকে চলে এলে কেন?

বলেছি তো,—জীবনটাকে ঢেলে সাজতে চাই।

কমলা এবার সত্য সত্যই বিরক্ত হয়ে বললে, মেয়ের ন্যাকামি দেখ। আচ্ছা বেশ,—বলতে না চাও, না বললে। কিন্তু ঠিক জেনো, সত্য চিরদিন চাপা থাকবে না।

সুভদ্রা চমকে উঠল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজকে সামলে নিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, সত্যি,—মিছে কথা আমি বলি নি, কমলা। আমি এসেছি ব্যবসা করতে, টাকা রোজগার করতে। তুমি দেখো—চোখ-মুখ বুজে আমি কেবল ব্যবসাই করব।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে, তবে হ্যাঁ,—এখানে ব্যবসার তেমন সুবিধে যদি না হয়, তবে ইচ্ছে আছে আবার পশ্চিমে চলে যাবার। অসাধারণ যদি কিছু আমি করি তবে সেটা হবে বাংলাদেশ ছেড়ে আবার পশ্চিমে যাওয়া,—আর কিছু নয়।

কমলার বিশ্বাস হল না; কিন্তু সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলি সে অবিশ্বাসও করতে পারলে না। একটু চুপ করে থেকে সে বললে, আচ্ছা, বুঝব দুচারদিনের মধ্যেই। নিজে যখন আমার কাছে থাকবে তখন চির দিন আর লুকোতে পারবে না নিশ্চয়ই।—

(৭)

বৈকালের গাড়ীতে অরুণাংশু কলিকাতায় চলে গেল। তা নিয়ে বাড়ীতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটল না। রমেনবাবু শান্ত ভাবেই তাকে বিদায় দিলেন। মহামায়াদেবীও চোখের জল চোখের মধ্যেই চেপে রেখে মুখে শুধু বললেন, একেবারে ভুলে থাকিস নে, বাবা; গিয়েই চিঠি দিস, আর ডাকলে আসিস।

অরুণাংশু কথা দিয়ে তবে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

সেই রাত্রেই অনামিকা প্রতুলবাবুর বিছানার উপর তাঁর গা ঘেঁষে বসে বললে, এ দিকের গোলমাল তো মিটে গেল, বাবা, এবার চল, আমরাও যাই। আর বেশী দিন এখানে থাকা আমাদের উচিত হবে না।

কেন, মা?—প্রতুলবাবু একটু যেন উদ্বিগ্ন হয়েই বললেন,—এ কথা কেন বলছ?

ভ্রূভঙ্গী করে অনামিকা উত্তর দিলে, তুমি কিচ্ছু বোঝ না, বাবা। চির কাল তো আর এখানে আমরা থাকতে পারব না,—কি দরকার মায়া বাড়িয়ে? যত বেশী দিন আমরা এখানে থাকব, বিদায় দিতে ওঁদের তত বেশী কষ্ট হবে।

মনে মনে প্রতুলবাবুকে মানতে হল যে আশঙ্কাটা অমূলক নয়। অনামিকার দূরদর্শিতার প্রমাণ পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সম্ভ্রমের চোখে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, ঠিক বলেছ, মা,—কথাটা আমার মনেই ওঠে নি। কিন্তু কোথায় যাবে, বল তো?

অনামিকা আবার ভ্রূভঙ্গী করে বললে, আবার ও কথা কেন জিজ্ঞেস করছ? সেদিন তো ঠিকই হয়ে গেল যে সারা পশ্চিমটা আমরা ঘুরে আসব,—একেবারে দ্বারকা পর্য্যন্ত।

প্রতুলবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, ঠিক, মা,—ঠিক। বেশ, কালই এদের আমি বলব,—দেখি, পরশুই যদি বের হয়ে পড়া যায়।

কিন্তু আমার সামনে বলো না যেন,—অনামিকা তর্জ্জনী তুলে বাপকে সাবধান করে দিলে,—আর বলো না যেন যে, যাবার জন্য আমিই উতলা হয়ে উঠেছি। তোমার তো আর কাণ্ডজ্ঞান নেই!—

তাতেই মুশকিল হল প্রতুলবাবুর। বলি বলি করেও পরদিন কথাটা তিনি বলতে পারলেন না। তার পরের দিনও সকালে দুতিনটি সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে বৈকালে আবার রমেনবাবুকে একেলা পেয়ে, মনে মনে বেশ খানিকটা পায়তারা কষবার পর লোকে যেমন করে কুইনাইন খায় কতকটা তেমনিভাবে কথাটা তিনি বলে ফেললেন, অনেক দিন তো হয়ে গেল, রমেনদা,—এবার আমাদের যেতে হবে।

রমেনবাবু চমকে উঠলেন; প্রতুলবাবুর কথাটারই যেন প্রতিধ্বনি করে তিনি বললেন, যেতে হবে!

চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে প্রতুলবাবু উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, রমেনদা,—যেতে হবে বই কি,—অনেক দিন তো হয়ে গেল!—

রমেনবাবুর মুখে এবার আর কোন কথা ফুটল না, এমন হল যেন তাঁর সারা শরীরটাই পাথর হয়ে গিয়েছে।

প্রতুলবাবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। রমেনবাবু সোজাসুজি নিষেধ করলে কি উত্তর দিতে হবে তা তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই যে কিছুই না বলে রমেনবাবু একেবারে চুপ করে গেলেন, এই অবস্থাটা তাঁর হিসাবের মধ্যে না থাকাতে হঠাৎ তিনি কর্ত্তব্য বা বক্তব্য কিছুই ভেবে পেলেন না।

কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করলেন রমেনবাবুই। দুতিন মিনিট পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কবে যেতে চাও?

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেও কুণ্ঠিত স্বরেই প্রতুলবাবু উত্তর দিলেন, কালই যে যাব এমন কোন কথা নেই, রমেনদা। তবে যেতে হবে সেই কথাই বলছিলাম।

তবে তোমাদের সম্মতি ছাড়া কি আর যাব! যেদিন খুশী হয়ে মত দেবে, যাব সেই দিন।

রমেনবাবুর ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক রকমের হাসি ফুটে উঠল; বললেন, খুশী হয়ে কি আর মত দিতে পারব, ভাই,—অনু-মা চলে গেলে বাড়ী যে আমার আঁধার হয়ে যাবে! তবু আটকাতে তো আর পারব না!—যেও যেদিন তোমাদের ইচ্ছে। কোথায় যাবে?

আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন প্রতুলবাবু। পশ্চিমে যে সব জায়গায় যাবার প্ল্যান তাঁদের তৈরি হয়ে আছে তার একটা ফিরিস্তি রমেনবাবুকে তিনি শুনিয়ে দিলেন। অযাচিত প্রতিশ্রুতিও দিয়ে ফেললেন যে, মেয়ে যদি পশ্চিমের সীমান্ত থেকে আবার দক্ষিণে যাবার বায়না না ধরে তবে ফিরবার পথে আবার দিনকয়েক এখানেই তিনি বিশ্রাম করে যাবেন।

রমেনবাবু কতক শুনলেন, কতক শুনলেন না। প্রতুলবাবুর কথা শেষ হলে আবার একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ, যেও। তবে আরও দিনকয়েক যদি থেকে যেতে পার, ভাই, তবে বড় খুশী হব আমরা। অরুণ এই সবে গেল কি না,—শেলটা এখনও বুকে বিঁধে রয়েছে।

অনুমতি যে পেয়ে গিয়েছেন তারই আনন্দে প্রতুলবাবু তখনই রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, বেশ, এক সপ্তাহ পরেই আমরা যাব,—বেড়াতেই যখন যাওয়া!—

কিন্তু রমেনবাবুর মুখের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হল না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন, তোমরা চলে গেলে খুবই কষ্ট হবে আমার। তোমাদের দেখে কত সাধই তো আমার মনে উঠেছিল। কিন্তু ভেবে দেখলাম যে, আমার সে সাধ মিটবার নয়। একমাত্র ছেলেই যার মানুষ হল না তার আর কোন সাধ মিটবে, বল! কষ্টই যে এ অদৃষ্টের লিখন।

কথাগুলি খুব স্পষ্ট নয়। প্রতুলবাবু অর্থটা ঠিক ঠিক ধরতে পারলেন না। কিন্তু সুরটা বড় করুণ,—ওর ঘা গিয়ে লাগল তাঁর মনের বীণার সমবেদনার তারটিতে। রমেনবাবুকে সান্ত্বনা দেবার, তাঁকে খুশী করবার প্রবল একটা আগ্রহ হঠাৎ যেন প্রতুলবাবুকে ভূতের মত পেয়ে বসল। একটু চুপ করে থেকে উচ্ছ্বসিত স্বরে তিনি বললেন, না, রমেনদা,—ছোট্ট একটি কষ্টকে তুমি কল্পনায় বড় বেশী বাড়িয়ে তোল।

রমেনবাবু হাসলেন,—অত্যন্ত বিষণ্ণ, ক্ষীণ সেই হাসি। বললেন, ছোট্ট একটু কষ্ট বলছ, প্রতুল! একমাত্র সন্তান মানুষ না হলে মনে কি যে কষ্ট হয় তার তুমি কি বুঝবে! বুক যে তাতে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়। সে কি ছোট্ট কষ্ট!—

কুণ্ঠিত ভাবে একটু হেসে প্রতুলবাবু উত্তর দিলেন, ছোট্ট কষ্ট তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সন্তান মানুষ না হলে তবে তো কষ্ট হবে! সে অবস্থা তো তোমার নয়! মানুষ না হবার অভিযোগ অরুণের বিরুদ্ধে কিছুতেই তো করা যায় না!—

কি যে বল!—বলে রমেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

প্রতুলবাবু জোরে জোরে মাথা নেড়ে দৃঢ় স্বরে বললেন, না, রমেনদা, না,—কিছুতেই সে অভিযোগ করা যায় না। অভিমানে অন্ধ হয়ে অরুণের প্রতি তুমি অবিচার করছ। ভুলচুক হয়তো তার হয়েছে,—কোন মানুষেরই বা তা না হয়! কিন্তু এমন কোন কাজ কোন দিনই সে নিশ্চয় করে নি যার জন্য কেউ তাকে অমানুষ বলতে পারে।

রমেনবাবু চমকে ফিরে তাকালেন; তাঁর চোখমুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু সে উজ্জ্বল্য বিদ্যুতের চকিত দীপ্তির মত। পরক্ষণেই মুখ ম্লান করে বিষণ্ণ স্বরে তিনি বললেন, তোমায় যদি আমার সত্যিকারের বন্ধু বলে আমি না জানতাম তবে বলতাম যে আমি আর আমার সন্তান,—দুজনকেই তুমি বিদ্রূপ করছ। কিন্তু তা আমি বলব না,—বলব যে, বৃথাই আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছ; তুমি নিজেই জান যে, অরুণ মানুষ হয় নি,—কোন দিন হবেও না।

না, রমেনদা, না,—প্রতুলবাবু আরও জোরে মাথা নেড়ে আরও দৃঢ় স্বরে বললেন,—আমি কক্ষনো এ কথা মানি নি,—মানবও না। মনুষ্যত্বের মাপে অরুণ এ যুগের কোন ছেলের চেয়ে খাটো নয়,—বরং সকলের সাথে দাঁড় করিয়ে দিলে তার মাথাটাই অনেককে ছাড়িয়ে উপরে উঠে যাবে।

মেঘের নীচে বর্ষার সূর্য্যের উঁকিঝুঁকির মত রমেনবাবুর চোখেমুখে আবার সেই অস্বাভাবিক দীপ্তিটি ফুটে ফুটে উঠতে লাগল। প্রতুলবাবুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সংশয়ের স্বরে তিনি বললেন, দেখ, প্রতুল, আগেও অনেকবার এ রকম কথা তুমি আমায় বলেছ। এ কি সত্যি তোমার মনের কথা? অরুণকে সত্যি কি তুমি অপদার্থ, অমানুষ মনে কর না?

বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে প্রতুলবাবু হাসিমুখে উত্তর দিলেন, না, রমেনদা,—

না; অরুণকে সত্যি আমি খুব ভাল ছেলে মনে করি। আমার ছেলে সে যদি হত, তার জন্য একটুও লজ্জা হত না আমার, বরং তাকে নিয়ে দশ জনের কাছে আমি গর্ব্বই করতে পারতাম।

রমেনবাবুর চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠল; একবার নড়ে বসলেন তিনি; মুখ ফিরিয়ে খোলা জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ তিনি বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন; তার র পহঠাৎ ফিরে আবার প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে খপ্ করে দুই হাতে তাঁর ডান হাতখানা কোলের উপর টেনে এনে কম্পিত স্বরে তিনি বললেন, তবে,—ভাই প্রতুল,—অনু চলে গেলে ঘরের আলো আমার নিভে যাবে,—ওকে আমায় দাও, ভাই,—আমার বুড়ো বয়সের মা করে, আমার ঘরের লক্ষ্মী করে, আমার পুত্রবধূ করে অনুকে আমার এই ঘরের মধ্যে আমি আটকে রাখতে চাই।

মেঘ নেই, ঝড় নেই,—হঠাৎ আকাশ থেকে বাজ পড়ল। প্রতুলবাবু চমকে উঠলেন। জাগরণে দূরে থাক্, কোন দিন স্বপ্নেও এ কথা তাঁর মনে ওঠে নি। অথচ সেই কথাই এল একেবারে প্রস্তাবের আকারে। তা-ও আবার সাদাসিধে প্রস্তাব মাত্র নয়,—একেবারে রমেনবাবুর মুখের অনুরোধ। প্রতুলবাবু এক বার ভাবলেন যে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন; কিন্তু তখনই ভুল ভেঙ্গে গেল। তাঁর হাতের উপরে রমেনবাবুর হাতের চাপ ক্রমশঃই যেন বাড়ছে,—সে হাত কাঁপছে থর থর করে, আর সেই কম্পন তার সারা গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে উদ্ধত, উন্মত্ত তরঙ্গের মত; চোখের সামনেই রমেনবাবুর মুখ,—রুগ্ন, বিবর্ণ মুখখানি উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে,—অথচ বিস্ফারিত চোখ দুটিতে ভিক্ষুকের দীনতা ও কাতরতা।

প্রতুলবাবুর মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল,—মুখের মধ্যে এক ফোটাও রস রইল না। বিব্রতভাবে চোখ নামিয়ে শুষ্ক, জড়িত স্বরে তিনি বললেন, তা—সে তো—মানে—এ তো খুব ভাল কথাই—মানে,—তোমার সাথে আত্মীয়তা—মানে, অরুণের মত ছেলে—হলে তো খুব ভালই হত;—তবে—মানে—ওরা কি বলবে—মানে—এই অনু—

কথা নয়, কেবল কতকগুলি শব্দ,—তা-ও আবার স্পষ্ট নয়। থেমে থেমে, কেটে কেটে যা-তা কতকগুলি কথা বলতে বলতে এক সময়ে প্রতুলবাবু নিজেই বোধ করি নিজের চেষ্টার নিরর্থকতা উপলব্ধি করে হঠাৎ থেমে গেলেন। ঐ

শীতের অপরাহ্ণেও তাঁর নাকের ডগা ও কপালের উপর বেশ বড় বড়, মোটা মোটা কয়েক ফোঁটা ঘাম দেখা দিল।

কোনটাই রমেনবাবুর চোখ এড়াল না। হতাশ হয়ে প্রতুলবাবুর হাত ছেড়ে দিলেন তিনি এবং পরক্ষণেই পিছনের তাকিয়ার উপর শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, না, প্রতুল,—এ হবার নয়;—আমি আগে থেকেই জানি।

নত মুখখানাকে আরও একটু নত করে প্রতুলবাবু শুধু বললেন, না, না, না;—কিন্তু সে যে কি অর্থে তা দুজনের কেউ ধরতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ পর রমেনবাবুই বললেন, তুমি সঙ্কুচিত হয়ো না, প্রতুল। আমারই মুখ নেই এ কথা তোমায় বলবার। তাই জিদ আমি করতেই পারি নে। তবু অনুরোধ আমার রইল,—ভিক্ষে চাওয়াও মনে করতে পার।

আমায় অপরাধী করো না, রমেনদা,—প্রতুলবাবু কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন; এবার মুখ তুলে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করেই তিনি বললেন,—ভিক্ষে কি বলছ, তুমি?—মানে, হয় যদি, সে তো হবে আমাদেরই সৌভাগ্য। তবে—মানে—হঠাৎ—

ঐ 'তবে' টাই তো ভাই আসল কথা!—বলতে বলতে রমেনবাবুর ঠোঁটের কোণে আবার সেই অদ্ভুত হাসির একটা রেখা ফুটে উঠল; সোজা হয়ে উঠে বসে তিনি আবার বললেন, সেজন্য তুমি কুণ্ঠিত হয়ো না। মনের একটা ইচ্ছে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে। অনুরোধ শুধু এইটুকু রইল যে, পার যদি, কথাটা একটু ভেবে দেখো।

ভেবে দেখবার প্রয়োজন প্রতুলবাবু খুব তীব্র ভাবেই অনুভব করছিলেন। যা ঘটে গিয়েছে, তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কেঁচো খুঁড়তে একেবারে যেন সাপ বের হয়ে পড়েছে। মনটাতে এত জোরে ধাক্কা লেগেছে যে, সেটার অবস্থা হয়েছে মূর্চ্ছিতের মত। এখন তাঁর সব চেয়ে বেশী দরকার নির্জ্জনতার। রমেনবাবুর কাছে বসে থাকাটাই তাঁর দুঃসহ একটা যন্ত্রণা মনে হতে লাগল। নিজের ঘরে পালিয়ে যাবার জন্য তিনি উসখুস করতে লাগলেন।

কিন্তু তাতেও বাধা পড়ল,—মুখ ফুটে কথাটা বলবার আগেই মহামায়াদেবী সেই ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন।

দুজনের কারও মুখের অবস্থাই স্বাভাবিক নয়,—দুজনেই চুপচাপ,—ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। মহামায়াদেবী মাঝপথেই থমকে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, কি হল তোমাদের?

দুজনেই চমকে উঠলেন; প্রতুলবাবু শুকনো রকমের একটু হাসি হেসে বললেন, এই যে বৌদি,—আসুন।

রমেনবাবুও নড়ে বসলেন; তিনিও মুখখানা হাসবার মত করে বললেন, প্রতুলকে বলছিলাম,—সেই তুমি, আর আমি অনেক বার যে স্বপ্ন দেখেছি, তারই কথা। ওঁরা চলে যাবে বলছিল কি না,—তাই বললাম। দাবী তো করতে পারি নে,—ছেলেই আমাদের মানুষের মত মানুষ যখন নয়!—পারি শুধু ভিক্ষে চাইতে। তাই অনুকে প্রতুল যদি অরুণের হাতে দিতে পারে সেই কথাটাই শুধু ভেবে দেখতে বললাম।

মহামায়াদেবীর মুখখানা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠে পরক্ষণেই আবার বিবর্ণ হয়ে গেল। উদ্বেগ, আশঙ্কা, সন্দেহ,—সব মিলে তার চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, চোখের কোণে এবং ললাটের বাঁকা রেখায় বিরক্তিও বেশ স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠল। অনামিকা আর অরুণাংশুর নাম একত্র মিলিয়ে স্বামীর সঙ্গে অবশ্যই তাঁর অনেক কথা হয়েছে। অনুকে ঘরে আনবার স্বপ্ন তাঁর নিজের,—ওরা চলে যাবার আগেই প্রতুলবাবুর কাছে কথাটা তুলতে হবে, এ-ও তাঁরই প্রস্তাব। স্বামীর সঙ্গে গোপনে অনেক আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তটা তিনি করে রেখেছিলেন। কিন্তু কথাটা যে তাঁর অসাক্ষাতে বলা হয়ে যাবে, এটা সেই সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সেই কারণেই স্বামীর মুখে সংবাদটা শুনে তিনি কেবল চমকে উঠলেন না, রীতিমত ভয়ও পেয়ে গেলেন। রমেনবাবুর কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধা খুব বেশী নেই; তাছাড়া নিজের ছেলে হলেও অরুণাংশুর সম্বন্ধে যে মত তিনি পোষণ করেন, তা নিয়ে সেই অরুণাংশুরই স্বপক্ষে ওকালতি যদিও বা করা যায়, ঘটকালি করা যায় না নিশ্চয়ই। কে জানে কি বলতে কি তিনি বলে ফেলেছেন—হিত করতে গিয়ে বিপরীত করে বসাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব তো কিছুই নয়!—

এক সঙ্গেই এত সব কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। চকিতে স্বামীর মুখখানা একবার দেখে নিলেন তিনি,—সে দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসার চেয়ে ধিক্কারের অনুপাত

বেশী। ফিরে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে যখন তিনি তাকালেন তখন তাঁর চোে ফুটে উঠল উদ্বেগ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। চৌবি একখানা টেনে এনে খাটের গা ঘেঁষে বসে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেে হেসেই তিনি বললেন, তা, ঠাকুরপো,—ভেবে দেখুন যত আপনার খুশী। কিং আমরা বলে রাখছি,—অনুকে আমাদের চাইই ;—বেয়াই সম্পর্ক আপনার সাে আমরা পাতাবই পাতাব।

প্রতুলবাবু আরও বিব্রত হয়ে পড়লেন। এতক্ষণ রমেনবাবু ছিলেন একা হাজার হলেও তিনি পুরুষ মানুষ ; তাঁর সঙ্গে প্রতুলবাবুর যে সম্বন্ধ তাতে শ্রদ্ধা মিশাল থাকলেও সেটা মুখ্যতঃ বন্ধুত্ব,—তাতে এক পক্ষে দাবী করবার অধিকা যেমন আছে, তেমনি অপর পক্ষে আছে সে দাবীকে প্রত্যাখ্যান করবার অধিকার কিন্তু মহামায়াদেবীর দাবী বা অনুরোধ অত সহজে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তিি নারী,—তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ধরণটাকে একেবারে বদলে দিতে হয় প্রতুলবাবুর মনে হতে লাগল যে, তিনি হঠাৎ যেন অথই জলের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন

তথাপি উত্তর তাঁকে দিতে হল ; ঠোঁটের কোণে অল্প একটু কাষ্ঠহাসি ফুটিয়ে তুে তিনি বললেন, সে তো আমারই সৌভাগ্য, বৌদি,—আপনাদের সাথে কুটুম্বিত করা !—

না, ভাই,—তা বলতে পারি নে,—মহামায়াদেবী ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন ; মু গম্ভীর করে, কণ্ঠস্বর মোলায়েম, এমন কি বেশ একটু করুণ করেই তিনি আবা বললেন, সৌভাগ্য হবে আমাদেরই অনুর মত মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী করে যদি ঘরে আনতে পারি। কি মমতাই যে তার উপড় পড়ে গিয়েছে আমাদের—সে চলে গিয়েছে মনে করলেই বুকের মধ্যে হুহু করতে থাকে। অনু এক দণ্ড চোখের আড়াল হলেই কি যে ওঁর অবস্থা হয়, সে তো এখানে থেকে নিজের চোখেই আপনি দেখেছেন !—

প্রতুলবাবু নিরুত্তর,—মনে মনেও কোন উত্তর তিনি ভেবে পেলেন না।

একটু পরে মহামায়াদেবীই আবার বললেন, কিন্তু আমাদের কথা আমি তত ভাবি নে, ঠাকুরপো, যত ভাবি ওদের দুজনের কথা। এক মাসেরও বেশী দুজনে এক সাথে ছিল,—যখনই দুজনকে একত্র দেখেছি তখনই মনে হয়েছে যে, ভগবান এদের দুজনকে এক করবার জন্যই যেন সৃষ্টি করেছেন। আর ওদের দুটিতে যে ভাব,—সে তো বেড়েই চলেছে। অরুণের মুখে 'অনু' ছাড়া তো কথাই নেই;

আর,—আপনি তো এসব জানেন না, আর আপনার মত সদাশিব ভোলানাথের চোখে এসব পড়বার কথাও নয়; কিন্তু আমি দেখেছি, ঠাকুরপো,—মেয়েমানুষের চোখ দিয়ে দেখেছি,—অরুণের ঘরটা নিজে গুছিয়ে না দিলে, অরুণের খাবার নিজের হাতে সাজিয়ে না দিলে অনুর যেন তৃপ্তিই হয় না!—

এবারও প্রতুলবাবু নিরুত্তর,—তার চোখ দুটি মহামায়াদেবীর মুখের উপর পড়ে রয়েছে বটে, কিন্তু দেখছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটি জিনিষ,—ছোট ছোট দুএকটি কথা, দুএকটি চাহনী, দুএকটি অনুরোধ, হাসি-গল্প, পরিহাস-বিদ্রূপ, অনুনয়-অভিমানের টুকরা টুকরা ছবি দিয়ে গড়া গত এক মাসের ইতিহাসের একখানা যেন সরল, সবাক ছায়াচিত্র।

কথা থামিয়ে মহামায়াদেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতুলবাবুর মুখের অবস্থাটা এক বার দেখে নিলেন,—মনের ভাবটাও যেন মোটামুটি আঁচ করে নিলেন। তার পর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলেন, ঠাকুরপো,—ওদের দুজনকে পাশাপাশি দেখলে মনে হয় না যে, ওদের দুহাত এক যদি করে দেওয়া যায় তো সে খুব ভাল হয়?—

প্রতুলবাবু অন্যমনস্ক, কতকটা যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতই বললেন, হ্যাঁ,—বেশ হয় তাহলে।

মহামায়াদেবীর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে সনির্ব্বন্ধ স্বরে তিনি বললেন, তাই আমরাও বলছি, ঠাকুরপো,—আর সেই জন্যই অনুকে আপনার কাছে ভিক্ষে চাচ্ছি আমরা।

কিন্তু এবার প্রতুলবাবু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলেন; এক বার মহামায়াদেবী ও এক বার রমেনবাবুর মুখখানা দেখে নিয়ে চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে তিনি বললেন, বার বার ও কথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না, বৌদি,—আমার একার মতে কিছুই তো হবার নয়! বুঝতেই তো পারেন,—মানে, অনু যখন বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে,—তখন তার নিজের মত ছাড়া এ ব্যাপারে কিছুই তো হতে পারবে না!—

চোখে-মুখে একটা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে তুলে মহামায়াদেবী উত্তর দিলেন, অনুর মত মেয়ে আপনার কথার অবাধ্য কিছুতেই হবে না, ঠাকুরপো!—

কিন্তু এরই উত্তরে সোজাসুজি মহামায়াদেবীর মুখের দিকে চেয়ে প্রতুলবাবু দৃঢ় স্বরেই বললেন, সেই জন্যই এ ব্যাপারে আমার কথায় কিছুই হবে না,—অনুর নিজের সানন্দ সম্মতি ছাড়া আমি কিছুই করতে পারব না।

মহামায়াদেবী অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলেন ; বললেন, তা তো ঠিকই,—তার মত নিতে হবে বই কি ! তার মত না নিয়েই কি আর আপনাকে আমরা কথা দিতে বলছি !—ওকে জিজ্ঞাসা করেই আপনি কথা দেবেন।

মিনিট খানিক কাল চুপ করে থাকবার পর হঠাৎ আঁচল দিয়ে চোখের কোণ দুটি মুছে ফেলে মহামায়াদেবী গাঢ় স্বরে আবার বললেন, জোর করবার, দাবী করবার মুখ সত্যি আমাদের নেই, ঠাকুরপো। তবু আপনি নিজ গুণে দয়া করেই তো অরুণকে মানুষ করবার ভার নিয়েছেন,—কাজেই তাকে সংসারী করবার ভারও আপনাকেই নিতে হবে।

থাক্, থাক্,—এবার কথা বললেন রমেনবাবু,—এ সব কথা তুমি থামাও এখন। আমাদের যা বলবার ছিল তা আমরা ওর কাছে পেশ করে দিয়েছি। এখন যা করবার তা প্রতুলই করবে। বার বার অনুরোধ উপরোধ করে ওঁকে আর বিব্রত করো না তুমি।—

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা আগেই হয়ে গিয়েছে। প্রতুলবাবু শুধু বিব্রত নন, রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই রমেনবাবুর অনুরোধে তখনকার মত বাইরে অনুরোধ-উপরোধের পালা সাঙ্গ হলেও প্রতুলবাবুর আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ চিত্তে অশান্ত তরঙ্গের মাতামাতি পুরা দমেই চলতে লাগল।

অবস্থাটা অভূতপূর্ব্ব। যে সম্ভাবনার কথা ইতিপূর্ব্বে কোন দিন তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি, তাই একেবারে বাস্তব হয়ে সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে,—চীৎকার করে ঘোষণা করেছে নিজের উপস্থিতি ; কেবল মনোযোগ মাত্র নয়, সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত দাবী করেছে অপ্রতিরোধ্য অধিকারের জোরে,—অপরাধের অনুভূতিক্লিষ্টা মায়ের কাছে অশান্ত, রোরুদ্যমান শিশু যেমন করে নিজের অধিকারের দাবী করে, ঠিক সেই রকমে। রমেনবাবু ও মহামায়াদেবীর প্রস্তাব, তাঁদের কাতর কণ্ঠের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁর নিজের পিতৃত্ব ও তৎসঞ্জাত দায়িত্ববোধ, মাতৃহীনা কন্যার যৌবন-পুষ্পিত তনুদেহ, অরুণাংশু, গত এক মাসের ইতিহাস,—এদের প্রত্যেকটাই কঠিন, জাজ্জ্বল্যমান বাস্তব ;—চোখ বুজে অস্বীকার করবার বা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার মত একটিও নয়। এত দিন তিনি যেন ঘুমিয়ে ছিলেন ; কখন যে এতগুলি শত্রু

তাঁকে ঘিরে ফেলেছে তা তিনি জানতেও পারেন নি; হঠাৎ জেগে উঠে নিজেকে সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর অসহায় অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

আসল কথা এই যে, অরুণাংশুর সঙ্গে অনামিকার বিয়ের কথা দূরে থাক্, মেয়ের বিয়ের কথাই এপর্য্যন্ত ভাববার মত করে তিনি ভাবেন নি। ঘরে গৃহিণী নেই, ঘরের বাইরেও অভিভাবকস্থানীয় এমন কোন আত্মীয় নেই যে জোর করে তাঁকে একটি কথাও বলতে পারে। একটি মাত্র কন্যাকে নিয়ে সৃষ্টির মধ্যেও সৃষ্টিছাড়ার মতই এত কাল তিনি জীবন কাটিয়ে এসেছেন। সে কন্যা যে কি সমস্যা, তা কেউ তাঁকে বুঝিয়ে দেয় নি। বন্ধুবান্ধব বা দূর-সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় কথাপ্রসঙ্গে অনামিকার বিয়ের কথা তাঁর কাছে তুললে তিনি কেবল একটি বার স্মিত মুখে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখেছেন,—কদাচিৎ কোন দিন হয়তো একটি আদরের বা পরিহাসের কথা বলছেন,—খুব বেশী হলে 'তাইতো' বলে কুণ্ঠিতভাবে চোখ নামিয়েছেন; তার পর লোকটি চলে গেলেই সব ভুলে গিয়ে আবার মেয়ের সঙ্গে নিতান্ত শিশুর মতই হাসিকৌতুক, মান-অভিমান, খেলাধূলায় মেতে উঠেছেন। মেয়ের বিয়ের ভাবনা কোন দিনই তাঁর মনের গায়ে পাকাপাকি ভাবে কোন দাগ কাটতে পারে নি। স্নেহের মুখোশপরা একটা উদ্ধত স্বার্থপরতা, হয়তো বা অবচেতন চিত্তের একটা অতি-সূক্ষ্ম ঈর্ষা তার প্রিয়তমা কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও এত দিন তাঁকে একেবারে অন্ধ করে রেখেছিল। স্বয়ং অনামিকাও তাঁর চোখ ফোটাবার জন্য কিছুই করে নি। এক বাপ ছাড়া কোন পুরুষের সঙ্গেই সে তেমন মেশে নি,—সে যে মেয়ে এবং যুবতী, এই কথাটাও যেন কোন মতেই বাপকে সে বুঝতে দেয় নি।

কিন্তু আজ এক দিন, এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত অবস্থাটা একেবারে বদলে গিয়েছে। গোটা সমস্যাটা খোলা একখানি পটের মত পূর্ণ ও স্পষ্ট হয়ে তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। উড়ো খবর নয়, কথার কথা নয়, পরিহাসতরল রসিকতা নয়,—আজ একেবারে জলজ্যান্ত পাত্রের পক্ষ থেকে পাকাপাকি বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। মেয়ে আছে, সে মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে, বিয়ে তার দিতে হবে,—এই জাজ্জল্যমান সত্যটাকে আজ আর উপেক্ষা করবার উপায় নেই।

কিন্তু মুশকিল হল ঐ প্রস্তাবটাকে নিয়ে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে,—এ কথা

মেনে নিলেও ঐ অরুণাংশুর সাথেই তাঁর বিয়ে দেবার প্রস্তাবে প্রতুলবাবুর মন যেন ঠিক সায় দেয় না। যে অবস্থাটা তাঁর হল তা উভয়সঙ্কটের। রমেনবাবুর কাছে এত দিন তিনি অরুণাংশুর প্রশংসাই করেছেন। সে যে অহেতুক স্তুতিবাদ ছিল, তা অবশ্য নয়। তাঁর ঐ আচরণের মধ্যে কপটতাও ছিল না। অরুণাংশুকে তাঁর ভাল লাগে নি, তা নয়। অরুণাংশুর রূপ উপেক্ষা করবার মত নয়। তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও তিনি যথেষ্ট পেয়েছেন। তার সরল, অমায়িক ব্যবহার ও হাসিখুশী ভাব, দেশ ও জনসেবাপ্রবৃত্তি, তার আত্মত্যাগ, তার কষ্ট-সহিষ্ণুতা, তার বিলাসবিমুখতা, তার দৃঢ়তা এবং সকলের উপর, এত বড় পরিবারের সম্ভ্রম ও অতুল পৈতৃক সম্পত্তি সম্বন্ধে তার পরিপূর্ণ উদাসীনতা লক্ষ্য করে প্রতুলবাবু মুগ্ধই হয়েছেন। সকল কথা ভাল করে জানার আগেই, সেই কলিকাতার বাড়ীতে থাকতেই অরুণাংশুকে তিনি বেশ একটু স্নেহও করতে সুরু করেছিলেন। তবু রমেনবাবুর কাছে বরাবরই তিনি অরুণাংশুর যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তার মধ্যে আতিশয্য ছিল। রমেনবাবু তাঁর প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তিনি তাঁর শুভাকাঙ্খী। তাঁর একমাত্র পুত্রের সঙ্গে অকারণে বা সামান্য কারণে তাঁর ছাড়াছাড়ি হবে, এই চিন্তাটা প্রতুলবাবু সইতে পারেন নি বলেই পিতা ও পুত্রের মনোমালিন্য দূর করে তাদের মিলন ঘটাবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। পিতার কাছে করেছেন পুত্রের প্রশংসা আর পুত্রের কাছে পিতার। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যবহারজীবীর মত উভয় ক্ষেত্রেই বেশ একটু বাড়িয়ে বলেছেন। তাছাড়া, তখন তিনি অরুণাংশুকে দেখেছেন একেবারে নিস্পৃহ চোখে—নিঃসম্পর্কীয় বাইরের এক জন লোক হিসাবে—বড় জোর, বন্ধুর পুত্র হিসাবে। কাজেই তার দোষত্রুটি সম্বন্ধে একটা সহিষ্ণু, এমন কি, উদার মনোভাব অবলম্বন করতে পেরে মনে মনে তিনি বরং বেশ একটু আত্মপ্রসাদই উপভোগ করেছেন। কিন্তু এবার যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তা একেবারেই আলাদা। আর এক জনের যে ছেলে বা জামাতা লেখাপড়া শিখেও শান্ত ও শিষ্ট হয়ে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন না করে বড় বড় মহাপুরুষদের অনুকরণে মহত্তর কর্ত্তব্যের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করে, দূরে দাঁড়িয়ে তাদের বাহবা দিয়ে স্বীয় গুণগ্রাহীতার পরিচয় দেওয়া এক কথা; আর তেমনি এক জন হবু-মহাপুরুষের হাতে নিজের যথাসর্ব্বস্বের সঙ্গে একমাত্র কন্যাকেও নিঃসঙ্কোচে সঁপে দেওয়া

একেবারে আর এক কথা। এই শেষের সমস্যাই বড় বেশী বাস্তব হয়ে অবিলম্বে প্রতুলবাবুর কাছে সমাধান দাবী করতে লাগল।

এবার প্রতুলবাবুর ঘাড়ে দায় পড়ল নির্ব্বাচন করবার। যে ছিল পর,—বন্ধুর পুত্র মাত্র, তাকেই ভাবতে হল নিজের একমাত্র কন্যার পাত্র হিসাবে; প্রয়োজন উপস্থিত হল তার যোগ্যতা, তার বিশ্বস্ততা অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখবার। কাজেই তাঁর চোখের দৃষ্টিই গেল বদলে। ইতিপূর্ব্বে অরুণাংশুর দোষত্রুটিগুলি যেন তাঁর চোখেই পড়ে নি, বা যেগুলির কথা রমেনবাবু উল্লেখ করলেও যুগধর্ম্ম বা বয়োধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নিজে তিনি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন, আজ কল্পনায় অরুণাংশুকে অনামিকার পাশে দাঁড় করিয়ে তার দিকে চাইতেই ঠিক সেইগুলিই কেবল বড় নয়, রীতিমত ভয়ঙ্কর প্রতীয়মান হতে লাগল,—বিশেষ করে, তার জীবনযাপনের প্রণালী এবং ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে তার মতামতগুলি। ধনের ভাবনা এক বারও প্রতুলবাবুর মনে উঠল না; অরুণাংশু নিজে এক পয়সাও কোন দিন রোজগার না করলেও তার স্ত্রীহিসাবে অনামিকাকে কখনও যে অর্থকষ্ট সইতে হবে না, এ তিনি নির্ব্বিবাদেই মেনে নিলেন। রূপ, স্বাস্থ্য বা বংশমর্য্যাদার সম্বন্ধেও তার কোন দুর্ভাবনা হল না। ঠিক রমেনবাবুর মত অরুণাংশুকে তিনি 'অমানুষ' আখ্যায় অভিহিত করে তাকে ছোট করেও তিনি দেখলেন না। তথাপি যে ছেলের সংসারের কোন আকর্ষণ নেই, জীবনের সব চেয়ে বিপদসঙ্কুল পথটাই যে বিচার করে বেছে নিয়েছে নিজের চলার পথ হিসাবে এবং ভগবানের অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করে গোটা সমাজটাকেই যে বিজাতীয় ছাঁচে ঢেলে নূতন করে গড়বার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে, তারই হাতে নিজের একমাত্র কন্যাকে সমর্পণ করবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর মনটা ক্রমাগতই খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল।

অথচ প্রস্তাবটাকে সড়াসড়ি অগ্রাহ্য করবারও উপায় নেই। সমস্যাটা জটিল। মন সায় দেয় না, কিন্তু মুখ ফুটে তা বলাও যায় না। গত এক মাস কাল ঐ রমেনবাবুর কাছেই কারণে এবং অকারণেও অরুণাংশুর প্রশংসা করে নিজের মুখে যে সব কথা তিনি বলেছেন তার কোনটাই প্রত্যাহার করা যায় না। রমেনবাবুর যে সব যুক্তি তিনিই অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে খণ্ডন করেছেন, আজ রমেনবাবুর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নিজের মুখে সেই সব যুক্তি প্রয়োগ করতে মনের

মধ্যে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়। অবস্থাটা যেন অখাত সলিলে ডুবে মরবার মত। ওর মধ্যেই আবার রমেনবাবু ও মহামায়াদেবীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বেড়াজালের মত তাকে চেপে ধরেছে। প্রস্তাবটা ঘটকের মারফতে এলে তিনি এমন বিব্রত হতেন না; প্রত্যাখ্যানের শক্ত কথাটাও তৃতীয় পক্ষের মুখের উপরেই হয়তো তিনি বলে দিতে পারতেন। কিন্তু যে অবস্থা হয়েছে তাতে উত্তরটা দিতে হবে হয় রমেনবাবুকে, নয় মহামায়াদেবীকে,— হয়তো বা তাঁদের দুজনকেই এক সঙ্গে। তাতেও মুশকিল হয়েছে আরও বেশী। মনটাকে শক্ত করে, মনে মনে বার বার মহড়া দিয়ে উত্তরটাকে ঠিক করলেও রমেনবাবুর দীন ভিক্ষুকের মত সকাতর মুখের ভাব বা মহামায়াদেবীর চোখের জলও তখনই মনে পড়ে যায়; আর সঙ্গে সঙ্গেই মনের ভিতরের কঠিন সঙ্কল্প আগুনের আঁচে বরফের মত গলে জল হয়ে যায়,—অত যত্নে মহড়া দেওয়া 'না' কথাটা মুখে আর ফুটতে চায় না।

কিন্তু প্রতুলবাবুর সব চেয়ে বেশী মুশকিল হল অনামিকাকে নিয়ে। সমস্যাটির যে ছবি এক বার তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, তাতে অনামিকা নিষ্ক্রিয় মোটেই নয়, বরং যেন বড় বেশী সক্রিয়। মহামায়াদেবী সেদিন প্রায় স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, অনামিকার মন আকৃষ্ট হয়েছে অরুণাংশুর দিকে। ঐ দুএকটি কথাই যেন প্রতুলবাবুর সাদা চোখে মায়াকাজল বুলিয়ে দিয়েছে,—গত এক মাসের ইতিহাসটাকে তিনি যেন নূতন করে দেখেছেন নূতন এক জোড়া চোখ দিয়ে। আগে কিছুই ওঁর মনে হয় নি; কিন্তু আজ অতি তুচ্ছ ঘটনাটিকেও তিনি আর তুচ্ছ করতে পারছেন না। সত্যই তো, অনামিকা অরুণাংশুর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছে যেমন আগে আর কোন পুরুষের সঙ্গেই সে মেশে নি। কেবল কলিকাতার বাড়ীতে নয়, এই এলাহাবাদের বাড়ীতেও। অরুণাংশুকে অনামিকা সেবাযত্ন করেছে, তার সঙ্গে হাস্যপরিহাস করেছে, গল্প করেছে, তার সম্বন্ধে অসাধারণ কৌতূহল প্রকাশ করেছে; সকলের উপর, তার বাপের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া করিয়ে দেবার জন্য ঐ অনামিকাই সকলের আগে তাঁকে অনুরোধ করেছে, পরে তাগিদ দিয়েছে এবং সকল রকম অশান্তি ও ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যেও নিজে শান্ত ও অটল থেকে তাঁকে প্রেরণা ও পরামর্শ জুগিয়েছে। কে জানে এ সব মনের টানের বাইরের অভিব্যক্তি কি না! নিজে নিজেই একটা সিদ্ধান্ত করে সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি সড়াসড়ি উড়িয়েই বা দেবেন কেমন করে!

মেয়ের মনের কতটুকু খবরই বা তিনি রাখেন! এই যে এতখানি বয়স তার হয়েছে, সে খবরটাও তো নিজে তিনি রাখবার মত করে রাখেন নি! মাতৃহীনা, আত্মীয়স্বজনহীনা কন্যাকে সমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন করে নিজের বয়সী দুচার-জন বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর সকল পুরুষের সাহচর্য্য থেকে বঞ্চিত করে বরাবর তাকে নিজের কাছেই তিনি বন্দী করে রেখেছেন,—বুকে তার কোন ক্ষুধা জেগেছে কি না, সে সম্বন্ধে তিনি কোন খোঁজও নেন নি। সেই মেয়ে এবার অরুণাংশুর মত ছেলের সাহচর্য্যে এসে তাকে যদি ভালবেসে থাকে, তাতে আশ্চর্য্য হবার তো কিছু নেই! বরং সেটাই হবে তার পক্ষে স্বাভাবিক। অন্ততঃ সে সম্ভাবনাটাকে অসম্ভব বলে তিনি উড়িয়ে দেবেন কোন অধিকারে!—

উড়িয়ে তিনি দিতেও পারলেন না। ঐ তো একটি মাত্র মেয়ে যাকে সুখী করা ছাড়া তাঁর নিজের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্যই নেই! আর সেই মেয়েরই বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। মেয়ের মনটাকে একেবারে উপেক্ষা করে সে প্রস্তাব সম্বন্ধে কি কোন সিদ্ধান্ত করা যায়! ফল হল এই যে, প্রতুলবাবুর মনের 'না' ইচ্ছাটা ঘা খেয়ে খেয়ে ক্ষীণ হয়ে পড়তে লাগল; অথচ 'হ্যাঁ' ইচ্ছাটাও শক্ত কোন অবলম্বনের অভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারলে না। বিহ্বল মনের বিহ্বলতা বেড়েই চলল।

এমন কেউ নেই যার কাছে একটা পরামর্শ চাওয়া যায়। রমেনবাবু ও মহামায়াদেবী বরপক্ষের লোক; তার উপর নিজেরাই আবার প্রস্তাবক;—তাঁদের কাছে পরামর্শ চাওয়ার কোন অর্থই হয় না। বাকি থাকে ঐ অনামিকা। তাঁর কাছে পরামর্শ অবশ্য চাওয়া যায়,—মুখে কথা ফুটবার পর থেকে ঐ অনুই তো সকল বিষয়েই তাঁর মন্ত্রীর কাজ করে এসেছে! আজ ঐ বিষয়ে পরামর্শ তারই সঙ্গে করবার প্রয়োজনও রয়েছে,—তার নিজের মত ছাড়া কিছুই যখন হবার নয়। কিন্তু ওতেও সঙ্কোচ এসে প্রতুলবাবুর মুখ চেপে ধরে। বাপ হয়ে বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে তারই বিয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি আলাপ করবেন কেমন করে! তার যুবতীহৃদয়ের গোপন রহস্যটি সম্বন্ধে কেমন করে তাকে নিজের মুখে জেরা করবেন তিনি,—কোন মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন তার ভালবাসার কথা! এত কাল কত গুরুগম্ভীর বিষয়, কত গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধেই তার সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা করেছেন,—কোন দিন কিছুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ হয় নি। কিন্তু

এবার যে বিষয়টি সম্বন্ধে আলাপ করা দরকার, তা একেবারে ভিন্ন জাতের। মেয়েকে সামনে বসিয়ে সোজাসুজি তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে,—বিয়ে করতে সে রাজী আছে কি না! ঐ তো এক নিদারুণ সমস্যা! অথচ ঐটুকুই কেবল নয়,—অরুণাংশুকে সে ভালবাসে কি না, তা-ও জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। অবস্থাটা কল্পনা করতেও প্রতুলবাবুর দেহ ও মন দুইই যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল তাঁর স্বর্গীয়া স্ত্রী লীলাকে; দেখতে দেখতে দুই চোখ তাঁর ছল ছল করে এল; মনে হল,—তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে এই সমস্যা নিয়ে আজ নিজেকে তাঁর একটুও ভাবতে হত না। তিনি নিজেই—হয়তো বা একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা না করেই—অনামিকার মনের কথাটি জেনে নিয়ে ঐ রমেনবাবুদের সঙ্গেও অনায়াসেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারতেন।

এমনি সব আকাশ-পাতাল কত রকম ভাবনা তাঁর মনে উঠতে লাগল। অথচ বাইরে সতর্ক থাকতে হল মনের দ্বন্দ্ব বা দুর্ভাবনা মুখের ভাবেও যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে। অনামিকাকে সব কথা খুলে বলতে যখন মন চাইছে না তখন তার কাছে ধরা পড়তে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু আত্মরক্ষা করা খুব সোজা কাজ নয়। অনামিকার চোখের দৃষ্টি স্নেহে কোমল বলেই সতর্কতায় বড় বেশী তীক্ষ্ন। বাপের মুখের ভাবের সামান্য ব্যতিক্রম হলেও তা-ও হয়তো তার চোখ এড়াবে না; আর চোখে পড়লেই জেরায় জেরায় সে তাকে অস্থির করে তুলবে। রোগের ভান করেও নিস্তার নেই। শরীর ভাল নেই শুনলেই অনামিকা এমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে যে, হয় তো বা সারাটা রাতই সে তার মাথার কাছে ঠায় বসে কাটাবে! আসল ভাবনাটার সঙ্গে আত্মরক্ষার এই দুর্ভাবনাটা মিলে প্রতুলবাবুকে আরও বেশী কাহিল করে ফেললে। অনামিকার চোখ এড়াবার উদ্দেশ্যে বৈকালে একা একাই বেড়াতে বের হয়ে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত তিনি বাইরেই কাটিয়ে এলেন। এসেই নিজের ঘরে গিয়ে আরাম-চৌকিতে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে মাথার কাছে বাতিটি জ্বেলে একখানা বই খুলে এমন ভাবে সেটা মুখের কাছে তুলে ধরলেন যাতে কাছে এসে খুব অভিনিবেশ সহকারে না তাকালে তাঁর মুখখানা কারও চোখে না পড়ে। বিস্মিতা অনামিকা জিজ্ঞাসা করলে মিথ্যা করে তিনি বললেন যে, বইখানা তাঁর এত ভাল লেগেছে যে, ও খানা শেষ না করে আর কিছুতেই তিনি মন দিতে পারছেন না। অথচ ঘণ্টা খানিক পর খাওয়া হয়ে যেতেই ঘুম পেয়েছে বলে ঘরে গিয়েই তিনি আপাদমস্তক

লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। অনামিকার সঙ্গে সে রাত্রে ভাল করে তিনি কথাই বললেন না।

কিন্তু বই বা লেপের আড়ালে সুদীর্ঘ কাল মুখ ঢাকা যায় না। গেলেও শিকারী অনবরত পিছন থেকে তাড়া করতে থাকলে উটপাখীর ঐ আত্মরক্ষাকৌশল অবলম্বন করে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। কার্য্যতঃ সমস্যার অস্তিত্বটাকেই অস্বীকার করে প্রতুলবাবু ওর সমাধান করতে পারলেন না। পরদিন সকালেই রমেনবাবুর অসাক্ষাতে মহামায়াদেবী আবার তাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, অনুর মতটা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঠাকুরপো ?

তাঁর কণ্ঠস্বর সঙ্কোচে মৃদু হয়ে ফুটলেও ওটাই প্রতুলবাবুর মনের গায়ে গিয়ে ফুটল তীক্ষ্ণধার একটি তীরের মত। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত, অস্ফুট স্বরে তিনি উত্তর দিলেন, না, বৌদি,—আজ জিজ্ঞেস করব'খন।—বলেই সন্ত্রস্ত হরিণশিশু যেমন করে শিকারীর সমুখ থেকে ছুটে পালায়, কতকটা সেই রকমেই তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন আর একটা প্রশ্নের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য।

কিন্তু ঘরে গিয়েই মেয়ের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন।

প্রতুলবাবুর ভাবান্তরটা রাত্রেই অনামিকার চোখে পড়েছিল। তাতে সে বিস্মিত হলেও তখন ততটা গা করে নি। কিন্তু সকালেও তাঁর অন্যমনস্কভাব, তাঁর মুখের উপর দুশ্চিন্তার হাল্‌কা, কালো, একখানা ছায়া দেখতে পেয়ে ব্যাপারটাকে সে আর উপেক্ষা করতে পারে নি। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রমেনবাবুর কাছে না গিয়ে সে বাপের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিল নির্জ্জনে জিজ্ঞাসাবাদ করে অবস্থাটা ঠিক ঠিক বুঝে নেবার উদ্দেশ্যে।

অমনই যখন তার মনের অবস্থা ঠিক তখনই প্রতুলবাবু এক রকম ছুটতে ছুটতে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। বাপের মুখের দিকে চেয়ে অনামিকার মনের বিস্ময় এক নিমেষেই উৎকণ্ঠায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে, বাবা ?

প্রতুলবাবু চমকে থমকে দাঁড়ালেন। ঠিক এই সময়ে অনামিকার কাছে ধরা পড়াটা তাঁর কাছে এক প্রথম শ্রেণীর দুর্দ্দৈব বিশেষ। তাঁর বিবর্ণ মুখখানি আরও

বেশী বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু ওরই মধ্যে কোনও রকমে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে তিনি বললেন, এ কি,—অনু যে! এখানে কেন, মা? কখন এসেছ তুমি? আমি ভাবছিলাম—

অতগুলি প্রশ্নকে একেবারেই উপেক্ষা করে অনামিকা বাপের মুখের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে, বাবা?

প্রতুলবাবুর বিব্রত ভাবটা আরও বেড়ে গেল; এক বার ঢোক গিলে তিনি বললেন, কৈ না,—কিছু হয়নি তো! অমনি রমেনদার সাথে কথা বলছিলাম। তা চলে এলাম কালকের সেই বইখানাকে শেষ করবার জন্য। কৈ,—কোথায় গেল বইখানা?—বলতে বলতে এমন ভাবে বইখানাকে তিনি খুঁজতে আরম্ভ করলেন যেন সত্য সত্যই ঐ বইখানার জন্যই তিনি ঘরে এসে ঢুকেছেন,—যেন অনামিকার দিকে মনোযোগ দেবার সময় তাঁর একেবারেই নেই।

অনামিকা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু প্রতুলবাবু বইখানা হাতে নিয়ে আরাম-চৌকিখানার উপর গিয়ে বসতেই অনামিকাও ঐ চৌকিরই হাতার উপর বসে পড়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে, বল না, বাবা,—তোমার কি হয়েছে?—সঙ্গে সঙ্গেই ভুরু আর ঠোঁটের বিশেষ একটা ভঙ্গী করে প্রতুলবাবুকে সে বুঝিয়েও দিলে যে, তাঁর অতগুলি কথার অর্থ যে কিছুই নেই, ওগুলি যে বলা হয়েছে তাকেই ভোলাবার জন্য, তা সে বেশ বুঝতে পেরেছে।

প্রতুলবাবু কাজেই আরও বেশী বিব্রত হয়ে বললেন, কি বলছ, অনু? কি আবার হবে? কিছুই তো হয় নি!—

তোমার অসুখ করেছে, বাবা?—অনামিকা জিজ্ঞাসা করলে।

কি মুশকিল!—প্রতুলবাবু কুণ্ঠিত স্বরে বললেন,—অসুখ কেন করবে! বেশ আছি আমি,—মানে, যেমন ছিলাম, ঠিক তেমনি।

অনামিকা এবার অধৈর্য্যভাবে মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়ে ঝাঁজের স্বরে বললে, না, বাবা,—তেমন নিশ্চয়ই তুমি নেই। আমার চোখ নেই বুঝি,—দেখতে পাই নে আমি?—নিশ্চয়ই তোমার কিছু হয়েছে। কি হয়েছে, বাবা?—

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। প্রতুলবাবু যত বলেন যে তাঁর কিছু হয় নি ততই অনামিকা আরও জিদ করতে থাকে; ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করে যেন মিথ্যাবাদী সাক্ষীকে সে জেরা করছে; রাগ করে, ধমক দেয়। অবশেষে সে অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে

নিলে ; গলার স্বর তার এমন কেঁপে উঠল যে, প্রতুলবাবুর আশঙ্কা হল যে হয়তো আর একটু পরেই সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলবে।

প্রতুলবাবু আর পারলেন না। সকল দ্বিধা, সকল সঙ্কোচ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ডান হাতে মেয়ের কোমরটা জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, শোন্ তবে,—বলছি। কিন্তু শান্ত হয়ে শুনতে পারবি তো ? জবাব দিবি আমার সকল কথার ?

অনামিকা বিস্মিত হয়ে বললে, কি কথা, বাবা ?

একটু ইতস্ততঃ করলেন প্রতুলবাবু ; সঙ্কোচে তাঁর চোখের পাতাদুটি একবার নত হয়েও পড়ল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অল্প একটু হেসেই তিনি বললেন, মনটা আমার সত্যি খারাপ হয়ে গিয়েছে, মা,—তোরই জন্য বড্ড বকুনি খেতে হয়েছে আমাকে।

অনামিকার মুখখানা দেখতে দেখতে বিবর্ণ হয়ে গেল ; শুষ্ক, অস্ফুট স্বরে সে বললে, আমার জন্য ?—বকুনি খেতে হয়েছে তোমাকে ? কে বকেছে, বাবা ?—কেন ?

প্রতুলবাবু মুখ ফিরিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তোমারই জন্য বই কি ! লোকে বলে যে, আমি তোমার কোন যত্ন করি নে,—তোমার কোন খোঁজ রাখি নে,—তোমার দিকে চেয়েও দেখি নে এক বার—

কে ? কে বলেছে এ কথা ?—বলতে বলতে অনামিকার বিস্মিত কণ্ঠস্বর হঠাৎ একেবারে উদ্ধত হয়ে উঠল ; প্রতুলবাবুর বাহুর বেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েও তাঁর আরও একটু কাছে ঘেঁষে বসে সে আবার বললে, এ যে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা, বাবা,—এখানে কার এত সাহস হল তোমায় এ কথা বলবার ?

কিন্তু প্রতুলবাবু মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, না, মা,—ধৃষ্টতা বলতে পারি নে। সত্য কথা বললে কি ধৃষ্টতা করা হয় ? সত্যি তো,—তোমার প্রতি পিতার কর্ত্তব্য পুরোপুরি পালন করি নি তো আমি !—তোমার বিয়ে তো দিই নি এখনও !—

ফণাতোলা সাপের মত ঘাড় উঁচিয়ে উঠেছিল অনামিকা প্রতিবাদ করবার জন্য। কিন্তু শেষের কথাটা কানে যেতেই মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতই তার 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা হয়ে গেল।

মেয়ের সেই বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতুলবাবু এবার হেসে ফেললেন ;

কৌতুকের স্বরে বললেন, দশ জনকে আর আমি কথা বলবার সুযোগ দেব না, মা ;— ঠিক করেছি যে এবার তোমার বিয়েই আমি দেব।

মুখ লাল করে, চোখ নামিয়ে অনামিকা শুধু বললে, ধেৎ ;—এবং পরক্ষণেই তার উদ্ধত মাথাটা সঙ্কুচিত হয়ে প্রতুলবাবুর মাথার পিছনে ঘাড়ের উপর ঢলে পড়ল।

প্রতুলবাবু নড়ে বসলেন ; পরম স্নেহে মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কোমল স্বরে বললেন, সত্যি, মা,—ভারি অন্যায় হয়ে গিয়েছে আমার। অনেক আগেই এ কথাটা আমার ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু এবার মন ঠিক করেছি আমি। যত তাড়াতাড়ি হয় তোমার বিয়ে দিয়ে তোমার নিজের সংসার পাতিয়ে দিতে হবে।

হাত দিয়ে বাপের হাতখানা মাথার উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে অনামিকা নিজেও সরে একটু দূরে গিয়ে বসল। তার পর তাকাল মুখ তুলে। বিচিত্র সে মুখ,—লজ্জা ও আনন্দের আভায় উজ্জ্বল গৌর বর্ণ টকটকে সিঁদুর দিয়ে মাজা কাঁচা সোনার মত ঝলমল করে জ্বলছে ; হীরার মত ঝকঝকে চোখদুটিতে সঙ্কোচের জড়িমা ; কালো পক্ষ্মের আড়ালে অর্দ্ধেকটা চোখ ঢাকা পড়ে গিয়েছে ; সামনের রেশমের মত হাল্‌কা, কোমল, ছোট ছোট চুলগুলি বিশৃঙ্খল হয়ে উড়ে পড়েছে কপালের উপর ; কানের দুলের পাথর দুখানা টলমল করে দুলেই চলেছে ; পাতলা ঠোঁট দুখানিতেও অমনি কম্পনের আভাষ ;—সমগ্র মুখখানিতে এক অনুপম মাধুর্য্য।

সেই মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রতুলবাবু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, কিন্তু তোমার মত ছাড়া কিছুই তো হবার জো নেই, মা ; তাই তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি, —তুমি কি বল ?

অনামিকা চোখ তুললে না, কিন্তু ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, তোমার কাছ থেকে আমায় তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছ, বাবা ? বেশ তো,—সে জন্য অত কথার কি দরকার ? ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও না বাড়ী থেকে,—তার পর চলে যাব যেদিকে দুচোখ যায়।

শোন কথা !—প্রতুলবাবু অপ্রতিভের মত বললেন,—তাই আমি বললাম নাকি !—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটু এগিয়ে এসে অনামিকার একখানি হাত তিনি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন,—টেনে আনলেন প্রায় বুকের কাছে ; তার পর

সস্নেহ কণ্ঠে বললেন, হয় পাগলী, নয় তো একেবারে খুকী। তোকে নিয়ে আমি কি করি, বল্ তো!

তাড়িয়ে দাও,—চাচ্ছই তো তাড়িয়ে দিতে;—বলতে বলতে অনামিকা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

শোন কথা!—প্রতুলবাবু আবার বিব্রত হয়ে পড়লেন,—মেয়ের বিয়ে দিলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় নাকি? সাধে কি বলি যে, তুই একেবারে পাগলী!

অনামিকা এবার আর কোন উত্তর দিলে না। একটু পরে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, অনু, মা, ছেলেমানুষি না করে ভেবেচিন্তে কথাটার উত্তর দাও তো, মা। সত্যি, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে—বিয়ে না দিয়ে আর তো নিজের কাছে তোমায় আমি ধরে রাখতে পারি নে!—

অনামিকা মুখ ফিরালে না, কিন্তু মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, না, বাবা, —তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না আমি।

শোন কথা!—প্রতুলবাবু আবার অপ্রতিভের মত বললেন,—তুই ছেড়ে যাবি কেন?—ছেড়ে তো যেতে হবে আমাকে। বাপ কি চির দিন মেয়ের কাছে থাকতে পারে! ওপারের ডাক এখন থেকেই তো শুনতে পাচ্ছি। তাই তো ভাবনা হচ্ছে তোকে এখানে কার কাছে রেখে যাব!—

বাবা!—বলে অনামিকা চমকে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে তাকাল; সুন্দর মুখের লজ্জার মাধুর্য্যটুকু চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল; আধবোজা চোখদুটিকে বিস্ফারিত করে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সে উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, এ কি বলছ, বাবা? নিশ্চয় তোমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে! বল তো,—কে তোমার মাথায় এই সব আজগুবি চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে? তিনি যে-ই হউন না কেন,—আমি আচ্ছা করে তাকে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে আসব।

প্রতুলবাবুর ঠোঁটের কোণে ম্লান রকমের অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল। চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে তিনি বললেন, না, মা, না,—আর কারও কোন দোষ নেই। এ তো আমার নিজেরই কর্ত্তব্য,—নিজেই বুঝতে পারছি আমি,—আরও আগেই তো বোঝা উচিত ছিল!—

তার পর হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, আর কেউ তো আমাদের নেই,—খালি তুই আর আমি। আমার মনে কোন সমস্যা জাগলে তোর কাছেই আমায়

পরামর্শ চাইতে হয়। আর তোরও যা মনের কথা, তা-ও আমাকেই বলবি তুই—বলবি নে?—

অনামিকা বিহ্বলের মত বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। অবস্থাটা অসাধারণ,—বাপের মুখে এমন কথা আগে কোন দিনই সে শোনে নি। আজ শুনে কিছুই বুঝতে না পেরে সে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ল।

কিন্তু তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই প্রতুলবাবুই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি বল, অনু?—তোমার বিয়ের কথাটা আর তো স্থগিত রাখা যায় না!—

এক বার ঢোক গিললে অনামিকা; তার পর টেনে টেনে বললে, ঠাট্টা করছ না তো, বাবা?—সত্যি আমার বিয়ের জন্য ভাবনা হয়েছে তোমার?

প্রতুলবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, হ্যাঁ, মা, হয়েছে,—মেয়ের বাপ-মাত্রেরই তো হয়।

অনামিকা দুতিন সেকেণ্ডকাল নিশ্চল হয়ে তার বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; তার পর সহসা খুব জোরে মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, না, বাবা,—আমি বিয়ে করব না।

শোন কথা!—প্রতুলবাবু কতকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতই আবার তাঁর পেটেণ্ট উত্তরটি উচ্চারণ করলেন। অসহায়ের মত করুণ চোখে কিছুক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। তার পর সাগ্রহে তাঁর হাতখানাকে আবার বুকের কাছে টেনে এনে অনুনয়ের স্বরে বললেন, অনু, ছেলেমানুষি করো না, মা। তা কি হয়? মেয়েদের কি বিয়ে না করলে চলে?

হ্যাঁ, চলে,—অনামিকা ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর দিলে,—অন্ততঃ আমার চলবে।

পাগল!—প্রতুলবাবু বিব্রত কণ্ঠে বললেন,—সত্যি,—চির দিন তোমার কাছে তো থাকতে পারব না আমি! আমি চলে গেলে তুমি কার কাছে থাকবে?

অনামিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে না। তার সারা শরীরটাই হঠাৎ যেন থর থর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিলে সে। বাঁ হাতে এলোমেলো চুল কগাছাকে মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বাপের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে শান্ত, গম্ভীর স্বরে বললে, সেজন্য তুমি ভেবো না, বাবা। তোমায় হারাবার পরেও বেঁচেই যদি আমায় থাকতে হয়, তবে একাই আমি বেঁচে থাকতে পারব।

স্বর্গ থেকে তখন আমার দিকে চেয়ে দেখো তুমি,—আমার জন্য সেখানে তোমার একটুও লজ্জা পেতে হবে না।

শোন কথা!—প্রতুলবাবু এবার একেবারেই দিশাহারা হয়ে পড়লেন; শুষ্ক, জড়িত স্বরে বললেন,—তাই আমি বলেছি নাকি!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। দুই হাত বাড়িয়ে মেয়ের মাথাটাকে বুকের উপর টেনে এনে গাঢ় স্বরে তিনি আবার বললেন, কি যে ছেলেমানুষি করিস তুই! এ রকম করলে আমি কি করি, বল্ তো!—

অনামিকা বাপের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে অভিমানের স্বরে বললে, হ্যাঁ,—আমি বুঝি! তুমি কেন ও সব কথা বললে!—

বিব্রত মুখে প্রতুলবাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করে বসে রইলেন, তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক বলেছ, মা,—হয়তো কথাটা আমি ঠিক ঠিক বলতেই পারছি নে। তোমার মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন!—

কি বলছ, বাবা!—অনামিকা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সোজা হয়ে বসে রুদ্ধনিশ্বাসে বললে।

আবার শুকনো রকমের একটু হাসি হেসে প্রতুলবাবু উত্তর দিলেন, ঠিকই বলেছি, মা। তোমার মা আজ বেঁচে থাকলে সব কথাই খুব সোজা করে তোমায় বুঝিয়ে দিতে পারতেন। আর তাঁর কথা তুমি ঠেলতেও পারতে না।

কিছুক্ষণ অনামিকার মুখে কোন কথাই ফুটল না,—যেন বাক্‌শক্তিই তার নেই। তার পর হঠাৎ তার সারা মুখখানি হাসির আলোকে ঝলমল করে জ্বলে উঠল। নিজেই এগিয়ে গিয়ে প্রতুলবাবুর গা ঘেঁষে বসে তাঁর একখানি হাত নিজের কোলের উপর টেনে এনে সে বললে, কি যে বল তুমি, বাবা!—তুমিই তো আমার মা-ও। তোমার কোন কথা কবে ঠেলেছি আমি? বল না,—কি করতে বলছ তুমি আমাকে?

প্রতুলবাবু অকস্মাৎ কন্যার এই ভাবান্তর দেখে আগের চেয়েও যেন বেশী বিব্রত হয়ে পড়লেন; মুখখানি হাসবার মত করে ঢোক গিলতে গিলতে বললেন, করতে,—মানে, বিশেষ কিছু তো নয়,—মানে—এই—

বিয়ে করতে বলছ,—এই তো?—অনামিকা বাধা দিয়ে হাসতে হাসতেই বললে,—আমি বিয়ে করলে সুখী হবে তুমি?

বাঃ রে!—প্রতুলবাবু অপ্রতিভ ভাবে বললেন,—মেয়ের বিয়ে দিয়ে সকল বাপই তো সুখী হয়।—

সকলের কথা ছাড়,—অনামিকা আবার বাধা দিয়ে বললে,—তুমি সুখী হবে কি না, তাই বল আগে।

প্রতুলবাবু আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন, খুশী—মানে—হবই তো—মানে, তোমায় সংসারী করতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হব, মা।

আচ্ছা, বেশ,—অনামিকা বাপের কথার মাঝখানেই ঘাড়টা একটু কাৎ করে হাসিমুখে বললে,—সময় হলে বিয়ে করব'খন। তুমি তো আর রূপকথার রাজার মত ভোরে উঠে যার মুখ দেখবে সেই ঝাড়ুদারের হাতেই আমায় সঁপে দিতে চাও না,—বর জুটলে তবে তো বিয়ে দেবে? বেশ,—তখন আমি অমত করব না। কেমন,—হল তো! তোমার কথা ঠেললাম না তো আমি! এইবার শান্ত হও দেখি,—হাস,—আগের মত করে হাস,—উহুঁ—হল না বলছি—

পাগলী—একেবারে ক্ষেপা!—বলতে বলতে প্রতুলবাবু হাসিমুখে মেয়ের মাথাটাকে আবার বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন।

ছদ্ম অভিমানের অস্বাভাবিক স্বরে অনামিকা বললে, আবার রাগ কেন করছ? মেনেই তো নিলাম তোমার কথা!—

প্রতুলবাবু মাথা নামিয়ে অনামিকার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, অনু, মা,—আসল কথাটা এখনও বলাই হয় নি। শান্ত হয়ে একটু শোন্ তো—তোল্,—মুখ তুলে চা আমার দিকে।—

শুনছিই তো,—অনামিকা মুখ না তুলেই উত্তর দিলে,—বল না কি বলবে।

বিব্রত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন প্রতুলবাবু; তাঁর মনের মধ্যে ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্কোচের যে দ্বন্দ্ব চলছিল, মুখের উপরেও তার আভাষ দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি বলেই ফেললেন, অনু,—তোমার একটি সম্বন্ধ এসেছে, মা।

মুখ দিয়েই প্রতুলবাবুর বুকে একটু জোরেই ঠেলা দিয়ে অনামিকা বললে, যাও!—

কিন্তু প্রতুলবাবুর সঙ্কল্প ততক্ষণে স্থির হয়ে গিয়েছিল; মুখখানা আরও একটু নামিয়ে তিনি অনুনয়ের কোমল স্বরে বললেন, অনু,—লজ্জা করো না, মা; তোমার মত না নিয়ে আমি তো কোন কথা দিতে পারি নে,—তাই তোমায় জিজ্ঞেস করছি।

কিন্তু রমেনদা বললেন,—মানে, তুমি মুখ তোল তো, মা,—কথাটা আগে ভাল করে শোন।—বলতে বলতে এক রকম জোর করেই তিনি অনামিকাকে সোজা করে বসিয়ে দিলেন।

অনামিকা কুণ্ঠিত, একটু যেন সন্ত্রস্ত স্বরেই বললে, কি বলছ, বাবা? আমায় কিছু না জানিয়ে কার সাথে যা-তা সব কথা বলছ তোমরা?

প্রতুলবাবু এক বার ঢোক গিলে বললেন, তোমায় জানাতে দিচ্ছ কোথায় তুমি? আর পাকা কথা কিছু তো এখনও হয় নি,—খালি কথাটা উঠেছে। রমেনদা বললেন,—মানে—ওঁদের ইচ্ছে,—মানে, অরুণের সাথে তোমার বিয়ে যদি হয়—

কি!—অনামিকা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই চমকে উঠে অস্ফুট স্বরে বললে।

প্রতুলবাবু আবার বার দুই ঢোক গিলে পরে বললেন,—মানে, এই রমেনদা'রা বলছিলেন, অরুণের সাথে তোমার বিয়ের কথা।

অনামিকার সব কটি ইন্দ্রিয় এক সঙ্গেই যেন বিকল হয়ে গেল,—মুখে কথা নেই, চোখে পলক নেই, নাকে নিশ্বাসও যেন নেই। কিন্তু সে মুহূর্ত্তেরই জন্য। পরক্ষণেই মুখ লাল করে, চোখ নামিয়ে, অসাধারণ রকমের উত্তেজিত স্বরে সে বললে, যাঃ!—এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথাটা আবার প্রতুলবাবুর বুকের মধ্যে ঢলে পড়ল।

কিন্তু প্রতুলবাবু মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, কেন, মা?—এমন ঘর, এমন বর,—মানে—অরুণকে তুমি তো ভাল করেই দেখেছ! আমার তো মনে হয় যে—

না, বাবা,—অনামিকা ঐ অবস্থায়ই সজোরে মাথা ঝেঁকে বললে,—কক্ষনো না,—এ কিছুতেই হতে পারে না।

প্রতুলবাবুর মুখ শুখিয়ে গেল; শুষ্ক কণ্ঠে তিনি বললেন, কেন, মা?

কেন আবার কি!—অনামিকা ঝাঁজের স্বরে উত্তর দিলে,—এ হবে না—কক্ষনো না।

একটু চুপ করে রইলেন প্রতুলবাবু; তার পর আবার অনামিকার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, কেন, অনু?—অরুণকে কি তুই ভা—ভা—ভাল—

'ভালবাসা' কথাটা কিছুতেই তিনি মুখে উচ্চারণ করতে পারলেন না,—

করবার সময়ও হল না। অনামিকা আবার মাথা ঝেঁকে ঝাঁজের স্বরে বললে, থাম তুমি,—চুপ কর, বাবা।

শুকনো জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটিকে বার দুই লেহন করবার পর প্রতুলবাবু কোন রকমে বললেন, মানে,—আমি বলছিলাম—অরুণকে কি তোমার ভাল লাগে না, মা?

অনামিকা আবার বাধা দিলে,—থাম তুমি।—কিন্তু পরক্ষণেই সুর বদলে সে আবার বললে, তাই আমি বলেছি নাকি? কিন্তু তুমি বলো না এ কথা,—না, ছিঃ!—এ হবে না, বাবা,—কিছুতেই না।

কিছুই বুঝতে না পেরে প্রতুলবাবু বিহ্বল স্বরে বললেন, কেন, মা?

অনামিকা কোন উত্তর দিলে না। বিপন্ন মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর প্রতুলবাবু দুই হাতে অনামিকার মুখখানি তুলে ধরবার চেষ্টা করতে করতে আবার বললেন, মুখ তোল্ তো, অনু,—চা' আমার দিকে। হবে না, কেন বলছিস? ওঁরা যে বললেন,—মানে,—খুলে বল দেখি সব কথা,—লজ্জা করিস নে, মা।

অনেক টানাটানির পর অনামিকা মুখ তুললে; কুণ্ঠিত চোখে বাপের মুখের দিকে চেয়ে বললে, এ কথা কে বলেছে, বাবা,—জ্যাঠামশায়?

প্রতুলবাবু ঢোক গিলে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ,—আর বৌদিও বলছেন। বড্ড চেপে ধরেছেন ওঁরা। আর আমিও,—মানে, আমারও—

না,—অনামিকা আবার মাথা ঝেঁকে বললে,—বলো না। বলতে বলতে হঠাৎ হাত দিয়ে প্রতুলবাবুর মুখই চেপে ধরলে সে;—আর বলো না, বাবা,—এ কিছুতেই হবে না।

প্রতুলবাবু অনামিকার হাতখানা নিজের মুখের উপর থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে অবরুদ্ধ স্বরে বললেন, ছাড়, ছাড়,—কি মুশকিল! শোনই না আগে কথাটা,—না হয়—

অনামিকা হাত সরিয়ে নিলে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেও সে উঠে দূরে সরে গেল যেখানে হাত বাড়িয়েও প্রতুলবাবু তার নাগাল না পান। প্রতুলবাবু বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, অনামিকার মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠেছে; চোখেও অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য; ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপছে; নিশ্বাস

পড়ছে জোরে জোরে, আর ওরই তালে তালে তার বুক উঠছে আর নামছে। উদ্বিগ্ন স্বরে তিনি বললেন, এ কি, অনু,—কি হল তোমার?

প্রতুলবাবুর চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই অনামিকা চোখ নামিয়ে নিলে; আর একবার মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, না, বাবা,—এ হতেই পারে না,— কিছুতেই না।

পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতেই সে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। প্রতুলবাবুর ব্যাকুল কণ্ঠের পুনঃ পুনঃ আহ্বানের উত্তরে এক বার সে ফিরেও তাকাল না।

রোজই এ সময়টাতে অনামিকা রমেনবাবুর কাছে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু আজ সে সে দিক দিয়েও গেল না। মহামায়াদেবী উপরে কি কাজ করছিলেন দেখে তাঁকেও এড়িয়ে সে নীচে রান্নাঘরে চলে গেল। স্নানের ঘরে সে অন্যান্য দিনের চেয়ে ঢের বেশী সময় কাটাল। খাওয়ার সময় রোজ নিজের হাতে পরিবেশন না করলে তার তৃপ্তি হয় না। কিন্তু আজ ক্ষিদের অজুহাত দেখিয়ে রমেনবাবুদের সঙ্গেই সে খেতে বসে গেল। খাওয়ার সময় কথা সে এক রকম বললেই না। খাওয়া শেষ হতেই সে নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলে।

কতটুকুই বা সময়,—সকালে বাপের সঙ্গে তার ঘণ্টাখানিকের বেশী কথা হয় নি। অথচ ওরই মধ্যেই তার জীবনে যেন একটা বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে,—হয়েছে তাই যা সে কোন দিনই ভাবে নি। বাপের মুখে ভাবনার ছায়া দেখে তার দুর্ভাবনা হয়েছিল; কিন্তু সেটা বাপের জন্য;—তার নিজের জন্য নয়। তার আশঙ্কা হয়েছিল, কোন বড়লোক মক্কেল হয়তো তাঁকে ছেড়ে গিয়েছে, হয়তো তাঁর ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে, অথবা হয়তো তাঁর কোন অসুখ করেছে। বাপের ভাবনার সঙ্গে তার নিজের যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে তা সে ভাবে নি বলেই আশঙ্কার সঙ্গে অনেকখানি ঔৎসুক্য নিয়েই সে তাঁকে জেরা করতে গিয়েছিল। কিন্তু ওরই ফলে যা বের হয়ে পড়েছে তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। এ-ও যেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়ে পড়া। সাপটা আচমকা কেবল বের হয়েই আসে নি, ফোঁস করে ফণা তুলে তার হাতের পাতায় দাঁতও

ফুটিয়ে দিয়েছে ;—এখন তার সারা গায়ে সেই বিষেরই মারাত্মক ক্রিয়া চলেছে,—শিরা-উপশিরাগুলির ভিতর দিয়ে যেন গরম সীসার স্রোত বয়ে চলেছে।

অরুণাংশুর সঙ্গে তার বিয়ের কথা উঠেছে ; তার বাপ নিজের মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, সে অরুণাংশুকে ভালবাসে কি না। দুপুরে কথাটা তার মনে উঠতেই তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, বুকের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রটা লাফালাফি সুরু করে দিলে, নাক-কান-মুখের রন্ধ্র দিয়ে আগুনের হল্‌কা যেন ছুটে বের হতে লাগল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ !—ছোট্ট ঐ প্রশ্নটির পিছনে কতখানি অনুভূতিই না লুকানো রয়েছে! আর কত স্মৃতি! সেই কলিকাতার বাড়ীতে প্রথম রাত থেকে সুরু করে সেদিন কলিকাতার যাত্রী অরুণাংশুকে গাড়ীতে তুলে দেওয়া পর্য্যন্ত নিজে সে অরুণাংশুর সঙ্গে যেমন মিশেছে, যেমন ব্যবহার করেছে,—সেই সব স্মরণ করে, তাদের উপর বিশেষ একটা অর্থ আরোপ করে তাদের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ঘটনাকেই বিশিষ্ট একটি মনোবৃত্তির বাহিক অভিব্যক্তি মনে করেই না তার বাপ তাকে ঐ প্রশ্ন করেছেন,—মনে মনে আরও বেশী এগিয়ে গিয়েই না বিবাহবন্ধনের মধ্যে তাদের দুজনের মিলন পর্য্যন্ত কল্পনা করেছেন! অথচ আসলে কিছুই হয় নি ;—অরুণাংশুকে একান্ত ভাবে লাভ করবার কোন ইচ্ছা, কৈ, তার মনের কোন কোণেই তো একবারও উঁকি দেয় নি !—

প্রথমে এই রকমই মনে হল অনামিকার।

অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে অবস্থাটাকে সে বুঝতে চেষ্টা করলে। তার বাপের ইঙ্গিত অনুসরণ করেই নিজের মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখলে সে। কিন্তু যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূর কোথাও সে অরুণাংশুকে দেখতে পেলে না। পিছনের দিকে তাকিয়ে গত এক মাসের ইতিহাসও সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে ; কিন্তু সেখানেও এমন কিছু তার চোখে পড়ল না, অনুরাগ বা আসক্তির সঙ্গে যার কোন রকমের সাদৃশ্য আছে। নিজের কৃতকর্ম্মের ব্যাখ্যা নিজেই সে করতে লাগল। অরুণাংশুর সঙ্গে সে মিশেছে,—কিন্তু সে তো একই পরিবারের দুটি ছেলেমেয়ের মত! অরুণাংশুকে সে একটু আদরযত্ন করেছে,—কিন্তু তা না করে উপায়ও তো তার ছিল না! কলিকাতার বাড়ীতে অরুণাংশু ছিল তাদের অতিথি,—তার আদরঅভ্যর্থনার দায়িত্বই ছিল তার নিজের উপর। এ বাড়ীতে আসবার পরেও এ বাড়ীর গৃহিণীই সংসারের খানিকটা ভার তার উপর

ছেড়ে দিয়েছিলেন ; সে ভার নিয়েছিল নিজের কৃতিত্বটুকু জাহির করবার জন্য ; তাই এ বাড়ীতেও অরুণাংশুর খোঁজখবর একআধটুকু নিতে হয়েছে তাকে। যা ওর মধ্যে ছিল তা নিছকই কর্ত্তব্যপরায়ণতার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। সত্য বটে, অরুণাংশুর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে নানা প্রশ্ন করেছে,—কিন্তু সে ও তো নিছক কৌতূহল। ঐ কৌতূহলের পরিতৃপ্তির জন্যই সে তার কাছে গিয়ে বসে গল্প করেছে ; তার কথা মন দিয়ে শুনেছে, পরে ঘরে এসে সে সম্বন্ধে হয় তো এক আধটুকু চিন্তাও করেছে। কিন্তু অরুণাংশুকে সে ভালবেসেছে, এ কথা, কৈ, এক বারও তো তার মনে হয় নি! আর কেউ যে তার ঐটুকু আগ্রহকেই ভালবাসা মনে করতে পারে, এ সম্ভাবনার কথাও কোন দিন তার মনে ওঠে নি।

অরুণাংশুকে তার ভাল হয় তো লেগেছে,—এ কথা অনামিকা নিজের কাছে নিজে অস্বীকার করতে পারলে না,—সকালে বাপের কাছেও তো অস্বীকার করতে পারে নি সে! কিন্তু ঐ ভাল লাগাই তো ভালবাসা নয়! নিজের অনুভূতি আর উপলব্ধিকে বিশ্লেষণ করে এখন সে এই সিদ্ধান্তেই গিয়ে উপস্থিত হল। অরুণাংশুকে সে মন্দ ভাবতে পারে নি। কখনও তাকে তার উদ্ভট মনে হয়েছে, আবার কখনও মনে হয়েছে ভয়ঙ্কর। কিন্তু মন্দ তাকে সে এক বারও মনে করে নি ; এমন কি, অরুণাংশুর কথা শুনে তার নিজের বিশ্বাস ও সংস্কার লজ্জা বা ঘৃণায় যখন রি রি করে উঠেছে, তখনও অরুণাংশুকে মন্দের পর্য্যায়ে ফেলে মনে মনেও তাকে সে ধিক্কার দিতে পারে নি। তাকে তার মনে হয়েছে সংসারের আর দশ জন লোক থেকে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ অসাধারণ এক জীব যাকে সাধারণের মাপকাঠি দিয়ে মোটে মাপাই যায় না। সেই কলিকাতার বাড়ীতেই শ্মশানচারী শিবের সঙ্গে অরুণাংশুর তুলনা করেছিল সে। আজও তাব সে মতের পরিবর্ত্তন হয় নি। তার জীবনসমুদ্র মন্থন করে যতটুকু অমৃত সে পেয়েছে তার সবটুকুই সে অপরকে বিলিয়ে দিয়েছে,—নিজে নিয়েছে কেবল বিষটুকু। এ রকম লোককে সে মন্দ কেমন করে বলবে! তাঁর জীবনের অতীত ইতিহাস আর তার ভবিষ্যতের স্বপ্নের কথা শুনে তাঁকে তার ভালই লেগেছে বই কি!—

কিন্তু ঐ ভাল লাগাই যে ভালবাসা, তা আগেও তার মনে হয় নি, আজও মনে হল না। নিজের মনের মধ্যে সে বার বার তাকিয়ে দেখলে,—সেখানে কৌতূহল

আছে, বিস্ময় আছে, শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু ভালবাসা আছে বলে এক বারও তার মনে হল না। বার বার কেবলই তার মনে হতে লাগল যে, অরুণাংশু এক অসাধারণ জীব,—একেবারেই যেন আর এক জগতের মানুষ ;—আকাশের জ্বলজ্বলে তারাটির মতই সুদূরের বিস্ময়, মনের ভিতরকার আপনার জন সে নয় ;—দূর থেকে মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে তার প্রশংসা করা যায়, কিন্তু একান্ত ভাবে নিজের বলে তাকে চাওয়া যায় না।

হঠাৎ এক সময়ে কথাটা অনামিকার মনে পড়ে গেল। অরুণাংশু কিছুই গোপন করে নি। সে-ও অনামিকাকে আর এক জগতের জীব বলেই মনে করেছে,—মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করে তাকে বিদ্রূপ করেছে, উপহাস করেছে ;—সে সব কষাঘাতের মতই তীব্র। ঠিক ঘৃণা না করলেও সে তাকে অবজ্ঞা করেছে,—শেষের দিকে উদ্ধারেরও অযোগ্য মনে করে করেছে কৃপা যা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতই অসহ্য। আর সকলের চেয়ে বড় কথা,—তারই মুখের উপর অরুণাংশু তারই সঙ্গে তুলনা করে আর একটি মেয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে,—সে মেয়ে সুভদ্রা।

অন্ধকারে বিজলীর ঝিলিকের মতই সুভদ্রার কথাটা অনামিকার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল, মহামায়াদেবীর কথা যে, সুভদ্রাকে তিনি নিজেই অরুণাংশুর ঘরে দেখে এসেছেন ; মনে পড়ল, তার নিজের চোখে দেখা বিচ্ছেদকাতর অরুণাংশুর মুখের উপর তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়ের অমন সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ; মনে পড়ল, অরুণাংশুর নিজের মুখের অমন সরল, অমন স্বতঃস্ফূর্ত, অমন উচ্ছ্বসিত স্বীকারোক্তি,—সুভদ্রাকে সে ভালবাসে। মনে পড়তেই অনামিকার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। যে অরুণাংশু আর একটি মেয়েকে অত গভীর ভাবে ভালবাসে যে তার সঙ্গে তুলনা না করে আর কোন মেয়ের কথা সে ভাবতেই পারে না, তারই সঙ্গে হবে তার বিয়ে !—খালি ঘরের মধ্যেই অনামিকা সবেগে মাথা নেড়ে একা একাই স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলে,—না, ছিঃ !—এ হতেই পারে না।

কখন বিকেল হয়ে গিয়েছে, অনামিকা তা জানতেও পারলে না। অন্যান্য দিন দুপুরে ঘণ্টাখানিক মাত্র বিশ্রাম করেই সে রমেনবাবুর ঘরে যায় ; তাঁর ঘুম তখনও না ভাঙলেও নিজেই তাঁকে ডেকে তোলে, তার পর হয় তাঁকে কোন একটা বই পড়ে শোনায়, নয় তো তাঁর কাছে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু প্রাত্যহিক

এই কর্ত্তব্য কর্ম্মটির কথা আজ তার মোটে মনেই পড়ল না। জগৎসংসারকে বিস্মৃত হয়েই যেন রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে একটি মাত্র চিন্তায় তন্ময় হয়ে সে বিছানার উপর বসে রইল।

তার ধ্যান ভাঙ্গল বাইরে থেকে বদ্ধ দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দে। চমকে উঠে বসতেই মহামায়াদেবীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর তার কানে এল,—অনু—ও মা, অনু! কত ঘুমোচ্ছ আজ?—বেলা যে পড়ে এল, মা!—

নিশ্বাস ফেলে অনামিকা উঠে দাঁড়াল; তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে ঘষে ঘষে বারকয়েক মুখ মুছে ওরই মধ্যে মাথার চুল আর পরনের কাপড়খানাকে একটু ঠিক ঠাক করে নিয়ে কম্পিত হস্তে সে দোর খুলে দিলে।

এত দেরী কেন, মা?—মহামায়াদেবী ঈষৎ শঙ্কিত স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন,—কোন অসুখ করে নি তো?

না, জেঠিমা,—অনামিকা কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে,—অমনি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; মুখটা ধুয়ে আসি আগে;—বলেই মহামায়াদেবীকে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ না দিয়েই দ্রুতপদে সে স্নানের ঘরে চলে গেল।

রমেনবাবুর সঙ্গে তার দেখা হল একেবারে চায়ের টেবেলে। তাকে আসতে দেখেই রমেনবাবুও উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি, অনু,—শরীরটা তোমার খারাপ হয় নি তো, মা?

না, জ্যাঠামশায়,—অনামিকা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে উত্তর দিলে,—বড্ড বেশী ঘুমিয়েছি কি না,—তাই।

এ যেন অনামিকার কণ্ঠস্বরই নয়। তার ঠোঁটের কোণে যে হাসিটুকু ফুটে উঠল তাতেও মাধুর্য্যের লেশ মাত্রও নেই। বিস্মিত চোখ সরিয়ে নিয়ে রমেনবাবু প্রতুলবাবুর মুখের দিকে তাকালেন,—তাঁর চোখদুটি পড়ে রয়েছে খাবারের থালার উপর। তার পরেই রমেনবাবুর বিহ্বল চোখ দুটি গিয়ে মিলল মহামায়াদেবীর চোখের সঙ্গে। চোখে চোখে কি যেন কথা হয়ে গেল। রমেনবাবু আর কোন কথা বললেন না। মহামায়াদেবীই অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, দাও তো, মা,—তোমার জ্যাঠামশায়ের হাল্কা চাটুকু আগে ঢেলে দাও।

চায়ের আসর ভাল জমল না, তার পরের সান্ধ্য বৈঠকও নয়। দিন থাকতেই বাড়ীতে যেন আঁধার ঘনিয়ে এল; সন্ধ্যার পর বিজলীর আলোও সে অন্ধকার দূর করতে পারলে না।

তার পরেও দুতিন দিন অমনি অবস্থা চলল। সেই সব আছে, অথচ কিছুই যেন নেই। এক রাত্রির মধ্যেই অনামিকা অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়েছিল,—পরের দিন তার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি হল না। তথাপি সবাই বুঝলে যে, আগের সে অনামিকা আর নেই। তার চঞ্চল গতি পলকে পলকে আর সেই আগের মত বিজলীর ঝলক ফুটিয়ে তোলে না; মুক্ত ফোয়ারার উজ্জ্বল জলধারার মত কথায় কথায় তার অকুণ্ঠিত কণ্ঠের কলহাস্য তীরবেগে উর্দ্ধে উঠে চূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না। তার গতিতে কেমন যেন একটা মন্থরতা এসেছে, কথায়ও তাই। সে এখনও হাসে, কিন্তু তা নিঃশব্দ হাসি,—কেমন যেন নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রাণ। তার মুখের উপর এমন একটা গাম্ভীর্য্য নেমে এসেছে যা স্নিগ্ধও নয়, শান্তও নয়। তার চঞ্চল চোখে আগের সে ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা আর নেই,—আধফোটা চোখ দুটিতে সর্ব্বদাই কেমন যেন একটা বিষণ্ণতা, কেমন যেন একটা উন্মনা ভাব হাল্‌কা মেঘের মত চেপে বসে থাকে। কথা বলবার সময় সাধারণতঃ কারও মুখের দিকে সে মোটে তাকায়ই না,—কদাচিৎ রমেনবাবু বা মহামায়াদেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নেয়।

একটি মাত্র সূর্য্য মেঘের নীচে ঢাকা পড়লে অত বড় জগৎটার যে অবস্থা হয় তেমনি হল রমেনবাবুর বাড়ীর অবস্থা। একা অনামিকার মুখ কালো হতেই সারা বাড়ীটাই যেন অন্ধকার হয়ে গেল। প্রতুলবাবুর মুখের হাসি তো দুদিন আগেই নিভে গিয়েছিল; এবার রমেনবাবু ও মহামায়াদেবীরও সেই অবস্থা হল। হাসি আর তাঁদের কারও মুখেই ফোটে না; কথা বলেন, তা-ও যেন ফিস্ ফিস্ করে। দুজনেরই মুখে কেমন যেন একটা উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত ভাব,—প্রতুলবাবু বা অনামিকার মুখের দিকে দুজনের এক জনও সোজাসুজি তাকাতেই যেন সাহস পান না,—পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতেও যেন তাঁদের দুজনেরই সঙ্কোচ বোধ হয়। তেমনি অবস্থা প্রতুল বাবু ও অনামিকারও,—তারাও দুজন যেন দুজনকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে। আগের মত অকারণে বাড়ীর সকলে আর একত্র হয় না। প্রয়োজনে বা অকস্মাৎ একের সঙ্গে অপরের দেখা হলেই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চায়,—দুই জোড়া চোখেই এক সঙ্গেই আশা ও উদ্বেগ ফুটে ওঠে,—কিন্তু চোখাচোখি হওয়া মাত্রই দুই জোড়া চোখই অপরিসীম কুণ্ঠাভরে আবার নত হয়ে পড়ে। সকলের মনেই একই ভাব, একই রকমের উদ্বেগ; প্রত্যেকেই জানে অপর প্রত্যেকটি

লোক কি ভাবছে; অথচ আর এক জনকে প্রশ্ন করবার সাহস কারও নেই।

বাড়ীতে মরণাপন্ন রোগী থাকলে বাড়ীর লোকের যে অবস্থা হয়, কতকটা তেমনি এদের সকলের অবস্থা হল,—প্রতি মুহূর্ত্তেই কি যেন একটা নিদারুণ দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে প্রত্যেকেই তটস্থ হয়ে রয়েছে। গোটা বাড়ীটার অবস্থাই তাই,—কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। বাড়ীর ঝি-চাকরেরা পর্য্যন্ত বুঝতে পারলে যে, বাড়ীতে অসাধারণ কোন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

প্রতুলবাবু নিজে সব চেয়ে বেশী বিপন্ন হয়ে পড়লেন।

এ বাড়ীর বাতাসই যেন তাঁর কাছে এত ভারী হয়ে উঠেছে যে সহজ ভাবে তিনি নিশ্বাসও নিতে পারেন না,—এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই যেন তিনি বাঁচেন, এমনি তাঁর মনের অবস্থা। অথচ যাবার উপায় নেই। স্বভাবতঃই তিনি দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক,—জোর করে কাউকে কিছু বলবার সাধ্য নেই, বিশেষতঃ বক্তব্য বিষয়টি যদি অপ্রীতিকর হয়। সেদিন রমেনবাবুকে তিনি নিজের মুখে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আরও কিছু দিন এখানে তিনি থেকে যাবেন। সে প্রতিশ্রুতিটাকে ভাঙ্গবার সাহস তাঁর নেই। তার পর যাবার আগে রমেনবাবু ও মহামায়াদেবীর মুখের উপর তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হবে,—সেই অবস্থাটা কল্পনা করলেই তাঁর গায়ে যেন জ্বর আসে। উত্তরটা দেবার পর এখানে আর থাকা যাবে না বলেই কোনও রকমে কথাটা বলে ফেলেই দায়মুক্ত হবার উপায় তাঁর নেই। কাজেই 'শেষের সেদিনের' বিভীষিকার মতই মস্ত একটা ভয় সব সময়েই তাঁর মনের মধ্যে জেগেই থাকে। সব মিলে অবস্থাটা তাঁর দুঃসহ হয়ে উঠল।

আরও মুশকিল হল এই যে, কোনও রকমে উত্তরটা রমেনবাবুকে শুনিয়ে দিয়ে এখান থেকে বিদায় হতে পারলেই যে তাঁর সকল যন্ত্রণার অবসান হবে, সে সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়লে ঢিলটি তখনই তলিয়ে যায় বটে, কিন্তু জলের বুকে যে তরঙ্গের চাঞ্চল্য জাগে, তা তখনই শান্ত হয় না। অরুণাংশুর সঙ্গে অনামিকার বিয়ের প্রস্তাবটাকে অস্বীকৃতির ভিতর দিয়ে খতম করে দিতে পারলেই যে অনামিকার বিয়ের সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে না, এ সত্য এবার তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছেন। তাই অনামিকার মুখের 'না' কথাটি তাঁর নিজের অন্তরের 'না'টির সঙ্গে মিলে গিয়ে থাকলেও মোটের উপর তিনি খুশী হতে

পারেন নি। বরং যে মুহূর্ত্তে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, অরুণাংশুর সঙ্গে অনামিকার বিয়ে হবে না, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর নিজের মনটি হঠাৎ বেঁকে গিয়ে ভাবতে সুরু করেছে যে, এই বিয়েটি হলেই বেশ হত,—এমন ঘর, এমন শ্বশুর-শ্বাশুরী, এত ঐশ্বর্য্য, এমন একাধিপত্য,—সকলের উপরে ঐ অরুণাংশুর মত বর! সে তো তার ছন্নছাড়া জীবনযাত্রাপ্রণালীকে বর্জ্জন করবারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে,—রাজী হয়েছে কলিকাতায় প্র্যাকটিস্ করতে! প্রতুলবাবুর মনে হতে থাকে যে, অরুণাংশুর সঙ্গেই অনামিকার বিয়ে হলে বেশ হত,—জামাই কলিকাতায় থাকত নিজের তত্ত্বাবধানে, মেয়ে সব সময়েই তাঁর চোখের সামনে থাকত,—তাদের দুটি সংসার স্বতন্ত্র হয়েও হত এক। এমনি সব এলোমেলো চিন্তা থেকে থেকে তাঁর মনে উঠতে থাকে, কল্পনার চোখের সামনে ছায়ার মত অরুণাংশু ও অনামিকার যুগলমূর্ত্তি ফুটে ওঠে, আবার পরক্ষণেই তা মিলিয়ে যায়। রূঢ় বাস্তবের কঠিন আঘাতে স্বপ্নাবিষ্ট চিত্ত সজাগ হয়ে ওঠে; মনে পড়ে যে, অরুণাংশুর সঙ্গে অনামিকার বিয়ে হবে না, অথচ অনামিকার বিয়ে দিতেই হবে,—খুব বেশী দিন তা আর ফেলে রাখা চলবে না। চিন্তা তখন আবার এক স্বতন্ত্র পথে ছুটতে থাকে। কোথায়, কেমন করে পাত্রের সন্ধান করা হবে, মনের মত সুপাত্র পাওয়া যাবে কি না, পেলেও অনামিকা তাকে পছন্দ করবে কি না, বিয়ের পর জামাই অনামিকাকে কোথায়, কোন দূর দেশে নিয়ে যাবে,—এই সব ভাবনায় তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন। ঘুরে ফিরে মন আবার সেই আদি বিন্দুতে গিয়ে উপস্থিত হয়; মনে হয় যে, না চাইতেই হাতের কাছে যাকে পাওয়া গিয়েছিল, সেই অরুণাংশুর সঙ্গে অনামিকার বিয়ে হলেই হয়তো বেশ হত,—রমেনবাবুর কাছেও কোন সঙ্কোচ থাকত না, ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা থেকেও মুক্তি পাওয়া যেত।

একটা কঠিন রোগ থেকে সেরে উঠবার পর রোগীর যে অবস্থা হয়,—রোগ নেই, অথচ দেহ ও মনের গ্লানি ও দুর্ব্বলতাও দূর হয় নি,—তেমনি অবস্থা হল প্রতুলবাবুর। যে বিশেষ সমস্যাটি থেকে তাঁর দুশ্চিন্তা ও মানসিক অস্বস্তির সুরু হয়েছিল, তার সমাধান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মনের শান্তি তিনি ফিরে পেলেন না। তাঁর মুখের উপরের কালো মেঘখানি আরও যেন ঘন হয়ে জমে উঠতে লাগল।

এ-ও অনামিকার চোখ এড়াল না। এবার আর ভুল করলে না সে; বরং আগে ভুল করেছিল বলেই বাপের ভাবান্তরের সঙ্গে নিজের কার্য্যকারণ সম্বন্ধের যাথার্থ্যকে এবার সে গোড়া থেকেই সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিলে। কোন কথা জিজ্ঞাসা

না করেও সে নিঃসংশয়েই ধরে নিলে যে, অরুণাংশুর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে নিজে সে রাজী হয় নি বলেই তার বাবা অত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন,—হয়তো মনে গুরুতর একটা আঘাতও পেয়েছেন। এই মনগড়া ব্যাখ্যাটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মনে মনে সে একটা গল্পও খাড়া করে ফেললে; তার পর সবিস্ময়ে সে উপলব্ধি করলে যে, মহামায়াদেবীর কলিকাতায় যাওয়া থেকে সুরু করে এই সেদিন পর্য্যন্ত যত ঘটনা ঘটেছে, তার সবগুলিকেই ঐ গল্পের সঙ্গে জুড়ে দিলে কোথাও কোন অসঙ্গতি হয় না। তার মনে হতে লাগল যে, অরুণাংশুর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার ইচ্ছাটা তার বাপের নিজের,—শুধু ইচ্ছা নয়, সম্পূর্ণ একটা পরিকল্পনাও গোড়াতেই তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন; কলিকাতায় এবং এলাহাবাদে গত এক মাসের মধ্যে যত সব ঘটনা ঘটেছে, তার প্রত্যেকটিই অরুণাংশুর সঙ্গে তার মিলন ঘটাবার সমগ্র ও সুচতুর একটি পরিকল্পনার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিপুল একটি আয়োজনেরই ছোট-বড় এক একটি অংশ মাত্র। ঐ বিয়ের প্রস্তাব নিজে সে সরাসরি অগ্রাহ্য করাতে তার বাপের অমন পরিকল্পনা, অত আয়োজন,—সব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

প্রতুলবাবুর নিষ্প্রভ চোখ আর বিষণ্ণ মুখে অনামিকা ঐ ব্যর্থতার বেদনাই যেন আঁকা দেখতে পেলে।

সঙ্গে সঙ্গেই অনামিকার নিজের বুকটাও ব্যথায় টন টন করে উঠল। ঐ তো তার বাপ,—স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই, বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত নেই,—সংসারে একা সে ছাড়া তার বাপের আর কেউ নেই। তাঁর চিত্তের সকল মমতা, সকল ভালবাসা নীবিড় আবেগে কেন্দ্রীভূত হয়ে একা তারই উপরে এসে পড়েছে; তাঁর সকল আশা লতিয়ে উঠেছে একা তাকেই অবলম্বন করে। অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখলে অনামিকা,—দুএক দিন নয়, দুএক বৎসরও নয়,—সুদীর্ঘকালের অবিস্মরণীয় ইতিহাস,—সে যেন রঙে রঙীন, রসে মধুর অতুলনীয় এক শিল্পশ্রী। কথা যখন তার মুখে ফোটে নি তখনই সে মা হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব, একেবারে অসহায়, একেবারে একা হয়ে পড়েছিল। সেই দিন থেকে তার এই বাপই কোন আত্মীয়-আত্মীয়ার সাহায্য না নিয়ে, ঝি বা গভর্ণেসের হাতে তাকে ফেলে না দিয়ে নিজেই বুকে করে তাকে মানুষ করেছেন,—দেহের শক্তি এবং মনের মধু অকাতরে তার মধ্যে ঢেলে দিয়ে তার দেহ ও মনকে রূপ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে অনুপম মাধুর্য্যে মণ্ডিত করে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন,—পায়ে তার কাঁটাটি পর্য্যন্ত ফুটতে দেন নি,—বুক দিয়ে

আড়াল করে সংসারের তপ্ত হাওয়ার স্পর্শ থেকে সযত্নে তাকে রক্ষা করে এসেছেন। কি সেই সেবা, কি ধৈর্য্য, কি ঐকান্তিকতা, কি ব্যাকুল আগ্রহ! তার মুখে সামান্য একটু হাসি ফোটাবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করে কি সেই আন্তরিক প্রচেষ্টা! মায়ের অভাব এক দিন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে অনুভব করে নি, ভাই-বোনহীন নিঃসঙ্গ সংসারে শৈশবের উদ্দেশ্যহীন অলস দিনগুলিতেও খেলাঘরের সাথীর অভাব পর্য্যন্ত নয়। একা এই বাপই তার দেহ ও মনের সকল অভাব মিটিয়ে সকল ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধন করেছেন। আজও তাই। আজও সে-ই তাঁর সব। সে ছাড়া জীবনে তাঁর আর কোন আকর্ষণ নেই, তার মঙ্গল ছাড়া তাঁর আর কোন কামনা নেই; তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করা, তার সন্তুষ্টি সাধন করা ছাড়া তাঁর জীবনের আর কোন উদ্দেশ্যই যেন নেই। তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন, আনন্দ সব সে নিয়ে,—একা সে-ই তার যথাসর্ব্বস্ব। যত ভাল তিনি তাকে বাসেন, তত কোন বাপই তার মেয়েকে ভালবাসতে পারে না।

অথচ অত ভালবাসার প্রতিদানে অমন তার বাপকে এবার সে আঘাত দিয়েছে! চির কাল যিনি তাকে কেবল দিয়েই এসেছেন, প্রতিদানে কিছুই চান নি, বোধ করি কিছু আশাও করেন নি, তিনিই এবার মুখ ফুটে একটি সম্মতি মাত্র যাচঞা করেছিলেন। তা-ও তাঁর নিজের জন্য নয়, তারই জন্য,—তারই বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে যাবার জন্য। অথচ তার কাছে তাঁর সেই একটি মাত্র প্রার্থনাকেও সে সরাসরি অগ্রাহ্য করে দিয়েছে। তাতে কত শক্ত আঘাতই যে তার বাপের বুকে গিয়ে লেগেছে, তাই অনামিকা কল্পনা করতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের বুকটাও তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে,—নিজেকে অত বড় অপকর্ম্মের কর্ত্তা মনে করে লজ্জা ও অনুতাপে সে দগ্ধ হতে থাকে। সোজাসুজি বাপের মুখের দিকে চোখ তুলে সে তাকাতেও পারে না।

অথচ না তাকিয়েও থাকতে পারে না সে। সুযোগ হলেই সে আড়চোখে বা পিছন থেকে প্রতুলবাবুর চিন্তাক্লিষ্ট, বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে,—চোখ আর যেন সে ফিরিয়ে নিতে পারে না। বাপের এ মূর্ত্তি আগে সে কোন দিনই দেখে নি। ছেলেবেলা থেকেই তাকে সে দেখে এসেছে আপনভোলা সদানন্দ মানুষ,—মুখের বিরাম নেই, ঠোঁটে হাসিটি লেগেই রয়েছে। তার সঙ্গে তিনি মিশেছেন যেন সমবয়সী বন্ধু; তার মুখের ভাবে কোন দিনই কর্ত্তৃত্বের কঠোরতা, পাণ্ডিত্যের

অভিমান, এমন কি, বয়সের সহজ গাম্ভীর্য্য পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নি। কিন্তু আজকের প্রতুলবাবুকে তার মনে হয় যেন আর এক মানুষ। গতির চাঞ্চল্য আর হাসির ঔজ্জ্বল্যের নীচে এত দিন যা চাপা পড়ে ছিল, আজ তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অনামিকা দূর থেকে তাকিয়ে দেখে যে তার বাপের কানের কাছে মাথার চুলে পাক ধরেছে, ললাটের কুঞ্চনরেখায় বয়সের হিসাব লেখা রয়েছে, চোখের নীচে ফুটে উঠেছে কালের কদাকার পদচিহ্ন। সে বুঝতে পারে যে, তার বাপের বয়স হয়েছে; তার মনে পড়ে যে, তাঁর হৃদযন্ত্রটা খুব সুস্থ বা সবল নয়,—ইতিমধ্যেই তা একাধিক বার বিকল হবার ভয় দেখিয়েছে; তার উপর এবার তিনি মনে অত বড় কঠিন আঘাত পেয়েছেন। ভাবতেই ভয়ে অনামিকার বুকটা গুড় গুড় করে কাঁপতে থাকে,—এই সেদিনও তো তিনি নিজের মুখেই তাকে ছেড়ে যাবার কথা বলেছিলেন। যদি সত্যি সত্যি তাঁর কিছু হয়,—বুকের মধ্যে অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনা আর নীরব অভিমান নিয়েই যদি তিনি চোখ বোজেন! তেমন একটা দুর্ঘটনা যদি ঘটে, তবে চির কাল চোখের জল ফেলেও একটি দিনের জন্যও তাঁকে সে আর ফিরিয়ে পারবে না,—নিজে সে সারা জীবন অনুতাপে দগ্ধ হলেও বাপের বুকের ব্যথা একটুও সে লাঘব করতে পারবে না,—নিজের হাতে নিজের শরীরটাকে কুটি কুটি করে কেটেও সে দিন সে তার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে না।

ভাবতে ভাবতে অনামিকার বুকটা এমন করে ওঠে যে, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না,—ছুটে নিজের ঘরে পালিয়ে যায়।

এক একটা মিনিট তার মনে হয় যেন এক একটা যুগ। পরের দিনটা কেবলই সে ছটফট করে কাটাল। কি যে সে চায়, নিজেই তা সে বুঝতে পারলে না। মনটা অশান্ত, উদ্দাম। বাপের কাছে গিয়ে বসতে ইচ্ছা খুবই হয়, কিন্তু কাছে যেতে সাহস হয় না। অথচ কাছে না গিয়েও নিস্তার নেই। নিজের ঘরের দোর বন্ধ করে চোখ বুজে বসে থাকলেও চোখের সামনে যেন বাপের বিষণ্ণ মুখখানি ভেসে ওঠে,—বুকের মধ্যে তখন কেমন যেন করতে থাকে,—জেগে ওঠে একটা অনির্ব্বচনীয় কোমল মমতার ভাব,—ছুটে গিয়ে বাপের মন থেকে সকল দুঃখ, সকল অভিমান নিঃশেষে মুছে ফেলবার জন্য তার সমস্ত অন্তরাত্মা অধীর আগ্রহে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কিন্তু শরীরটা পাথরের মত অচল,—টেনে, ঠেলে কিছুতেই তাকে নড়ানো যায় না।

বৈকালে চা খাবার পর রোজই ঐ টেবেলে বসেই খানিকটা গল্পগুজব হয়। এত দিন ঐ আসরে সব চেয়ে বেশী কথা বলেছে অনামিকা; প্রতুলবাবু সুরটা ধরিয়ে দিয়ে কেবল তাল রেখে চলেছেন মাত্র। কিন্তু এখন তারা দুজনেই নীরব,—কাজেই আসর আর জমে না। তবু অনিচ্ছা আর অস্বস্তি সত্ত্বেও দ্বিতীয় দিন অনামিকা শেষ পর্য্যন্ত ঐ আসরেই বসে ছিল, দুএকটি কথাও বলেছিল। কিন্তু তৃতীয় দিন চা খাওয়া হয়ে যেতেই সে একটা অছিলা করে উঠে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে; তার পর অসময়েই গা ধোবার অজুহাতে সে স্নানের ঘরে চলে গেল। ঐ তার একটা নিরাপদ আশ্রয়। সে নিজের ঘরে থাকলে তার ডাক পড়তে পারে, কিন্তু সে স্নানের ঘরে আছে জানলে নিতান্ত প্রয়োজনেও কেউ তাকে ডাকতে সাহস পাবে না।

আধঘণ্টাখানিক পর সে যখন স্নান সেরে বের হয়ে এল তখন চায়ের আসর ভেঙ্গে গিয়েছে। কারও সঙ্গেই তার দেখা হল না। কাউকেও খুঁজলেও না সে। রমেনবাবুর ঘরের সমুখ দিয়ে পা টিপে টিপে সে প্রতুলবাবুর ঘরের দিকে চলে গেল। এই সময়টাতে রোজই প্রতুলবাবু রমেনবাবুর ঘরে থাকেন,—কোন দিন গল্প করেন, কোন দিন বা বসেন দাবা খেলতে। অনামিকা ধরেই নিলে যে আজও তার বাবা রমেনবাবুর ঘরেই রয়েছেন। সে ভাবলে যে এই অবসরে তাঁর ঘরখানাকে সে গুছিয়ে দিয়ে আসবে; তাতে ওঁদের দুজনেরই সান্নিধ্য এড়ানো যাবে, অনুপস্থিতির কৈফিয়তের জন্যও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলতে হবে না।

কিন্তু পর্দ্দা ঠেলে ঘরে গিয়ে ঢুকেই দোরের কাছেই সে থমকে দাঁড়াল। ঘর খালি নয়,—প্রতুলবাবু ঘরেই রয়েছেন।

অনামিকা চমকে উঠল,—সেই বিষণ্ণ মুখ, সেই অন্যমনস্ক ভাব। জানালার ধারের বড় আরাম চৌকিখানাতে না-শোয়া না-বসা তাঁর অবস্থা। কোলের উপর কি একখানা বই খোলা পড়ে রয়েছে, কিন্তু চোখ দুটি খোলা জানালা দিয়ে কোথায় যে চলে গিয়েছে, তা বলা যায় না। অনামিকার উপস্থিতি তিনি টেরও পেলেন না; কিন্তু এই অসময়ে ঘরের মধ্যে তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে অনামিকার

বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। চক্ষের পলকে ঘর-বাড়ী, জগৎ-সংসার সব যেন তার চোখের সমুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল; আবেগের প্রচণ্ড, দুর্ব্বার এক বন্যা এসে তার মন থেকে অতীতের সকল স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের সকল ভাবনা একটি মাত্র তরঙ্গের মুখে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আর কিছুই তার চোখে পড়ল না কেবল অন্যমনস্ক বাপের বিষণ্ণ, গম্ভীর ঐ মুখখানি ছাড়া; আর কোন ভাবনা তার মনে এল না,—শুধু মনে হতে লাগল যে, ঐ তার স্নেহশীল বাপের এই যে আজ শোচনীয় দুরবস্থা,—এ তো তারই অপকীর্ত্তি!—

অপরাধের অনুভূতি অনামিকার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল, আর ওরই সঙ্গে এল কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করবার আকাঙ্খা। আঁচল দিয়ে চোখের কোণ দুটি মুছে ফেলে ধীর পদবিক্ষেপে সে প্রতুলবাবুর কাছে এগিয়ে গেল; আলগোছে তাঁর মাথার উপর ডান হাতখানি রেখে সে শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলে, বাবা!—

প্রতুলবাবু চমকে উঠলেন; তাড়াতাড়ি পা গুটিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, এ কি-অনু!—কখন এলে মা!—

অনামিকা নিজেই চৌকির প্রশস্ত হাতার উপর ঝুঁকে বসল; বললে, এই তো এখন।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতুলবাবু উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলেন, তোমার মুখখানা বড্ড শুকনো দেখছি যে, মা!—কোন অসুখ করে নি তো!—

অনামিকা খুব সংক্ষেপে উত্তর দিলে, না। তার পরেই সোজাসুজি প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বেশ স্পষ্ট করেই সে বললে, তুমি সে দিন সেই যে বলেছিলে না, বাবা,—আমি বলেছিলাম, ভেবে দেখব,—তা যা তুমি বলেছিলে তাই হবে; আমি মন ঠিক করেছি, বাবা,—আমার কিছু অমত নেই।

প্রথমে প্রতুলবাবুর শরীরটা যেন পাথর হয়ে গেল; কিন্তু তার পরেই এমন নড়ে উঠল যেন প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্প নীচে থেকে তাঁকে ঠেলা দিয়েছে। মাটি থেকে পা দুখানিকে চৌকির উপর টেনে তুলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিদ্যুদ্বেগে অনামিকার দিকে মুখ করে ঘুরে বসলেন এবং তার মুখের দিকে চেয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে বললেন, কি, কি বলছ, মা,—কিসে অমত নেই তোমার?

এই তুমি যা বলেছিলে, তাই,—বলতে বলতে বার দুই ঢোক গিললে অনামিকা; —মানে, এই বাড়ীতেই আমার যদি বিয়ে হয় তাতে কোন অমত নেই আমার।

প্রতুলবাবু বিহ্বল স্বরে বললেন, কি বলছ, অনু ? তুমি যে সেদিন বললে যে এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না !

অনামিকা চোখ নামিয়ে উত্তর দিলে, না, বাবা,—তা বলিনি আমি ; তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছিলে ;—আমি বলেছিলাম, ভেবে পরে জানাব তোমায় ; তাই বলতে এলাম।

কথাটা সত্য নয়,—প্রতুলবাবুর বিশ্বাসও হল না। সে দিনের ঘটনা আগাগোড়া তাঁর মনে পড়ে গেল,—অনামিকার প্রত্যেকটি কথা, মুখের প্রত্যেকটি ভঙ্গী পর্য্যন্ত। অনিশ্চিত চিত্তের ইতস্ততঃ ভাব তাতে একেবারেই ছিল না,—ছিল সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি। কিন্তু তা যেমন সত্য ছিল, অনামিকার আজকের এই ভাব, এই কথা,—এ-ও তেমনি সত্য। একেও মিথ্যা বলে, ছলনা বলে উড়িয়ে দিতে না পেরে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত তিনি মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

অনামিকা বিব্রত হয়ে পড়ল ; আর এক বার ঢোক গিলে মুখখানা হাসবার মত করে সে বললে, তোমার কথা কি আমি ঠেলতে পারি, বাবা ?

প্রতুলবাবু চমকে উঠলেন,—অনামিকার মুখের ঐ অদ্ভুত হাসির আলোকেই এতক্ষণ পর সত্যটাকে যেন আবছায়া রকমে দেখতে পেলেন তিনি। তাড়াতাড়ি ডান হাত বাড়িয়ে মেয়েকে তার কোমরের কাছ দিয়ে জড়িয়ে ধরে গাঢ় স্বরে তিনি বললেন, তাই বল,—তোমার বুড়ো ছেলের মন রাখতে এসেছ, মা ! কিন্তু সে জন্য তোমার নিজের মনটাকে ফাঁসি দিয়ে মারতে পাবে না তুমি,—তা আমি তোমায় কিছুতেই করতে দেব না, মা।

ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠে অনামিকা বললে, না, বাবা,—তা নয়। আমি কি আর তোমার চেয়ে বেশী বুঝি ! তুমি নিজে কি আর সব দিক না ভেবে এ সব ঠিক করেছ !—

ঠিক করেছি !—প্রতুলবাবু বিব্রত হয়ে বললেন,—ঠিক তো কিছুই করি নি আমি ! কথাটা ওঁরা তুললেন,—তাই তোমায় আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

অনামিকা চমকে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে ; তার পর নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ তো,—আমার উত্তরও তো এখন তুমি শুনলে ! এবার ওঁদের তুমি কথা দিয়ে দাও,—সব ঠিক হয়ে যাক্।

প্রতুলবাবু নিজেও নড়ে বসলেন ; বিহ্বল স্বরে বললেন, ঠিক হয়ে যাবে, কি বলছ অনু ? সত্যি বল তো, মা,—এই কি তোমার মনের কথা ?

একটু হাসবার চেষ্টা করে অনামিকা উত্তর দিলে, তা নয় তো কি !—বলেই সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রতুলবাবু আরও বেশী বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অনামিকার মুখের কথা বিশ্বাস করতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না,—সে দিনের সেই সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি তাঁর মনে পড়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে পড়ল আরও আগের কথা,—মহামায়াদেবীর সেই অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত—অনামিকার নিজের সব কার্য্যকলাপ। প্রথম দিনের যে সন্দেহটা অনামিকার সে দিনের অমন ঝাঁঝালো উত্তরের তাপে ঝলসে গিয়ে ডালপালা গুটিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল, সেটাই এখন যেন নববর্ষার ধারাস্নাত চারার মত আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠল,—কি জানি, হয়তো অনামিকা অরুণাংশুকে ভালই বেসে ফেলেছে,—সে দিন সঙ্কোচে মনের কথা প্রকাশ করতে পারে নি,—আজ আর থাকতে না পেরে নিজেই বলতে এসেছে। কিন্তু বিপরীত সন্দেহটাও নিতান্ত দুর্ব্বল নয় ; তাঁরই নিজের অনিচ্ছার সমর্থন পেয়ে সেটা আবার রীতিমত প্রবল হয়ে উঠেছে। সুতরাং কোনটাকে অগ্রাহ্য করে কোনটাকে যে তিনি সত্য বলে গ্রহণ করবেন, তা তিনি তখনই ঠিক করতে পারলেন না। অনামিকার মুখের দিকে তাকিয়েও নিশ্চিত কিছু বুঝতে না পেরে অবশেষে হতাশ হয়ে অনামিকার একখানা হাত নিজের কোলের উপর টেনে এনে আবার তাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিক করে বলছিস তো, মা,—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে !—

অনামিকা বাপের দৃষ্টি এড়িয়ে উত্তর দিলে, ঠিকই বলেছি, বাবা,—আমার কিচ্ছু অমত নেই।

ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন প্রতুলবাবু ; আকাশ-পাতাল কত কি ভাবনা যে তাঁর মনে উঠতে লাগল তার লেখাজোখা নেই। তার পর সহসা অনামিকার হাতের উপর বেশ জোরে একটু চাপ দিয়ে মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, না, মা, না,—এত তাড়াতাড়ি কিছু ঠিক করবার দরকার নেই। বিষয়টি গুরুগম্ভীর,—তুমি খুব ভাল করে এ সম্বন্ধে ভেবে দেখ।

অনামিকা মৃদু স্বরে বললে, আমি ভেবেছি, বাবা,—খুবই ভেবেছি।

তাহলেও আরও ভাবা দরকার,—প্রতুলবাবু কণ্ঠস্বরে আরও বেশী জোর দিয়ে

বললেন,—ঘরোয়া ব্যাপারের যা-তা একটা কথা এ তো নয় ;—এ হল গিয়ে বিয়ের কথা,—জীবনের সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

একটু থেমে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে প্রতুলবাবু আবার বললেন,বিয়ে তো একটা খেলা নয়, মা,—এক দিনের একটা উৎসবও নয়, মামুলি একটা সামাজিক অনুষ্ঠানও নয়। আমাদের দেশে, আমাদের কাছে বিয়ে তো ধর্ম্ম।

চোখ নামিয়ে উত্তর দিলে অনামিকা, তা আমি জানি।

আরও যেন গম্ভীর হয়ে গিয়ে প্রতুলবাবু বললেন, সেই জন্যই তোমায় আমি আরও ভাল করে ভেবে দেখতে বলছি। তুমি হয়তো বললে ছোট্ট একটি 'হ্যাঁ' ; কিন্তু সারা জীবন ঐটুকু কথারই জের টানতে হবে তোমাকে। এক দিনের সামান্য একটু অনুষ্ঠানের উপর তোমার জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল, ব্যর্থতা-সার্থকতা নির্ভর করবে। ঝোঁকের মাথায় বা প্রবৃত্তির তাড়নায় এমন একটা গুরুতর বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করো না তুমি,—সাময়িক একটা আবেগের বশবর্ত্তী হয়েও নয়,—তা সে আবেগ যত মহৎই হউক না কেন। বিয়ে জিনিষটা ভাবালুতার বিষয় মোটেই নয়, মা,—ছেলেখেলা তো নিশ্চয়ই নয়।

অনামিকা কোন উত্তর দিলে না, মুখও ফিরালে না। প্রতুলবাবুও কিছুক্ষণ চুপ করেই বসে রইলেন। এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে ফেলে তিনি বোধ করি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঐ অবসন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠবার পর আবার যখন তিনি মুখ তুললেন তখন ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। অনামিকা তখনও মুখ ফিরিয়ে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল,—অস্পষ্ট আলোকে তার মুখখানা ভাল দেখতে না পেয়ে প্রতুলবাবু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, মা, অনু,—এক বার চাও তো, আমার দিকে।

কিন্তু অনামিকা মুখ ফিরালে না। কয়েক সেকেণ্ড কাল সতৃষ্ণ চোখে তার আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, তোমার মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন, অনু, তবে কি আর তোমার বিয়ের জন্য আমার মাথা ঘামাতে হত! তিনি নেই বলেই আমার দায়িত্ব এত বেশী বেড়েছে আর ওরই সঙ্গে বেড়েছে ভাবনা,—পাছে আমার একটা ভুলের জন্য তোমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই বার বার তোমায় বলছি,—আমার কথা তুমি ভেবো না ; যার সাথে তোমার বিয়ের কথা উঠেছে তাকে নিজে তুমি চির জীবনের সাথী বলে

গ্রহণ করতে পারবে কি না, কেবল সেই কথাই তুমি ভাল করে বিবেচনা করে দেখ।

অনামিকার সারা শরীরটাই এক বার থর থর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আঁচল দিয়ে মুখখানা মুছে নিলে সে; তার পর বাপের মুখের দিকে চেয়ে শান্ত, গম্ভীর স্বরে সে বললে, বাবা,—আমার মাকে তো আমার মনে নেই; কিন্তু তোমার তো সবই মনে থাকবার কথা। তোমার কি মনে হয় যে খুব হাল্‌কা একটা মনোবৃত্তি নিয়ে এ রকম ব্যাপারে তিনি একটা মত দিতে পারতেন?

প্রতুলবাবু বিহ্বলের মত বললেন, এ কথা কেন বলছ, মা?

প্রশ্নটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই অনামিকা বললে, আমি তো তাঁরই মেয়ে,—হাল্‌কা মনোবৃত্তি নিয়ে আমি কিছু করছি নে, বাবা। যা বলেছি তা আমি বেশ ভেবেই বলেছি। তুমি আমার জন্য যা ঠিক করেছ তাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

এ কি বলছ, মা?—প্রতুলবাবু ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলেন,—এই তো মস্ত ভুল করছ তুমি। ঠিক তো আমি কিছুই করি নি,—ওঁরাই আমায় ধরেছেন। আমি শুধু বলেছি যে, প্রস্তাবটা সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করব।

সে তবে তুমি করো, বাবা,—বলতে বলতে অনামিকা হাত ছাড়িয়ে নিলে,—আমার যা বলবার তা আমি তোমায় বলেছি,—আর কোন কথা জিজ্ঞেস করে তুমি আমার অপরাধ বাড়িয়ো না। খালি আশীর্ব্বাদ করো যে, তোমার অবাধ্য হবার দুর্ম্মতি কোন দিন যেন আমার না হয়।

কথা শেষ করেই ধীর পদবিক্ষেপে সে বের হয়ে গেল। প্রতুলবাবুর মুখে আর কোন কথা ফুটল না।

প্রতুলবাবুর মনের মধ্যে সব আবার ওলটপালট হয়ে গেল। যা হউক একটা সিদ্ধান্ত তিনি করেছিলেন; তাতে আর কিছু না থাকলেও নিশ্চয়তা ছিল। এবার তা গেল ভেঙ্গে; মনের মধ্যে যে জড় শান্তিটুকু এসেছিল তা-ও সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয়ে গেল। নূতন করে কোন সিদ্ধান্ত তিনি ঠিক করতে পারলেন না। নিজের মনের অনিচ্ছা তো আছেই,—তার শিকড় যে নীচের দিকে কত দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তা ভাল করে বোঝাই যায় না। কিন্তু সব চেয়ে বেশী মুশকিল তাঁর হল ঐ

অনামিকার ইচ্ছাটাকে নিয়ে। সেটা তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না। অনামিকা যদি নির্দ্দিষ্ট কোন একটা মত খুব জোর করে প্রকাশ করত, তবে নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে দাবিয়ে রেখে মেয়ের মতেই তিনি মত দিতে পারতেন। কিন্তু তা সে করে নি ;—সে একবার বলেছে "না", আর একবার বলেছে বিপরীত। 'হ্যাঁ' কথাটা সে বেশ জোর দিয়ে বললেও ওরই সঙ্গে সে আবার একটা লেজুরও জুড়ে দিয়েছে,—বাপের অবাধ্য সে কিছুতেই হবে না। কাজেই তার ঐ সম্মতির মধ্যে কতটুকু যে তার নিজের মত আর কতটুকু যে বাপের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ গিয়ে ঢুকে পড়েছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে কেবল এইটুকু তিনি বুঝে নিয়েছেন যে, দায়িত্বটা সম্পূর্ণ তাঁরই ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। ওরই গুরুভারের নীচে তাঁর দুর্ব্বল মনটা ক্লিষ্ট ও অবসন্ন হয়ে ক্রমেই যেন পাঁকের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল।

এমনি যখন তাঁর অবস্থা তখন আবার তাগিদ এল,—রমেনবাবুর কাছ থেকে নয়, খোদ মহামায়াদেবীর কাছ থেকে। প্রতুলবাবু নিজে থেকে কিছুই বলছেন না দেখে ধৈর্য্য আর রাখতে না পেরে সুযোগ খুঁজে নিজেই সেদিন তিনি, প্রতুলবাবুর ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। দুএকটি অবান্তর কথা বলবার পরেই সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, কি হল, ঠাকুরপো—অনুর সাথে কোন কথা হল আপনার ?

প্রতুলবাবু নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। যে কথাটা অনবরতই তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল, অথচ মুখ ফুটে কাউকেই তিনি বলতে পারছিলেন না, তা-ই এবার প্রকাশ হয়ে পড়ল। অসহায়ের মত মহামায়াদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে গাঢ়, কম্পিত স্বরে তিনি বললেন, কিছুই ঠিক করতে পারছি নে, বৌদি,—অনুর মনের আসল কথাটা যে কি তা আমি মোটে ধরতেই পারছি নে।

মহামায়াদেবীর মুখখানা আশঙ্কায় কালো হয়ে গেল ; উদ্বিগ্ন স্বরে তিনি বললেন, কেন, ঠাকুরপো,—কি বলেছে সে ?

প্রতুলবাবু অসহায়ের মত উত্তর দিলেন, ঠিক করে সে কিছুই বলে নি ; তাতেই তো আমি মুশকিলে পড়ে গিয়েছি।

একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ কণ্ঠে তিনি আবার বললেন, এ আমার কর্ম্মই

নয়, বৌদি ;—ওর মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে ওর মনের কথা টেনে বের করতে পারতেন তিনি।

মহামায়াদেবীর ম্লান মুখ দেখতে দেখতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—হঠাৎ যেন অকূল সাগরে কূল দেখতে পেয়েছেন তিনি। কিন্তু উৎফুল্ল ভাবটাকে গোপন করে, কণ্ঠস্বরে সমবেদনার আমেজ দিয়ে তিনি বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, ঠাকুর-পো,—এ আপনার কাজই নয়,—কোন পুরুষেরই কাজ নয় এ। মেয়েমানুষের কাছে ছাড়া মেয়েদের মুখ খোলে না।

একটু থেমে কুণ্ঠিত ভাবে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একটু যেন ভয়ে ভয়েই তিনি আবার বললেন, তা, ঠাকুরপো,—আপনি যদি বলেন,—মানে, আপনার অমত যদি না হয়,—তবে আমিই অনুকে একবার বলে দেখতে পারি ;—বলব ?

আপনি !—প্রতুলবাবু বিহ্বল স্বরে বললেন,—আপনি অনুকে জিজ্ঞেস করবেন ?

তা কেন করব না, ঠাকুরপো ! বলতে বলতে মহামায়াদেবীর মুখে-চোখে অদ্ভুত এক রকমের হাসি ফুটে উঠল,—অনু তো আমার মেয়ের মত,—মানে, মেয়েই তো তাকে আমি করতে চাচ্ছি। আর,—তাছাড়া,—গরজও তো আমারই বেশী।

প্রতুলবাবু আবার বিহ্বল হয়ে পড়লেন। এ আবার আর একটা অপ্রত্যাশিত অবস্থা। এ কদিন ধরেই এমনি হচ্ছে। যার সম্ভাবনার কথাও কোন দিন তাঁর মনে ওঠে নি, তাই উপস্থিত হচ্ছে একেবারে বাস্তব হয়ে। একটার পর আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে মনটা তার বিকল হয়েই ছিল,—মহামায়াদেবীর প্রস্তাব শুনে তা আরও বিকল হয়ে গেল। এক বার তিনি ভাবলেন যে, মহামায়াদেবীর প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া হবে না,—উনি নিজে গিয়ে অনুরোধ করলে অনামিকা হয় তো আরও বিব্রত, আরও বিহ্বল হয়ে সম্পূর্ণ একটা ভুল সিদ্ধান্ত করে বসবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হল যে, মহামায়াদেবীর কথাই ঠিক,—মেয়েদের কাছে ছাড়া মেয়েদের মুখ ফোটে না,—মহামায়াদেবী চেষ্টা করলে হয় তো অনামিকার মনের আসল কথাটা জেনে আসতে পারবেন।

কিন্তু তিনি কিছু ঠিক করবার আগেই মহামায়াদেবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলেন, ঠাকুরপো ? অনুর সাথে নিজেই আমি একবার কথা বলি !—

প্রতুলবাবু আর ভাবতে পারলেন না,—মনেও হাল ছেড়ে দিলেন, মুখেও

তাই। সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, কি জানি,—আমি আর কিছু ভাবতে পারছি নে, বৌদি; সব ভার আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিলাম আমি,—যা করবার আপনারাই করুন।

মহামায়াদেবীর উদ্বিগ্ন মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু এবারও সে ভাবটা গোপন করে কোমল আশ্বাসের স্বরে তিনি বললেন, তাই ভাল, ঠাকুরপো। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। মেয়ে করে, মা করে যাকে আমরা ঘরে আনতে চাচ্ছি, তার কোন অমঙ্গল আমরা হতে দেব না। আর তার অমতেও কিছুই আমরা করব না।

সেদিন বিকেলেই চুল বাঁধবার নাম করে অনামিকাকে তিনি এক রকম জোর করেই নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। কিন্তু কাজটা উপলক্ষ মাত্র,—আসল উদ্দেশ্য কথা বলা। তার খুব সুবিধা হয়ে গেল। অনামিকাকে তিনি পেলেন প্রায় তাঁর কোলের উপরে; অথচ মুখোমুখি বসতে হল না; চোখের দিকে চেয়ে কথা বলবার যে সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে অনেক মহারথীকেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে হয়, তার দৌরাত্ম্য আর তাকে ভুগতে হল না। আঙুল দিয়ে চুলের জট ভেঙ্গে নিয়ে চিরুনি চালাতে সুরু করেই নিজের দেহের খানিকটা ভার অনামিকার উপর ঢেলে দিয়ে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে তিনি বলে উঠলেন, আর তিনটি দিন পরেই তুমি চলে যেতে চাচ্ছ, মা,—আমার বুকটা এখন থেকেই হু হু করছে।

শুনে অনামিকার নিজের বুকটাই হু হু করে কেঁপে উঠল। এ কথা যে কিসের ভূমিকা তা এক রকম সে আন্দাজ করে নিলে। কিন্তু মুখে সে কোন উত্তর দিলে না।

মহামায়াদেবী উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করলেন না, একটু পরেই আবার বললেন, কিন্তু তোমায় ছেড়ে বেশী দিন আমরা থাকতে পারব না, অনু। আমাদের ঘরেই আবার তোমায় আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসব, সে বার আর পর বলে ছেড়ে যেতে পারবে না।

এবারও অনামিকা উত্তর দিলে না। কথাটা যে সে শুনতে পেয়েছে এমন কোন লক্ষণও তার ব্যবহারে প্রকাশ পেল না।

একটু পরে মহামায়াদেবীই আবার বললেন, তোমার বাবাকে উনিই সব কথা বলেছেন। তাঁর কাছে শোন নি তুমি?

অনামিকা এবারও নিরুত্তর। দেখে মহামায়াদেবী একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়লেন। একটু চুপ করে থেকে গলার স্বর একেবারে বদলে দিয়ে তিনি আবার বললেন, জোর করবার মুখ আমাদের নেই, মা ; তোমাকে লোভ দেখাবারও আমাদের কিছুই নেই,—ভগবান নিজেই তো তোমার দুহাত ভরে দিয়েছেন! যার হাত ধরে আমাদের ঘরে তোমায় আসতে বলছি, সেই আমাদের ছেলেই যখন মানুষের মত মানুষ নয় তখন তোমাকে আর কিসের লোভ দেখাব আমরা !

এবারও অনামিকা উত্তর দিলে না,—কিন্তু একটু নড়ে বসল সে।

ঐ অতটুকু সাড়া পেয়েই উৎসাহিত হয়ে মহামায়াদেবী আবার বললেন, তবু ঐ ছেলের জন্যই তোমার বাবার কাছে তোমায় আমরা ভিক্ষে চেয়েছি, মা। ঐ তো লক্ষ্মীছাড়া ছেলে,—কিন্তু লক্ষ্মী ছাড়া আর কেউ তো তাকে লক্ষ্মীমন্ত করতে পারবেও না! তোমার মধ্যে সেই লক্ষ্মীকে আমরা দেখতে পেয়েছি, তাই তোমার উপর আমাদের এত লোভ।

এবারও উত্তরে অনামিকা একটি কথাও বললে না। উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর মহামায়াদেবী হাতের কাজ বন্ধ করে অনামিকার ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে তার মুখের দিকে চেয়ে সনির্বন্ধ স্বরে বললেন, কি বল, অনু ?— তোমায় না হলে আমাদের চলবেই না। শুনেছই তো সব,—আর নিজের চোখেই অনেক কিছু তুমি দেখেও নিয়েছ। কত টানলাম, কত দড়িদড়া দিয়ে বাঁধলাম,—কিন্তু ছেলেকে ঘরে রাখতে পারলাম না। কি দুঃখে যে দিন আমাদের যাচ্ছে তা এক ভগবানই জানেন। এবার তোমায় দেখে একটু আশা হয়েছে,— বিশ্বাস হয়েছে যে, আমরা যা পারি নি, তুমি তা পারবে। আমাদের সকলের অনুরোধ ঠেলতে পারবে না তুমি,—আমার ঘরছাড়া ছেলেকে ঘরে এনে বেঁধে দিতে হবে, মা।

এবার উত্তর দিলে অনামিকা ; মহামায়াদেবীর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সবেগে মাথা নেড়ে সে বললে, না,—তা আমি পারব না।

এমন একটা উত্তর মহামায়াদেবী আশা করেন নি,—ধরণটা নিশ্চয়ই নয়। তাঁর মুখ শুখিয়ে গেল। উদ্বিগ্ন স্বরে তিনি বললেন, কেন, মা ?

মুখ নামিয়ে অস্ফুট স্বরে অনামিকা উত্তর দিলে, আকাশের তারাকে কি কেউ বাঁধতে পারে, জেঠিমা !—

এ কথাটা মহামায়াদেবীর কানে গেলেও মাথায় ঢুকল না; বিহ্বল স্বরে তিনি বললেন, কি বলছ, মা ?

আরও একটু মুখ নামিয়ে আগের চেয়েও মৃদু স্বরে অনামিকা বললে, না, জেঠিমা,—আমি বলছিলাম যে, আমার গুণ তো কিছুই নেই !—

এই কথা !—মহামায়াদেবী আশ্বস্ত হয়ে বললেন। তাঁর মুখের উপর যে কালো মেঘখানা ভেসে এসেছিল তা দেখতে দেখতে কেটে গেল, ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসিও ফুটে উঠল। হাতের চিরুনিখানা মাটিতে নামিয়ে রেখে ডান হাতে অনামিকার গাল দুটি টিপে দিয়ে তিনি কৌতুকের স্বরে বললেন, তোমার গুণ আছে কি নেই, তা তো তোমার জানবার কথা নয়, মা,—জানি আমরা। সে জন্য তোমায় ভাবতে হবে না, করতেও হবে না কিছু। তুমি কেবল আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়ে আমার ঘরে এস,—পরশমণির মত তোমার একটু ছোঁয়া লাগলেই আমার ঘরের সব লোহা সোনা হয়ে উঠবে।

অমনি করেই মহামায়াদেবীর সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, ছুটল সদ্যোমুক্ত কল্লোলিত জলধারার মত। একটি মাত্র সন্তানের জননী তিনি। অথচ ঘটনাচক্রে সেই সন্তানের সঙ্গেও তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়েছে। বৎসরের পর বৎসর পার হয়ে গিয়েছে,—ছেলেকে তিনি চোখেও দেখেন নি, রাজসংসারের অপরিমেয় সম্পদের অধিকারিণী হয়েও অভাবগ্রস্ত সন্তানকে এক কপর্দক দিয়েও তিনি সাহায্য করতে পারেন নি। সে কি কম কষ্ট! কি যে দুর্ভাগ্য তাঁর,—বার বার তিনি আলো জ্বালতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু জ্বলতে না জ্বলতেই তা নিভে গিয়েছে। দুই হাত দিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে যা তিনি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন, তা-ই হাত থেকে ফসকে গিয়েছে। সুদীর্ঘ কালের সাধনা ও চেষ্টায় পিতৃপরিত্যক্ত সন্তানের ঘরে ফিরবার এ দিকের বাধাটাকে যদিও এত দিন পর তিনি অপসারিত করতে পেরেছেন তবু ছেলে নিজেই এখন আর ঘরে আসতে চাচ্ছে না,—সব থাকতেও সব ছেড়ে সে হয়েছে সন্ন্যাসী,—কত মায়াবী-মায়াবিনীরাই যে তাকে যাদু করেছে,—মুগ্ধ হয়ে, অন্ধ হয়ে মরীচিকার পিছনে পিছনে ছুটে ক্রমেই সে ঘর থেকে, সংসার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। চারিদিকের নীবিড় অন্ধকারের মধ্যে ভগ্নহৃদয়া জননী আজ যে আলোটুকু দেখতে পেয়েছেন, তা ঐ অনামিকা। আজ সে-ই তাঁর এক মাত্র ভরসা, একমাত্র নির্ভর; তাকেই অবলম্বন করে তাঁর শুখিয়ে যাওয়া,

এলিয়ে- পড়া আশার লতাটি আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। সে অবলম্বনটুকুও সরে গেলে তাঁর জীবনের আর কোন লক্ষ্যও থাকবে না, আশ্রয়ও নয়।—

এমনই সব কথা,—তাঁর ক্ষোভ, তাঁর দুঃখ, তাঁর আশা, তাঁর পরিকল্পনার কথা মহামায়াদেবী অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ পর হঠাৎ এক সময়ে তাঁর মনে হল যে, যাকে উদ্দেশ করে তিনি এত সব কথা বলে যাচ্ছেন, সেই অনামিকার শরীরটা যেন কাঠের মত নিথর ও কঠিন হয়ে গিয়েছে; মনে পড়ল যে, তাঁর এত সব কথার প্রত্যুত্তরে অনামিকা একটি কথাও উচ্চারণ করে নি। মনে হতেই থেমে গেলেন তিনি; তাঁর চোখেমুখে আবার উদ্বেগের ছায়া ঘনিয়ে এল; একটু চুপ করে থাকবার পর ভয়ে ভয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি বল, মা? তোমার কাছে আমি যে অনেক আশা করেছি,—নিরাশ হতে হবে না তো?

অনামিকা এ প্রশ্নেরও উত্তর দিলে না দেখে মহামায়াদেবীর মুখের উপরকার কালো ছায়াখানি আরও যেন কালো হয়ে উঠল। কিন্তু চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। একটু চুপ করে থেকে আবার গলার স্বর একেবারে বদলে দিয়ে তিনি বললেন, মা অনু,—কত লেখাপড়াই তুমি শিখেছ,—আমি তোমায় আর কি শেখাতে পারি? তবু কি চোখেই যে তোমায় আমি দেখেছি—মনে হচ্ছে যে তুমি যেন আমারই মেয়ে। তাই তোমার নিজের মা বেঁচে থাকলে আজ যে কথা তিনি তোমায় নিশ্চয়ই বলতেন, সেই কথাটাই আমিও তোমায় না বলে পারছি নে, মা।

একটু থেমে গম্ভীর স্বরে তিনি আবার বললেন, সীতা-সাবিত্রীর দেশের মেয়ে তুমি,—আর অমন সতীলক্ষ্মীর গর্ভে তোমার জন্ম। নিজেই তো তুমি জান, মা, যে, নিজের সুখসুবিধার কথা এ দেশের মেয়েরা কোন দিনই ভাবেন নি। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েই তাঁরা সংসারকে ধন্য করেছেন, নিজেরাও পেয়েছেন নারীজন্মের চরম সার্থকতা। সংসার হল এ দেশের মেয়েদের ধর্ম্ম,—বিয়ে তাদের একটা ব্রত। লক্ষ্মীর অংশে জন্ম তাদের,—তাদেরই সেবা, ত্যাগ আর পূণ্যে সংসারের সব কাচ হীরা হয়ে উঠেছে,—শূন্য হয়ে উঠেছে এক এক টুকরো স্বর্গ। মেয়েরা ছেলেদের দোষগুণের চুলচেরা বিচার করতে সুরু করলে সংসার কি এক দিনও টিকতে পারে, মা?

অনামিকার পাথরের মত শক্ত দেহটা এবার নড়ে উঠল; দেখে মহামায়াদেবী কাতর স্বরে বললেন, কি বল, মা? তুমি ছাড়া আমার অরুণকে আর কেউ ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তাই আমাদের দুটি বুড়োবুড়ীর সব আশা গিয়ে পড়েছে তোমার উপর। আমাদের তুমি নিরাশ করবে না তো?

ঘামে অনামিকার সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল, নিশ্বাস আসছিল বন্ধ হয়ে। অনেক চেষ্টায় শক্তি সঞ্চয় করে অস্ফুট স্বরে সে বললে, এ সব কথা আমায় কেন বলছেন, জেঠিমা?—বাবাকে বলুন।

উত্তরটা পাওয়া গেল অনেক সাধ্যসাধনার পর। কিন্তু মহামায়াদেবী যে উত্তর আশা করেছিলেন তা এ নয়। কাজেই মনের মধ্যে সংশয় থেকেই গেল। হাতের কাজ বন্ধ করে একটু চুপ করে থাকবার পর ম্লান মুখে কোনও রকমে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে তিনি বললেন, কিন্তু তোমার মত ছাড়া কিছুই তো হতে পারবে না, মা!

উত্তরে অনামিকা বললে, আমার যা বলবার তা আমি বাবাকেই বলেছি।

মহামায়াদেবী চমকে উঠলেন, রুদ্ধনিশ্বাসে বললেন, বলেছ,—কি বলেছ, মা?

অনামিকা মৃদু স্বরে বললে, আপনি বাবাকেই জিজ্ঞেস করবেন।

একটু থেমে, মহামায়াদেবীর মুখে কোন উত্তর ফুটবার আগেই, নিজে থেকেই সে আবার বললে, বাবার যা মত, আমারও তাই। তাঁর কথা আমি কিছুতেই অমান্য করব না।

মহামায়াদেবী বিপদে পড়ে গেলেন। প্রতুলবাবু খোলাখুলি ভাবে তাঁকে কিছুই বলেন নি; মেয়ের সঙ্গে কি সব কথা তাঁর হয়েছে তা তিনি আন্দাজ করতে পারলেন না। বিব্রত মুখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবার পর তিনি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন, কিন্তু, মা,—তোমার নিজের মতটাই হল গিয়ে আসল। সেটাই যদি—

হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি,—মুখের কথা মুখেই আটকে গেল। তাঁর চোখ দুটি গিয়ে মিলল একেবারে অনামিকার চোখের সঙ্গে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যে অনামিকার মুখ তিনি দেখতে পান নি, সেই অনামিকাই হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে মহামায়াদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে অকম্পিত, গম্ভীর স্বরে বললে, আমার মতের কথা অত বেশী ভাবছেন কেন আপনারা? বাবার সামান্য একটু অমত থাকলেও আমার পুরোপুরি মতেও কিছুই হবে না,—তাঁর অবাধ্য কোন কারণেই হব না আমি।

বলেই আবার সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

মহামায়াদেবী অপ্রস্তুতের মত চুপ করে গিয়েছিলেন ; অনামিকার কথা শুনে শুকনো রকমের একটু হেসে তিনি বললেন, ঠিক বলছ তো, মা ? তোমার বাবার মত হলেই তোমার মত হবে তো ?

মুখ না ফিরিয়েই কুণ্ঠিত, মৃদু স্বরে অনামিকা উত্তর দিলে, হলেও লাভ কি হবে ? আমাদের দুজনের মতই তো সব নয়। আরও এক জনের সম্মতি তো চাই,—আর সেটাই হল আসল।

মহামায়াদেবী বিহ্বল হয়ে পড়লেন। এমন অবস্থা তাঁর হল যেন অতর্কিতে প্রকাণ্ড একটা ঢেউ ছুটে এসে তাঁর উপরে আছাড় খেয়ে পড়েছিল, আঘাতটা সামলে নেবার আগেই তিনি আবার ভাটার টানে ধরা পড়ে গিয়েছেন। তাঁর মাথার মধ্যে অনেকগুলি চিন্তা এক সঙ্গে উঠে পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে কেমন যেন তাল পাকিয়ে গেল ; বিহ্বল চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল সেই সংঘাত আর বিশৃঙ্খলার প্রতিচ্ছবি। দুতিন মিনিট কাল তাঁর মুখে কোন কথাই ফুটল না ; কিন্তু তার পরেই হাসির আলোকে তাঁর সারা মুখখানা ঝলমল করে জ্বলে উঠল। অনামিকার ঘাড়ের উপর দিয়ে হেট হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডান হাতের তিনটি আঙুল দিয়ে তার চিবুক ছুঁয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, তার জন্য তোমায় একটুও ভাবতে হবে না, মা। তুমি নিজে আমাদের নিরাশ করো না, তার পর যা করবার তা আমরাই করব।

চুল বাঁধা ততক্ষণে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, বাকিটুকু মহামায়াদেবী খুব তাড়াতাড়িই শেষ করলেন! তার পর অনামিকাকে ঘুরিয়ে মুখোমুখি বসিয়ে নিজের আঁচল ভিজিয়ে তার মুখ মুছে দিলেন ; চোখের পাতায় খুব সরু করে কাজল এঁকে দিলেন ; কপালে ছোট একটি সিঁদুরের ফোটা দিয়ে তার নীচে সেঁটে দিলেন ঝকঝকে কালো একটি টিপ! প্রসাধন শেষ করে, আর এক বার চিবুক ধরে অনামিকার মুখখানি নিজের মুখের কাছে তুলে অল্প একটু হেসে তিনি বললেন, এ মুখ দেখেও রুণুর মত যদি না হয় তো তার মত অভাগা সংসারে আর দ্বিতীয় নেই।

চক্ষের পলকে অনামিকার মুখখানি সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠল ; চোখ বুজে অস্ফুট কিন্তু তীব্র ঝাঁঝালো স্বরে সে বললে, যাঃ,—এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঝটকা দিয়ে মুখখানা মুক্ত করে নিয়েই সে উঠে দাঁড়াল।

হাসিমুখে তার বিচিত্র মুখখানার দিকে চেয়ে মহামায়াদেবী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, যাও মা, শীগগির গা ধুয়ে এস গে; উনি আবার এক্ষুনি ডাকাডাকি সুরু করে দেবেন।

কিন্তু যাবার জন্ত পা বাড়িয়েও অনামিকা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। একটু যেন ইতস্ততঃ করলে সে; কিন্তু তার পরেই আবার মুখ ফিরিয়ে কুণ্ঠিত চোখে এক বার মহামায়াদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই তাঁর পায়ের কাছে হাটু গেড়ে বসে তাঁর পা ছুঁয়ে তাঁকে সে প্রণাম করলে এবং বিস্মিতা মহামায়াদেবীর মুখে বিস্ময় বা আশীর্ব্বাদের কোন কথা ফুটবার আগেই বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের জীবন্ত একটি শিখার মতই সে ছুটে বের হয়ে গেল।

মহামায়াদেবীর মুখে সকল কথা শুনে রমেনবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, অনু ঠিকই বলেছে; অরুণের মত না জেনে এ ব্যাপারে আর কিছুই করা যাবে না।

উত্তরে মহামায়াদেবী বললেন, তার মত আমি জানি। তুমি কানা বলেই আমিও কানা হই নি। রুণুর মত আমি তার মুখের ভাবেই পড়ে নিয়েছি।

কিন্তু রমেনবাবু জোরে জোরে মাথা নেড়ে আগের চেয়েও গম্ভীর স্বরে বললেন, না, না,—অনুমানের উপর নির্ভর করে এ ব্যাপারে কোন কাজই করা যায় না। আর তাড়াহুড়ো করে করবার মত কাজও এ নয়। অরুণ কলকাতায় প্র্যাকটিস্ করবে বলেছে,—দুচার ছমাস তার আচারব্যবহার না দেখে আর একটা কচি জীবনকে ওর জীবনের সাথে গেঁথে দিতে পারি নে।

মহামায়াদেবীর চোখদুটি পলেকের জন্ত নিষ্প্রভ হয়েও হঠাৎ ধক্‌ধক্ করে জ্বলে উঠল। ভুরু দুটি বেঁকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে তিনি বললেন, থাম তুমি,—তোমার যা বুদ্ধি তা সব আমি দেখে নিয়েছি। এবার আমার হাতে সব ছেড়ে দাও। আমার মাথা খাও,—এ ব্যাপারে একটি কথাও বলতে পাবে না তুমি। যা করবার সব আমিই করব।

সেই দিনই প্রতুলবাবুর কাছে গিয়ে তিনি বললেন, আপনার কিছু ভাবনা নেই, ঠাকুরপো। আমি আগে যা বলেছিলাম তা-ই ঠিক;—এ বিয়েতে অনুর মত আছে ষোল আনা।

প্রতুলবাবু চমকে উঠলেন; রুদ্ধনিশ্বাসে বললেন, মত আছে?—স্পষ্ট করে এ কথা সে বলেছে?

মহামায়াদেবী অল্প একটু হেসে উত্তর দিলেন, যা বলেছে তার চেয়ে বেশী কোন মেয়েই মুখ ফুটে বলতে পারে না।

শুনে প্রতুলবাবুর মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল,—খুশী হবার কোন লক্ষণই তাতে প্রকাশ পেল না। মহামায়াদেবীকে দেখেই উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাঁর মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল। তবু ওরই মধ্যে ছিল একটা সজীবতার চাঞ্চল্য—সক্রিয় কৌতূহলের বিশিষ্ট একটা তীক্ষ্ণতা। কৌতূহলের পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সেই গতি গেল থেমে, অথচ ছায়া যেমন ছিল তেমনি থেকে গেল। প্রতুলবাবু কথাও বললেন না, মুখও ফিরিয়ে নিলেন না,—অভিভূতের মত মহামায়াদেবীর মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

এটা মহামায়াদেবী আশা করেন নি,—ভিতরে ভিতরে তিনি মুষড়ে পড়লেন। তবু মুখের হাসিটুকু বজায় রেখেই একটু পরে তিনি সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে, ঠাকুরপো,—অনুর মত তো জানাই গেল। এবার আপনার আর কোন আপত্তি নেই তো!—

প্রতুলবাবু সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠে বললেন, না, আপত্তি আর কি!—বলতে বলতে একটি নিশ্বাসও পড়ল তাঁর। শরীরটাকে বেশ জোরে একবার নাড়া দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ স্বরে তিনি বললেন, ওর যা ইচ্ছে আমারও তাই। ওর সুখ ছাড়া সংসারে আমার কাম্য তো আর কিছুই নেই!—

মহামায়াদেবী রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কথা পাকা হয়ে গেল তো?

প্রতুলবাবু আবার চমকে উঠলেন; কুণ্ঠিত, বিপন্ন মুখে কোন ও রকমে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে ক্ষীণ স্বরে তিনি বললেন, সেটা এখন থাক্, বৌদি,—এ রকম গুরুতর একটা ব্যাপার,—মানে, কলকাতায় গিয়ে হৃদশজন যারা আছেন, তাদের সাথে একটু পরামর্শ করে পরে আপনাকে আমি চিঠি লিখব।

মহামায়াদেবীর মুখখানা ম্লান হয়ে গেল;—নানা রকম আশঙ্কা জাগল তাঁর মনে। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র তিনি নন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রতুলবাবুর কথাটাকে মেনে নিয়েই যেন তিনি বললেন, তাই হবে, ঠাকুরপো,—তাড়াহুড়ো আমাদেরও নেই। এখনই পাকাপাকি কিছু আমরাও ঠিক করতে চাই নে,—

করবার উপায়ও তো নেই। অমুকে আমরা তার নিজের বাড়ীতে গিয়েই আশীর্ব্বাদ করব,—পাকা কথাও হবে সেখানেই। তবে কি জানেন ? দুপক্ষেরই মনটা ঠিক হয়ে গেলে অনেক দুর্ভাবনা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। শুভকর্ম্মে অনেক রকমের বিঘ্ন ঘটবার আশঙ্কা থাকে কি না,—তাই।

প্রতুলবাবু কুণ্ঠিতস্বরে বললেন, তা তো ঠিকই।

মহামায়াদেবী সায় দেবার মত করে বললেন, সেই জন্যই যা দুর্ভাবনা আমাদের। নইলে তাড়াহুড়ো আর কি!—বর বা কনে কেউ তো আর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে না!—

প্রতুলবাবু নীরব; একটু পরে মহামায়াদেবীই আবার বললেন, আমি আপনাকে পাকা কথা দিতে বলছি নে, ঠাকুরপো,—আমাদের তরফেও তো সব ঠিক হয় নি এখনও,—মানে, কথাটা আপনাকে তাহলে খুলেই বলি।

বলতে বলতে মহামায়াদেবী বসবার চৌকিখানাকে প্রতুলবাবুর আরও একটু কাছে সরিয়ে নিয়ে গেলেন; গলার স্বর দুপর্দ্দা নীচে নামিয়ে অসাধারণ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তিনি আবার বললেন, আমাদের অরুণের মতটাও ভাল করে জানা দরকার—এখানে আসবার জন্য তাকে আমরা আজই সকালে 'তার' করে দিয়েছি। উদ্দেশ্য যে, সে এলে আমিও কথাটা তাকে জিজ্ঞেস করতে পারব, আর ওদের দুজনেরও পরস্পরের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হতে পারবে। ওরা একালের ছেলে-মেয়ে কি না,—এ জিনিষটা দরকার।

প্রতুলবাবু কোন উত্তর দিলেন না, শুধু চোখ দুটিকে অসাধারণ রকমের বড় করে মহামায়াদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু চুপ করে থেকে মহামায়াদেবীই আবার বললেন, কাজেই বুঝতে পারছেন ঠাকুরপো,—অরুণের নিজের মত আগে না জেনে আপনাকে পাকা কথা দিতে বলব না আমি। তবে, বুঝতেই তো পারছেন,—আর কটা দিন এখানেই আপনা-থেকে যেতে হবে। অরুণ আসুক,—ওদের দুজনের কথাবার্ত্তা হউক, ওরাই ওদের সম্বন্ধ ঠিক করুক,—এই আমি চাই। আমাদের বাপ-মায়ের কাজ তো কেবল আশীর্ব্বাদ করা,—সেটা ধীরেসুস্থে দুপক্ষেরই সুবিধে মত কলকাতাতেই হবে।

প্রতুলবাবু নীরব। আবার আর একটি সঙ্কটে পড়ে গেলেন তিনি। কিন্তু আগেও যেমন হয়েছে, এখনও তাই হল,—মনটা জোরে জোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করতে থাকলেও 'না' কথাটা মুখে তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ পর মহামায়াদেবীই আবার তাঁকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলেন, ঠাকুরপো,—অরুণ যখন আসছে তখন আর কটা দিন এখানেই থেকে যাবেন তো আপনারা ?

প্রতুলবাবুর মাথাটা গুলিয়ে গেল ; গুছিয়ে আর ভাবতে পারলেন না তিনি ; অসহায়ের মত মহামায়াদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুষ্ক, মৃদু স্বরে তিনি বললেন, বেশ,—আপনি যখন বলছেন,—তাই হবে ।

মহামায়াদেবী প্রতুলবাবুকে একটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন,—সকালে অরুণাংশুকে কোন 'তার' করা হয় নি। কিন্তু প্রতুলবাবুর মুখ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েই আর কালবিলম্ব না করে, স্বামীকেও কিছু না জানিয়ে নিজের নামেই অরুণাংশুকে তিনি 'তার' করে দিলেন।

(৮)

সারাটা দিন কলিকাতায় উদ্দেশ্যহীনের মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার একটু আগে সুবোধ ঠিক করলে যে সে দেশে যাবে,—কত দিন দেশে যায় নি সে !—

গাড়ীতে দারুণ ভীড়। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় কেবল ঢুকবার চেষ্টাতেই সুবোধের গায়ের জামা দুতিন জায়গায় ছিড়ে গেল। জুতোর ভিতরেও একটা পা গেল থেৎলে। প্রাণটা এসে যেন উঠল প্রায় ঠোঁটের কাছে। ভিতরে যে অবস্থার মধ্যে সে গিয়ে পড়ল তা বর্ণনার অতীত। আলো যা আছে তা না থাকবার মত। ভয়ঙ্কর গরম ; হাওয়া নেই,—আ... কবল সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়া আর ঘামে-ভেজা মানুষের শরীরের উৎকট দুর্গন্ধ,—নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয় ; চোখ চাইলে চোখের ভিতরে জ্বালা করতে থাকে। দুইঞ্চি জায়গা বা এক নিশ্বাস হাওয়ার জন্ম ... কাণ্ড চলছে। চেঁচামেচির অন্ত নেই ; চীৎকার, ভৎর্সনা ও অভিশাপবর্ষণের ...। অসহায় কণ্ঠের কাতর আবেদন আর শিশুকণ্ঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি একত্র মিলে যে কলরবের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কানে তো তালা লাগেই, মনটাও ভূতগ্রস্তের মত দিশাহারা হয়ে পড়ে। মানুষগুলিকে মনে হয় যেন প্রেতমূর্তি,—কামরাখানিকে মনে হয় যেন দান্তে কি মিল্টনের নরককুণ্ড।

এক হাতে বাঙ্কের একটা শিকল এবং আর এক হাতে ছাদের একটা লোহার হুক চেপে ধরে দুখানা বেঞ্চের মাঝখানে সুবোধ কতকটা বাদুরের মত ঝুলে এবং কতকটা বানরের মত বেঁকে দাঁড়িয়ে নিজের জন্য একটু আশ্রয় করে নিলে। দুপাশের সহযাত্রীদের দিকে চেয়ে করুণ স্বরে সে বললে, আপনাদের অসুবিধে করব না আমি, দাঁড়িয়েই যাব।

তার অবস্থা দেখে জ্বলন্ত চোখগুলিও কোমল হয়ে এল ; এক জন যাত্রী নিশ্বাস ফেলে বললে, তাই যেতে হবে। কি আর করবেন,— যুদ্ধের বাজার !—

সত্যই যুদ্ধের বাজার। সেটা সুবোধ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছিল,—দেশের সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এ রকম কখনও হয় না। গাড়ীর মধ্যে অত যে অস্বস্তি, অত যে তাদের ব্যক্তিগত অভিযোগ, তবু সকলের মুখেই ঐ যুদ্ধের কথা,—ব্যক্তিগত জীবনের ভালমন্দ, লাভক্ষতি সবই যেন কার্য্যকারণসূত্রে ঐ যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোকের কথা সুবোধের কানে এসে ঢুকতে লাগল।

ইভাকুয়েশনের হিড়িকে কলিকাতার নারী ও শিশু বেশীর ভাগই শহর ছেড়ে পালিয়েছে। পুরুষেরা যারা রয়েছে তাদের কষ্টের সীমা নেই। হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া তো আছেই, তার উপর আবার কি যে খাবে তার ঠিক নেই। খাওয়া তো নয়, যেন টাকা চিবানো। তা-ও টাকা দিলেই কি সব জিনিষ পাওয়া যায়! বাজারে আটা নেই, চিনি নেই, নুন নেই,—চালের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। তার উপর রেলগাড়ীতে নরকযন্ত্রণা সয়ে মাঝে মাঝেই পরিবারের তত্ত্বাবধান করতে দেশে যেতে হয়। আপিস আর পারিবারিক সমস্যা ছাড়া নৈতিক সমস্যাও আছে। কারও হয় তো উড়ন্ত ছেলে বিয়ের পর বৌএর শিকলে ঘরের কোণে বাঁধা পড়েছিল ; বোমার ভয়ে বৌ পালাতেই ছেলেও আবার উড়তে সুরু করেছে। বুড়ো বাপ সেই কাহিনী এক জন সহানুভূতিশীল সহযাত্রীকে শোনাতে শোনাতে শেষ পর্য্যন্ত কেঁদেই ফেললে। শ্রোতাটি অনুকম্পায় গলে গিয়ে বললে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়,—ঋষিরা কি আর মিছে কথা বলেছেন!

যুদ্ধের কথা ছাড়া আর কথাই নেই। কেউ বোমার বর্ণনা দিচ্ছে, কেউ বিষাক্ত গ্যাসের। একজন এমন জাঁকিয়ে রেঙ্গুনে বোমা পড়ার বর্ণনা দিলে যেন নিজে সে সেখানে উপস্থিত ছিল। জয়পরাজয়ের হিসাব নিয়ে এক জায়গায় বাজী খেলা চলেছে। দুটি ছোকরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর জনযুদ্ধের তর্ক নিয়ে মেতে উঠেছে,—

সেখানে প্রায় হাতাহাতি হবার অবস্থা। এক জন মফস্বলের ব্যবসায়ী কলিকাতায় এসেছিল মালপত্র কিনতে। তার মুখে কলিকাতার বর্ণনা প্রায় সাহিত্য হয়ে উঠেছে আর কি!—রাত্রে আলকাতরার মত কালো অন্ধকার, দিনের বেলাতেও চোর-ডাকাত; আট আনার কমে রিক্সাওয়ালা দুপা যেতে চায় না, হোটেলে খাবার যা মিলে, তা অখাদ্য, চার আনার জলখাবার খেলেও পেটের একটা কোণও ভরতে চায় না,—এই সব। বর্ণনা শেষ করে হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসল, হ্যাঁ, মশায়,—যুদ্ধটা হঠাৎ থেমে যাবে না তো!—

বসতবাড়ীখানাকে পর্য্যন্ত বাঁধা রেখে টাকা ধার করে সে অনেক মাল কিনে ফেলেছে,—এখন জমিয়ে রেখে চড়া দামের বাজারে বেচে বড়লোক হবে সে। তার আশঙ্কা, পাছে যুদ্ধটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেলে বাজার মাটি হয়ে যায়।

যুদ্ধ, যুদ্ধ,—সকলের মুখেই ঐ এক কথা। সুবোধের অবসন্ন মনটা অনুভূতি হারিয়ে ফেললে। তার তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের সামনে সব যখন একাকার হয়ে গেল, তখনও তার কানের কাছে ঐ একটি মাত্র শব্দই যেন বেজে বেজে উঠতে লাগল,—গাড়ীর চাকাই যেন ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করে বলে চলেছে,—যুদ্ধ যুদ্ধ, যুদ্ধ—

ভোরে গোয়ালন্দ। ট্রেণ থেকে নেমে সুবোধ ষ্টিমারে গিয়ে চাপল। পূর্ব্ববঙ্গের বিপজ্জনক এলাকার মধ্যে ছোট একটি গাঁয়ে তার বাড়ী। গোয়ালন্দ থেকে অনেকটা পথ ষ্টিমারে যেতে হয়; তার পর নৌকায়, তার পর আবার খানিকটা হাটা পথ।

সন্ধ্যার একটু আগে ষ্টিমার তাকে তার নিজের জিলার সীমানার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে গর্জ্জন করে চলে গেল।

অবস্থা দেখে সুবোধ অবাক হয়ে গেল। এটা এ অঞ্চলের বেশ বড় বন্দর; ঘাটে সব সময়েই এত নৌকা বাঁধা থাকে যে, জল পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না। কিন্তু এবার বড় নৌকা একখানাও তার চোখে পড়ল না। যে দুএকখানা ছোট ডিঙ্গি পাওয়া গেল তারা এমন চড়া ভাড়া হেঁকে বসল যে, উত্তরে সুবোধের মুখে কথাই ফুটল না। কারণ বুঝতে সময় লাগল তার। এও যুদ্ধের সঙ্গেই কার্য্যকারণসূত্রে সংশ্লিষ্ট। আসন্ন জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় শত্রুকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলের সব বড় নৌকা সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে কিনে নেওয়া হয়েছে। কাজেই ছোট ডিঙ্গি যে কখানা আছে তার ভাড়া তো বাড়বেই। এক জন মাঝিই তাকে বুঝিয়ে

দিলে। নৌকার বদলে নৌকাওয়ালারা বেশ টাকা পেয়েছে; বেশী নৌকা যাদের ছিল, জেলেদের কাছে নৌকা ভাড়া দেওয়াই ছিল যাদের ব্যবসা, তারা সব নৌকা বেচে দিয়ে এক এক জন হাজার হাজার টাকা পেয়েছে; সেই টাকা দিয়ে এখন অন্য ব্যবসা করছে তারা। ঐ মাঝিই সুবোধকে পরামর্শ দিলে,—রাতটা ষ্টেশনে কাটালে পরদিন ভোরে হয় তো অপেক্ষাকৃত সস্তায় সে কোন একটা ভাগের নৌকা পেয়ে যেতে পারে।

বেশী ভাড়া দেবার সাধ্য সুবোধের ছিল না। বাধ্য হয়েই তাকে থেকে যেতে হল।

ষ্টেশনে বিশ্রামাগার বলতে যা পাওয়া গেল তা একখানা খড়ের চালাঘর। ঘরও ঠিক বলা যায় না, কারণ মাত্র দুদিকে বেড়া আছে; তাই থেকেই ধরে নিতে হয় যে, কোন কালে হয় তো অপর দুদিকেও বেড়া ছিল। মেঝে কাঁচা; কোন দিন যে ওতে গোবরজলের ছিটা পড়েছে তা বোঝা যায় না। তবু ঐ ঘরেই আরও কয়েক জন লোক রাত কাটাবার ব্যবস্থা ঠিক করে নিয়েছিল,—কেউ হয় তো নিঃস্ব ভিখারী, কেউ কেউ হয় তো ভোরের ষ্টিমার ধরতে এসেছে। সুবোধ নিরুৎসুক চোখে তাকিয়ে দেখলে,—কেউ একটা মাদুর, কেউ বা একটা ছেঁড়া কাঁথা বিছিয়ে শোবার আয়োজন করছে। বেশীর ভাগই পুরুষ, মেয়ে যে কটি, তাদের কেউ যুবতী নয়। সকলেই ছোট জাতের লোক, সকলেই গরীব,—মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায়। কেউ বোধ করি বেশী দূরের যাত্রী নয়, —লাটবহরের বালাই কারও বড় একটা নেই; যার আছে তাও যৎসামান্য। সবই সাধারণ। সুবোধের চোখে অসাধারণ প্রতীয়মান হল কেবল এক বুড়ী। কোণের দিকে একা বসে রয়েছে সে। তার পাশে মেছুনীদের ঝুড়ির মত বেশ বড় একটা ঝুড়ি,—ওরই মধ্যে কাঁথা দিয়ে জড়ানো বড় একটা পুটুলি, একটি পিতলের ঘড়া, গুটি দুই মুখ-বাঁধা মাটির হাড়ি, একখানা থালা, টিনের ছোট একটি তোরঙ্গ এবং সংসারের টুকি-টাকি আরও দুচারটি জিনিষ,—একটা গোটা সংসারই যেন ঝুড়ির মধ্যে। একটু পরেই বড় একটি ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে ঐ বুড়ীর কাছে এল একটি আধা-বয়সী পুরুষ। ঝুড়ির ভিতর থেকে থালা বের করে ওর উপর ঠোঙ্গা উজার করে ঢেলে দিলে নানা রকমের খাবার,—কচুরী, জিলিপি, জিবে-গজা, এমনি সব দোকানের জিনিষ। বুড়ী ফোক্‌লা মুখে এক গাল হেসে মাথা নেড়ে বার বার যেন প্রতিবাদ করতে

লাগল, আর পুরুষটি হাত জোড় করে তাকে অনুরোধ করতে লাগল বোধ করি ঐ সব মিঠাই-মণ্ডা খাবার জন্যই। সুবোধ ভাবলে, পুরুষটি বোধ করি ঐ বুড়ীর ছেলে, নয় তো ওর জামাই। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সকালে তার ঘুম ভাঙ্গল তুমুল একটা কোলাহলের মধ্যে। জাহাজ এসেছে। ওর ইঞ্জিনটা ক্রুদ্ধ অজগরের মত ফোঁস ফোঁস করছে, যাত্রী এসে জুটেছে শো'খানিক—টিকেট ঘরের সামনে তাদের কোলাহলে কান আর পাতা যায় না; সকলের উপরে কে এক জন তারস্বরে মরা কান্না সুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে ঐ আওয়াজটাতেই সুবোধের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সেই বুড়ী, কিন্তু মুখে আর কালকের সেই হাসি নেই। বুক চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে, কখনও বা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পাগলের মত চীৎকার করে কাঁদছে সে। পদ অনেক, কিন্তু ধূয়া-মাত্র একটি,—আমার অমন পুঁটি মাছের মত চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে টাকা কোথায় উড়ে গেল গো—

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করবার পর সুবোধ বুঝলে। যুদ্ধের প্রয়োজনে এ অঞ্চলে বে-সামরিক অধিবাসীদের উচ্ছেদ চলেছে। গাঁয়ের ছোট বড় আরও অনেকের সঙ্গে বুড়ীও ঘরছাড়া হয়েছে। কিন্তু ছোট জীর্ণ কুড়ে ঘরখানার বদলে সে নগদ আশীটি টাকা পেয়েছিল। সেই টাকা আর সংসারের জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে সে চলেছিল তার জামাই বাড়ীতে। পথে এক জন অপরিচিত লোক যেচে তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেয়, নিজের পরিচয় দেয় বুড়ীর জামাইএর গাঁয়ের লোক বলে। বুড়ী বিশ্বাস করে তাকে তার সব কথা বলেছিল,—টাকার কথা পর্য্যন্ত। তার পরেই লোকটি বুড়ীকে একেবারে মা ডেকে বসে, গাটের পয়সা খরচ করে বাজার থেকে খাবার কিনে এনে খাওয়ায়। সেই খাবার খেয়েই বুড়ী ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে উঠে ঐ লোকটির দেখা আর সে পায় নি, গাটের চার কুড়ি টাকারও নয়।

সুবোধ বুঝলে সবই। একটি নিশ্বাস ফেলে নিজের পয়সায় টিকেট কিনে বুড়ীকে সে ষ্টিমারে তুলে দিলে।

এতক্ষণ তার চোখে পড়েনি, বুড়ীর হ্যাঙ্গাম চুকিয়ে উপরে উঠে আসবার পর চোখে পড়ল,—একটা চায়ের দোকান। ঠিক দোকান নয়,—ছোট একটি কাঠের টেবেল, একটি তোলা উনোন, একটি লোহার কেটলি ও কয়েকটি পেয়ালা-পিরিচ নিয়ে ভ্রাম্যমান ফেরিওয়ালার সামান্য একটু আয়োজন মাত্র। এ জিনিস আগে এ

অঞ্চলে একেবারেই ছিল না। সুবোধ চা খেতে খেতে খোঁজ নিয়ে জানলে যে দোকানটি নূতন হয়েছে। কত ফৌজের লোক যাতায়াত করে,—ওদের কাছে চা বেচে লোকটির বেশ দুপয়সা হচ্ছে আজকাল। পথে যেতে যেতে আরও অনেক নূতনত্ব সুবোধের চোখে পড়ল। অভাবনীয় পরিবর্ত্তন। আগে যেখানে গ্রাম ছিল এখন হয় তো সেখানে কিছুই নেই,—হয় তো মরা গাঁয়ের কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে হয় তো নূতন গাঁয়ের পত্তন হয়েছে,—তার গঠন ও সংগঠন একেবারে আলাদা। অনেকটা দূর পর্য্যন্ত কোন মানুষই তার চোখে পড়ল না। তার পর যাদের সে দেখতে পেলে তারা এ দেশের চেনা মানুষ নয়। যারা এ দেশেরই লোক, তাদেরও চেনা মানুষ বলে আর যেন চেনাই যায় না।

এ সত্যই তার আবাল্যের পরিচিত জন্মভূমি কি না, সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সুবোধের সন্দেহ হতে লাগল। মাঠের শ্যামশোভা আছে, সমৃদ্ধি নেই; ক্ষেতে ক্ষেতে ফসলের চেয়ে আগাছার সংখ্যা বেশী কোন কোন জায়গায় পল্লীপ্রকৃতির অনাবিল শান্তির রূঢ় ও উদ্ধত প্রতিবাদের মত কাঁটা-তারের বেড়া উঠেছে,—কালো, তীক্ষ্ণ, সর্পিল লোহার তার সবুজ মাঠকে ঘিরে ঘিরে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে,—কোথায় যে ওর আরম্ভ আর কোথায় শেষ, তা বোঝাই যায় না। বড় বড় অনেক গাঁয়ে জনমানুষের সাড়াশব্দ নেই,—উঠানে স্তূপীকৃত জঞ্জাল, খড়ের চাল ভেঙ্গে পড়েছে, কঙ্কালসার দুএকটি কুকুর ছাড়া গৃহপালিত আর কোন পশু চোখে পড়ে না। অথচ এই ধ্বংশস্তূপের পাশেই হয় তো নূতন এক লোকালয়ের পত্তন হয়েছে। গাঁ হলেও সে যেন এক একটা শহর। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বড় বড় ঘর আলোয় উজ্জ্বল, হাওয়ায় সুশীতল, ছায়ায় স্নিগ্ধ; সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, দূরে রন্ধনশালা ও স্নানাগার। সুশৃঙ্খল বিন্যাস, সুমার্জ্জিত পরিচ্ছন্নতা ও জলনিকাশের সর্ব্বাঙ্গীন সুব্যবস্থার মধ্যে বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্ক আর শিল্পীর স্বপ্ন যেন এক সঙ্গে রূপ পরিগ্রহ করেছে। মাঠ ভেঙ্গে, মাটি কেটে, জলা ভরিয়ে পাকা, চওড়া, শক্ত রাজপথ তৈরি হয়েছে,—সেই পথে ফৌজ আর রসদ বোঝাই মোটর লরি চলেছে। ক্ষেতের আল ছাড়া কোন পথ যে দেশে কোন দিনই ছিল না, সেই দেশেই এত সব বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন দেখতে পেয়ে সুবোধ অবাক হয়ে চেয়ে রইল,—এ যেন কোন এক অদ্ভুতকর্ম্মা বিশ্বকর্ম্মার অপরূপ এক একটি বিস্ময়সৃষ্টি।

একটি গোরা সৈনিকের সঙ্গে কিছু কথাও হল তার। ধান বোঝাই মোটর-

লরিখানা কি জানি কেন বিগড়ে গিয়েছিল। মিস্ত্রী গাড়ীর তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে গাড়ীখানাকে মেরামৎ করছিল, কাছে দাঁড়িয়ে গোরা সৈনিকটি টানছিল সিগারেট। সুবোধকে দেখেই কি জানি কেন 'হ্যালো' বলে তাকে সে সম্ভাষণ করলে।

সৈনিকটি খুব ভদ্র না হলেও অভদ্র নয়। সুবোধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে কথা বললে। সুবোধের প্রশ্নের উত্তরে সে খুলেই বললে যে লরিতে ধান আছে, গভর্ণমেণ্ট উদ্বৃত্ত ধান কিনে এ অঞ্চল থেকে সরিয়ে ফেলছে পাছে এ জিনিষ জাপানীদের হাতে পড়ে।

সরকারী পরিকল্পনাটার কথা সুবোধ আগেই শুনেছিল, আর শুনেছিল বিরুদ্ধ সমালোচনাও। একটু উত্তেজিত হয়েই সে জিজ্ঞাসা করলে, এ সব ধান তোমরা জুলুম করে কেড়ে নিচ্ছ, না চাষীরা স্বেচ্ছায় বেচছে?

সৈনিকটি একটু যেন বিস্মিত হয়েই বললে, বেচবে না কেন? ওরা দাম পাচ্ছে অনেক বেশী।

সে তো আরও খারাপ। বেশী দামের লোভে সব ধানই যদি তারা বেচে দেয়?

তাহলে তারা আরও বেশী টাকা পাবে।

কিন্তু তার পর তারা খাবে কি?

চালই খাবে,—আবার টাকা দিয়ে বাজার থেকে কিনবে।

কিন্তু পাবে কোথায়?—সব ধানই তো তোমরা সরিয়ে ফেলছ!—

সৈনিকটি কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ চোখে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার পর মুচকি হেসে বললে, তুমি বুঝি গান্ধীর লোক?

হাসি বা কথার সুরে খোঁচা ছিল না; তাই সুবোধও হেসে ফেলেই বললে, হতেও পারি।

ঠোঁটের হাসিটুকুকে কান পর্য্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে সৈনিকটি সকৌতুক কণ্ঠে উত্তর দিলে, হতে পারে না, তুমি ঠিক গান্ধীর লোক। কিন্তু সাবধান, বেশী বাড়াবাড়ি করো না যেন,—দেশটা পুলিশের চরে ছেয়ে গিয়েছে।

মনটা সুবোধের খারাপ হয়ে গেল, পুলিশের ভয়ে নয়, দেশের যে সমস্যাটি এমন জীবন্ত হয়ে তার চোখে পড়ল তারই সমাধানের কোন পথ ভেবে না পেয়ে। বাকি পথটা সে পার হয়ে গেল কতকটা স্বপ্নাবিষ্টের মত।

গাঁয়ে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। খুব বেশী অবশ্য নয়, তবু সুবোধের মনে হল যেন গভীর রাত। কলিকাতা অঞ্চলে সে ব্ল্যাক্-আউট দেখেছে,—সেখানে আঁধার করা হয়েছে আইন করে। গাঁয়ে আলো নিভাবার জন্য আদেশ জারি হয় নি,—তবু আঁধার এখানে গাঢ়তর। দুএকটি মাত্র বাড়ীতে আলো জ্বলছে। শব্দও বড় একটা নেই। নিজের বাড়ীর কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল। গা যেন ছম্ ছম্ করতে লাগল তার।

কত দিন সে বাড়ীতে আসে নি। আগের বারেই ঠাকুরমার অবস্থা দেখে তার মনে হয়েছিল যে বুড়ী পরপারের যাত্রী হয়ে বৈতরণীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে,—এত দিনে কি তার হয়েছে কে জানে! চোখ বড় করে তাকিয়ে দেখলে সে; কিন্তু আলোর ক্ষীণতম একটি রেখাও তার চোখে পড়ল না,—দেখা গেল শুধু অন্ধকার। বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ের নীচে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আরও যেন ঘন, আরও যেন কালো মনে হয়; পুরানো দালানগুলি চোখে পড়ে নীবিড়তর অন্ধকারেরই স্বতন্ত্র এক একটি স্তুপের মত। পায়ের নীচে মাটি পর্য্যন্ত চোখে দেখা যায় না।

আলো নেই, আওয়াজ নেই,—সুবোধের বুকটা কেঁপে উঠল। বাইরের উঠানে দাঁড়িয়েই সে কম্পিত স্বরে ডাকলে, ঠাকুমা!—

পরের মুহূর্ত্তে তার মনে হল যে অন্ধকার ও স্তব্ধতা দুইই যেন আরও বেশী গভীর হয়ে উঠেছে। নিশ্বাস বন্ধ করে সে আবার ডাকলে, ঠাকুমা!—

এবার উত্তরে কে যেন ভিতর থেকে বললে, কে গো,—কে?

মেয়ে-মানুষের আওয়াজ, কিন্তু তার ঠাকুরমার আওয়াজ নয় বুঝে সুবোধের বুকটা আবার ছাৎ করে উঠল। তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল সে; গলার স্বর উঁচু করে বলতে বলতে গেল সে, ঠাকুমা, ঠাকুমা,—ও ঠাকুমা!—

কে? কে রে?—এবার আর একটি নারীকণ্ঠ ব্যাকুল হয়ে সাড়া দিলে,—ও মরণের মা, দেখ তো কে? এ যেন—

সুবোধ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল,—এ তার ঠাকুরমার গলার আওয়াজ। রোয়াকের কাছে এগিয়ে এসে সে উৎফুল্ল স্বরে বললে, আমি ঠাকুমা,—আমি সুবোধ।

এঁ্যা—দুঃখু!—তুই এসেছিস! বাড়ীর কথা, বুড়ীর কথা আবার মনে পড়েছে তোর?—বলতে বলতে জগদ্ধাত্রীদেবী আলুথালু হয়ে উঠানে নেমে এসে অন্ধকারেই

সুবোধকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর অন্তরের স্নেহ চোখের জলের বড় বড় ফোটায় সুবোধের মাথায়, মুখে, গায়ে ঝড়ে পড়তে লাগল।

স্নেহের এই উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি সুবোধ প্রাণ ভরে উপভোগ করলে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নানের মত। কিন্তু ঐ সঙ্গে একটু লজ্জাও বোধ হল তার। কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, হ্যাঁ, ঠাকুমা, আমি দুঃখু। কিন্তু এই অন্ধকারে তোমরা ভূতের মত চুপ করে বসেছিলে কেন? যা ভয় আমাকে পাইয়ে দিয়েছিলে! কেন,—আলো জ্বাল নি কেন?

আর আলো, দাদা!—কেরোসিন তেল কি দেশে আছে যে আলো জ্বালব!—জগদ্ধাত্রীদেবী খেদের স্বরে বললেন; কিন্তু আলো জ্বালবার হুকুমও দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই,—ও মরণের মা,—আলোটা জ্বাল না শীগগির। দাদার আমার মুখখানি একবার দেখি।

মুখ দেখে তিনি শিউরে উঠলেন; প্রায় আর্ত্ত কণ্ঠে বললেন, এ কি চেহারা হয়েছে তোর!—

সুবোধ চোখ নামিয়ে লজ্জিত স্বরে বললে, অনেকটা পথ হেটে আসতে হয়েছে কি না!—

কি খেয়েছিস?

কাল ভাত খেয়েছিলাম,—আজ চিড়ে।

চিড়ে!—জগদ্ধাত্রীদেবী কিছুক্ষণ হা করে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; তার পর মুখ ফিরিয়ে ব্যাকুল স্বরে বললেন, ও মরণের মা,—তুমি তো তাহলে এখনই যেতে পাবে না। দাদু যে আমার সারা দিন চিড়ে খেয়ে আছে!—উনোন জ্বেলে আমার রান্নার আয়োজন না করে দিলে তোমায় আমি কিছুতেই যেতে দেব না।

মরণের মা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে বললে, তা আর কি হয়েছে, মা-ঠাকরুণ,—এক্ষুনি আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

কিন্তু বৃদ্ধা ঠাকুরমার জরাজীর্ণ দেহটার দিকে চেয়ে সুবোধ নিজে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল; বললে, কিছু দরকার নেই ঠাকুমা,—খিদে আমার একটুও নেই।

তুই থাম্,—জগদ্ধাত্রীদেবী ধমক দিয়ে বললেন,—সারা দিনটা কেটেছে চিড়ে খেয়ে,—আবার বলছে দরকার নেই!—

সুবোধ আরও বেশী কুণ্ঠিত হয়ে বললে, সত্যি বলছি, ঠাকুমা,—কিচ্ছু দরকার নেই। এত রাতে তোমার ঐ শরীর নিয়ে রাঁধাবাড়ার হাঙ্গাম করতে যেয়ো না তুমি।

জগদ্ধাত্রীদেবী হাসলেন; সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ রে, দুঃখু,—তুই আমায় কি ভাবিস, বল্ তো? শরীর তো শরীর,—আমার চিতেয় গিয়ে উঠবার ঠিক আগের সময়টাতেও তুই যদি না খেয়ে আমার সামনে এসে উপস্থিত হোস, তখনও তোকে রেঁধে না খাইয়ে আমি কি চিতেয় গিয়ে উঠতে পারব?

খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে অনেক রাত হয়ে গেল। কথা বলতে বলতেই জগদ্ধাত্রীদেবী এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু সুবোধের চোখে ঘুম এল না। অনুকূল অবস্থার অভাব অবশ্য ছিল না। শরীরটা ক্লান্ত। সারা দিন অনাহারের পর গুরুভোজনের ফলে তাতে আবার কেমন যেন একটা নেশার আবেশ এসেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম; কেবল ঝিঁঝি পোকার এক টানা ঝিঁ ঝিঁ রব ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সে শব্দেও ঘুম-পাড়ানো গানের সুর ঘরে ও বাইরে সূচিভেদ্য অন্ধকার। তথাপি সম্পূর্ণ শান্ত এই পরিবেশের মধ্যেও সুবোধের শান্তিপিয়াসী মনটা হঠাৎ যেন বড় বেশী অশান্ত হয়ে উঠল। গত দুদিন তার বাইরের ইন্দ্রিয়গুলি মোটেই অবসর পায় নি,—তারা প্রতি মুহূর্ত্তেই অসংখ্য উপাদান আহরণ করে সব তার মনের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ওদের নীচে যা চাপা পড়ে গিয়েছিল তাই এই অন্ধকার অবসরের রাত্রে আবার তার মনের উপর তলায় উঠে এসে লাফালাফি সুরু করে দিলে। এ চিন্তা তার সুভদ্রাকে নিয়ে। তাকে আবার মনে পড়ল তার। মনে হতে লাগল যে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেও তার চোখের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সুভদ্রা যেন ক্রমাগতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কল্পনার চোখে হতভাগিনী সুভদ্রার সেই ভূলুণ্ঠিত মূর্ত্তিটি দেখতে দেখতে এক সময়ে তার নিদ্রাহীন খোলা চোখ দুটিও জলে ভরে উঠল।

পরদিন সকালে মুড়ি-মুড়কির ফলার সেরেই সুবোধ বেরিয়ে পড়ল,—গ্রামখানা এক বার ঘুরে দেখতে হবে।

বছর দুই আগে যেমন সে দেখে গিয়েছিল তেমন আর নেই। ছোটরা বড় হয়েছে; বড়রা অনেকে এ সংসার থেকে একেবারে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে, কেউ

গ্রাম ছেড়ে গিয়েছে জীবিকার অনুসন্ধানে। অনেক বাড়ীর দোরেই তালা ঝুলছে দেখা গেল; দেয়ালে পুরু হয়ে শ্যাওলা জমেছে, প্রাঙ্গণে গজিয়েছে ঘাস। মালিকেরা যুদ্ধের বাজারে নূতন নূতন চাকরি পেয়ে দেশদেশান্তরে চলে গিয়েছে; কেউ কেউ গিয়েছে চাকরির খোঁজে। গাঁয়ের কৈবর্ত্ত-বাগদীদের পাড়ায় পুরুষ মানুষ এক রকম নেই বললেই চলে,—বিমানঘাঁটি বা সামরিক রাস্তা তৈরি করবার জন্য অনেকে নাকি আসাম পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে। এদের কেউ কেউ দুতিন সপ্তাহ পর দুএক দিনের জন্য বাড়ীতে আসে, কেউ হয়তো একেবারেই আসে না; কেউ কেউ মাসে মাসে মনি-অর্ডার করে মোটা টাকা বাড়ীতে পাঠায়, কেউ হয় তো একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখে না। সুবোধের মনে হল যে, তার এই আবাল্যের পরিচিত জন্মভূমির জীবনের ধারাটাই কেমন যেন জমকালো রকমে বদলে গিয়েছে। খরস্রোতা নদী হঠাৎ তার গতি বদলালে যেমন হয়,—উষর প্রান্তর শ্যামল হয়ে ওঠে আর জনবহুল শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়ে যায়,—এ-ও যেন কতকটা তেমনি। ধ্বংস আর সমৃদ্ধি চলেছে দুই সমান্তরাল রেখায়। জীবনে কেমন যেন একটা নূতন ছন্দ এসেছে। ওরই সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার শক্তি যার নেই, সে চলমান জনতার পায়ের তলে পড়ে আর্ত্তনাদ করে মরছে। যুদ্ধের নূতন যুগ নূতন জীবিকা নিয়ে এসেছে,—এনেছে নূতন শিল্প, নূতন ব্যবসা। সুতার অভাবে তাঁতি ও জোলার তাঁত বন্ধ হয়েছে; অথচ এই গাঁয়েই কলের সুতা দিয়ে জাল তৈরি হচ্ছে,—মাছ ধরবার জাল নয়, ফৌজের ব্যবহারের জন্য ঢাকনী জাল। শোলার টুপী তৈরি করবার একেবারে নূতন এক শিল্প ফেঁপে উঠেছে,—বহু লোকের অন্নসংস্থান হচ্ছে তাতে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও নূতন পদ্ধতি আর নূতন কৌশলের আবির্ভাব হয়েছে। দোকানদারী আছে, কিন্তু ওর ধারাটি গিয়েছে বদলে। আগে মাল বেচে তবে লাভ করতে হত; এখন লাভ করতে হয় না বেচে। দোকানদারী থেকে শতগুণে বেশী আয় হয় কন্‌ট্রাকটরের ব্যবসাতে। আগে যারা হাটে হাটে কাপড় বা মনোহারি জিনিষ বেচে কায়ক্লেশে পেটের ভাতের সংস্থান করত, তাদের অনেকেই এখন ইট, শাক-সবজী বা ঢাকনী জালের কন্‌ট্রাক্ট নিয়ে রাতারাতিই বড়লোক হয়ে গিয়েছে। অনেকের আবার পুরানো লাভজনক ব্যবসার যায় যায় অবস্থা,—বাজারে মাল নেই; থাকলেও এই সুদূর পল্লীতে তার আমদানি নেই। বেচারা ব্যবসা করবে কি দিয়ে!—

পরিবর্ত্তন হয়েছে বৈপ্লবিক। জীবনযাত্রার গতানুগতিক ধারাটি শুখিয়ে গিয়েছে ; স্রোত চলেছে নূতন পথে। সে পথে পা বাড়াবার সাহস বা শক্তি যাদের নেই, তাদের শোচনীয় দুর্দ্দশা সুবোধের চোখে পড়ল। কৈবর্ত্ত-বাগ্‌দীদের মধ্যে যারা ভিটা ও বৌএর মায়া ছেড়ে দূরে কাজ করতে যেতে পারে নি, তারা ভিটেয় পড়ে অনাহারে মরছে ; আর মরছে তথাকথিত সম্ভ্রান্ত, গ্রাম্য পরশ্রম-জীবীর দল,—পুরোহিত ব্রাহ্মণ, দশ ঘর প্রজার ক্ষুদে জমিদার, মাতৃবক্ষাশ্রিত অর্দ্ধ-শিক্ষিত যুবক, গ্রামবাসীর মামলা-মোকদ্দমায় পুরুষানুক্রমিক পরামর্শদাতা, পাঠশালার শিক্ষক আর উদ্যমহীন, মস্তিষ্কহীন ছোট ছোট দোকানদার। এদের কেউ কেউ পরিবার নিয়ে গাঁ থেকে উঠেই গিয়েছে।

এই গাঁয়েরই সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে সুবোধ। পথে বের হতেই প্রায় সকলেই তাকে চিনতে পারলে। অনেকেই যেচে তার সঙ্গে আলাপ করলে। কেউ শোনালে তার দুর্ভাগ্যের করুণ কাহিনী, কেউ বা সৌভাগ্যের ইতিহাস। যুদ্ধ আর মহাত্মা গান্ধীর খবর সকলেই তাকে জিজ্ঞাসা করলে।

বৃদ্ধ হলধর দত্ত গ্রামসম্পর্কে সুবোধের ঠাকুরদাদা। সুতার ফ্রেমে আঁটা কাচের চশমার উপর দিয়ে অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকবার পর তাকে নিঃসংশয়ে চিনতে পেরে সে উল্লাসের স্বরে বললে, তাই তো,—দুঃখুই তো ! কবে এলে ? বোস, দাদা,—বোস।

সুবোধ হাসিমুখে উত্তর দিলে, কালই রাত্রে এসেছি, ঠাকুরদা। তার পর ? খবর সব ভাল তো ?—

আর ভাল, দাদা,—যা দিনকাল পড়েছে,—কোন রকমে টিকে আছি আর কি ! কিন্তু তোমার নিজের খবর আগে বল। চাকরি-বাকরি কিছু হল ?

প্রশ্নটির জন্য সুবোধ তৈরি হয়েই ছিল,—পথে আসতে আসতে আরও কত জন তাকে ঠিক এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছে। আত্মরক্ষার জন্য একটা উত্তরও মনে মনে সে ঠিক করে রেখেছিল। তাই মুখখানা ম্লান করে সে বললে, কৈ আর হল, ঠাকুরদা !—

হলধর বিস্মিত, ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েই বললে, কেন দাদা, কেন ? এত লোকের চাকরি জুটে যাচ্ছে আজকাল !—

সে তো সবই যুদ্ধের চাকরি,—সুবোধ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে,—চাকরি তো

নয়,—মাথাটা দেবার নেমন্তন্ন। সে রকম চাকরি আপনি নিতে বলেন ঠাকুরদা ?

রাম রাম!—হলধর দত্ত হঠাৎ যেন শিউরে উঠল; মাথাটা খুব জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে বললে,—সে রকম উপদেশ কি দিতে পারি আমি ? আর তা-ও তোমাকে ? সকলকেই আমি বরং পই পই করে বারণ করছি।

একটু থেমে, সুরটা একটু নামিয়ে দত্ত আবার বললে, যুদ্ধের চাকরি তো দূরের কথা, চাকরিই বা কেন করতে যাবে তুমি ? এত বড় বংশের ছেলে,—তুমি যাবে চাকরি করতে ? কেন,—কোন দুঃখে ? আমি বলি যে, ব্যবসা কর, দাদু। সদরে গিয়ে যা হয় একটা সাব্-কনট্রাক্ট নিয়ে এস,—দুদিনে লাল হয়ে যাবে।

মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সুবোধ বললে, ভেবে দেখি, ঠাকুরদা। অনেক ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ীতে এসেছি। আগে দুদিন বিশ্রাম করে নি।

তা কর, দাদা,—তা তো করবেই,—দত্ত আবার মাথা নেড়ে আপ্যায়নের স্বরে বললে,—তাড়াহুড়ো কিছুই নেই। তোমার ঘরে তো আর খাবারের অভাব নেই,—অনেক গিয়েও মা-লক্ষ্মীর সংসার। তা বেশ, দুদিন বিশ্রাম কর,—খাও দাও ; তার পর—

কিন্তু কথাটা হঠাৎ যেন তার গলায় আটকে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ স্বরে সে আবার বললে, কিন্তু সুখ নেই, দাদা,—খাওয়া-দাওয়ার সুখ আজকাল একেবারে নেই। মাছ-দুধ তরি-তরকারি সব যাচ্ছে ঐ নন্দদুলালদের পেটে। পয়সা দিয়েও কিছু পাবার জো নেই।

নেই যে তা সুবোধ দুপুরে খেতে বসেই বুঝতে পারলে। মাছ নেই,—জগদ্ধাত্রী দেবী চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাকে শুনিয়ে দিলেন যে, অনেক চেষ্টা করেও মাছ তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি,—বোধ করি হাটের দিনের আগে মাছ আর পাওয়াই যাবে না। দুধে জল,—এ অঞ্চলের ক্রেতা বা বিক্রেতা আগে যা কোন দিন কল্পনাও করতে পারে নি, সেই অসম্ভবই আজ কেবল সম্ভব নয়, এক মাত্র সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্বাল দিলেও দুধের জল মরে না। তরি-তরকারির অবস্থাও তেমনি। বাজারে দাম দিয়েও জিনিষ পাওয়া যায় না ; বাড়ীর গাছে যা ফলে তা-ই এক মাত্র সম্বল।

তবু দুতিন গ্রাস খাবার পরেই সুবোধ তৃপ্তির স্বরে বললে, বাজারে কিছু

না পেয়েও যা তুমি আমার পাতে দিয়েছ, ঠাকুমা, এর দশ ভাগের এক ভাগও বহু দিনই আমার ভাগ্যে জোটে নি। এ তো আমার রাজভোগ।

কিছুক্ষণ জগদ্ধাত্রীদেবী চুপ করে তার খাওয়া দেখলেন; তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন, হ্যাঁ রে, দুঃখু,—তোর চাকরি-বাকরি কিছু-হল?

সুবোধ চমকে উঠল; তার পর হেসে ফেলে বললে, না, ঠাকুমা, হয় নি; চাকরির জন্য কোন চেষ্টাও করি নি।

তবে কি করছিস আজকাল?

চির কাল যা করেছি, তাই!

সেই স্বদেশী বুঝি?

এক গ্রাস ভাত মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে সুবোধ খুব সংক্ষেপে উত্তর দিলে, হুঁ।

জগদ্ধাত্রীদেবী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন; তার পর একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, তা ঐ স্বদেশী করেও তো শুনেছি যে কত জনের কত রকম হিল্লে হয়ে যায়। ঐ যে কত রকমের সমিতি না কি,—বোর্ড, মুন্সিপাল, লাটের সভা,—এই সব জায়গায় চাকরি পায়, টাকা পায়, কত নাম হয়!—

এ-সব কথা তুমি কার কাছে শুনলে, ঠাকুমা?—সুবোধ বাধা দিয়ে বিস্ময়ের স্বরে বললে; তার পরেই হো হো করে হেসে উঠল সে।

জগদ্ধাত্রীদেবী অপ্রতিভ ভাবে মুখ নামিয়ে নিলেন, কিন্তু হার মানলেন না। লজ্জিত হলেও প্রতিবাদের স্বরেই বললেন, যার কাছেই শুনে থাকি নে কেন, তুই বল্ না, এ রকম হয় কি না!—

সুবোধ স্মিত মুখে উত্তর দিলে, হয়।

তবে তোর হল না কেন?

একটু ইতস্ততঃ করে শেষ পর্য্যন্ত সুবোধ আবার হেসে ফেলেই বললে, যে পথে গেলে ঐ সব চাকরি বা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় সে পথেই আমি যাইনি, ঠাকুমা; আমি যে পথে চলেছি সে পথে খালি কাঁটা আর কাঁকর; সে পথে চলতে গেলে অনেক দিন পেটের ভাত বা মুখে দেবার জলটুকু পর্য্যন্ত জোটে না; সে পথে জেলে যাওয়া যায়, গুলি বা লাঠি খেয়ে মরা যায়, কিন্তু চাকরি পাওয়া যায় না।

জগদ্ধাত্রীদেবী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, থাক্, দাদা, থাক্,—চাকরি তোমায় করতে হবে না!

ঘরের ছেলে ঘরে যখন ফিরে এসেছ তখন এবার স্থির হয়ে ঘরেই বোস তুমি। তোমার বাপ-দাদা যা রেখে গিয়েছেন তা-ই তোমার মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের জন্য যথেষ্ট। কি দরকার তোমার দেশে দেশে বেড়াবার?

বৈকালে সুবোধ বের হবার উপক্রম করতেই জগদ্ধাত্রীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে, দুঃখু,—রজনীর বাড়ীতে গিয়েছিলি?

সুবোধ সবিস্ময়ে বললে, কোন রজনী ঠাকুমা?

জগদ্ধাত্রীদেবী বেশ যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, রজনী আবার কোন রজনী হবে?—এ গাঁয়ে রজনী তো মোটে এক জন—তোর জ্যাঠামশায়।

সুবোধ লজ্জিত হয়ে বললে, না, ঠাকুমা, যাওয়া হয় নি।

একবার যাস সেখানে,—জগদ্ধাত্রীদেবী এবার শান্ত, ঈষৎ করুণ কণ্ঠে বললেন,—না হয় সে তোর বাপের সাথে কেবল ঝগড়াই করেছে,—তবু জ্ঞাতি তো! আর, তাছাড়া, বেচারারা বড় দুঃখে পড়েছে আজকাল।

কেন ঠাকুমা?—সুবোধ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

জগদ্ধাত্রীদেবী একটি নিশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন, কর্ম্মফল দাদা,—পাপের ফল আর কি। রজনী তো উড়িয়েই দিলে সব,—গাঁজাগুলির অভ্যাস ছাড়তে পারলে না তো! ছেলেটাও বাপের মতই। এত দিন তো বাড়ীতেই বসে ছিল,—মাস কয়েক আগে কলকাতায় যাবার নাম করে কোথায় যে চলে গিয়েছে, কেউ জানে না। সব দুঃখের সেরা দুঃখ,—দুগ্‌গা মেয়েটা বিয়ে হবার ছমাসের মধ্যেই শাঁখা-সিদুঁর ঘুচিয়ে বাপের বাড়ীতে ফিরে এসেছে। আহা!—হতভাগীর মুখের দিকে চাইলেও দুঃখে বুক ফেটে যায়!—

সুবোধ স্তব্ধ হয়ে শুনলে; তার পর একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, যাব, ঠাকুমা,—আজই যাব।

৪

রজনী বাড়ুজ্জের বাড়ীতে সে দিন সুবোধের যাওয়া হল না।

পথে হালদারদের বাড়ী,—সুবোধের রাজেনদার। গাঁয়ে যখন সুবোধ থাকত তখন রাজেন্দ্র ছিল তার বন্ধু, দাদা এবং গুরু। মড়া পোড়াতে যেমন, কংগ্রেসের সভাসমিতিতেও তেমনি রাজেন্দ্রই ছিল এ অঞ্চলের সকল ছেলের পাণ্ডা। কিন্তু

পাড়াগাঁয়ে বেশীর ভাগ যুবকের মতই রাজেন্দ্রও অল্প বয়সেই বে-থা করে সংসারে জড়িয়ে পড়ে। সুবোধও দেশ ছেড়ে চলে যায়। তার পর দেখা আর তাদের হয় নি। সে বার দেশে এসে সুবোধ শুনেছিল যে রাজেন্দ্র কি একটা চাকরি নিয়ে ডিহিড়িতে চলে গিয়েছে। আজ তাদের বাড়ীটা চোখে পড়তেই সুবোধ মনের মধ্যে অনেকখানি কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল।

কাঁচা বাড়ী। একখানা টিনের আর খান দুই খড়ের ঘর। অন্দরের আব্রু রক্ষা করছে একখানা পাকাটির বেড়া। সেই বেড়ার কাছে এসে সুবোধ থমকে দাঁড়াল,— ভিতরে নিতান্ত বে-আব্রু আর অপ্রীতিকর রকমের কি যেন একটা কলহ চলেছে।

করি নি ?—বেশ করেছি ;—যুবতী নারীর কোমল কণ্ঠে কঠিন ঝঙ্কার বেজে উঠল,—পারব না,—পারব না আমি এত খাটতে। এত করেও পান থেকে চুন খসলেই যদি এত গঞ্জনা আমায় সইতে হয়, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

ওমা !—গঞ্জনা আবার আমি কোথায় দিলাম, বৌমা !—বর্ষীয়সী নারীর কণ্ঠে উত্তর হল ; সে স্বরও অভিমানে ক্ষুব্ধ, বিরক্তিতে কঠিন ;—বেলা পড়ে এল অথচ কাজকর্ম্ম সব রইল পড়ে। সেই কথাটাই বলেছি বই তো নয় !—

তা অমন মুখঝামটা দিয়ে না বললেও চলত। আমি কারও কেনা বাঁদী নই !—

ওমা আমি কোথায় মুখঝামটা দিয়েছি ? মুখঝামটা দিচ্ছ তো তুমি। আর তা-ও কি কথার কি কথা ! নিজের সংসারের কাজ নিজে করলে সে কি বাঁদীগিরি করা হয় ?

আমার আবার সংসার কিসের ? স্বামী নেই, সন্তান নেই। দুখানা চালাঘর আর দুহাত জমি,—তাই নিয়ে মেয়েমানুষের সংসার হয় নাকি ?

সুবোধের বুকটা ছাৎ করে উঠল। কণ্ঠস্বর শুনেই দুটি স্ত্রীলোককেই সে চিনতে পেরেছে ;—একটি তার রাজেনদার মা, আর একটি তারই স্ত্রী। একটা ভয়ঙ্কর রকমের দুর্ঘটনার আশঙ্কা সুবোধের মনে জেগে উঠল।

কিন্তু ভিতরে যুবতী মেয়েটি কণ্ঠস্বর আরও এক পরদা উপরে চড়িয়ে বলেই চলল,—পরিচর্য্যা তো করছি মাটির ; সেবা করে ঘি ঢালছি ভস্মের উপর ; বেঁচে আছি পশুর মত দুবেলা দুমুঠো ভাত খাবার জন্য। আমার আবার সংসার কি ? পারব না আমি আর এই বিড়ম্বনা সইতে। চলে যাব যেদিকে দুচোখ যায়।

বৃদ্ধাও এবার সুর চড়িয়েই উত্তর দিলে, ওমা!—কোথায় যাব আমি! মেয়েমানুষ হয়ে নিজের স্বামী, নিজের সন্তানের সম্বন্ধে এমন অলক্ষুণে কথা তুমি বলতে পারলে, বৌমা? জিভে আটকাল না তোমার? কেন,—কি নেই তোমার? যা যা নিয়ে মেয়েমানুষের জীবন সার্থক হয়, তোমার তার কিসের অভাব? কাছেই না হয় তারা নেই; কিন্তু—

সুবোধ একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে,—যাক, তার অশঙ্কা তাহলে অমূলক,—রাজেনদার কিছু হয় নি!—

কি যে হয়েছে তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। রাজেন্দ্রর মায়ের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তার স্ত্রী বলে উঠল, তাই তো আমার দুঃখ; সেই জন্যই তো আমার বুক ফেটে যায়। কিছু যদি না থাকত, বুকে আমি পাষাণ দিয়ে পড়ে থাকতে পারতাম। কিন্তু সব থাকতেও বঞ্চিত হয়ে পড়ে আছি। স্বামী পাই নে, সন্তান পাই নে; দিন কাটে মাটির ঢেলা আর আতুরের সেবা নিয়ে। এ আমার বাঁদীগিরি নয় তো কি? এর চেয়ে ছেলেবয়সে আমার বাপ-মা যদি মরে যেত, বিয়ে না হত আমার, পেটের জ্বালায় পরের বাড়ী গিয়ে ঝি হতাম, কি গুরুতর লোকসান হত তাতে? সংসার!—বললেই শূন্য সংসার হয়ে ওঠে নাকি?

থাম বলছি,—গৃহিনী এবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—আমার সোনার সংসারকে শূন্য তো করেছেই,—যেটুকু আছে তা-ও উৎসন্ন করতে চাও নাকি? ওমা!—কর্ত্তা কি যে হাঘরের মেয়ে ঘরে এনেছিলেন! এমন তো জন্মেও দেখি নি। সর্ব্বনাশী হতচ্ছাড়ী স্বামীর ভরা সংসারকে বলে কি না শূন্য!—

বলি কি সাধে? যা চোখে দেখি, তাই; বুকের মধ্যে রাতদিন যা অনুভব করি, তাই মুখের কথায় ফুটে বের হয়। স্বামীর সংসার আমার গড়ে উঠতে দিলেন কই? স্বামীর কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে বেঁধে রাখলেন চালাঘরের খুঁটির সাথে নিজের একরোখা জিদ বজায় রাখতে; চাঁদের হাট আমার ভেঙ্গে দিলেন ঠিক বসবার মুখেই। স্বামী ছেড়ে পড়ে রইলাম পাড়াগাঁয়ে আতুর শাশুরীর সেবা করতে,—তবু যদি সত্যিকারের আতুর হত, মনে মনে সান্ত্বনা পেতাম যে, পরকালের কাজ করছি। কিন্তু এ যে আমার ত্রিশঙ্কুর অবস্থা,—না মাটি, না স্বর্গ। আমার সোনার সংসার দুপায়ে মাড়িয়ে ভেঙ্গে দিয়ে এখন আমারই ঘাড়ে আবার দোষ চাপানো!—আমি যা

করেছি তা দেখেছে গাঁয়ের লোক; আর দেখছেন ভগবান। স্বামী ছেড়ে, সন্তান ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি কেবল আপনারই মুখের দিকে চেয়ে। তবু যদি—

—বার বার ও কথা তুমি আমায় শুনিয়ো না, বৌমা। আমি তোমায় বেঁধে রাখি নি। আমার স্বামী-শ্বশুরের ভিটায় আমি পড়ে আছি; আর তাই আমি থাকব যে কটা দিন ভগবান দেহে আমার প্রাণ রাখেন। আর কাউকে আমি থাকতে বলি নে,—বেঁধে রাখা তো দূরের কথা। আমার নিজের পেটের ছেলে পর হয়ে গেল,—আমায় ছেড়ে চলে গেল কোথায় কোন দূর দেশে। তাকে ছেড়ে আমি যখন থাকতে পেরেছি, তুমি পরের মেয়ে কাছে আমার না থাকলেও আমার দিন কাটবে। চাই নে আমি তোমার হাতের সেবা। তুমি যাও,—যেদিন, যখন খুসী, তখনই তুমি যেয়ো। বলেই তো রেখেছি সে কথা। ছেলেকেও স্পষ্ট করেই সে কথা বলে দিয়েছি। কিন্তু আসল গুড়েই যে বালি!—তোমার স্বামীই তো তোমায় কাছে নিতে চায় না।

—তাতেই না যাওয়ার কথা যখন তখন মুখে আসে আপনার!—বধূ গলার স্বর আরও এক পরদা উপরে তুলে বললে,—আপনাকে খালি বাড়ীতে একা ফেলে রেখে উনি আমায় কিছুতেই নিয়ে যাবেন না জেনেই না কথায় কথায় এত উদারতা দেখানো হয়!—কিন্তু এটা কি খালি আমারই কথা, একা আমারই সুখদুঃখের বিষয়? এই যে বাড়ীতে পড়ে থাকবার গোঁ আপনার, এতে একা আমারই উপর কি অবিচার হচ্ছে? অমন যে আপনার ছেলে, সে-ই কি সুবিচার পেয়েছে আপনার কাছে? তাকেও ঘরছাড়া, বনবাসী করেন নি আপনি? আমার যেমন, তারও তো তেমনি স্ত্রী-সন্তান থাকতেও কেউ নেই। কি কষ্টে তিনি আছেন তা আমি জানি। অমন যে মা-অন্ত প্রাণ ছেলে, খুব পুরস্কার দিয়েছেন তাকে। রামের মত ছেলে বলেই বনবাসে তাকে পাঠাতে পেরেছেন।—

আমি বনবাসে পাঠিয়েছি তাকে?

তা নয় তো কি? রামের তবু সীতা সাথে ছিল;—ওঁর সীতাকেও তো কেড়ে নিয়ে ধরে রেখেছেন আপনি।

মিছে কথা,—গৃহিনী আবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললে,—এই মিছে কথার জন্য জিভ তোমার খসে পড়বে, বৌমা। আমি অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি,—

আমার কথা ব্যর্থ হবে না। আর বনবাসে যদি পাঠিয়েও থাকি,—বেশ করেছি। তুমি তার হয়ে কথা বলবার কে ? সে আমার পেটের সন্তান।

—আমারও তিনি স্বামী যেমন আপনার তিনি সন্তান। হাজার বার তাঁর হয়ে আমি কথা বলব। তাঁর মনের কথা জানি বলেই আমি বলি। আর আপনিও কি জানেন না, কি তুষের আগুন তাঁর বুকের মধ্যে আপনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন ? কেন ?—সে বার আপনার সামনেই নিজের হাতে বাড়ীতে তিনি আগুন লাগাতে যান নি ? তবু বাড়ী ছেড়ে না যাবার জিদ একটুও কি টলেছে আপনার ?

—টলেই নি তো,—আর টলবেও না। আমার স্বামীর ভিটা ছেড়ে এক পা-ও নড়ব না আমি। কেন যাব ? স্বামীর ভিটা ছেড়ে ছেলের বাসাবাড়ীতে থাকতে যাব দিনরাত তোমার মুখঝামটা সইতে ?—এক মুঠা ভাতের জন্য ছেলের কাছে হাত পাততে ? তার চেয়ে এই গাঁয়ে খালি বাড়ীতেই না খেয়ে মরব আমি। মরবার সময়ে এক ফোটা জলও যদি না পাই—

কথা ছুটল আগ্নেয়গিরির তপ্ত প্রস্রবণের মত,—বোধ করি ঐ সঙ্গে চোখের জলও। কোন পক্ষেরই ক্লান্তি নেই। পাকাটির বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে সুবোধ বিব্রত হয়ে পড়ল। সে বুঝলে যে এক দিনের আকস্মিক ব্যাপার এটা নয়; শ্বাশুরী-বউএর এমন কলহ প্রায়ই হয়ে থাকে। গোড়ার কথাটাও সে মোটামুটি আন্দাজ করে নিলে,—যুগযুগের স্মৃতিপবিত্র প্রতিষ্ঠান পরিবারের বিরুদ্ধে কালের দুর্ব্বার অভিযান চলেছে ; যা ছিল পাকা ইমারৎ, তারই এক এক খানা ইট প্রচণ্ড তরঙ্গের নির্ম্মম আঘাতে খসে পড়ে কোথায় ভেসে যাচ্ছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। সেই প্রলয়লীলারই এ এক খণ্ডচিত্র,—প্রবল আক্রমণের মুখে ধ্বংসোন্মুখ পরিবারের ক্ষীণ প্রতিক্রিয়ার আক্ষেপ মাত্র।

সুবোধ এক বার ভাবলে যে এ সময়ে তার মত এক জন বাইরের লোকের ওখানে না যাওয়াই ভাল। কিন্তু তখনই আবার তার মনে হল যে, সে কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে অন্ততঃ সাময়িক ভাবে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটার অবসান হয়ে যেতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত জেঠিমা বলে একটা হাঁক দিয়ে সে ভিতরেই ঢুকে গেল।

কলহও সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। অপরিচিত এক জন পুরুষকে হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে দেখতে পেয়ে বধূ তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ;

শাশুড়ীও কথা থামিয়ে সুবোধের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল—যেন হঠাৎ সে ভূত দেখেছে।

কুণ্ঠিত মুখে হাসি ফুটিয়ে সুবোধ বললে, আমায় চিনতে পারছেন না, জেঠিমা? আমি সুবোধ। রাজেনদার সাথে কত দিন যে আমায় কাছে বসিয়ে কত খাইয়েছেন আপনি!—

ও হরি!—গৃহিণী হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে অধীর স্বরে বললে,—সুবোধ কি বলছিস তুই?—তুই যে আমাদের দুঃখু! আয়, বাবা, আয়,। বাড়ীতে কবে এলি তুই? কৈ,—আমি তো কিছুই শুনি নি! বোস্, বাবা, বোস্। ও আমার পোড়াকপাল,—বসবার যে কিছুই নেই এখানে! বলি ও বৌমা,—শীগগির একখানা আসন নিয়ে এস তো!—

থাক্, থাক্, জেঠিমা,—আমি এই মাটিতেই বসছি,—এ তো আমার নিজের বাড়ীই। কিন্তু আপনাকে প্রণাম করি আগে।

প্রণাম শেষ করে সে সত্য সত্যই গৃহিণীর কাছে মাটিতেই বসে পড়ল।

ওতে সে আরও চঞ্চল হয়ে উঠল; গলার স্বর আরও কয়েক পরদা চড়িয়ে বললে, বলি, ও বৌমা,—কোথায় গেলে আবার তুমি? এ তো পর কেউ নয়,—এ আমাদের দুঃখু;—ঘরের ছেলের মত। এর কাছে তোমার আবার লজ্জা কি? আসন নিয়ে এস একখানা,—শীগগির।

কথা শেষ হবার আগেই বধূ হাতে একখানা পিড়ি নিয়ে দোর খুলে বারান্দায় নেমে এসেছিল। তার মাথার কাপড় মাত্র কপাল পর্য্যন্ত টানা, ব্যবহারে ব্যস্তসমস্ত ভাব নেই, অনাবশ্যক সঙ্কোচের জড়িমাও নেই। সহজ ভাবেই সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে সে বললে, ওঠ, ঠাকুরপো,—পিড়িখানা আগে পেতে দিই। কবে এলে তুমি? ভাল আছ তো!

আগের মুহূর্ত্তেই বাড়ীতে যে একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গিয়েছে, বধূর ব্যবহারে বা কথার স্বরে তার আভাষ মাত্রও প্রকাশ পেল না।

সশ্রদ্ধ, মুগ্ধ চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে সুবোধ উঠে দাঁড়াল; ঢিপ করে তার পায়ের কাছেও একটা প্রণাম করে হাসিমুখে বললে, বেশ ভাল আছি, বৌদি;—এসেছি সবে কাল রাত্রে। আপনি ভাল আছেন তো?

প্রণামটা বোধ করি বধূ প্রত্যাশা করে নি,—লজ্জায় মুখ লাল করে চুপ

সরে গেল সে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে-ও হাসিমুখেই উত্তর দিলে, ভালই আছি, ঠাকুরপো। দেশের ভাগ্য যে দেশকে তোমার মনে পড়েছে। আমাদের কথাটা আর না-ই বললাম।

মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সুবোধ বললে, দেশ আর দেশের লোককে বরাবরই মনে পড়েছে, বৌদি; কিন্তু আসবার সুবিধে এর আগে আর হয় নি।

একটু থেমে গৃহিণীর মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, আপনার শরীরটা বড্ড ভেঙ্গে পড়েছে, জেঠিমা,—চেনাই যেন যাচ্ছে না।

আমার কথা আর বলো না, বাবা,—গৃহিণী মুখখানাকে কালো করে উত্তর দিলেন,— আমি এখন যেতে পারলেই বাঁচি। সকলের পথে কণ্টক হয়ে আছি আমি,—এখন গেলে আমারও হাড় জুড়োয়, অপর সকলেও নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারে।

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, কি যে বলেন আপনি!—তার ভয় হল পাছে যে প্রসঙ্গটি তার আসাতে চাপা পড়ে গিয়েছিল, সেটাই এই উপলক্ষে আবার উঠে পড়ে।

হলও তাই। গৃহিণী ফোঁস করে একটি নিশ্বাস ছেড়ে বললে,—মিছে কথা নয়, বাবা,—বেঁচে থেকে আর কি সুখ আছে আমার? তিনি তো স্বর্গেই গিয়েছেন; একটি মাত্র ছেলে,—সেও আমায় পরিত্যাগ করে গিয়েছে।

সুবোধ চমকে উঠে বললে, সে কি কথা জেঠিমা? রাজেনদা ডিহিড়িতে চাকরি করেন না এখন?

গৃহিণী মুখ ফিরিয়ে বললে, চাকরি সেখানেই করে, তবে বাড়ীতে আর আসে না। আসবেই বা কেন? আমি তো আর তার কেউ নই!—

কথাটা বুঝতে না পেরে সুবোধ বিহ্বলের মত বধূর মুখের দিকে তাকাতেই সে লজ্জিত ভাবে মুখ নামিয়ে নিলে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, বাড়ীতে আসবার সুবিধে হয় না, ঠাকুরপো। দূরের পথ,—আসা-যাওয়ায় অনেক টাকা খরচ। মাইনে তো মোটে ষাটটি টাকা। ও থেকে পথখরচ আর বাচে না। খরচ তো কম নয়,— আলাদা আলাদা তিনটি সংসার।

সুবোধ সবিস্ময়ে বললে, তিনটি সংসার!—

হ্যাঁ, ঠাকুরপো,—বধূ উত্তর দিলে,—তিনটিই বলতে হবে বই কি! ডিহিড়িতে

তাঁর নিজের খরচ আছে, এখানে আমাদের খরচ আছে, তার উপর আবার ছেলের আলাদা খরচ।

সে আবার কেন ?

হবে না ? সে যে সদরে ইস্কুলে পড়ে,--বোর্ডিংএ থাকে।

সুবোধ আরও বেশী বিস্মিত হয়ে বললে, সে কি কথা, বৌদি ? ঐটুকু ছেলে বোর্ডিংএ থাকে ?

গৃহিণী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, আর যেন থাকতে না পেরেই এবার সে বলে উঠল, তাই দেখ, বাবা,—দেখ তোমরা। এমন কথা আর শুনেছ কখনও ? দুধের ছেলেকে বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়ে বোর্ডিংএ রাখে কেউ কোন দিন ? অথচ ও ঠিক তাই করলে,—আমার উপর রাগ করে শোধ নেবার জন্য। ছেলেটা কত কাঁদলে,—ঠাকুমা, ঠাকুমা, বলে দুই হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে রইল। কিন্তু সে লক্ষ্মীছাড়ার প্রাণ গলল না তাতেও। হিড় হিড় করে বাছাকে আমার টেনে নিয়ে গেল। আহা হা—সে কথা মনে পড়লে—বলতে বলতে বুড়ী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

সুবোধ কতকটা বিব্রত, কতকটা বিহ্বলের মত আবার বধূর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু বধূ শান্ত, গম্ভীর স্বরে বললে, না, ঠাকুরপো, তেমন ছোট সে নয়। বছর দশেক বয়স হয়েছে তো !—

তবু—

বোর্ডিংএ না পাঠিয়ে উপায় ছিল না, ঠাকুরপো। গাঁয়ে তো ইস্কুল নেই,—পাড়ার মূর্খ, অসভ্য ছেলেদের সাথে মিশে গোল্লায় যাচ্ছিল সে। তাই তারই ভবিষ্যতের কথা ভেবে বোর্ডিংএই দিতে হল তাকে।

সুবোধ তথাপি অবস্থাটাকে মেনে নিতে পারলে না ; কুণ্ঠিত হলেও প্রতিবাদের স্বরেই সে বললে, কিন্তু, বৌদি,—রাজেনদা খোকাকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন না কেন ?

বধূ এবারও গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, তা হয় না, ঠাকুরপো। কারখানার চাকরি, সকাল-বিকেল কাজে যেতে হয়। খোকার তদ্বির করবার সময় কোথায় তার ?

সমস্তাটা সুবোধের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু ঐ সঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। অনুসন্ধানী, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার

তাকিয়ে দেখে সে কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু খুকীকে দেখছি নে কেন, বৌদি? সেই সে বার যেটিকে আপনার কোলে দেখে গিয়েছিলাম?

বধূ চঞ্চল হয়ে উঠল; তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে সে। সুবোধের প্রশ্নের উত্তর দিলে গৃহিণী; হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে সে বললে, সে কি আর আছে, বাবা? ঠাকুর যে তাকে কাছে ডেকে নিয়েছেন!—

সুবোধের মুখ কালো হয়ে গেল। শুষ্ক কণ্ঠে সে বললে, কি হয়েছিল, জেঠিমা?

ঐ যে ম্যালোয়ারি না কি, তাই। কত চিকিৎসা করা হল, কিন্তু জ্বর আর সারল না।

কিছুক্ষণ কারও মুখেই কোন কথা ফুটল না। তার পর গৃহিণীই চোখের জল মুছে করুণ স্বরে আবার বললে, তাই দেখ, বাবা,—দেখে যাও কি সুখে আমি আছি। অথচ কত সাধই না আমার ছিল! বাপের এক সোনার সংসার থেকে শ্বশুরের আর এক সোনার সংসারে এসেছিলাম,—লোকজন, ছেলে-মেয়ে, গরু-বাছুর নিয়ে জমজমাট সংসার। ভেবেছিলাম,—ধনে-পুত্রে তা আমার আরও বাড়বে,—স্বামী, সন্তান পুত্র-বধূ, নাতি-নাতিনী, নাত-বৌ, নাত-জামাই নিয়ে কুড়ে ঘরের সংসারই আমার হবে ইন্দ্রের রাজপুরী। অথচ দেখ কি হয়ে গেল সব! বুড়ো বয়সে পেটের সন্তান, আমায় ছেড়ে চলে গেল,—বারণ মানলে না।

যেন অনুপস্থিত স্বামীকে সমর্থন করবার জন্যই বধূ এক রকম বাধা দিয়ে বললে, না গিয়ে উপায় ছিল না, ঠাকুরপো,—পোড়া পেটের যা জ্বালা।—

ম্লান মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, তা জেঠিমা, আপনারাও সেই ডিহিড়িতে যান না কেন? বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা সেটা। সবাই একত্র এক জায়গায়—

কথাটা সে শেষ করতে পারলে না, চোখের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিয়ে বধূ তার কথার মাঝখানেই বলে উঠল, অনেক দিন পরে এসেছ, ঠাকুরপো,—গরীবের বাড়ীতে একটু জল মুখে দিতে হবে।

সুবোধ বাধা পেয়ে থেমে গিয়েছিল; নিবন্ত আগুনে ফুঁ দিয়েছে বুঝে সে মনে মনে অনুতপ্তও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। গৃহিণী বধূর কথাটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই আগুনের মতই জ্বলে উঠে বললে, তোমারও মুখে ঐ কথা! সেই লক্ষ্মীছাড়াটাই তোমায় পাঠিয়েছে বুঝি? তা বেশ,—ভেঙ্গে দিয়ে যাও,—

যেটুকু আছে তারও সর্ব্বনাশ করে দিয়ে যাও,—আমি কাউকেই বেঁধে রাখব না। পেটের ছেলেকেই পারি নি, আর এ তো পরের মেয়ে। কিন্তু আমি যাব না,—স্বামীর ভিটা ছেড়ে এক পা-ও নড়ব না আমি,—না খেয়ে, এককোঁটা জল না পেয়ে শুখিয়ে মরে গেলেও না।

মাটির দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সুবোধ বললে, না, জেঠিমা, তেমন কথা আমি বলি নি। শুধু—

গৃহিণী এ কথাটাকেও উপেক্ষা করে গলার স্বর আরও এক পরদা চড়িয়ে বলে চলল, জানি আমি যে, সব যাবে। সব তো গিয়েছেই,—যেটুকু আছে তা-ও আমার সঙ্গে সঙ্গেই যাবে। কিন্তু বেঁচে থেকে শেষ সর্ব্বনাশটুকু আমি হতে দেব না। এ আমার সংসার,—আমার স্বামী-শ্বশুরের সংসার। আমার এই সাত পুরুষের ভিটায় সন্ধ্যে বেলায় প্রদীপ জ্বলবে না, শেয়াল-কুকুর এসে বাসা বাঁধবে,—এ আমি বেঁচে থেকে কিছুতেই সইতে পারব না। যার ইচ্ছা হয় সে যাক্। কিন্তু আমি যাব না। যত ষড়যন্ত্রই তোমরা কর না কেন, আমাকে এখান থেকে তোমরা কেউ নড়াতে পারবে না।

বধূ এতক্ষণ মুখ নামিয়ে চুপ করে বসে ছিল, কিন্তু এবার উঠে দাঁড়াল সে। শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললে, কেউ কোন ষড়যন্ত্র করে নি মা আপনাকে ভিটাছাড়া করবার জন্য। আর যাকে ঠেস দিয়ে বার বার এই যাওয়ার কথা আপনি বলছেন, সবাই জানে যে, তার যাবার পথ খোলা থাকলেও সে যায় নি; আর মরে না গেলে আপনাকে খালি বাড়ীতে একেলা ফেলে রেখে সে যেতেও পারবে না। আপনার জিদের নীচে তার ইচ্ছে চিরদিনই চাপা পড়ে আছে, আর ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। আপনি যখন শাশুড়ী,—মায়ের মত—

গৃহিণী হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল; প্রায় চীৎকার করে বললে, শুনলে, বাবা, ছঃখু,—শুনলে?

বধূ ভ্রূক্ষেপও করলে না; যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাবে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে বললে, একটু বসতে হবে, ঠাকুরপো,—একটু জল মুখে না দিয়ে যেতে পাবে না তুমি। আমি এক্ষুনি আসছি। আমার মাথার দিব্যি রইল,—কারও উপর রাগ করে চলে যেয়ো না যেন।

বধূ রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। যতক্ষন দেখা গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত শাশুড়ী তার দিকে চেয়ে রইল; তার পর ফিরে সুবোধের দিকে চেয়ে বললে, শুনলে তো,

বাবা,--শুনলে তো বউএর কথা ? অথচ এই-ই আমার সংসার। এত করেও কারও মন পেলাম না। সকলের কাছেই আমি অপরাধী হয়ে রয়েছি। অথচ কি আমার অপরাধ, বল তো ? সকলকে আমি এক সঙ্গে রাখতে চাচ্ছি—এই তো ? কিন্তু ছেড়ে কি যাওয়া যায় বাবা ? বল,—তুমিই বল।—

মনের কথাটা চীৎকার করে গৃহিণীকে শুনিয়ে দেবার ইচ্ছা হল সুবোধের,—যাওয়া নিশ্চয়ই যায় এবং যাওয়াই তার কর্তব্য,—একটি ভিটা আর দুখানি চালাঘরের চেয়ে মানুষের মনের মূল্য ঢের বেশী,—তিনি মা আর শ্বাশুরী বলেই ছেলে আর বৌএর জীবন ও যৌবনকে ব্যর্থ করে দেবার অধিকার তার নেই,—তার অন্ধ স্বার্থপরতা আর অন্তঃসারশূন্য আত্মম্ভরিতাই স্নেহের ছদ্মবেশে তার অন্তরকে অধিকার করে বসে আসল মাতৃস্নেহকেই গলা টিপে হত্যা করেছে। কিন্তু গৃহিণীর মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলি সে বলতে পারলে না,—নিদারুণ একটা বিতৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার জন্য বেশ একটু অনুকম্পাও সে বোধ করলে। এবার সে নিঃসংশয়েই বুঝলে যে, স্বার্থান্ধ শ্বাশুরী আর ব্যর্থযৌবনা বধুর কলহের ভিতর দিয়ে যে ছবি তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, তা যুগের সঙ্গে যুগের সংঘর্ষের ছবি। বুড়ী তখনও চোখের জল মুছতে মুছতে তার দুঃখ, তার নৈরাশ্যের কথা অনর্গল বলে যাচ্ছিল ;—কিন্তু সুবোধের মনে হল যে, স্বপনপুরীর রাজকন্যার জন্য জাগ্রত শিশু অধীর হয়ে বিলাপ করছে। সামন্ত যুগের যে স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবার স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে, তাকেই দুই দুর্ব্বল হাতে আঁকড়ে ধরে বুড়ী হায় হায় করে কাঁদছে। অতীতের কথা সুবোধের মনে পড়ে গেল। সে যুগের অর্থনীতি ছিল সরল, জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর। জীবিকার জন্য সে যুগে কাউকেই বিদেশে যেতে হত না। স্বামী, শ্বশুর, পুত্র, পুত্রবধু, পৌত্রপৌত্রী নিয়ে পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থের সংসার হয় তো বা সোনার সংসারই হয়ে উঠত। সেই যুগেরই মেয়ে এবং বধু ঐ গৃহিণী। অতীতের স্বপ্ন আজও তার চোখে লেগে রয়েছে। যুগের যে পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা বুঝবার শক্তি তার নেই। তার চোখের সামনেই প্রমত্ত নটরাজের পায়ের নীচে তার নিজের সংসারই ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছে, তবু আজও তার স্বপ্নের ঘোর কাটে নি,—প্রাণহীন সংসারের শবদেহটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদেই চলেছে সে।—

সান্ত্বনা বা পরামর্শের কোন কথাই সুবোধের মুখে এল না।

তাকে বাঁচিয়ে দিলে বধূ। একটু পরেই থালায় করে অল্প একটু খাবার আর এক গ্লাস জল এনে সুবোধের সামনে সুষ্ঠু ভাবে সাজিয়ে দিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, ঘরে কিছুই নেই, ঠাকুরপো,—এমন দিনে তুমি এলে—

বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই থালাখানিকে কাছে টেনে নিয়ে সুবোধ উত্তর দিলে, বাঃ রে,—এ কি কম? তবু যদি আপনার মনের মধ্যে আফশোষ থেকে যায়, বৌদি, তবে আর এক দিন,—যেদিন ঘরে অনেক জিনিষ থাকবে,—আমায় খবর দেবেন। আগে থেকে তৈরি হয়ে এসে এমন খেয়ে যাব যে—

খবর দেওয়াই রইল,—বধূ বাধা দিয়ে হেসে বললে,—যে কদিন বাড়ীতে থাকবে, রোজ বৈকালে আমার এখানে তোমার নিমন্ত্রণ। তবে অনেক জিনিষ তোমায় আমি কোন দিনই দিতে পারব না, ভাই,—তা-ও আগেই বলে রাখছি। তোমার গরীব বৌদির বাড়ীতে কোন দিনই ক্ষুদকুড়ার বেশী পাবে না তুমি।

কিন্তু সে তো বিদুরের ক্ষুদকুড়া,—সুবোধও হেসে উত্তর দিলে,—মণ্ডা-মিঠাই কোথায় লাগে তার কাছে! ওর লোভে আমি রোজই আসব, বৌদি,—ঠিক জানবেন, রোজই।

গৃহিণী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তুমি খাও, বাছা।

তার অত কথার উত্তরে যে সুবোধ একটি কথাও বলে নি সেই সুবোধই যে বধূর সঙ্গে রহস্যালাপে অমন মেতে উঠল, এটা যেন সে বরদাস্ত করতে পারলে না। মুখখানা অন্ধকার করে সে আবার বললে, আমি যাই,—কত কাজ পড়ে রয়েছে। আমার সংসারের কাজ আমি না করলে আর কে করবে!—

শুধু কথায় নয়, চোখেও বধূর দিকে একটি কটাক্ষ করে গৃহিণী নীচে নেমে গেল।

সুবোধ অপ্রতিভ ভাবে চুপ করে গিয়েছিল, গৃহিণী একটু সরে যেতেই বধূ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, কিছু মনে করো না, ঠাকুরপো,—অনর্থক তোমাকেও অনেকগুলি কথা শুনতে হল।

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, না, বৌদি,—আমার আর কি! আপনাকেই তো বেশী কথা শুনতে হয়েছে।

মুখখানি হাসবার মত করে বধূ উত্তর দিলে, ও কিছু নয়,—ও আমাকে রোজই শুনতে হয়।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে, কি যে ওঁর হয়েছে আজকাল,—সব কথাতেই রাগ।

সুবোধ বললে, বয়স হলে সবারই এ রকম হয়।

উনি আবার সকলকেই ছাড়িয়ে গিয়েছেন,—বধূ উত্তর দিলে,—কি যে ওঁর ধারণা হয়েছে,—যেন বিশ্বশুদ্ধ লোক ওঁকে বাড়ীছাড়া করবার জন্য ওঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে লেগেছে। অথচ আসল ব্যাপার তা মোটেই নয়। সে বার দেশে এসে তিনি এক বার ডিহিড়ী যাবার কথা তুলেছিলেন; কিন্তু ওঁর মত নেই বুঝে আমরা সে ইচ্ছে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি। তবু ওঁর আশঙ্কা ঘোচে নি,—এখনও কথায় কথায় কেবল সেই কথাই উনি তুলবেন। আজও,—এই তুমি আসবার একটু আগেও, সেই কথাই উঠেছিল। তাতেই তো এত কথা তোমায় শুনতে হল!—

মুখ নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুবোধ; তার পর হঠাৎ মুখ তুলে বললে, আমি সব শুনেছি, বৌদি,—ঐ বেড়াটির আড়ালে দাঁড়িয়ে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে আপনার,—না?

বধূর মুখখানি লাল হয়ে উঠল; তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত, অস্ফুট স্বরে সে বললে, না, না,—তা নয়। শুধু ছেলেটার জন্য,—তাকেও কাছছাড়া করতে হল কি না!—

সুবোধ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ছেড়ে বললে, এটা যুগের অভিশাপ বৌদি,—যুগসন্ধির কালে এই রকমই হয়। একটা যুগ কেটে গিয়েছে, আর একটা যুগের আবির্ভাব এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। বিগত যুগটার ছায়া এসে পড়েছে নূতন যুগের উপর,—তাকে ঠিক ফুটতে দিচ্ছে না,—শেষ রাত্রির অন্ধকার উষাকে যেমন ফুটতে দেয় না। আপনাদের মত মাঝখানে যারা পড়ে গিয়েছে, বিগতপ্রায় যুগের কালো ছায়ার নীচে নিশ্বাস তো তাদের বন্ধ হয়ে আসবেই!—

পরদিন সুবোধ রজনী বাড়ুজ্জের বাড়ীতে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে এল।

দিন সাতেকও লাগল না, গাঁয়ের প্রত্যেকটি লোক, প্রত্যেকটি অলিগলি পর্য্যন্ত দেখা হয়ে গেল;—কেবল নিজেদের গাঁ নয়, আশপাশের আরও কয়েকখানা গাঁ

পর্য্যন্ত। নূতনত্বের মোহ গেল কেটে ; যে উত্তেজনাটুকু এসেছিল, ইন্ধন ফুরাতেই তা নিজে ছাই হয়ে গেল। তার পর এল অবসাদ,—প্রাণহীন পাড়াগাঁয়ে কর্ম্মহীন অলস দিনগুলির প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত গুণে গুণে কাটাবার দুঃসহ বিড়ম্বনা।

একেবারে অজ পাড়াগাঁ। স্কুল নেই, পোষ্ট-আপিস নেই, থানা নেই,—দৈনিক হাট পর্য্যন্ত বসে না! চারিদিকে ঝোপ-ঝাড় ; যেখানে-সেখানে জলা বা ডোবা ; গাঁয়ের বাইরে এত বড় মাঠ যে ওর শূন্যতার মধ্যে মন দিশাহারা হয়ে পড়ে। হুগলীর তুলনায় এ যেন একেবারে বিপরীত সীমান্ত। আধুনিক সভ্যতার কোন উপকরণই এখানে নেই। রেল বা মোটরগাড়ী দূরে থাক্, এই যুদ্ধের দিনেও এখানে আকাশে একখানা এ্যারোপ্লেন পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

পরিচিত লোক নেই, তা নয়। স্ত্রী-পুরুষ কত জনকেই সে দেখতে পেলে যারা তাকে সত্যিকারের স্নেহ করে। এমন দুএক জনের সঙ্গেও দেখা তার হল যারা বাল্যে তার নিজেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তবু কারও সঙ্গেই সে মোটেই কোন আত্মীয়তা বোধ করলে না। এরা যেন আর এক জগতের মানুষ,—এদের ভাষা পর্য্যন্ত আলাদা। নিজেদের ছোটখাটো সুখদুঃখ নিয়ে নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক এদের জীবন,—বৃহত্তর জীবনস্রোতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নাই। সে জীবনের কোন সমস্যা এরা বোঝে না, বুঝবার চেষ্টাও করে না। এমন যে যুদ্ধ,—যা এরই মধ্যে তাদেরও জীবনটাকে গোড়া পর্য্যন্ত নেড়ে দিয়েছে, বন্যার মত ছুটে আসছে তাদের সকলকে ডুবিয়ে, ভাসিয়ে নেবার জন্য, তার সম্বন্ধেও এদের কেমন যেন নিষ্ক্রিয়, উদাসীন ভাব। কূপমণ্ডূকত্বের অতিরিক্ত আর কোন অস্তিত্ব যদি এদের থাকে, তার মধ্যে মানুষের সক্রিয় সচেতনতা নেই, আছে কেবল ভীতিবিহ্বল পশুর পলায়নপরতা।

কদিনের মধ্যেই সুবোধ হাঁফিয়ে উঠল। এমন একটা লোক এখানে নেই যার সঙ্গে প্রাণ খুলে দুটি কথা বলতে পারে সে। কাজও কিছুই নেই। এই সুদূর পল্লীতে নিঃসঙ্গ, নির্ব্বান্ধব, কর্ম্মহীন দিনগুলিকে নিয়ে সে এক সমস্যায় পড়ে গেল। তার মনে হতে লাগল যে সংসার ছেড়ে, কর্ম্মক্ষেত্র ছেড়ে সে যেন বনবাসে এসেছে,—সূর্য্যালোকের সংস্পর্শহীন জলাভূমির আর্দ্র, দুর্গন্ধময় বিষাক্ত বায়ু নিশ্বাসে টেনে টেনে পলে পলে আত্মহত্যা করছে সে।

হুগলী থেকে সে পালিয়ে এসেছিল শান্তির জন্য। কিন্তু পল্লীর প্রতিবেশের মধ্যে

শান্তির প্রাচুর্য্য থাকলেও মনে সে শান্তি পেলে না। হুগলীতে সেই স্মরণীয় রাত্তিতে মনটা তার একেবারেই বিকল হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, তার নিজেরই বহু সাধনার উপলব্ধির কথাও তখন তার মনে পড়ে নি। সে ভুলেই গিয়েছিল যে, চিরকাল কাজের মধ্যেই সে শান্তি পেয়েছে, অলস দিনযাপনের মধ্যে নয়। এত বড় অভিজ্ঞতাটা ভুলে যাওয়া কি যে মারাত্মক ভুল তা এখন ক্রমশঃই সে বুঝতে লাগল। এখানে কাজ একেবারেই নেই; পড়বার একখানা ভাল বই পর্য্যন্ত নেই যার মধ্যে অস্থির মনটা দুএক ঘণ্টা ডুবে থাকতে পারে। একটানা অবসরের প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠের মধ্যে সেটা ছাড়া পেয়ে লাগামছাড়া ঘোড়ার মতই উদ্দাম হয়ে উঠল,—অন্ধ একটা আবেগের তাড়নায় সুবোধ যেখানে থেকে পালিয়ে এসেছিল, স্থান আর কালের ব্যবধান ডিঙ্গিয়ে সেখানেই আবার ছুটে গিয়ে তারই অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আসল কথা সুভদ্রাকে সুবোধ ভুলতে পারলে না। সে রাত্রে সব চেয়ে বড় যে আশঙ্কা সুবোধের মনে জেগে উঠেছিল সেটা ঐ সুভদ্রার সঙ্গে দেখা হবার আশঙ্কা। ঐ ভয়েই সে এত দূরে পালিয়ে এসেছিল। অথচ এখানে তার মনে হতে লাগল যে, তাকে অনুসরণ করেই সুভদ্রা যেন এখানেও এসে উপস্থিত হয়েছে। নিজে সে হুগলীতে থাকলে বহু দিনই হয় তো দিনে এক বারও তার সঙ্গে সুভদ্রার দেখা হত না,—আগেও তো অমনি হয়েছে,— দিনের পর দিন কেটে গিয়েছে, অথচ সুভদ্রাকে একবার সে চোখের দেখাও দেখে নি। কিন্তু সুভদ্রার শারিরীক সান্নিধ্য থেকে শত শত ক্রোশ দূরের এই অজ পাড়াগাঁয়ে এখন সেই সুভদ্রাই যেন তার অলস জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তেরই একমাত্র সাথী হয়ে উঠল।

এমনি যখন তার মনের অবস্থা তখন এক দিন সে খবর পেলে যে ক্রোশ দুই দূরের এক গ্রামের সব কজন গৃহস্থের উপর উৎখাতের নোটিশ হয়েছে। অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখবার জন্য সুবোধ পরের দিন সকালে সেই গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হল।

যা সে দেখলে সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য,—শুধু দৈহিক দুর্দ্দশারই নয়, চরম মানসিক অধোগতিরও শোচনীয় এক জীবন্ত চিত্র। পচিশ-ত্রিশ ঘর সাধু, শ্রমশীল, নির্ব্বিরোধী চাষী পরিবার কেবল এক সালের ক্ষেতের ফসল আর মাথা গুঁজবার খানকয়েক জীর্ণ চালাঘরই হারায় নি, সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছে তাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা-প্রণালী, আজন্মের পরিচিত বন্ধুবান্ধব, পারিবারিক জীবনের সহজ আনন্দ এবং সব

চেয়েও যা বেশী দামী, সেই নৈতিক চরিত্রও,—আশা, আত্মমর্য্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সুবিচার দাবী করবার সাহসটুকুকে পর্য্যন্ত হারিয়ে সত্যই একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। অবিচারকে তীব্র ভাবে অনুভব করবার শক্তিই যেন তাদের আর নেই, সুবিচার বলে গ্রহণ করবার মত বুদ্ধি আর বলিষ্ঠ ত্যাগপ্রবৃত্তিও নয়। প্রতিবাদ করবার শক্তি তাদের নেই, অথচ কর্ত্তব্যপালনের উন্মাদনাভরা পরিতৃপ্তিও তারা লাভ করে নি। মানুষই যেন তারা নয়; নৈরাশ্যের পঙ্ককুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জমান, ভাষাহীন, বোধশক্তিহীন, মনুষ্যত্বহীন জড়পিণ্ড কয়েকটি পুতুলনাচের পুতুলের মত অদৃশ্য কোন এক খেলোয়ারের নির্দ্দেশে জীবনের একটা প্রহসন বজায় রেখেছে মাত্র।

নোটিশ ছিল সাত দিনের। কয়েক ঘর লোক এরই মধ্যে চলে গিয়েছে; কয়েক জন আজ যাচ্ছে; অবশিষ্ট কয়েক জন যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সকলের গন্তব্য স্থান এক নয়,—তাদের সকলের জন্য বিশেষ কোন বাসস্থান কেউ নির্দ্দেশ করে দেয় নি, ঘরবাড়ী তৈরি করে দেওয়া তো দূরের কথা। ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু টাকা অবশ্য সকলেই পেয়েছে, কিন্তু তার পরের ব্যবস্থা করবার ভার যার যার নিজের। সুযোগ আর সাধ্য মত সবাই যার যার ব্যবস্থা করেও নিয়েছে,—কেউ সপরিবারে কাছাকাছি কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেবে, কেউ বা যাবে দূরে। কেউ স্ত্রী-পুত্রকে আত্মীয়ের বাড়ীতে রেখে নিজে বেরিয়ে যাবে জীবিকার অনুসন্ধানে,—হয়তো বা কাছাকাছিই কোন জায়গায় সামরিক রাস্তা বা বিমান-ঘাটি তৈরি করবার কাজে গিয়ে যোগ দেবে দিনমজুর হিসাবে, না হয় তো জিলার সদরে বা কলিকাতাতেই চলে যাবে কাজের সন্ধানে। পরিচিত সমাজ, সাত পুরুষের ভিটা আর প্রাণের চেয়েও প্রিয় চাষের জমি তারা পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে, আর ওরই সঙ্গে গৃহস্থালীর কত কি খুটিনাটি জিনিষ যার প্রয়োজন-মূল্য গৃহস্থ পরিবারের কাছে অপরিমেয় কিন্তু বিনিময়-মূল্য কিছুই নেই। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই এ সব জিনিষ এখানেই পড়ে থাকবে। এই সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সমস্যার জন্যই অনেকে তাদের এক মাত্র মূলধন হাল এবং গরুও এরই মধ্যেই বেচে ফেলেছে। নিজেদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই যাদের নেই, তারা গরুবাছুর নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখবে!—

সুবোধ শুনলে সবই। গাঁয়ের সামনের খোলা জায়গাটিতে বেশ একটু ভীড়

জমে উঠেছিল। যারা আজই চলে যাবে তারা ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েদের চোখে জল। পুরুষদের চোখও একেবারে শুকনো নয়। কেবল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই লাফালাফি চেঁচামেচি করে বিদায়ের করুণ সুরের মধ্যে নিতান্ত খাপছাড়া রকমের নূতন এক উল্লাসের সুর জুড়ে দিয়েছে। কোন দিনই যারা গাঁ ছেড়ে বাইরে যায় নি, এই যাওয়ার ব্যাপারটা তাদের কাছে যেন একটা উৎসব।

প্রাঙ্গণে শুধু মানুষই নয়,—ওদের পাশেই ছোট ছোট স্তূপে জড় হয়েছে তাদের ভাবী যাযাবর জীবনের সর্ব্বস্ব,—ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর, ছেঁড়া কাপড়, বেতের ধামা, বাঁশের ডালা, মাটির হাঁড়ি ও সান্‌কী, পিতল-কাঁসার দুএকখানা বাসনও। গরুছাগলও কয়েকটি আছে। যাত্রী নয়, এমন লোকও কয়েক জন এসেছে। তাদের কেউ সমব্যথী, কেউ বা কৌতূহলী দর্শক। জমিদার, মহাজন এবং অন্যান্য পাওনাদারের লোকও এসেছে বকেয়া বাকি আদায় করবার জন্য এক বার শেষ চেষ্টা করতে। এ অঞ্চলের চৌকীদারও এসেছে,—তার উদ্দেশ্য শান্তিরক্ষা করা। সেই লোকটিই সুবোধকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, বাবু বুঝি—

সুবোধ নিজের পরিচয় দিলে। পিতার পরিচয়ে সবাই তাকে চিনতে পারলে।

ওদের সঙ্গে কথা বলে সুবোধের মনটা আরও দমে গেল। এক জনও অবস্থাটাকে ভাল বুঝতে পারে নি। ঘরবাড়ী ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে কেউ বা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা আবার মুঠা মুঠা নগদ টাকা পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠেছে। কেউ দোষ দিচ্ছে অদৃষ্টকে, কেউ গাল দিচ্ছে ইংরাজকে। এক জন গলা খাটো করে সুবোধকে জিজ্ঞাসাই করলে, জাপানীরা কবে আসবে ঠাকুরমশায়,—এ পাষণ্ডদের ভরাডুবি কবে হবে?

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। পাষণ্ডদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ওদের যত তীব্রই হউক না কেন, তাদের কোন কাজের প্রতিবাদ করবার সাহস কারও নেই। উৎখাতের ব্যাপারটাকে সবাই মেনে নিয়েছে প্রাকৃতিক একটা বিপর্য্যয়ের মত। এক জন ভিটার নাম করে কেবলই চোখের জল ফেলছে দেখে সুবোধ বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বললে, ভিটে তো গিয়েছেই; এবার তোমরা কোথায় যাবে?

লোকটি কান্না থামিয়ে হতাশ স্বরে বললে, যার যেখানে সুবিধে হয়, সে সেখানেই যাবে। আমি যাব আমার ভায়রা-ভাইএর বাড়ীতে।

সুবোধ জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের যাবার জায়গা এরা ঠিক করে দেয় নি?

কারা, দাদাঠাকুর?—লোকটি বিহ্বলের মত বললে।

সুবোধ বললে, এই যারা ঘর ছাড়বার নোটিশ তোমাদের উপর জারি করে গেল?

লোকটি অভিভূতের মত কিছুক্ষণ সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইল,—যেন কথাটা মোটে সে বুঝতেই পারে নি। তার পর অদ্ভুত এক রকমের হাসি হেসে সে উত্তর দিলে, কি যে বলেন, আপনি! কোথায় আমরা যাব সে কথা এক বার কেউ আমাদের জিজ্ঞেসও করে নি। থাকবার যায়গা আবার কে ঠিক করে দেবে?

হঠাৎ সুবোধের মনে পড়ে গেল পথে আসতে আসতে যা সে দেখে এসেছে,—সৈনিকদের বসবাসের জন্য সেই সব নূতন গড়া ব্যারাক—পাকা বাড়ী, কলের জল, বৈজ্ঞানিক জল-নিষ্কাষণের ব্যবস্থা,—যেন আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের হাতে অভিনব এক একটি নগর এক রাত্রির মধ্যেই গড়ে উঠেছে। তার মনে হতে লাগল যে, অমনি সব ঘরবাড়ী এই সব গৃহহারা হতভাগ্যদের জন্যও তৈরি হতে পারত। ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, চাইতে পার নি? দাবী করতে পার নি যে, তোমাদের জন্যও নিরাপদ জায়গায় নূতন ঘর বেঁধে দিতে হবে?

দেখতে দেখতে লোকটির মুখখানি শুখিয়ে একেবারে ছোট হয়ে গেল। সন্ত্রস্ত চোখে চারিদিকে এক বার তাকিয়ে নিয়ে সুবোধের মুখের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে সে বললে, চুপ, দাদাঠাকুর, চুপ,—চৌকিদার শুনতে পেলে আমাদের আর রক্ষে থাকবে না।

একটু পরে সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে সে আবার বললে, আমরা গরীব মানুষ, দাদাঠাকুর,—আমাদের কি সাধ্য যে রাজার হুকুম অমান্য করি! ভগবান আছেন,—তিনি দেখছেন সবই। তিনিই বিচার করবেন। রাবণ রাজার মত যার পাপ, রাবণ রাজার মতই তার ভরাডুবি হবে।

সুবোধের মনটা আগে থেকেই খারাপ ছিল, আরও খারাপ হয়ে গেল। হুগলী ছেড়ে আসা অবধিই এমনি সব দৃশ্য তার চোখে পড়ছে, কানে আসছে কেবল এমনি সব কথা,—এমনি সকরুণ দীর্ঘশ্বাস, এমনি মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, এমনি

অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে অভিশাপবর্ষণ। নপুংসকের পুত্রকামনার মতই করুণ আর হাস্যাস্পদ এদের কামনা। জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডটিই যেন ভেঙে গিয়েছে। আসন্ন জাপানী আক্রমণের পটভূমিকায় কি শোচনীয়, কি মর্মন্তুদ এই নৈতিক অপমৃত্যুর দৃশ্য। খুশী হবার, নিজেকে অভিনন্দন জানাবার কারণ কারও নেই,—যারা যুদ্ধের আয়োজন করছে তাদেরও নয়, যারা যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ওকে প্রতিরোধ করতে চাচ্ছে, তাদেরও নয়,—না সরকারের, না কংগ্রেসের। কেমন যেন অগোছাল ও অস্পষ্ট রকমে সুবোধের মনে হতে লাগল যে কারও কোন চেষ্টাই যেন সার্থক হচ্ছে না,—নিষ্ক্রিয়, জড় জাতি কি যেন একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে গড়িয়ে চলেছে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে। বিজয়োন্মত্ত শত্রুর উদ্ধত আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে শাসকশক্তির সতর্ক আয়োজনের কত আড়ম্বরই তার চোখে পড়েছে; কিন্তু জাতির মনটাও তো তার দৃষ্টি এড়ায় নি! অত বড় উর্ব্বর ক্ষেত্রটা একেবারেই যেন ফাঁকা পড়ে আছে,—সেখানে না আছে প্রতিরোধের সঙ্কল্প, না আছে শাসক-শক্তির প্রতি মমত্ববোধ,—প্রকৃত সমস্যাটির উপলব্ধি পর্য্যন্ত সেখানে নেই। ভিত্তিটাকেই এমন কাঁচা রেখে ওর উপর প্রতিরোধের যে বিরাট ইমারৎ তৈরি হয়েছে, কি ওর মূল্য? কতটুকু ওর শক্তি? সুবোধের মনে হতে লাগল যে, শত্রুকে প্রতিরোধ করবার জন্য দেশের শাসকশক্তির এই যে এত সব সাড়ম্বর আয়োজন,—এই সৈন্যসমাবেশ, এই সমরসম্ভারের আমদানী, এই লোকাপসারণ,—এ সব তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়বে শত্রু যদি প্রবল বিক্রমে এ দেশ আক্রমণ করে বসে।

পথ চলতে চলতে কেবলই সুবোধের মনে হতে লাগল যে, কেবল সরকারের প্রচেষ্টাই নয়, কংগ্রেসের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে,—দেশের শাসনশক্তি যদি বৈকুণ্ঠের স্বর্গ তৈরি করে তাতেই আশ্রয় নিয়ে থাকে তবে কংগ্রেসও শক্ত মাটির উপরে দৃঢ়তর আবাসস্থান তৈরি করতে পারে নি। যুদ্ধ সুরু হবার পর থেকে কংগ্রেস যা বলেছে, যা করেছে, সবই একে একে সুবোধের মনে পড়ে গেল। এ নাটকের অভিনয় নিস্পৃহ দর্শকের মত দূর থেকে সে কেবল চেয়ে দেখে নি, নাটকের অভিনেতা হিসাবেই নিজে সে অভিনয় করেছে। কংগ্রেসের নীতি অনুসারে নিজে সে প্রচার করেছে যে, এ যুদ্ধ ভারতবাসীর যুদ্ধ নয়, এ নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ,—ইংরাজদের নিজস্ব একটা ব্যাপার যার সঙ্গে এ দেশের লোকের কোন সম্বন্ধই নেই। সত্যাগ্রহী হিসাবে যুদ্ধবিরোধী প্রচার করে নিজে সে বেশ কিছু দিন জেলও খেটে

এসেছে। কংগ্রেসের ঐ যুদ্ধবিরোধী নীতিরই প্রতিধ্বনি আজ সে শুনতে পাচ্ছে দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, প্রাজ্ঞ-অজ্ঞ, প্রত্যেকটি লোকের মুখে। এই একটু আগেই হিজলঘাটি গাঁয়ের লোকেরাও ঐ কথাই তাকে শুনিয়ে দিয়েছে,—যুদ্ধকে এরা নিজেদের যুদ্ধ মনে করে না,—ইংরাজের প্রতি বিন্দু মাত্র অনুরাগও এদের নেই। কিন্তু তাই বলেই এ কি তাদের,—কংগ্রেসের,—সার্থকতার নিদর্শন? দেশব্যাপী এই যে ইংরাজবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী মনোবৃত্তি,— এ কি খুশী হবার মত কিছু? সুবোধের মন সায় দিলে না। তার মনে হতে লাগল যে, লোকের মনের যে ভাব তাদের কথায় প্রকাশ পাচ্ছে তা নিছকই নেতিমূলক মনোবৃত্তি,—অসুস্থ চিত্তের কেমন যেন একটা বিকার। এ মনোবৃত্তির ইতির দিকটা একেবারে খালি,—আসন্ন জাপানী আক্রমণের পটভূমিকায় এ যেন সর্ব্বতোভাবেই বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কলেশহীন, নিরর্থক, এমন কি, অনিষ্টকর। ইংরাজবিদ্বেষ লোকের মনে বাড়ছে, এ কথা সত্য। কিন্তু দেশের ও জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় কি এর সার্থকতা? এই যে যুদ্ধবিরোধী মনোবৃত্তি,—এ তো নিছকই কাপুরুষতা, কেবলই পলায়নপরতা,—সহজ, আদিম, আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তির অমার্জ্জিত, কুৎসিৎ রূপ। নূতন এক বৈদেশিক আক্রমণের সূচনাতেই ইংরাজবিদ্বেষের সঙ্গে এই যে যুদ্ধবিরোধী মনোবৃত্তির সংযোগ,—এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সমগ্র জাতিটাই আক্রমণকারীর পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে না কি?—

ভবিষ্যতের কল্পনা করে সুবোধ ক্রমাগতই যেন শিউরে উঠতে লাগল। মুক্ত, স্বাধীন ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল রূপ তার চোখে পড়ল না; তার কেবলই মনে হতে লাগল যে, দেড় শত বছর আগে ভারতের যে পরাধীনতা সুরু হয়েছিল, যুদ্ধের পরেও তা-ই চলতে থাকবে। জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে পরাধীন ভারতের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর কোনও কারণে জাপান যদি এ দেশ আক্রমণ না করে তবে ইংরাজ রাজত্বই এ দেশে অব্যাহত থাকবে। হয় বৃটিশ ভারত, নয় জাপানী ভারত,—স্বাধীন ভারতের আবির্ভাবের সম্ভাবনা সে কিছুতেই কল্পনা করতে পারলে না।

হঠাৎ অরুণাংশুকে তার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল কম্যুনিষ্টদের নূতন জিগির,—এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ,—প্রতিরোধ নয়, সহযোগিতাই হবে ভারতীয় জনগনের পালনীয় নীতি। মনে পড়তেই তার মনটা বিতৃষ্ণায় বেঁকে গেল। কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গেই ঐ মনেরই নিভৃত একটা কোণে তীক্ষ্ণ একটা সংশয় কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠল,—যে নীতি ও যে কর্ম্মপদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে, সেই নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতিই কি অভ্রান্ত?—তাই কি সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ? আসন্ন বৈদেশিক আক্রমণের যে সম্ভাবনা ইতিমধ্যে প্রায় নিশ্চয়তা হয়ে উঠেছে, ওরই আলোকে তাদের পুরাতন নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতিকে নূতন করে পরীক্ষা করবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় নি কি? নিষ্ক্রিয় বৃটিশ-বিদ্বেষকে সক্রিয় স্বাধীনতার আকাঙ্খায় রূপান্তরিত করবার জন্ত তাদের কর্ম্মসূচির আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে না কি?

দুঃখু, ও দুঃখু—বলি, ও দুঃখু—

ডাক শুনে সুবোধ সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠল। মাঠ পার হয়ে কখন যে সে গাঁয়ে এসে ঢুকেছে, সে তা জানতেও পারে নি। ডান দিকে চোখ ফিরাতেই হলধর দত্তের বৈঠকখানা তার চোখে পড়ল। ফোক্‌লা মুখে এক গাল হেসে দত্ত রসিকতা করে বললে, দাদু কি চলতে চলতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে? এত বার ডাকছি—

ঘরে ঢুকে কুণ্ঠিত স্বরে সুবোধ বললে, শুনতে পাই নি, ঠাকুর্দ্দা,—একটা কথা ভাবছিলাম।

সে কথাটা সম্পর্কে দত্ত কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করলে না; আদর করে সুবোধকে কাছে বসিয়ে বললে, এস, দাদা, এস;—তোমার কথাই ভাবছিলাম। কাগজখানা সন্থ এসেছে কি না!—

কাগজ!—সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে।

হ্যাঁ রে, হ্যাঁ,—বুড়ো মাথা দুলিয়ে গর্ব্বের স্বরে উত্তর দিলে,—খবরের কাগজ। আমি রাখি যে—সাপ্তাহিক "বসুমতী।" পিয়ন সবে কাল বিকেলে দিয়ে গিয়েছে। সেই থেকেই তোমার কথা মনে উঠছিল। ভাবছিলাম—

সত্যই খবরের কাগজ। সুবোধ সাগ্রহে সেখানা কাছে টেনে নিলে। এখানে এসে অবধি সে খবরের কাগজ পড়ে নি। এ গাঁয়ে কেউ যে গাঁটের পয়সা খরচ করে খবরের কাগজ কিনতে পারে তা সে ভাবতেও পারে নি,—কাজেই খোঁজও করে নি। আজ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন একটা জিনিষ হাতে পেয়ে সে রীতিমত খুশী হয়ে উঠল। হউক না সাপ্তাহিক,—তবু খবরের কাগজ তো!

ছাপার অক্ষরের উপর তার চোখ গিয়ে পড়তেই মনটা তৎক্ষণাৎ ওর মধ্যে যেন ডুবে গেল। হলধর দত্তের বাকি কথাগুলি তার কানেও গেল না।

খবর তো বটেই,—খবরের সেরা খবর। যেমন চমকপ্রদ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব কংগ্রেস অগ্রাহ্য করেছে,—মুসলীম লীগও তাই। প্রায় সমস্ত কাগজখানিই ঐ সংবাদ দিয়ে ভরা। স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের মূল প্রস্তাব এবং ও সম্বন্ধে তার নিজের ভাষ্য ; তৎসম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব, কংগ্রেস নেতাদের বিবৃতি, স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের উত্তর, মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলালের প্রত্যুত্তর, অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বিবৃতি,—এ সব কাগজখানির এ সংখ্যায় সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছে। প্রত্যেকটি সংবাদ সুবোধ যেন বুভুক্ষুর মত গিলতে লাগল,—বিশেষ করে নেতাদের বিবৃতিগুলি। ওদের প্রত্যেকটিই তার মনে হতে লাগল যেন এক একটি জীবন্ত প্রেরণা। জ্বালাময়ী ভাষায় অন্তরের জ্বলন্ত বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। আপোষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়েছে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের অনমনীয় সঙ্কল্প পুনরায় ঘোষণা করা হয়েছে, নেতারা একজোট হয়ে দাবী করেছেন যে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির প্রতিশ্রুতিই আজ আর যথেষ্ট নয়, সে মুক্তি আজই চাই ; চাই ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, আসন্ন বৈদেশিক আক্রমণকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করবার জন্য চাই সমর আর দেশরক্ষা বিভাগের উপর দেশবাসীর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব। নিছক ভাবালুতা নয়, বস্তুনিরপেক্ষ ভাবময় আদর্শ মাত্রের জন্য হৃদয়ভিত্তিক উচ্ছাস মাত্র নয়,—বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী চিত্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ভারতের স্বাধীনতার অপরিহার্য্যতাকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে,—আর কিছুর জন্য না হউক, গোটা জাতিটাকে দেশরক্ষার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে জাপানকে প্রতিরোধ করবার কাজে নিয়োগ করবার জন্যই অবিলম্বেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাই।

অকাট্য যুক্তি, অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত, অনমনীয় দাবী। দেশরক্ষার অধিকারের দাবী পূর্ণ হয় নি বলেই কংগ্রেসের নরম ও গরম দল এক হয়ে আপোষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ; পড়তে পড়তে সুবোধের শিরায় শিরায় রক্তের প্রত্যেকটি কণাই যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। তার মনে হতে লাগল যে, তারই অন্তরের সকল আশা, আকাঙ্খা ও সঙ্কল্পই যেন ঐ সব বিবৃতির মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে,—যেন এতক্ষণ, পর্য্যন্ত যে কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে অন্তরে সে ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল

এদেরই মধ্যে রয়েছে তারও সন্তোষজনক মীমাংসার ইঙ্গিত,—যেন এদেরই ভিতর দিয়ে সে শুনতে পাচ্ছে অনেক দূরে রণদামামার উন্মাদনাভরা গম্ভীর নির্ঘোষ আর দেখতে পাচ্ছে সুদূর দিগন্তের কোলে নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারের গায়েও উষার প্রথম আলোকরশ্মির মত সফল স্বপ্নের ক্ষীণ হলেও গোলাপী একটু আভাষ।—

আশায় ও আনন্দে সুবোধের চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠল,—অন্ধের মত, মূর্খের মত বাইরের যে জগৎ থেকে পালিয়ে এসে নিজে সে এই অন্ধকূপের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, সেই বিরাট, চলমান, কর্ম্মকোলাহলমুখর জগৎটার সবাক একখানি চলচ্চিত্রই সে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একটার পর আর একটা খবর পড়তে পড়তে তার মনে হতে লাগল যে, অন্ধকূপের বদ্ধ বাতায়ন হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে খুলে গিয়েছে,—দূরে, অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে জীবনের বিপুল, বিচিত্র শোভাযাত্রা, মহাসাগরের জলদগম্ভীর সঙ্গীতের মত কানে আসছে দামামার গম্ভীর নির্ঘোষ, মুক্ত আকাশের আলোকোজ্জ্বল নীলিমার মধ্যে থেকে থেকে যেন ফুটে উঠছে কর্ম্মমুখর বৃহত্তর জগতের সাদর নিমন্ত্রণ।—

কিন্তু তাল কেটে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দত্ত আর যেন থাকতে না পেরেই বললে, কি খবর আছে কাগজে?—ও দুঃখু?—

সুবোধ যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল; একটু বিরক্ত হয়েই বললে, কি বলছেন?

যুদ্ধের অবস্থা কেমন মনে হয়?—দত্ত ভুরু নাচিয়ে বললে,—আমাদের একটু বুঝিয়ে দাও, দাদা,—পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মানুষ আমরা!—

সুবোধ কুণ্ঠিত হয়ে বললে, সবটা এখনও পড়া হয় নি, ঠাকুর্দ্দা।

তার পরেই সুর বদলে সে আবার বললে, কাগজখানা আমি নিয়ে যাই, ঠাকুর্দ্দা,—সবটা পড়া হয় নি আমার,—হলেই ফেরৎ দিয়ে যাব।

বিব্রতের মত একটু চুপ করে থেকে দত্ত উত্তর দিলে, তা নিয়ে যাও তাহলে। কিন্তু বৈকালেই আবার নিয়ে এসো। তখন গাঁয়ের লোক আরও দুদশজন এসে জুটবে। সবাইকে সব খবর তখন খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে,—মনে থাকে যেন।

শেষ পর্য্যন্ত না শুনেই সুবোধ কাগজগুলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পথে আসতেই আবার তার মনে হতে লাগল যে, বাইরের বড় জগৎটার ডাক আবার যেন সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

দিন সাতেক পরের কথা। সুবোধ অভ্যাসমত মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে অনেক বেলায় বাড়ীতে ফিরতেই জগদ্ধাত্রীদেবী হায় হায় করে উঠলেন,—সর্ব্বনাশ হয়েছে রে, দুঃখু,—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সুবোধের মুখ শুখিয়ে গেল; উঠানের মাঝখানেই থমকে দাঁড়িয়ে সে বললে, কি হয়েছে, ঠাকুমা?

সর্ব্বনাশ হয়েছে। হতভাগী সর্ব্বনাশ করেছে,—নিজে তো গিয়েছেই, আর সকলকেও ডুবিয়ে গিয়েছে।

কে?—কে কাকে ডুবিয়ে গিয়েছে?

ঐ যে—ওমা!—দুধ দিয়ে কি কালসাপ পুষেছিল ওরা! ঐটুকু মেয়ে,—সাত চড়ে কথা কয় না,—দেখলে মনে হয় ডান-বাঁ চেনে না এখনও। অথচ তারই পেটে পেটে এত কি না শয়তানী বুদ্ধি!—ওমা—কোথায় যাব আমি—

কার কথা বলছ, ঠাকুমা?—সুবোধ এবার ধৈর্য্য হারিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে,—কার মেয়ে কি সর্ব্বনাশ করেছে?

জগদ্ধাত্রীদেবী একটু কাছে এগিয়ে এলেন; কিন্তু কথা যা বললেন তা উত্তর নয়,—সে কি বলবার কথা, দাদা? চোখে যা দেখে এসেছি,—হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে আমার। ওমা—কি মেয়ে!—মেয়ে তো নয়, মিটমিটে ডাইনী। মান-প্রাণ দুইই খুইয়েছে হারামজাদী।

কিন্তু কে?

ঐ যে—ঐ আমাদের—ও মা—নিজে তো গিয়েছেই,—এখন বাড়ীশুদ্ধ সকলের হাতে দড়ি পড়বার অবস্থা!—

কি বিপদ!—সুবোধ অসহিষ্ণুর মত বললে,—কথাটা খুলেই বল না, ঠাকুমা,—কার মেয়ের কথা বলছ তুমি?

কার মেয়ে আবার? ঐ রজনীর মেয়ে—ঐ আমাদের দুর্গার কথা, দাদা—

কি করেছে সে?

সে কি বলবার কথা, দাদা?—সে যে—

কিন্তু বলতে হল। সুবোধের জেরার উত্তরে অনেক অবান্তর কথা, অনেক নির্ম্মম

সমালোচনার সঙ্গে জগদ্ধাত্রীদেবী যা বর্ণনা করলেন তা এক ভাগ্যবিড়ম্বিতা কিশোরীর জীবনের মর্ম্মস্পর্শী এক সকরুণ কাহিনী।

কুলীনের মেয়ে দূর্গা; বয়স হবে কুড়ির কাছাকাছি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিয়ে যদিও বা হল, স্বামীর ঘর আর তার করা হল না। বিয়ের পর দুটি মাস যেতে না যেতেই নোয়া-সিঁদূর খুলে সে আবার তার বাপের ঘরে ফিরে এল। সে আজ বছর দেড়েকের কথা।

কিন্তু দুর্গা যা হারিয়েছিল সে তার সৌভাগ্য আর সাধব্য, জীবন নয়;—সিঁথির সিন্দুরই সে মুছে এসেছিল, যৌবন নয়। লাল পাড়ের রঙীণ শাড়ী আর গায়ের অল্প দামের কখানা গয়না শ্বশুরবাড়ীতে ছেড়ে এলেও প্রকৃতির নিজের দেওয়া নারীদেহের সকল আভরণই সে সাথে নিয়ে এসেছিল; বুকের মধ্যে এনেছিল উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারীর অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ছন্দোময় কল্লোলিত উচ্ছাস, আর শিরার মধ্যে অপরাজেয় প্রাণের উদ্দাম, অবিরাম প্রবাহ। যে আকাঙ্ক্ষার বীজ প্রকৃতি নিজের হাতে রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন, বৈধব্যের কৃচ্ছসাধনা তাকে পুড়ে ভষ্ম করতে পারে নি। জীবনের কঠিন, অনমনীয় দাবীর কাছে দূর্গার শিক্ষা হার মেনেছিল; প্রবল আকাঙ্ক্ষার দুর্ব্বার আকর্ষণে নিজে সে ভেসে গিয়েছিল দুর্ব্বল, হালকা একটি তৃণখণ্ডের মত।

ঠিক কি যে হয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না। তবে এইটুকু বোঝা গিয়েছে যে, সে মা হতে যাচ্ছিল, কিন্তু হতে চায় নি। অবাঞ্ছিত সন্তানকে জন্মের আগেই সংসার থেকে বিদায় করে নিজের সতী নামটার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের মান বাঁচাবার জন্য পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা ধাত্রীর সাহায্য নিয়েছিল সে। সে বুড়ীর অভিজ্ঞতা হয় তো ছিল. কিন্তু কৃতিত্ব ছিল না। অত্যন্ত স্থূল যন্ত্রের সাহায্যে সেকালের অবৈজ্ঞানিক নিয়মে বিধবা দুর্গার জরায়ুর ভিতর থেকে ভ্রূণটিকে সে বের করে আনতে পারলেও পরে রক্তপাত সে বন্ধ করতে পারে নি,—সারা রাত অজস্র রক্তপাতের ফলে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে দুর্গা সকালে মরে শান্তি লাভ করেছে। অপরিণত ও অজাত শিশু মাতৃগর্ভেই প্রাণ হারালেও প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে নি,—যে মা মা হয়েও অবলীলাক্রমে গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণ নাশ করতে পারে, যেন তার উপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যেই তাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে সে। এদিকে মেয়ের অকালমৃত্যুতেই রজনী বাড়ুজ্জের দুর্ভাগ্যের অবসান হয় নি। লজ্জা তো ঢাকা

পড়েই নি, বরং আরও বীভৎস হয়ে পাড়াপ্রতিবেশী সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এমন কি, কার কাছ থেকে যেন খবর পেয়ে এ মৌজার দফাদার পর্য্যন্ত রজনীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়েছে। রজনী এবং তার হয়ে দুএকজন দরিদ্র প্রতিবেশী সাধ্যসাধনা করতে কসুর করে নি; কিন্তু দফাদার গোঁ ধরে বসেছে যে, দারোগার হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত শব সে শ্মশানঘাটে নিয়ে যেতে দেবে না।

সব কথা শুনে সুবোধ স্তব্ধ হয়ে গেল। রজনীর দুর্ভাগ্যের কথা তত সে ভাবলে না, কেবল দুর্গাকেই তার মনে পড়তে লাগল। ছেলেবেলায় মেয়েটিকে সে কত বার দেখেছে; এবার এসেও দেখেছে দুতিন বার,—এই তো দুদিন আগেও কত কথা তাদের হয়েছে। সত্যই দুর্গা নাম তার সার্থক হয়েছিল,—দুর্গাপ্রতিমার মতই রূপবতী সে। গরীব, গ্রাম্য ব্রাহ্মণের বিধবা মেয়ে ঐ দুর্গা,—হয় তো বা এক বেলার হবিষ্যান্নও সব দিন ভরপেট সে খেতে পায় নি। নিরাভরণ দেহ, চুলে তেল নেই, অমার্জ্জিত দেহের গৌর বর্ণ এই বয়সেই রুক্ষ হয়ে উঠেছে। একখানা ময়লা, মোটা, থানকাপড়ে কোনও রকমে লজ্জা ঢেকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে সেই প্রথম দিন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। তবু সুবোধের মনে হয়েছিল যে, সে যেন আগুনের জ্বলন্ত একটি শিখা,—অপরাজিত জীবনের লীলায়িত একটি ছন্দ। প্রথম দেখার সঙ্কোচ কেটে যাবার পর সে তার কাছে আবার অতীতের সেই চঞ্চলা বালিকাটির মতই প্রগল্‌ভা হয়ে উঠেছিল; এক দিন বলেই ফেলেছিল, বৌ আনবে না, দুঃখুদা? চিরদিন বুঝি এমন সন্ন্যাসীই থাকবে?—সুবোধ হেসে উত্তর দিয়েছিল, কি দরকার? বেশ তো দিন কেটে যাচ্ছে।—কিন্তু দুর্গা ছেলেমানুষের মত মাথা ঝেঁকে স্নেহময়ী ভগ্নীর মতই আবদার করে বলেছিল, না, দুঃখুদা, তা হবে না,—এবার বিয়ে তোমায় করতেই হবে।—হতভাগিনী নারী!—সুবোধের চোখে জল আসবার উপক্রম হল,—ভাগ্যবিড়ম্বিতার কি পরিণাম!—

একটি নিশ্বাস ফেলে সুবোধ বললে, কি করতে হবে, ঠাকুমা?

তুই একবার চল্ সেখানে,—জগদ্ধাত্রীদেবী চোখ মুছে উত্তর দিলেন,—রজনী কেবলই তোর কথা বলছে; দফাদারকে তুই যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—

সেই রাত্রে দুর্ব্বোধ্য কার্য্যকারণসূত্রে সুভদ্রাকে সুবোধের মনে পড়ে গেল। এই দুর্গার মতই হতভাগিনী সে,—হয় তো বা ওর চেয়েও বেশী। সুভদ্রার জীবনের

সমস্যা বরং আরও বেশী জটিল,—স্বামী পাবার আগেই সে মা হয়েছে। যে সমাজে দুর্গার ঠাঁই হল না, সুভদ্রাও তো সেই সমাজেরই মেয়ে,—অননুমোদিত মাতৃত্বের সমস্যা নিয়ে কি করবে সে? সমাজের রক্তচক্ষু, শত্রুর বিদ্রূপ, বন্ধুদের নির্ম্মম পরিহাস কল্পনা করে এই দুর্গার মতই সে নিজের জীবন বিপন্ন করবে না তো? অথবা সকল লজ্জা, সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে সে নিজেই গিয়ে মৃত্যুর শরণাপন্ন হবে না তো? দুঃখ তো সে কম পায় নি! প্রাণঢালা ভালবাসার বিনিময়ে সে পেয়েছে প্রতারণা,—জীবনের প্রারম্ভেই জীবনটা তার ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তার উপর ভবিষ্যতের এই সমস্যা,—পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের জননী হয়ে হৃদয়হীন, প্রতিহিংসাপরায়ণ এক সমাজের মধ্যে সুখহীন, আশাহীন একক জীবন যাপন করবার সম্ভাবনা ছাড়া তার সামনে আর কিছুই নেই। এই অবস্থায় ধৈর্য্য ও বিচারবুদ্ধি হারিয়ে মরিয়ার মত ভয়ঙ্কর রকমের কোন একটা কাজ করে ফেলা তার মত অসাধারণ মেয়ের পক্ষেও অসম্ভব তো না-ও হতে পারে!—তাকে উপদেশ দেবার, সান্ত্বনা দেবার কেউ তো আর নেই! যে ছিল, সে নির্ম্মম সত্য কথাটা তাকে শুনিয়ে দিয়েই চলে গিয়েছে,—মরে গেলেও সুভদ্রা হয় তো তার কাছে আর কিছুই চাইবে না। কিন্তু কি করবে সে? আজই বা সে কি করছে? অথবা এই দুর্গার মতই ভয়ঙ্কর কোন একটা কাজ এরই মধ্যে সে করেই ফেলে নি তো?—ভাবতেই সুবোধের বুকটা কেঁপে উঠল। সুভদ্রার জীবনের এত বড় একটা সঙ্কটের সময়ে তাকে একা ফেলে নিজে সে এত দূরে চলে এসেছে বলে হঠাৎ নিজের কাছেই নিজেকে তার অপরাধী মনে হতে লাগল।

সেই রাত্রে হুগলীর গঙ্গার ধারে নিজের কাছে নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়েছিল; কিন্তু আজকের এই অপরাধবোধ আর এক রকমের জিনিষ। সে রাত্রে তার ভাল ঘুম হল না।

পরের দিন সুবোধের জ্বর এল কম্প দিয়ে। গাঁয়ের কবিরাজ নাড়ী টিপে, নিদানের শ্লোক আওড়ে, বায়ুপিত্তকফ সম্বন্ধে অনেক বুকনি ঝেড়ে দুচার রকমের গুলি আর অনেক রকম অনুপানের ব্যবস্থা দিয়ে গেল। কিন্তু সুবোধ নিজে বুঝলে যে তার জ্বর ম্যালেরিয়া। জিলার সদরে লোক পাঠিয়ে সে জোলাপের ওষুধ আর কুইনাইন আনিয়ে নিলে। জ্বর বন্ধ হল সাত দিন পর। জগদ্ধাত্রী দেবী খুসী হয়ে গাঁয়ের অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় অনেকখানি দুধ ঢেলে পূজা দিয়ে এলেন;

সুবোধের কপালে সিঁদুরের একটা টিপ দিয়ে বললেন, মা পূজা নিয়েছেন,—জ্বর আর হবে না।

সুবোধ উত্তর দিলে না। জগদ্ধাত্রীদেবী বের হয়ে যাবার পর কুইনাইনের শিশিটা আর এক বার সে পরীক্ষা করে দেখলে,—অনেক চেষ্টায় সামান্য একটু কুইনাইন পাওয়া গিয়েছে; যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে জ্বরের আর একটা ধাক্কা সামলানো হয় তো যাবে। কিন্তু তার পর? সুবোধের মনটা খারাপ হয়ে গেল। যে দেশের জল আর বাতাসে ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়ানো রয়েছে, সে দেশে কুইনাইন পেলেও জ্বরকে সে ঠেকাবে কেমন করে?

দিন দুই পর গাঁয়ের চৌকিদার সুবোধের কাছে এসে খুব বিনীত ভাবেই তাকে খবর দিলে, দারোগা পাশের গাঁয়ে ইয়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে এসে বসেছেন,—সুবোধকে একটি বার সেখানে যেতে হবে।

সুবোধ বিস্মিত হল; এক বার তার সন্দেহ হল যে এটা দুর্গার অপমৃত্যুর জের। কিন্তু দারোগার কাছে যেতেই তার ভুল ভেঙ্গে গেল।

দুএকটা অবান্তর কথা বলবার পরেই দারোগা জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি এখন গাঁয়েই থাকবেন?

সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে, কেন, বলুন তো?

দারোগা অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে, আগে তো এখানে থাকেন নি আপনি,—নূতন এসেছেন। কি বৃত্তান্ত, কদিন থাকবেন,—সে খবরটা রাখতে হয় আমাদের। বুঝতেই তো পারছেন!—

সুবোধ মুচকি হেসে বললে, তা পারছি। কিন্তু যদি বলি যে আমি এখানে থাকব তাহলে কি করবেন আপনি?

আমি আর কি করব!—দারোগা কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে,—কেবল উপরে একটা রিপোর্ট করতে হবে। আপনার বিরুদ্ধে এরই মধ্যে একটা রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে কি না!—

রিপোর্ট!—সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে,—কি রিপোর্ট পেলেন আপনি?—

দারোগা এবারও কুণ্ঠিত স্বরেই উত্তর দিলে, হ্যাঁ, রিপোর্ট এসেছে একটা। সে দিন হিজলঘাটি গাঁয়ে লোকাপসারণের বিরুদ্ধে গাঁয়ের লোকদের উত্তেজিত করেছিলেন আপনি।

চক্ষের পলকে সে দিনের ঘটনাটা আগাগোড়া সুবোধের মনে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ মুখে তার উত্তর ফুটল না।

মিনিট খানিক পর দারোগাই আবার বললে, তবে জানেন, সুবোধবাবু,—কোন ভদ্রসন্তানের ক্ষতি করবার ইচ্ছে আমার একেবারে নেই। আপনি যদি এ গাঁয়ে না থাকেন তবে ও রিপোর্ট আমি চেপে যেতে পারি।

সুবোধ চমকে উঠে বললে, না, দারোগাসাহেব,—আপনার ইচ্ছে হলে ও রিপোর্ট আপনি স্বচ্ছন্দে উপরে পাঠাতে পারেন। তবে আমার নিজের কথা এই যে, এখানে থাকবার জন্য আমি আসি নি। আমার কর্ম্মক্ষেত্র আর এক জায়গায়। লোক ক্ষেপাতে হলে সেখানে গিয়েই ক্ষেপাব,—এখানে নয়।

একটু চুপ করে থেকে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে সে আবার বললে, আপনার কোন ভাবনা নেই, দারোগাসাহেব,—আমি শীগগিরই চলে যাব।

দারোগা চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে জিজ্ঞাসা করলে, কবে ?

সুবোধ হেসে ফেলে উত্তর দিলে, ঐ জায়গায় আপনাকে এক্ষুনি খুসী করতে পারছি নে, দারোগাসাহেব। শরীরটা একটু শক্ত না হলে যেতে পারব না। তাছাড়া,—জানেন তো,—সংসারে আমার থাকবার মধ্যে আছেন এক বুড়ী ঠাকুরমা। তাঁর কাছ থেকে ছুটি নেওয়া খুব সোজা কাজ নয়।

কিন্তু তারও সুযোগ খুব তাড়াতাড়িই এসে গেল। দিন দুই পরেই জগদ্ধাত্রীদেবী খুব ঘটা করে সুবোধকে কাছে বসিয়ে খুব বড় রকমের একটা গৌরচন্দ্রিকার পর বেশ মোলায়েম করে বললেন, তোর জন্য একটা সম্বন্ধ এসেছে, দুঃখু।

সুবোধ চমকে সোজা হয়ে বসে বললে, কি ?

জগদ্ধাত্রীদেবী মুচকি হেসে বললেন, তোর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, দাদা। মূলগাঁওয়ের মুখুজ্জেদের বড় সাধ তোর কাছে মেয়ে দেবার। ঘর ভাল,—দেবে-থোবেও বেশ। আর মেয়েটিও শুনেছি খুব সুন্দরী,—একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা।

এটুকু ভূমিকা। তার পর মূলগাঁওয়ের মুখুজ্জেদের খ্যাতি, বিত্ত আর প্রতিপত্তির বর্ণনা চলল ; যে মেয়েটিকে কোন দিনই তিনি দেখেন নি, তারই রূপগুণের বর্ণনা করতে গিয়ে জগদ্ধাত্রীদেবী হঠাৎ যেন কবি হয়ে উঠলেন আর সুবোধের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার স্বর্গীয় মাতাপিতার স্বপ্নের কথা বলতে বলতে সত্য সত্যই

তিনি কেঁদে ফেললেন। সকলের শেষে তিনি বললেন তাঁর নিজের কথা,—তাঁর বয়স হয়েছে, আর বেশী দিন তিনি বাঁচবেন না; কিন্তু মরবার আগে নাত-বৌকে যদি তিনি বরণ করে ঘরে তুলতে না পারেন, এই এত বড় অভিজাতবংশের রাজপ্রাসাদকে লক্ষ্মীহীন রেখেই তাকে যদি প্রাণত্যাগ করতে হয়, তবে মরেও তিনি শান্তি পাবেন না।

সব কথা সুবোধের কানে গেল না। কিন্তু মনটা তার মুগ্ধ হয়ে গেল আর চোখ দুটি অনড় হয়ে জগদ্ধাত্রীদেবীর মুখের উপর পড়ে রইল। সে মুখে অনুপম মাধুর্য্য, আর সে মাধুর্য্য জরাজীর্ণা বৃদ্ধার চিরনবীন অন্তরেরই অবিকল প্রতিচ্ছবি। সেই মনের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি, অদম্য অধ্যবসায় আর বিচিত্র সৃষ্টিকুশলতার কথা ভেবে সুবোধ অবাক হয়ে গেল। আশৈশবের বঞ্চিতা হতভাগিনী তার এই ঠাকুরমা। গরীবের ঘরে তাঁর জন্ম। বাপকে তিনি শৈশবেই হারিয়েছিলেন। স্বামীকে তিনি পেয়েছিলেন না পাওয়ার মত। সন্তান তিনি একেবারেই পান নি। পরের যে সংসারকে তিনি নিজের করবার জন্য আঁকড়ে ধরেছিলেন, তা-ও তাঁর চোখের সামনেই ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছে। সারাটা জীবনই তাঁর কেটেছে মরীচিকার অনুসন্ধানে। ব্যগ্র, ব্যাকুল দুটি বাহু মেলে যাকে তিনি বুকে টেনে আনতে চেয়েছেন, সে-ই তাকে ফাঁকি দিয়ে দূরে পালিয়ে গিয়েছে। তথাপি আজও তাঁর খোঁজা শেষ হয় নি। জীবনের কাঁটাভরা দীর্ঘ পথ হেটে এসে রক্তাক্ত চরণে বৈতরণীর তীরে সহস্র আশা ও আকাঙ্খার ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়িয়েও আজও তিনি ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নের জাল বুনে চলেছেন,—সুবোধের কাছ থেকে কোন উৎসাহ, এমন কি, একটা ইঙ্গিত পর্য্যন্ত না পেয়েও আজও তিনি সেই সুবোধেরই বিয়ে দিয়ে নূতন করে আবার সংসার পাতবার কল্পনায় বিভোর হয়ে রয়েছেন। ভেবে সুবোধের চোখে জল আসবার উপক্রম হল।

তার মৌনতাকে জগদ্ধাত্রীদেবী সম্মতির লক্ষণ বলে ভুল করে বসলেন। মনে মনে বেশ একটু খুসী হয়েই তিনি বললেন, তাহলে, দুঃখু,—মেয়েটিকে না হয় তুই নিজেই গিয়ে এক বার দেখে আয়,—কেমন?

সুবোধের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল; চমকে সোজা হয়ে বসল সে। মনটাকে তৎক্ষণাৎ সে শক্তও করে নিলে,—না, আর না; ব্যাপারটাকে আর বেশী দূর গড়াতে দেওয়া হবে না; আঘাত যখন দিতেই হবে তখন আর দেরী করা নয়। জগদ্ধাত্রীদেবীর

মুখের দিকে চেয়ে সে এক নিশ্বাসেই বলে ফেললে, দুএকদিনের মধ্যেই আমি চলে যাব, ঠাকুমা,—আমার কাজ আছে।

উত্তরটা জগদ্ধাত্রীদেবীর কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে হঠাৎ যেন তাঁর সারা শরীরটাই পাথর হয়ে গেল। তাঁর চোখে পলক পড়ল না, মুখে কথাও ফুটল না।

কিন্তু মুখ দেখেই তাঁর মনের ভাবটা আন্দাজ করে নিয়ে চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সুবোধ বললে, কালই যাব না, ঠাকুমা,—যাব তিন-চার দিন পর। আজ কেবল কথাটা তোমায় জানিয়ে রাখলাম।

কিন্তু এতে কোন ফল হল না; জগদ্ধাত্রীদেবী গাঢ় স্বরে বললেন, চলে যাবি তুই? বাড়ীতে থাকবি নে?

অধিকতর কুণ্ঠিত স্বরে সুবোধ বললে, কাজ আছে কি না!—

কিন্তু আমি যে—

কথাটা তিনি শেষ করলেন না। চোখের জল ইতিমধ্যে বাঁধ ভেঙ্গে গালের উপর ঝড়ে পড়েছিল; আঁচলের কোণ দিয়ে চোখ দুটি মুছে ফেলে তিনি আবার বললেন, কবে ফিরবি?

ঠিক বলতে পারি নে, ঠাকুমা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জগদ্ধাত্রীদেবী সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, চিরটা কালই এমন লক্ষীছাড়ার মতই ঘুরে বেড়াবি, দুঃখু? বে-থা করবি নে? সংসারী হবি নে?

সুবোধ হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তাতে তার মুখখানি হয়ে উঠল কুৎসিৎ; আর জগদ্ধাত্রীদেবীর কানে যা গেল তা শুষ্ক, কর্কশ, ফাঁপা, অদ্ভুত এক রকমের অস্ফুট একটু শব্দ।

তবু জগদ্ধাত্রীদেবী আশা ছাড়তে পারলেন না; বললেন, কিন্তু এঁরা যে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন,—কি বলব এঁদের? অপেক্ষা করতে বলব?

সুবোধ উত্তরে শুধু বললে, কি দরকার!

তবে নিষেধ করে দিই?

তাই ভাল।

জগদ্ধাত্রীদেবী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন; তার পর সহসা মুখ ফিরিয়ে গাঢ় স্বরে বললেন, আমার কথা শুনবি কেন তুই?—আমি তো আর তোর মা নই!—

অভিমান করলেন তিনি ; অনেক চোখের জল ফেললেন, রাগও করলেন। তাঁরই প্ররোচনায় গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ অনেকেও সুবোধকে অনেক অনুরোধ করলে। কিন্তু সুবোধের সঙ্কল্প টলল না। যাবার দিনটাও ঠিক করে নির্ম্মম ভাবে সে খবরটাও জগদ্ধাত্রীদেবীকে সে শুনিয়ে দিলে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত তাঁকেই হাল ছাড়তে হল।

যাবার আগের দিন জগদ্ধাত্রীদেবী সুবোধের সামনেই সিন্দুক খুলে পুরানো কিন্তু ভারি সুন্দর কাজ করা কাঠের ছোট একটি বাক্স সুবোধের সামনে রেখে বললেন, এই নে।

সুবোধ সবিস্ময়ে বললে, কি, ঠাকুমা,—কি আছে এতে ?

সঙ্গে সঙ্গে চাবি দিয়ে বাক্সটি সে খুলেই ফেললে। চোখে পড়ল সোনার এক জোড়া বালা,—স্তূপীকৃত সিঁদুরের মধ্যে ঝক্‌ঝক্ করছে। চমকে জগদ্ধাত্রীদেবীর মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, কি ঠাকুমা ? এ বালা কার ?

জগদ্ধাত্রীদেবী বললেন, তোমার মায়ের।

মায়ের ?

হ্যাঁ, দাদা,—তোমার মায়ের,—জগদ্ধাত্রীদেবী একটি নিশ্বাস ছেড়ে পরে উত্তর দিলেন,—তোমার মা মরবার আগে আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল ; বলেছিল তোমার বউ এলে তার হাতে পরিয়ে দিতে।

কতকটা কুণ্ঠিত, কতকটা বিহ্বল স্বরে সুবোধ বললে, কিন্তু এ বালা আমায় কেন দিচ্ছ, ঠাকুমা ?

জগদ্ধাত্রীদেবী মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলেন, তোমার বৌকে বরণ করে ঘরে তুলবার ভাগ্য তো আর আমার হল না,—তাই তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি। তুমিই পরিয়ে দিয়ো বৌকে ; বলো তোমার মায়ের কথা। আর,—আর আমার কথাও বলো,—আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ো তাকে।

সুবোধ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ; তার পর নিঃশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, এ বালা তোমার কাছেই থাক্, ঠাকুমা।

কিন্তু উত্তরে জগদ্ধাত্রীদেবী মাথা নেড়ে বললেন, না, দাদু,—দিন-কাল ভাল নয় ; কখন কি হয় বলা যায় না।

কি যে বল তুমি, ঠাকুমা !—সুবোধ একটু বিরক্ত হয়েই বললে,—এত দিন এটা তোমার কাছে রইল,—কিছু হল ; না—আর আজ—

না,—না,—ও তুই নিয়ে নে দুঃখু,—জগদ্ধাত্রীদেবী একটু দূরেই সরে গিয়ে বললেন,—চোর-ডাকাত আছে, আরও কত কি আছে ;—ও জিনিষ আমি আর রাখতে চাই নে।

সুবোধ বললে, চোর-ডাকাতের কথাটা কথাই নয় ; আর কি আছে তাই বল।

একটু চুপ করে থেকে জগদ্ধাত্রীদেবী মৃদু স্বরে বললেন,—আমার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে, দাদু,—এখন কবে যাই ঠিক নেই। তাই তোর জিনিষ তোর হাতে তুলে দিলাম,—বৌ এলে তাকে দিস।

সুবোধ হুগলীতেই ফিরে গেল।

রেলের ষ্টেশন থেকে কারখানার বস্তি পর্য্যন্ত এলাকাটা তার নিজের রাজ্যের মত। এক কালে সে ছিল এ রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট। কিন্তু এবার এখানে এসে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

সে বার জেল থেকে ফিরে এসেও সে বিস্মিত হয়েছিল,—লোকে তাকে চিনতেই পারে নি। তবে সে বিস্ময় ছিল আর এক রকমের ; আসলে তা ছিল ক্ষোভ। তথাপি নিজেকে সে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিল এই ভেবে যে, প্রায় একটি বৎসর এ অঞ্চলের অধিবাসীরা তাকে দেখতে পায় নি। এবার তার অনুপস্থিতির কাল দুমাসের বেশী হয় নি ; লোকে তাকে চিনতে পারলে না, তা-ও নয়। তবু অবস্থা দেখে সে যেন ঘাবড়ে গেল।

বেশীর ভাগ লোকই এমন ভাবে তার দিকে তাকাল যেন এখানে আবার তাকে দেখবার আশা কেউ করে নি। সুবোধের মনে হল যে, দুএক জন যেন তাকে দেখে মুখ টিপে হাসলে ; কেউ কেউ যেন ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে গেল ; দুএক জন যারা কথা বললে, তাদের ব্যবহারেও কোন আন্তরিকতা প্রকাশ পেল না।

মজদুর ইয়ুনিয়নের আপিসের কাছে গিয়ে সুবোধ থ হয়ে গেল,—আপিস সেখানে নেই, ভিতরে মুদীর দোকান, দোকানদারও বিদেশী ; এখানে নূতন এসে দোকান খুলে বসেছে।

পাশের দোকানের লোকটি সুবোধকে খবর দিলে যে মজদুর ইয়ুনিয়ন বড় রাস্তার উপরে একটা বড় বাড়ীতে উঠে গিয়েছে। সেই লোকটিই শ্যামাচরণের খবরও

দিলে,—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কারখানা এলাকা ছেড়ে গেরস্ত এলাকার একটা ছোট বাড়ীতে উঠে গিয়েছে সে।

শ্যামাচরণের খবর পেয়ে সুবোধ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু শ্যামাচরণ তাকে দেখে প্রথমে বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেল,—যেন সে ভূত দেখেছে অথবা নিজের চোখকেই নিজে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু তার পরেই সে ছেলেমানুষের মত হৈ চৈ করে উঠল,—এ কি,—সুবোধবাবু যে! কখন এলেন আপনি? কোথা থেকে এলেন?—গিয়েছিলেনই বা কোথায়?

কিন্তু সুবোধ উত্তরে বললে, আমার নিজের কথা পরে হবে, শ্যামাচরণদা—এখানকার খবর আগে বল,—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে।

শ্যামাচরণের উৎফুল্ল মুখ চক্ষের পলকে গম্ভীর হয়ে গেল; সে সংশয়ের স্বরে বললে, আপনি বুঝি কিছুই জানেন না? শোনেন নি কিছুই?

সুবোধ ঘাড় নেড়ে অস্ফুট স্বরে বললে, না।

শ্যামাচরণ উত্তর দিলে মিনিট খানিক পর। একটি নিশ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে সে বললে, তেমন কিছু নয়; ইয়ূনিয়নের নির্ব্বাচন হয়ে গেল; বিমলবাবু এবার হলেন সেক্রেটারি। তার পর আপিস তিনি ওখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছেন।

একটু থেমে অদ্ভুত এক রকমের হাসি হেসে শ্যামাচরণ আবার বললে, শুধু আপনি নন,—আমিও এবার বাদ পড়ে গিয়েছি, সুবোধবাবু,—কার্য্যকরী সমিতিতেও ওরা আমায় নেয় নি।

সুবোধ নড়ে বসল; ভূরুদুটি কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নির্ব্বাচন হল যে? অরুণাংশু বলেছিল আমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সব রকম সুযোগ দেবে?

শ্যামাচরণের ভুরু জোড়াও একটু যেন বেঁকে গেল; কয়েক সেকেণ্ড কাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে; তার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, সে কথা এখনও আপনার মনে আছে নাকি, সুবোধবাবু? আমি তো ভেবেছিলাম অন্য রকম। ওদের উপর রাগ আমি যতই করি না কেন, দোষ দিতে পারি নে ওদের। অরুণবাবু দেরী করতেই বলেছিলেন; কিন্তু বিমলবাবু বললেন যে, সুবোধবাবু নিজেই যখন কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন তখন দেরী করবার আর কি দরকার!

সুবোধের মুখ চুন হয়ে গেল। অভিযোগ মর্ম্মান্তিক, কিন্তু মিথ্যা নয়। এখানে থাকাই উচিত ছিল তার। মনে মনে মানতে হল তাকে যে, অরুণাংশুর সঙ্গে ও রকম একটা সর্ত্ত করবার পর এখান থেকে চলে যাওয়া, বিশেষতঃ কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়া তার উচিত হয় নি; ওতে নিজের কর্ত্তব্যচ্যুতি তো হয়েছেই অনুচরদের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

একটু মোলায়েম করে হলেও শ্যামাচরণও ঐ কথাটাই তাকে শুনিয়ে দিলে,—আপনার জন্যই এ রকম হল, সুবোধবাবু,—আমাদের দলের এক জন লোককেও ওরা কমিটিতে যেতে দেয় নি।

কুণ্ঠিত চোখে শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে সুবোধ উত্তর দিলে, সত্যি, আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে, শ্যামাচরণদা,—কিন্তু আর হবে না।

শ্যামাচরণ বিস্মিত হয়ে বললে, কি হবে না?

সুবোধ অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে, হঠাৎ এখান থেকে চলে গিয়ে যে অন্যায় আমি করে ফেলেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমি করব,—এমন করে করব যে ভবিষ্যতে কেউ আর বলতে পারবে না যে, কাজের সময় সুবোধকে তার নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

শ্যামাচরণ কথাটা যেন ঠিক ঠিক বুঝতে পারলে না, অথবা যা বুঝলে তা সে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করতে পারলে না। মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর অস্ফুট স্বরে সে বললে, কি করবেন, সুবোধবাবু?

সুবোধ দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, এখানেই আবার আমি নূতন করে ইয়ুনিয়ন গড়ব।

নূতন ইয়ুনিয়ন?

হ্যাঁ,—একেবারে আন্‌কোরা নূতন। এক দিন আমিই তো এখানে নূতন ইয়ুনিয়ন গড়েছিলাম।—

শ্যামাচরণ বিস্ময়ে আবার নির্ব্বাক হয়ে গেল। একটু পরে সুবোধই অল্প একটু হেসে আবার বললে, কি, শ্যামাচরণদা,—আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

না,—তা ঠিক নয়,—বলতে বলতে শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে,—কিন্তু—মানে—নূতন ইয়ুনিয়ন সত্যি করবেন আপনি?

করব না?—সুবোধ দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে,—এ দেহের সমস্ত শক্তি, মনের সমস্ত অনুরাগ তিল তিল করে ঢেলে দিয়ে মজদুর ইয়ুনিয়ন গড়েছিলাম। ভেবেছিলাম

যে, এ হবে একখানি শাণিত অস্ত্র যা দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে তার কার্য্যকারিতা আর তীক্ষ্ণতার প্রমাণ দেবে। অথচ স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন আসন্ন হয়ে এসেছে তখনই আমার সেই অস্ত্র চলে গেল প্রতিক্রিয়ার হাতে। আমারই হাতে-গড়া অস্ত্রের অপপ্রয়োগ আজ আমি অক্ষমের মত চেয়ে দেখব নাকি?

শ্যামাচরণ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে যে, কথা বলতে বলতে অবরুদ্ধ আবেগে সুবোধের ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে,—মুখের উপরে ফুটে উঠেছে একটা অনমনীয় দৃঢ়তার ভাব,—সঙ্কল্পের দীপ্তি চোখ দুটিতে জ্বলে উঠেছে আগুনের প্রদীপ্ত দুটি শিখার মত। বিস্ময়ে শ্যামাচরণের মুখে কথাই ফুটল না।

কিন্তু একটু থেমে সুবোধই আবার বললে, না, শ্যামাচরণদা,—ওরা যা নিয়েছে নিক,—আমি এখানে নূতন করেই আবার ইয়ুনিয়ন গড়ব,—এমন লোক নিয়ে ইয়ুনিয়ন গড়ব যারা জিগিরের মোহে ভুলবে না, সোভিয়েট রুশিয়ার দালালী করাকেই সাম্যবাদের রাজপথ বলে চালাতে চাইবে না, রুশিয়ার স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ যারা বড় করে দেখতে পারবে আর দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতেও যারা কুণ্ঠিত হবে না। তুমি আমার এই ইয়ুনিয়নে আসবে, শ্যামাচরণদা?

শ্যামাচরণ নিজেকে আর সামলাতে পারলে না, উৎফুল্ল স্বরে বললে, নিশ্চয়ই আসব, সুবোধবাবু; আর আমি ঠিক জানি যে, আপনি ডাক দিলে এ কারখানার প্রত্যেকটি মজদুরই আপনার ইয়ুনিয়নে এসে যোগ দেবে।

কিন্তু উচ্ছ্বাসটা থিতিয়ে আসবার পর শ্যামাচরণের চোখেমুখে আবার সংশয়ের ছায়া দেখা দিল। কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, কিন্তু সুবোধবাবু, আপনি নিজে এখানে থাকবেন তো?

বোধ করি বা ভবিষ্যতের কি একটা স্বপ্ন দেখেই সুবোধ নিজেও তখন খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল; সে মুচকি হেসে বললে, শুধু এখানে নয়, শ্যামাচরণদা,—আমি থাকব তোমার এই বাসায়,—বারান্দায় একখানা চারপাই পেতে পড়ে থাকব।

এর উত্তরে শ্যামাচরণের মুখে কথাই ফুটল না।

বেশ একটু কৌতুক অনুভব করে সুবোধই আবার বললে, বৌ রাগ করবে ভেবে ভাবনায় পড়ে গেলে, শ্যামাচরণদা? কিন্তু কোন ভাবনা নেই তোমার। তাকে বলে-কয়ে আমিই সব ঠিক করে নেব।